বুদ্ধদেব গুহ

ঋজুদা সমগ্র ৪

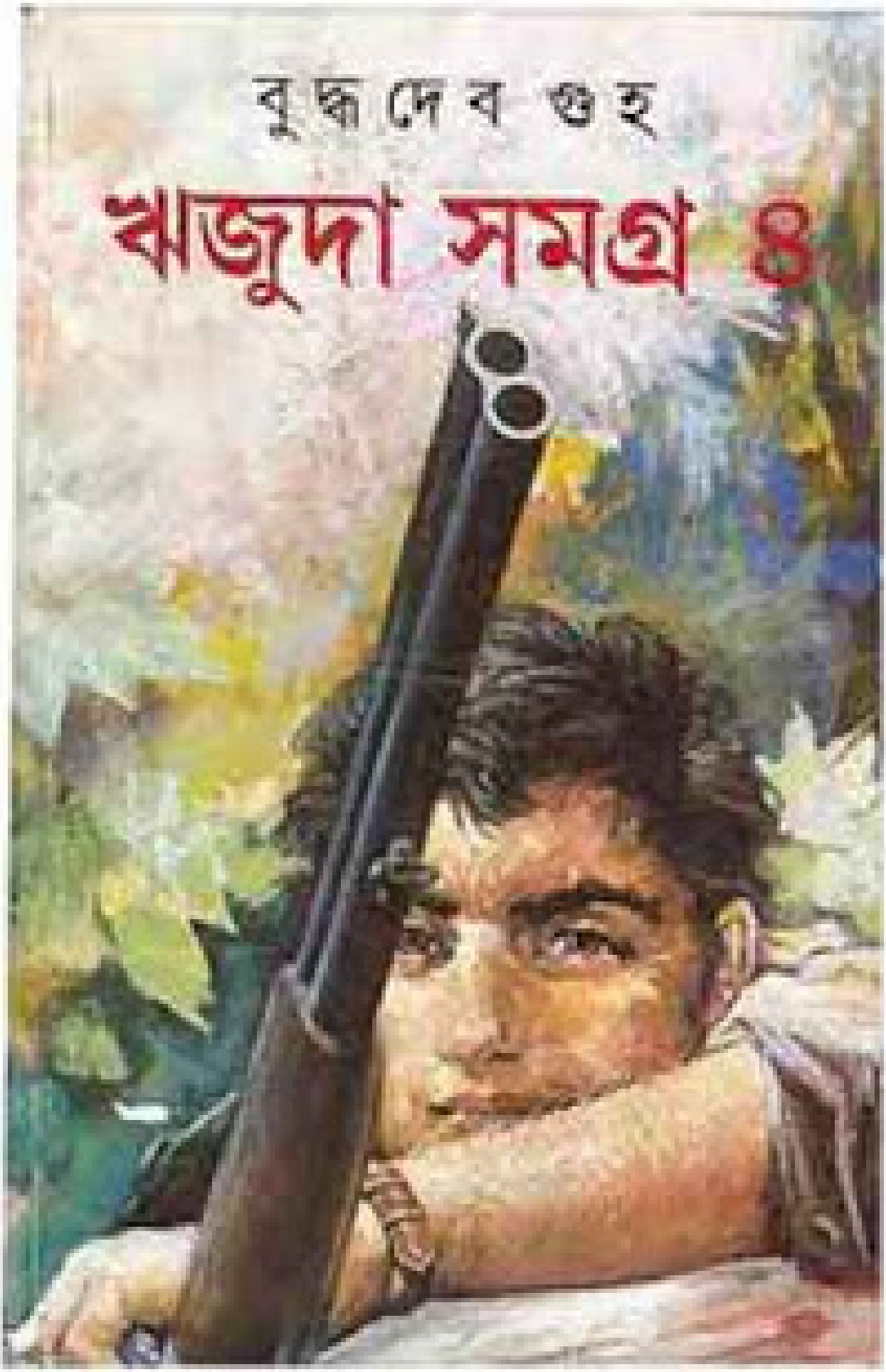

ঋজুদা সমগ্র ৪

বুদ্ধদেব গুহ

গ্রন্থ-পরিচয়

ঝিঙ্গারিয়ার মানুষখেকো। শারদীয়া বর্তমান,২০০০।

ঋজুদা এবং ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে। শারদীয়া কিশোর ভারতী,১৯৯৯।
পরে পরিবর্ধিত আকারে অঞ্জলি প্রকাশনী থেকে।

ভভিলস আইল্যান্ড। শারদীয়া বর্তমান,২০০১।

জুজুমারার বাঘ। শারদীয়া তথ্যকেন্দ্র,২০০০।

হুলুক পাহাড়ের ভালুক। শারদীয়া কিশোর ভারতী,২০০১।

ঋজুদার সঙ্গে রাজডেরোয়ায়। শারদীয়া আজকাল,২০০০।

মোটকা গোগোই। শারদীয়া আজকাল,২০০১।

অরাটাকিরির বাঘ। শারদীয়া তথ্যকেন্দ্র,২০০১।

মুখবন্ধ

এই সংকলনে অনেকগুলি ঝজুদা কাহিনীই সংকলিত হল। এর মধ্যে গোয়েন্দা কাহিনী যেমন আছে তেমন আছে অ্যাডভেঞ্চার ও শিকার কাহিনীও।

'ডেভিলস আইল্যান্ড' আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ঝজুদা ইন ফুল-স্ট্রেস্থ, অর্থাৎ রুদ্র, তিতির এবং ভটকাইকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পৌঁছেছেন। সেখানে, একসময়ের জলদস্যুদের ডেরা 'ডেভিলস আইল্যান্ড' ও অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী।

'ঝজুদা এবং ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে' ঝাড়খণ্ড-এর হাজারিবাগ জেলার সীমারিয়া-টুটিলাওয়ার জঙ্গলে এক ডাকাতের সঙ্গে ঝজুদাদের এনকাউন্টারের কাহিনী।

'ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো' মধ্যপ্রদেশের দুর্গমতম অঞ্চল 'ব্যায়রান'-এর কাছে ঝিঙ্গাঝিরিয়াতে একটি মানুষখেকো বাঘ শিকারের গল্প। সেখানে ঝজুদার সঙ্গে শুধুমাত্র রুদ্রই ছিল।

'জুজুমারার বাঘ' এবং 'হুলুক পাহাড়ের ভালুক' ঝজুদার নিজের বলা শিকার কাহিনী। এতে তার চেলাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। জুজুমারা, ওড়িশার সম্বলপুরের সম্বলপুর-রেঢ়াখোলের পথের পাশে একটি জঙ্গলাবৃত জায়গা আর হুলুক পাহাড় ঝাড়খণ্ডের পালামৌ জেলার মারুমারের একটি উঁচু পাহাড়।

'অরাটাকিরির বাঘ' ওড়িশার কালাহান্ডি জেলার অরাটাকিরি গ্রাম-সংলগ্ন এলাকাতে বিচরণকারী একটি মানুষখেকো বাঘ শিকারের গল্প। সেখানে তিতির যেতে পারেনি।

'মোটকা গোগোই' আসামের কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্যের মধ্যে ঐকশৃঙ্গ পাণ্ডার-মারা চোরা শিকারিদের সঙ্গে ঝজুদা, রুদ্র এবং ভটকাই-এর টক্করের কাহিনী।

একটি কথা জোর দিয়ে বলা দরকার যে ঝজুদাকাহিনীর একটিও পটভূমি কল্পিত নয়। আমি নিজে যে সব জায়গাতে এবং জঙ্গলে গেছি, দেশে এবং বিদেশে, সেই সমস্ত পটভূমিতেই ঝজুদার কাহিনীগুলি সযত্নে বুনেছি। এগুলির একটিও যাকে বলে, কষ্ট-কল্পিত গাল-গল্প, তা নয়। এগুলি পড়লে ভারতের নানা রাজ্যতো বটেই বিদেশের নানা জায়গাতে বেড়ানো যেমন হয় তেমন স্বদেশের প্রতি ভালবাসা, ন্যায়বোধ এবং সাহসও জন্মায়। কিশোর কিশোরীদের রুচি উন্নত হয়, সুন্দর হয় এবং তারা শেখেও অনেক কিছু। তাদের চরিত্র এবং রসবোধ গড়ে ওঠে।

ঋজুদার একটি কাহিনীও হেলা-ফেলাতে লেখা নয়। নিজে সেই সব জায়গাতে গেছি তো বটেই সেই সমস্ত জায়গা ও জায়গার মানুষজন সম্বন্ধে অনেক পড়াশোনাও করেছি। শুধুমাত্র তারপরেই কলম ধরেছি।

বড়দের জন্যে লেখার চেয়ে কিশোরদের জন্যে লেখা অনেক কঠিন।

আমার বিশ্বাস, আমার মৃত্যুর পরেই ঋজুদা কাহিনীগুলি আরও জনপ্রিয় হবে কারণ তখন রুদ্র নতুন নতুন কাহিনী প্রতিবছর আর উপহার দেবে না।

বিনত

বইমেলা ২০০২

বুদ্ধদেব গুহ

সূচিপত্র

ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো ১৩
ঋজুদা এবং ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে ৫৯
ডেভিলস আইল্যান্ড ১৩৩
জুজুমারার বাঘ ১৯৭
হুলুক পাহাড়ের ভালুক ২২৯
ঋজুদার সঙ্গে, রাজডেরোয়ায় ২৫১
মোটকা গোগোই ৩০৫
অরাটাকিরির বাঘ ৩৪৩

গ্রন্থ-পরিচয় ৩৮৩

ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো

ঋজুদার সঙ্গে এ পর্যন্ত দেশ-বিদেশের অনেকেই জঙ্গলে গেছি কিন্তু এইরকম প্রচণ্ড গরমে কখনও আসিনি কোথাওই। আর গরম বলে গরম? মধ্যপ্রদেশের গরম। তার ওপরে মে মাসের শেষ।

ঋজুদা বলে, যখনই মনে হবে খুব গরম বা শীত লাগছে অমনি মনে করার চেষ্টা করবি এর চেয়েও বেশি গরম আর শীত কোথায় পেয়েছিস এর আগে। আর যেই সে কথা মনে করবি অমনি মনে হবে যে এ গরম বা শীত সেই তুলনাতে 'কিসসুই' নয়।

ঋজুদার এই টোটকা অন্য জায়গাতে যে কাজে লাগেনি তা বলব না কিন্তু মধ্যপ্রদেশের এই সিধি জেলার গহন অরণ্য আর পাহাড়ঘেরা বনে সেই ধন্বন্তরী টোটকাও পুরোপুরি বিফল হয়েছে।

তবে একথা ঠিক যে, ঋজুদা বা আমি কেউই শখ করে এখানে আসিনি। সিধি জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তো বটেই, মধ্যপ্রদেশের চিফ সেক্রেটারি শর্মা সাহেব এবং প্রিন্সিপাল কনসার্ভেটর পরিহার সাহেবের সনির্বন্ধ অনুরোধেই এই পাহাড় জঙ্গলের 'কালাপানি' অঞ্চল এই 'ব্যয়রান'-এর মধ্যের একটি অখ্যাত জায়গার ফরেস্ট-বাংলোতে ডেরা করেছি আমরা ঝিঙ্গাঝিরিয়ার কুখ্যাত মানুষখেকো বাঘটি মারবার জন্যে। রেওয়ার মহারাজ আগেকার দিনে এই সব অঞ্চলে খুনি ও অন্য অপরাধীদের নির্বাসন দিতেন, ইংরেজরা যেমন দিতেন আন্দামানে। তাই এই 'ব্যয়রান'ও কালাপানি হিসেবে বিখ্যাত।

বাঘের সঙ্গে ঋজুদার যেরকম প্রেম তা সম্ভবত নয়না মাসির সঙ্গেও ছিল না। যখন ঋজুদার সঙ্গে প্রথমবার ওড়িশার টিকরপাড়াতে যাই, নয়না মাসি, মেসোর সঙ্গে সেখানে দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছিল। তখন আমি খুবই ছোট ছিলাম, ঋজুদা যদিও বলে, 'তুই এখনও ছোটই আছিস।' ছোট হলেও ঋজুদার মধ্যে নয়না মাসি সম্বন্ধে ভারি আশ্চর্য এক আচ্ছন্ন ভাব লক্ষ করেছিলাম। হয়তো তাকেই ভালবাসা বলে। জানি না। সেই ভাবটির কার্যকারণ পরে আরও বড় হয়ে হয়তো বুঝব।

বাঘের সঙ্গে গভীর প্রেম বলেই 'The wide hearted gentleman' বাঘকে ঋজুদা এমনি কখনওই মারতে চায় না। মানুষখেকো বাঘও নয়। বলে, আরে! বেচারি তো আর শখ করে মানুষখেকো হয়নি! মানুষের অত্যাচারেই হয়েছে। পাপ করলে মানুষকে তার প্রায়শ্চিত্ত তো করতে হবেই। খাকই না কিছু মানুষ। মানুষের মতো বংশবৃদ্ধি তো আজকাল গিনিপিগ বা নেংটি ইঁদুর বা শুয়োরেরাও করে না। হোক কিছু মানুষের বংশনাশ।

তবে সুন্দরবনের বাঘেদের উপরে কিন্তু ঋজুদার একটুও দরদ নেই। ঋজুদা বলে, পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগ যতই বাতেল্লা করুন না কেন সুন্দরবনের বাঘমাত্রই যে মানুষখেকো সে বিষয়ে আমার কোনওই সন্দেহ নেই। ওই সব মানুষখেকো বাঘ বাঁচাবার জন্যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড যে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে গত কয়েক বছর ধরে সরকারের মাধ্যমে এবং ক' বছরে বাঘ কত বেড়েছে সুন্দরবনে তা সঠিক কারও জানা না থাকলেও অসমসাহসী সব মউলে, জেলে, বাউলে গরিবস্য গরিব কত মানুষেরা ওই কয়েক বছরে যে সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘেদের পেটে গেছে তা নিয়ে একটি গবেষণা হওয়া দরকার। ভবিষ্যতে হয়তো হবেও। তখন যেসব মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে এত মানুষ 'খুন' হয়েছে তাদের যথাযোগ্য শাস্তিবিধানও হবে হয়তো। ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের উচিত তাঁদের দেয় টাকার কিছু অংশ এই গরিব মানুষদের বেঁচে থাকার জন্যে বরাদ্দ করা।

এখন বিকেল সাড়ে চারটে। রোদের তাপ এখনও প্রচণ্ড। গত রাতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সন্ধে সাতটা থেকে বারোটা জিপে করে আমরা ঘুরছি স্পটলাইট নিয়ে রাইফেল-বন্দুক রেডি পজিশনে ধরে। যদি মানুষখেকোর সঙ্গে অচানক মোলাকাত হয়ে যায়, এই আশাতে। কিন্তু হয়নি।

প্রায় ছ'দিন অন্তর একজন করে মানুষ মেরে চলেছে এই ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো। সবসুদ্ধ, আজ অবধি, যে সব মৃত্যু বনবিভাগ এবং জেলাপ্রশাসনের খাতাতে নথিবদ্ধ হয়েছে, তাতে জানা গেছে যে বত্রিশ জন মানুষ খেয়েছে বাঘটা। বনের গভীরতম জায়গার অনেক মৃত্যুর খবর নথিবদ্ধ হয়ওনি। মানুষই চলে গেলে, তা খাতায় লিখিয়ে কী লাভ তা ভেবে পায়নি এই গরিব-গুরবোরা।

আমরা গতকালই সকালে রেনুকুটে ট্রেন থেকে নেমে এখানে এসে পৌঁছেছি দুপুরবেলাতে। আজ দুপুরে খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে সারারাত জাগতে হবে জেনে বিকেল চারটেতে এককাপ চা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছি নিজের নিজের জলের বোতল, রাইফেল-বন্দুক, গুলি, এবং টর্চ নিয়ে।

আজই একেবারে শেষরাতে একটি রায়শোয়ার মেয়েকে ধরেছিল বাঘটা। মেয়েটির নাম সুখমন্তি। সে প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দিতে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছিল। মেয়েটির ডানদিকের বুক এবং পেছনের বাঁদিকের কিছুটা খেয়ে তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে একটা আলগা পাথরে ভরা ছোট টিলার অগভীর গুহার

থাকে, যাকে ইংরেজিতে বলে 'wallowing', তখন বলাই বাহুল্য, শম্বর বা হরিণদের যতই গরম লাগুক তারা ওই জলের ত্রিসীমানাতেও আসে না।

ব্যাকওয়াটারের জলটা যেখানে, সে জায়গাটা আমার এবং ঋজুদার দু'জনেরই আগ্নেয়াস্ত্রের পাল্লার মধ্যে। ঋজুদার ধারণা যে, বাঘ গুহাতে রাখা মেয়েটির দিকে যাবার আগে ওই জলে তার তৃষ্ণা মিটিয়ে যাবে এবং খাওয়া শেষ হবার পরেও আবার ওখানেই জল খেতে আসবে। ওই জলের তিনপাশে ঝোপ-ঝাড় বিশেষ নেই। ছোট গাছ-গাছালিও বলতে বিশেষ কিছু নেই তাই বাঘ যদি সত্যিই জলে আসে তবে নিশানা নিয়ে গুলি করতে সুবিধা হবে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। সপ্তমী কি অষ্টমী হবে। চাঁদ উঠবে। তবে দেরি করে। চাঁদের বা তারার আলো জলে প্রতিফলিত হয় বলে জলা জায়গাকে অন্য জায়গা থেকে অনেক বেশি আলোকিত করে। চাঁদ যদি নাও ওঠে তবুও তারার আলোতেও গুলি করা যাবে ও টার্গেট দেখা যাবে। যদি হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয় তবে মুশকিল। গতকালও সন্ধের পর অনেকক্ষণ ঝড়ের তাণ্ডব চলেছিল। মে মাসের শেষ, বর্ষা বুঝি তড়িঘড়িই এসে গেল। এমনিতেই সারা পৃথিবীর আবহাওয়াই তো ওলট পালট হয়ে গেছে। ঋতুচক্র আর নিয়ম মেনে আদৌ ঘোরে না।

দেখতে দেখতে ঘণ্টা দেড়েক সময় কেটে গেল। আলো একটু নরম হয়েছে। ভাবছি, পাটা খুব আস্তে আস্তে একটু ছড়িয়ে দিই এমন সময়ে চোখ পড়ল জলের দিকে। মিশকালো, অত্যন্ত লম্বা একটি সাপ, প্রায় তিনমানুষ লম্বা হবে, জলের দিকে চলেছে জল খেতে। তার মিশকালো গায়ের ওপরে সাদা কালো পটি দেওয়া। পেটের দিকে কালো রং হালকা হয়ে প্রায় সাদাটে হয়ে গেছে। সাপটা জলের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ ফণা তুলে দাঁড়াল। মাটি থেকে প্রায় তিন সাড়ে তিন ফিট মতো উঁচু ফণা। ফণার উপরে ইংরেজি V চিহ্নকে উলটে দিলে যেমন দেখায় তেমনই একটা চিহ্ন। কেন অমন করল, কে জানে। কোনও কিছু তাকে বিরক্ত করেছে কি? ঠিকই তাই। যা ভেবেছিলাম। একটা বিরাট বিরাট দাঁতওয়ালা শুয়োর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ করতে করতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে জল খেতে আসছিল। শুয়োরের লেজটা উত্তুঙ্গ হয়ে রয়েছে, বুনোদের যেমন হয়। দিশি শুয়োরের লেজ শোয়ানো থাকে। বরাহ বাবাজি ওই সাপের চেহারা, দৈর্ঘ্য এবং ফণা তোলার বহর দেখে আর না এগিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সাপটা জলের প্রান্তে মাথা নিয়ে গিয়ে জল খেল তারপর অতি দীর্ঘ শরীরটাকে ভারি চমৎকার এক চকিত ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে নিয়ে যে পথে এসেছিল সে পথেই ফিরে গেল। সাপটা ফিরে গেলে বরাহ বাবাজি জলে এসে সামনের দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে জল খেল। তার দাঁতের বাহার আছে বটে। বাঁকানো দাঁত দুটি। যার পেট চিরবে, সে অভিশাপ দেবার সময়ও পাবে না। তার আগেই পঞ্চত্বলাভ করবে।

সাপটা কী সাপ হতে পারে তাই ভাবছিলাম। আমি সাপ তেমন চিনি না। চিনতে চাইও না। আফ্রিকান গাব্বুন ভাইপারই হোক কি উত্তর আমেরিকার

র‍্যাটল-স্নেক কি আমাদের দিশি গোখরো, কেউটে, কি শঙ্খচূড় তাদের থেকে দূরে থাকতেই ভালবাসি আমি। সাপ দেখলেই গা ঘিনঘিন করে আমার। সব সাপকেই বিষধর বলে মনে হয়। ঋজুদা অনেকই বুঝিয়েছে আমাকে যে আমাদের দেশের অধিকাংশ সাপই নির্বিষ। কিন্তু আমার সাপকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যায় না। কামড়ালে তবেই না বোঝা যাবে বিষধর না নির্বিষ। অমন এক্সপেরিমেন্টে কাজ নেই আমার।

বরাহ বাবাজি জল খেয়ে ফিরে যেতেই দূর থেকে বাতাসে কীসের যেন এক গুঞ্জরণ ভেসে এল। যেন কোনও মনো-ইঞ্জিন টাইগার মথ বা বনাঞ্জা প্লেন উড়ে আসছে। আওয়াজটা কাছে আসতেই বোঝা গেল একটি আওয়াজ নয়, আওয়াজের সমষ্টি। প্রায় শ' পাঁচেক কমলা-রঙা প্রজাপতির একটি ঝাঁক উড়ে আসছে এদিকে। কাছাকাছি আসতেই তারা নীচে নেমে এল এবং তারপর ঝিঙ্গাঝিরিয়া নদী থেকে যে তিরতিরে স্রোত বেয়ে ব্যাকওয়াটারের জল এসেছে সেই তিরতির করে যাওয়া স্রোতের পাশের ভিজে বালিতে একবার বসে আবার উড়ে তারা জল খেতে লাগল। আশ্চর্য এক দৃশ্য। গেরুয়া মাটি, সাদা জল সবকিছু প্রজাপতিদের ডানার কমলা রঙের আভাতে ঢেকে গেল। ফ্লেমিংগো পাখিরা আমাদের ওড়িশার চিলিকা হ্রদ-এ বা আফ্রিকার লেক মানিয়ারা বা গোরোংগোরোর মৃত আগ্নেয়গিরির গহ্বরের হ্রদে বসে থাকলে জলে যেমন কমলা ছায়া পড়ে তেমনই ঝিঙ্গাঝিরিয়ার নালার জলে কমলা ছায়া পড়ল। ঠিক সেই সময়েই একটা কোটরা হরিণ খুব ভয় পেয়ে ডাকতে ডাকতে আমার পেছন দিকের জঙ্গলের গভীরে দৌড়ে গেল আর এক জোড়া রেড-ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ ডিড-ড্যি-ড্যু-ইট ডিড-ড্যি-ড্যু-ইট করে ডাকতে ডাকতে ঝিঙ্গাঝিরিয়া নালার প্রায় শুকনো বুক ধরে উড়তে উড়তে তাদের লম্বা লম্বা পা দুটি দোলাতে দোলাতে এদিকে উড়ে আসতে লাগল।

আমি, ঋজুদা যেখানে বসে আছে গামহার গাছটার ওপরে, সেদিকে তাকালাম। বাঘ কি এসে গেল দিন থাকতেই?

একটা কাঠঠোকরা পাখি ঋজুদার ডানদিকে ঝিঙ্গাঝিরিয়া নালার দিকে একটা বড় গাছে বসে ঠক ঠক করছিল, তিতিরেরা চিহাঁ চিহাঁ চিহাঁ করছিল, তারা হঠাৎই যেন মন্ত্রবলে থেমে গেল। শেষ বিকেলের কাকলিমুখর প্রকৃতির মুখে কে যেন হঠাৎই কুলুপ এঁটে দিল। কিন্তু সেই নিস্তব্ধতা বন্ধ্যা হল। তা নিস্তব্ধতাই প্রসব করল শুধু! তার পরেও ঘটনার মতো কোনও ঘটনা ঘটল না।

ঋজুদা আজকে হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ডের প্যারাডক্স নিয়ে বসেছে। প্যারাডক্স ব্যাপারটা যে কী তা অনেক শিকারিও জানেন না। আপনারা যাঁরা রুদ্র রায়ের লেখা এই ঋজুদা-কাহিনী পড়ছেন তাঁরা যে জানবেন না তাতে আর আশ্চর্য কী! প্যারাডক্স আগেকার দিনের রাজা-মহারাজদের এবং সচ্ছল রহিস শিকারিদের অতি প্রিয় স্পোর্টিং ওয়েপন ছিল। ডবল ব্যারেল বন্দুকের মতোই দেখতে কিন্তু

তার ব্যারেল পয়েন্ট বারো বোরের। স্মুথ বোর শটগান। আর অন্য ব্যারেলটাতে রাইফলিং করা। ফলে, প্যারাডক্স দিয়ে বন্দুক এবং রাইফেল দুয়েরই কাজ একই সঙ্গে করা যায়। তবে এসব ওয়েপন আমার মতো সাধারণ ঘরের শিকারিরা অনেকেই দেখেননি। ঋজুদার কথা আলাদা। সে একধারে মহারাজা অন্যধারে ফকির।

বন একেবারেই নিস্তব্ধ হয়ে যেতেই হঠাৎ খেয়াল হল আমার যে, সূর্য, ঋজুদা যে টিলার কাছে বসেছে সেই টিলাটির পেছনের পশ্চিমের উঁচু পাহাড়টার আড়ালে ডুবে গেল। অন্ধকার হতে যদিও তখনও অনেক দেরি ছিল। দিনভর রোদে-পোড়া বনের গা থেকে একটা তীব্র উগ্র কটু-কষায় গন্ধ উঠতে লাগল। তখন বোধহয় গ্রীষ্মবনের গা-ধুতে যাবার সময়। পর্ণমোচী গাছেদের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার পোড়া পোড়া গন্ধ, পাথরের বগলতলি আর উরুর ভাঁজে ভাঁজের খাঁজে খাঁজের শিলাজতুর গন্ধ, পিটিসবনের উগ্র গন্ধ, বনপথের ঝাঁঝা রোদে তন্দুরি হওয়া লাল মাটির গন্ধ সব মিলেমিশে এক আতরের কারখানাই খুলে গেল যেন হঠাৎ আর ওমনি তীব্রস্বরে মনের কামনা বয়ে হাওয়াটা বইতে লাগল দিনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে।

বলতে ভুলে গেছি, সাপটা চলে যেতেই পাখিরা এসেছিল। কেউ একা একা। কেউ কেউ দোকা দোকা। আবার কেউ ঝাঁক বেঁধে। কত না তাদের রঙের বাহার, গলার স্বরের বৈচিত্র্য। কোকিল, পাহাড়ি ময়না, বেনে-বউ, কুবো, তাদের মস্ত বড় কালো লেজ আর বাদামি শরীর নিয়ে, ময়ূর, বন-মুরগি, তিতির, পাপিয়া, ফুলটুসি, মৌটুসি, দুর্গা টুনটুনি, টিয়া, নীলকণ্ঠ, বড়কি ও ছোটকি ধনেশ এবং মোহনচূড়া। আরও কত পাখি। সকলের নাম কি জানি আমি। এই বন যেন পাখিরই রাজ্য।

সবই ভাল, কিন্তু যখনই গুহার মধ্যে [redacted] বাঘের নখদন্তে ক্ষতবিক্ষত, ছেদিত-অঙ্গ মেয়েটির কথা মনে পড়ছে, ভারি মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখতেও পারিনি আমি। [redacted] গায়ের রং কালো যদিও, কিন্তু ভারি সুন্দর তার গড়ন শরীরের। এক মাথা চুল, কোমর ছাপানো।—এখন রক্তে মাখামাখি হয়ে রয়েছে। জটা বেঁধে গেছে। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। তার মুখটি দেখেছিলাম। পাশ ফেরানো। ভারি মিষ্টি মুখ। ভাবছিলাম, তার মা-বাবা আর স্বামীর বুকের মধ্যে কীই না বুঝি হচ্ছে এখন, যদি আমার বুকের মধ্যেই এমন ঝড় ওঠে। তবে গরিবদের কষ্ট সইবার ক্ষমতা অসীম। তাদের সব কিছুই সয়ে যায়। অন্তত আমরা তাই ভাবি।

সাপটা কী সাপ কে জানে। ঋজুদাও নিশ্চয়ই দেখেছিল। পরে ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

এবারে আকাশে যে গোলাপি আভাটি ছিল তাও দ্রুত সরে যাচ্ছে। একটা কুটুরে ব্যাঙ ডেকে উঠল। অনেক দূর থেকে বনের গভীরতম কেন্দ্রবিন্দু থেকে

কালপেঁচা ডাকল একটা। দুরগুম-দুরগুম-দুরগুম করে। ওই আলো আঁধারিতেই একজোড়া নেকড়ে বাঘ এবং একটি হায়না জল খেয়ে গেল তাদের জিভে চক-চক-চক-চক শব্দ করে। ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকোরও এতক্ষণে জল খেয়ে সেই গুহাটির দিকে যাওয়ার কথা। কিন্তু সে এল না। কেন এল না, কে জানে। সে যদি নাই এসে থাকে তবে কোটরা হরিণটা অমন ভয় পেয়ে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে গেল কেন কিছুক্ষণ আগে? রেড-ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গরাই বা উড়তে উড়তে কাকে পাইলটিং করে নিয়ে আসছিল এদিকে?

এটা বুঝতে পারছি যে এই বাঘকে মারা অত সহজ হবে না আমাদের পক্ষে। কারণ একে মারার অনেকেই চেষ্টা করেছেন রেনুকুট, মির্জাপুর, সিঙ্গরাউলি, রবার্টসগঞ্জ, বেনারস এবং সিধির শিকারিরা। যাঁরা কেউই হয়তো আমার তো বটে, ঋজুদার চেয়েও খারাপ শিকারি নন। অথচ কেউই মারতে পারেননি তাকে। সেই বাঘকে খুব সহজে আমরাও মারতে পারব না।

এর আগে ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো তিনজন শিকারিকে মেরেছে। তার মধ্যে একজনকে খেয়েওছে। সিঙ্গরাউলির কয়লা খাদানের একজন আদিবাসী মেট। আসলে আমলোরির। সে খুব ভাল শিকারি ছিল। তবে ওই তিন শিকারিই বাহাদুরি করে মাটিতে অথবা বড় পাথরের আড়ালে বা টিলার ওপরে বসেছিল। মাচা বাঁধায়নি। ঠিক কী যে হয়েছিল তা বলতে পারত একমাত্র তারা নিজেরাই। কিন্তু তারা তো আর কথা বলতে পারবে না।

মনে হচ্ছে, অন্ধকার গাঢ় হবার পরেই বাঘ আসবে মড়িতে। তবে সে যদি যে পথ দিয়ে এসে মড়ি এখানে রেখে ফিরে গেছিল সে পথ দিয়েই আসে, তবে অন্ধকারেও অন্ধকারতর তাকে চোখে পড়বেই। আমার চোখকে ফাঁকি দিলেও সে ঋজুদার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। কিন্তু তার কি পিপাসা পায়নি একটুও। 'মারা' বনবাংলোর ফরেস্ট গার্ড ভাইয়ালাল শর্মা যা বলেছিল তাতে ঝিঙ্গাঝিরিয়ার ওই জল ছাড়া এ তল্লাটে জল আর কোথাওই নেই। বাঘ যে অন্যত্র জল খেয়ে আসবে এমনও নয়। তবে? সে এল না কেন? সে কি আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছে?

এতসব প্রশ্ন নিজেই নিজেকে করছি আর জবাবগুলো নিজের বুকের মধ্যেই গুমরোচ্ছে। ঋজুদা যদি আমার মাচাতেও বসত, মানে, দু'জনে একই মাচাতে, তাহলেও ওই সব প্রশ্নর একটিও এখন করা যেত না। কারণ, কোনও জানোয়ারের মড়ি বা মানুষের মৃতদেহ যার উপরেই বসা হোক না কেন, মানুষখেকো বাঘ শিকারে এলে শিকারিকেও মড়ার মতোই বসে থাকতে হয়। অনেক বছরের শিক্ষা লাগে ভাল শিকারি হতে। চোখ, কান, নাক তো বটেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কেও জাগিয়ে তুলতে হয়। চোখের দৃষ্টিকে একশো আশি ডিগ্রি বিস্তার করতে শিখতে হয়। এর জন্যে অনেকেই শিক্ষানবিশি লাগে। এই কারণেই অনেক কাঁদুনি গাওয়া সত্ত্বেও ঋজুদা ভটকাইকে এবারে নিয়ে আসেনি সঙ্গে। বুঝতেই পারছি যে ঝিঙ্গাঝিরিয়ার

বাঘকে ঋজুদা বিশেষ সম্ভ্রমের চোখে দেখছে। কারণটা এই যে, সে সত্যিই খুব ধূর্ত এবং বিপজ্জনক। নইলে ঋজুদার সঙ্গে কম মানুষখেকো বাঘ তো আমরা এ পর্যন্ত কবজা করিনি! নিনিকুমারীর বাঘ, পুরাণাকোটের বাঘ, আরও কত জায়গার বাঘ।

এখন গভীর অন্ধকার নেমে এসেছে। রাত-পাখির ডাক, পেঁচাদের ঝগড়া, দূরের পাহাড় থেকে ভেসে আসা শম্বরের দলের হঠাৎ একপ্রস্থ ঢাঙ্ক ঢাঙ্ক ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দই নেই। অন্ধকার ক্রমশই গাঢ় হয়ে উঠেছে। গাঢ় থেকে গাঢ়তর। এমনই যে, চোখের পাতা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। অন্ধকার যেন হঠাৎ তরলিমা লাভ করেছে। জলের তলাতে চোখ খুলতে দুই চোখের পাতাকে যেমন জল সরাতে হয়, জল সইতেও হয়, তেমনই করে এই অন্ধকারকে সরাতে হচ্ছে চোখের পাতা দুটির। তবে জলের তলায় চোখ একবার খুললে সবুজ নীল সোনালি কত রঙের আলোর সুতো দিয়ে কোনও অদৃশ্য তাঁতির তাঁত বোনা দেখা যায় কিন্তু এই অন্ধকারের গভীরে, অন্ধকার সরিয়ে চোখের পাতা মেললে শুধু অন্ধকারই। গভীর, গভীরতর, গভীরতম। নাঃ চোখ এখন পুরোপুরিই অকেজো হয়ে গেছে। এখন শুধু কান আর নাকেরই ভরসা।

কতক্ষণ সময় কেটে গেল কে জানে! যে-ঘড়িটা এবারে পরে এসেছি তার ডায়ালে রেডিয়াম নেই। টর্চ জ্বালানোর প্রশ্নই ওঠে না। আমার কাছে টর্চ নেইও। যা আছে তা একটি পেনসিল টর্চ, ক্ল্যাম্পের সঙ্গে রাইফেলের ব্যারেল-এর গায়ে ফিট করা। ব্যাক-সাইটের একটু পেছনে। বাঁ হাত দিয়ে ব্যারেলের নীচে যেখানে রাইফেলকে ধরব নিশানা নেবার সময়ে, সেই বাঁ হাতেরই বুড়ো আঙুল দিয়ে ওই টর্চ-এর লম্বাটে সুইচটিতে চাপ দিলেই রাইফেলের নলের ওপরে লাগানো টর্চের নিশানা নিয়ে গুলি করতে সুবিধে হবে। কিন্তু সে টর্চ তো ব্যারেলের সঙ্গেই লাগানো। তা খোলা যাবে না। যতক্ষণ অন্ধকার থাকে, মানে রাতের বেলা খোলা যদি যেতও তবেও অবশ্য মাচাতে বসে তা জ্বেলে ঘড়ি দেখা যেত না আদৌ।

হঠাৎই একটা ফিস ফিস আওয়াজ উঠল, প্রায়-পত্রহীন বনে বনে, পথের ধুলোতে, ঘাসে, পাতায়। একটা হাওয়া ছাড়ল ঝুরু ঝুরু করে। ঘাস পাতা পটুসের ঝোপ আন্দোলিত হতে লাগল। দেখতে দেখতে হাওয়াটা জোর হল এবং জোর হতেই তখনই বোঝা গেল যে, অন্ধকার হয়ে যাবার পরেই আমার অজানিতে পরতে পরতে মেঘ জমেছে আকাশে। সেই জন্যেই হয়তো এত গুমোট লাগছিল এতক্ষণ। সে কারণেই তারাও দেখা যাচ্ছিল না এবং অন্ধকার অত গাঢ় হয়েছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাওয়াটার জোর বাড়ল এবং পুবের পাহাড়গুলির দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আসতে লাগল। তার মানে ওদিকে বৃষ্টি নেমেছে। তারও কিছুক্ষণ পরে গোমো থেকে বাড়কাকানাতে আসা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের মতো ধীরে-সুস্থে বৃষ্টি এল চিটির-পিটির শব্দ করে। তপ্ত কড়াইয়ে জল পড়লে যেমন বাষ্প ওঠে, গন্ধ ছোটে বাপ্পর, তেমনই রোদেপোড়া লাল মাটির পথে জল

পড়তেই গন্ধ উঠল চারদিকে। আর শুধু পথের ধুলোর গন্ধই তো নয়, সারি সারি দাঁড়িয়ে-থাকা ঊর্ধ্ববাহু নাগা সন্ন্যাসীদের মতো হরজাই জঙ্গলের গাছেদের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা থেকেও গন্ধ উড়তে লাগল। গন্ধ উড়তে লাগল চাঁপা ফুলের। বনের বুকের কোন গোপনে যে তারা ফুটে ছিল এতক্ষণ বোঝা পর্যন্ত যায়নি। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি বনের বুকের ওই গন্ধ-জরজর বৃষ্টির ফিসফিসানির মধ্যে। একেবারে ভুলেই গেলাম যে আমি বসে আছি একটি সুন্দরী মেয়ের অর্ধভুক্ত-লাশ পাহারা দিয়ে মানুষখেকো বাঘ মারার জন্যে। এই আমার দোষ। আমি যে কবি নই শিকারি, এই বাস্তব কথাটাই মনে থাকে না আমার ঠিক যখন সেই কথাটা মনে রাখা খুবই জরুরি।

বেশ অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টি যেমন হঠাৎই এসেছিল তেমন হঠাৎই থেমে গেল এবং তারপর দামাল হাওয়াটা রাখালের মতো এক আকাশ বিক্ষিপ্ত মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল অন্য বনের দিকে। তারারা ফুটল একে একে। তাদের নরম স্নিগ্ধ নীল সবুজ দ্যুতির নরম ছায়া কাঁপতে থাকল ঝিঙ্গাঝিরিয়ার ব্যাকওয়াটারের জলে। একটা কুটুরে ব্যাঙ ডেকে উঠল অদৃশ্য একটি গাছের কোটর থেকে। যে বড় বড় ঝিঁঝিরা অসহ্য গরমে দিনের বেলাতেই করতাল বাজানোর মতো করে ডাকে তারা বনের প্রথম বৃষ্টিকে স্বাগত জানিয়ে ডেকে উঠল সমস্বরে আর এক জোড়া পিউকাঁহা ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে ডেকে কলুষহীন রাতের আকাশকে চষে বেড়াতে লাগল। আকাশ তারাদের আলোতে আলোকিত হওয়াতে টিলাটাকে আরও বেশি কালো ও ভুতুড়ে মনে হতে লাগল। ঋজুদা যে গামহার গাছটাতে বসেছিল সেটাকে আলাদা করে চেনা গেল না আর। সেটা যেন টিলাটারই অঙ্গীভূত হয়ে গেল।

আমার খুব পিপাসা পেয়েছিল। খুব আস্তে আস্তে ওয়াটারবটলটা বাঁ পাশ থেকে তুলে ছিপি খুলে প্রায় নিঃশব্দে গলাতে যখন জল ঢালছি ঠিক তখনই দেখলাম পুবের জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে আধখানা চাঁদ উঠল বৃষ্টিস্নাত পাহাড় বনকে রুপোঝুরি করে। জলের বোতলটা ছিপি বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে দিয়ে এবার দু'চোখ ভরে সেই আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য দেখতে লাগলাম। এতক্ষণ যেন অন্ধ হয়েই ছিলাম। এই আধখানা চাঁদ এসে চক্ষুদান করল আমায়। দুঃখ হল রায়শোয়ার মেয়েটির জন্যে। কী যেন নাম তার? সুখমন্তি। হ্যাঁ সুখমন্তি। কিন্তু সুখ ছিল না তার কপালে। সুখমন্তি বেচারি জানতেও পেল না যে প্রচণ্ড দাবদাহর পরে বৃষ্টি নেমেছে ঝিঙ্গাঝিরিয়া এলাকাতে। সে এমন বৃষ্টিভেজা বনের রূপ দেখতে পেল না। পাবে না, আর কোনওদিন।

আরও কতক্ষণ কেটে গেল কে জানে। রাত তখন ন'টা-দশটা হবে। জলের দিকে চেয়ে আছি আমি। ঋজুদা আমাকে ভার দিয়েছে বাঘ যদি ফিরে যাবার পথ ধরেই গুহার দিকে আসে এবং জলও যদি খায় তবে যখন সে আসবে তখনই তাকে ধড়কে দিতে হবে। তাই আমার এলাকাতেই আমি জোর নজরদারি

চালাচ্ছি। এখন যদি বাঘ আসে তবে তাকে আর মানুষ খেতে হবে না। গর্ব করে বলছি না, কিন্তু এই রাইফেলের একটিও গুলি আজ অবধি ফসকাইনি আমি। বাঘ আজ এলে, তার আর নিস্তার নেই।

একই দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উদগ্রীব, উৎকর্ণ, উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে এক ধরনের ক্লান্তি আসে শিকারির অজান্তেই। জানি না, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কি না। একটি কোটরা হরিণ জল খেতে এসেছিল যে কখন, খেয়ালই করিনি কারণ চোখের পাতা নিশ্চয়ই জুড়ে গেছিল। হঠাৎই তার হিস্টিরিয়া-রোগীর মতো চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে টিলার উলটোদিকে দৌড়ে যাওয়াতে চমক ভাঙল আমার। চমকে উঠে টিলার দিকে চেয়ে দেখি আলগা পাথর একের পর এক থরে থরে সাজিয়ে রাখা কালো ভুতুড়ে টিলাটার আকৃতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

কী পরিবর্তন?

ভাল করে নজর করে দেখি টিলার কাছিম-পেঠা মাথাটির আকৃতি যেন আগের মতো নেই। কী ঘটল? নিজেকে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরও পেলাম এবং পেয়েই রাইফেল তুললাম সেইদিকে। বাঘটা পেছন দিক থেকে টিলার মাথাতে উঠে এসেছে নিঃশব্দে। উঠে, টিলার মাথা থেকে ঋজুদা যে গামহার গাছটিতে বসে আছে তাতে নামার মতলব করছে। অতদূর থেকে গুলি করলে গুলি হয়তো লাগত কিন্তু গুলি করতে হলে রাইফেলটাকে তুলে ধরে গুলি করতে হবে কারণ টিলাটার উচ্চতা আমার মাচা থেকে অনেকখানি এবং তা করতে গেলে আমার রাইফেলের গুলি চিরাঞ্জিদানা গাছের কোনও ডালপালাতে লেগে প্রতিসরিত হয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কিছু একটা না করতে পারলে ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো ঋজুদাকে আচমকা ধরে ফেলে তার মাথাটা চিবিয়ে দেবে। বাঘ মারার চেয়েও ঋজুদাকে বাঁচানো আমার কাছে অনেকই বেশি জরুরি বলেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, ঋজুদা! বাঘ! তোমার মাথার উপরে বসে।

আমার গলা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই একটা চাপা বিরক্তির ওঁয়াও আওয়াজ তুলে বাঘ মুহূর্তের মধ্যে টিলার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ভেবেছিলাম, ঋজুদা বলবে, থ্যাঙ্ক ইউ রুদ্র। আজ তোর জন্যেই জীবন পেলাম আমি। কিন্তু তা না বলে, ঋজুদা প্রচণ্ড এক ধমক দিল আমাকে। বলল, ইডিয়েট!

আমি থ হয়ে গেলাম। ঠাকুমা যে বাক্যটি প্রায়ই বলেন, সেই বাক্যটিই মনে পড়ে গেল আমার ঃ 'যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।'

সকালে 'মারা' বাংলোতে ডিমের ভুজিয়া, দিশি ঘিয়ে ভাজা পরোটা আর লেবুর আচার দিয়ে যখন আমরা ব্রেকফাস্ট সারছি তখন নীগাঁহি থেকে সুরাবলী সিং রেঞ্জার তাঁর জিপ নিয়ে এসে হাজির। বললেন যে, নর্দার্ন কোলফিল্ডসের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস. কে. সেন সাহেব আর ফিনান্স ডিরেক্টর এ. কে. দাস সাহেব আপনার খোঁজখবর করতে এসে পৌঁছোবেন একটু পরেই, কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না জানতে। সঙ্গে বিশ্বজিৎ বাগচীকেও নিয়ে আসবেন, সুপারিনটেনডিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, তিনি নাকি ঋজুদা-কাহিনীর খুব ভক্ত এবং নিজেও কবি।

আমি আর ঋজুদা সারারাত যার যার গাছে বসেছিলাম চুপ-চাপ। পুবে আলো ফুটতেই মাচা থেকে আমরা দু'জনেই নামলাম। থুড়ি, ঋজুদা তো মাচাতে বসেনি, গামহার গাছের ডালেই বসেছিল।

সুখমন্তিকে সেখানেই ফেলে আমরা কিছুটা এগোতেই দেখি সুখমন্তির বাবা ও স্বামী এবং মারা গ্রামের বেশ কয়েকজন লোক হাতে টাঙ্গি, গাদা বন্দুক, তীর-ধনুক ইত্যাদি নিয়ে দল বেঁধে এ দিকেই আসছে। রাতে কোনও গুলির শব্দ না শুনতে পেয়ে ওরা বুঝতেই পেরেছিল যে বাঘ মরেনি। তবে এও বুঝতে পারেনি যে, শিকারিরাও বেঁচে আছে কিনা। তেমন মনে করার পেছনে যুক্তিও ছিল। কারণ, এ বাঘ তো শিকারি-খেকো হিসেবেও খুবই নাম কিনেছে। ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো চুপিসাড়ে দুই শিকারিকে খেয়ে সাফ করে দিয়ে থাকলেও তো অতদূরের গাঁয়ে বসে তার শব্দ শোনা যেত না। তা ছাড়া কমবয়সি আমার চেহারা-ছবি গ্রামবাসীদের বিশেষ ভাল যে লাগেনি তা প্রথমেই আমি বুঝেছিলাম। ওদের মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন বলতে চাইছে, 'হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল?' নেহাত ঋজুদার ল্যাংবোট হয়ে এসেছি বলেই আমাকে ওরা মেনে নিয়েছিল।

ওরা সকলে আমাদের মুখোমুখি আসতেই ঋজুদা বলল, সুখমন্তি যেমন ছিল তেমনই আছে। তোমরা ওকে কবর দিতে পারো। ওকে আর আমাদের দরকার নেই। বাঘ ওকে আর ছোঁয়নি।

ওরা সঙ্গে করে একটি ছোট খাটিয়া এবং নীলরঙা মোটা একটা খদ্দরের চাদর নিয়ে এসেছিল। সুখমন্তির বড় জা যে সেও এসেছিল ভাসুরের সঙ্গে। গতকাল তাকে খুবই কাঁদতে দেখেছিলাম। আজকে কিছুটা সামলেছে। ওর জা সুখমন্তির কাছে গিয়ে তার শরীর চাদরে ঢেকে তারপরই চৌপাইয়ে তুলে নিয়ে আসবে। পুরুষদের নগ্না সুখমন্তির কাছে যেতে লজ্জাও করত খুবই। আমার তো মনে হয়েছিল এই বুঝি সুখমন্তি চোখ খুলে আমাকে দেখতে পেয়েই লজ্জাতে ধড়ফড় করে উঠে বসবে। কথায় বলে না, 'লজ্জা যায় না মলেও।'

ওরা তারপর 'রাম নাম সত্ হ্যায়। রাম নাম সত্ হ্যায়' ধ্বনি দিতে দিতে সুখমন্তিকে নিয়ে গিয়ে কবর দেবে ওদের কবরভূমিতে।

ওরা আমাদের পেছনে ফেলে টিলাটার দিকে এগিয়ে গেলে ঋজুদা আমাকে বলেছিল, আজই আমরা কলকাতাতে ফিরে যেতে পারতাম যদি তুই অমন কেলো না করতিস।

আমি বললাম, আমি জানব কী করে!

কী জানবি?

ঋজুদা বিরক্তির সঙ্গে বলল।

তারপর বলল, তুই কি আমার সঙ্গে জঙ্গলে এই প্রথমবার এলি? তুই কোন আক্কেলে ভাবলি যে বাঘ টিলার উপরে উঠে এসেছে আর আমি তা জানতেই পারিনি।

তারপরে, পাইপটাতে ভাল করে আগুন ধরিয়ে বলল, তোকে বলিনি আগে, কারণ, বলার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আমি যে টিলাটার গায়ের সঙ্গে প্রায় লেগে-থাকা গামহার গাছটাতে বসেছিলাম তা তো ওই জন্যেই। গাছটাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল গরমের সন্ধেতে নানা পশু-পাখি-সরীসৃপের ভিড় ঠেলে ঝিঙ্গাঝিরিয়ার বাঘ ওদিক দিয়ে হয়তো গুহাতে আসবে না। উলটোদিক দিয়েই আসবে। এবং এলে, এই কাছিম-পেঠা টিলাটার মসৃণ মাথা থেকে প্রায় চল্লিশ ফিট লাফিয়ে নামার চেয়ে গামহার গাছের মোটা ডাল বেয়ে নেমে আসাটাই ওর পক্ষে সুবিধের হবে। কেন মনে হয়েছিল জানি না, কিন্তু হয়েছিল। আমার এরকম মনে হয় সময়ে সময়ে, মনে হয় ভিতর থেকে কেউ মনে করিয়ে দেয়।

তারপর বলল, বাঘটা টিলার মাথাতে এসে প্রথমে গুঁড়ি মেরে বসেছিল অনেকক্ষণ সমস্ত পরিবেশ প্রতিবেশ ভাল করে নিরীক্ষণের জন্যে। তখনই তাকে মারতে পারতাম কিন্তু একটা গাছের ডালের আড়ালে ছিল তার গলা ঘাড় এবং বুক। অত কাছ থেকে ওই রকম বড় ও কুখ্যাত বাঘকে তো বেজায়গাতে গুলি করা যেত না। এক গুলিতেই তাকে ধরাশায়ী না করতে পারলে সে আমাকে ছ্যাদরা-ভ্যাদরা করে দিত। তাই অপেক্ষা করছিলাম, কখন সে উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা এগিয়ে এসে গামহার গাছে পা রাখবে। উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আমি স্মুথ-ব্যারেলের অ্যালফাম্যাক্স-এর পৌনে তিন ইঞ্চি এল. জি. দিয়ে ঘাড়ে মারতাম আর মারলেই সে টিলার মাথাতেই থিতু হয়ে যেত। কিন্তু কী আর করব।

আমি চুপ করে রইলাম।

ঋজুদা বলল, এই জন্যেই বলে, 'Man proposes God disposes'। বাঘটা যেই উঠে দাঁড়াতে যাবে, আমি গুলি করব, ঠিক সেই সময়েই তোর আর্তনাদ। নিমেষের মধ্যে সে এক ডিগবাজিতে ভাগলবা হল। ওই ডিগবাজির উপরেই যে গুলি করতে পারতাম না, তা নয়। করলে, হয়তো গুলি লাগতও তার শরীরে। কিন্তু শরীরে যেসব জায়গাতে লাগাতে চাইছিলাম সেইসব জায়গাতে লাগত না।

হয়তো পেটে বা পেছনের পায়ে লাগত। সেই ঝুঁকি এই বাঘের বেলা নেওয়া যেত না।

তারপর প্যারাডক্সটাকে ডান কাঁধ থেকে বাঁ কাঁধে কাঁধ বদল করে বলল, এই বাঘের জন্যে, যদি আহত করে তাকে ছেড়ে দিতাম, জবাবদিহি আমাকে যেমন করতে হত, তেমনই করতে হত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অনুপ কুমারকে। বনমন্ত্রীকেও মধ্যপ্রদেশে বিধানসভায় কৈফিয়ত দিতে হত।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বিধানসভায়?

হ্যাঁ। ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকোর প্রসঙ্গ এমনিতেই মধ্যপ্রদেশের বিধানসভায় প্রায় দৈনিকই উঠেছে গত কয়েকমাস হল। এই বাঘের জন্যে নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর কোনও কোনও ওপেন-কাস্ট মাইনের কাজ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বাঘ যদি এই অঞ্চল ছেড়ে সেদিকে দয়া করে একটু এগিয়ে যায়, তাহলেই চিত্তির। তাই নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর কর্তাদেরও মাথা-ব্যথা শুরু হয়েছে। মানে, prevention is better than cure বুঝলি না।

তারপর বলল, বাঘ মারা তো বে-আইনি বাহাত্তর সাল থেকেই। প্রথমত, এ বাঘ মানুষখেকো হয়েছে, এবং এত মানুষ খেয়েছে বলে এবং দ্বিতীয়ত, এর দেখা পাওয়াই অতি দুরূহ বলে বনবিভাগও ট্রাঙ্কুলাইজার গান ব্যবহার করে বা অন্য উপায়ে একে কবজা করতে পারেনি এতদিনেও। তাই না মানুষখেকো ঘোষণা করিয়ে আমাকে তলব দিয়েছেন। এই বাঘ আর অন্য কোনও মানুষকে মারার আগেই একে মারতে না পারলে এই প্রথমবার আমি বে-ইজ্জত হব। এতদিনের সুনাম সব জলে যাবে। এদিকে আমি চারদিনের বেশি থাকতেও পারব না। সাহারা এয়ারওয়েজ-এর একটা ফ্লাইট আছে বেনারস-কোলকাতা। হপিং ফ্লাইট যদিও। সিঙ্গরাউলি থেকে বেনারস গাড়িতে গিয়ে সেখান থেকে শুক্রবার ফ্লাইট ধরে কোলকাতা ফিরতেই হবে আমাকে কারণ শনিবার সকালে দিল্লি যেতেই হবে।

আমি অপরাধীর মতো বললাম, সরি ঋজুদা। আমার জন্যেই মানুষখেকোটাকে তুমি মারতে পারলে না।

ঋজুদা বলল, ঠিক আছে। তবে তুই কী করে ভাবলি যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি বা বাঘকে দেখতেই পাইনি। যে-শিকারি মানুষখেকো বাঘ মারতেই এসে বাঘে-মারা মানুষের kill-এর ওপরে বসে ঘুমিয়ে পড়ে তার অবশ্যই বাঘের পেটে যাওয়া উচিত।

ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে যেতেই ঋজুদা বাংলোর বারান্দার কাঠের টেবলের উপরে একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজের শিট বিছিয়ে সুরাবলী সিং রেঞ্জার, শম্ভুপ্রসাদ ত্রিপাঠী এবং ভাইয়ালাল শর্মা দুই ডেপুটি রেঞ্জারের সঙ্গে বসে একটা ম্যাপ এঁকে ফেলল।

আগে এই সমস্ত এলাকাই নাকি রেওয়া করদ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। খুব উঁচু উঁচু অতি দুর্গম ঘন জঙ্গলাবৃত পাহাড়, গভীর সব ভয়াবহ খাত ও উপত্যকা।

পানীয় জলের সাংঘাতিক অভাব। ভয়াবহ সব বন্য প্রাণীর, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, এবং নানারকম অসুখের আগার এই সব 'ব্যয়রান' অঞ্চলকেই রেওয়ার রাজা Open Air Jail হিসেবে ব্যবহার করতেন। যে সব প্রজা এবং শত্রুকে এই অঞ্চলে নির্বাসন দিতেন তারা কেউ কেউ পাগল হয়ে যেত, কেউ কেউ জানোয়ারের জীবন যাপন করত, তবে অধিকাংশই তাদের জ্বালা জুড়োত এই নির্বাসনে মরে গিয়ে। তাই এই অঞ্চলের ভয়াবহতার সঙ্গে এরা পরিচিত ছিল বহুদিন থেকেই। বড় বড় বাঘ, ভাল্লুক, বাইসন, বুনোমোষ, শম্বর, নানারকম বিষাক্ত সাপে ভরা ছিল এই সব বন। তবে আশ্চর্যের কথা, হাতি ছিল না। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ইত্যাদি সব জায়গার বনেই হাতি আছে কিন্তু মধ্যপ্রদেশে বিন্ধ্য, সাতপুরা এবং মাইকাল পর্বতশ্রেণী থাকা সত্ত্বেও হাতি যে কেন নেই এটা ভেবে অবাক লাগে আমার। হাতি কেন নেই? এর সদুত্তর কারও কাছেই পাইনি। এমনকী আমার জঙ্গলের এনসাইক্লোপিডিয়া ঋজুদার কাছেও নয়।

এই বন থেকেই রেওয়ার রাজা সাদা বাঘ বা Albino বাঘ ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের রাজধানী রেওয়াতে সাদা বাঘের বংশবৃদ্ধি করেছিলেন।

ওদের সকলের কাছে শুনে যা বোঝা গেল এবং সেই মতো ঋজুদাও আঁকল ম্যাপটা যে, সবসুদ্ধ পঞ্চাশ বর্গ মাইল এলাকাতে বাঘটার ক্রিয়া-কাণ্ড আপাতত সীমিত আছে। কাচেন নদী, লাউয়া নালা, গাডডা নালা, ভুতালি নালা, রাবণমারা গুম্ফা, ঝিঙ্গাঝিরিয়া নালা, পাতঝর, রাজমিলান, বিন্দুলের পথে, মেয়ার নদী এবং বিন্দুল হল এই বাঘের 'beat'। এই অঞ্চলেরই সব ছোট ছোট গ্রাম থেকে অনবরত মানুষ নিচ্ছে বাঘটা।

ঋজুদা ওঁদের সকলকে জিজ্ঞেস করল বাঘটাকে কেউ নিজচোখে দেখেছেন কি না? আর সে মানুষখেকো হল কেন সে সম্বন্ধে কিছু জানেন কি না?

ভাইয়ালাল বললেন, মাছবান্ধা নালার পাশে একটি দশবারো বছরের কেওট ছেলে বাঘটাকে দেখেছিল সে যখন শেষ বিকেলে তার দিদিকে ধরে। বসন্তশেষে ওর দিদি মাছবান্ধা নালাতে পোলো দিয়ে মাছ ধরছিল আর ও আওলা গাছে উঠে তখন আমলকী পাড়ছিল। ছেলেটি বলেছিল যে বাঘটি চলার সময়ে গোঙানির মতো শব্দ করে এবং তার সামনের বাঁ পায়ে একটা চোট আছে। খুঁড়িয়ে হাঁটে।

'কেওট'টা কী ব্যাপার?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ঋজুদা বলল, ইন্টারাপট করিস না। কেওট মানে জেলে।

সুরাবলী সিং রেঞ্জার বললেন, বাঘটার পায়ে যদি চোট থাকেও বাঘটাকে কিন্তু এই অঞ্চলের কোনও শিকারি আহত করেনি। ব্যয়রানেই ও চোট পেয়ে হয়তো সেই চোটেরই পর পালিয়ে এদিকে চলে আসে। প্রথম দিকে নাকি মাছ ধরে খেত তারপর হঠাৎই কোনও মানুষ, ওই ছেলেটির দিদিরই মতো, মেরে ফেলে এবং খেয়ে বুঝতে পারে যে মানুষ মারা সবচেয়ে সোজা আর তারপর থেকেই শুধু

মানুষই মারতে থাকে। যত মানুষ সে মেরেছে তার মধ্যে নব্বুই ভাগই মেয়ে। কেন যে, তা সেই জানে।

ভাইয়ালাল শর্মা বললেন যে, বাঘটা হুজুরু পাহাড়ের একটা গুহাতে থাকে। যদি কোনও শিকারি দিনমানে সাহস করে তার ডেরায় গিয়ে তার সঙ্গে টক্কর দিতে পারে তাহলে নির্ঘাৎ সে মারা পড়বে। অন্য ভাবে তাকে মারা ভারি মুশকিল। মানুষের মৃতদেহের মড়ির উপরে যদি শিকারি বসে থাকে তবে এই বাঘ মড়ির প্রতি কোনও ঔৎসুক্য না দেখিয়ে শিকারিকেই ধরার চেষ্টা করে। তিনজন শিকারিকে তো সে ধরেওছে। এইরকম সাংঘাতিক দুঃসাহসী মানুষখেকো বাঘের কথা বাপ-দাদাদের মুখেও কখনও শুনিনি। সারা জীবন তো আমার বাপ-দাদার জঙ্গলেই কাটল।

আমি ভাবছিলাম, গতরাতে চতুর্থ শিকারিকে ধরার চেষ্টা করেছিল।

একজন শিকারিকে তো খেয়েইছে। অন্যদের মাথাগুলো, আমরা যেমন করে পাহাড়ি পাড়হেন মাছের মাথা চিবাই তেমন করে চিবিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে। ওর ওই দুঃসাহসের জন্যেই স্থানীয় শিকারিরা একে একে রণে ভঙ্গ দিয়েছেন সকলেই। যদিও পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে মধ্যপ্রদেশ সরকার এই বাঘ মারার জন্যে।

ঋজুদা শুধোল, যদি হুজুরু না, কি পাহাড়ে তার বাস এবং সে গুহাও যদি সকলে চেনে তবে একদিন সকলে মিলে ছুলোয়া করে তাকে মারবার চেষ্টা কেন করা হল না?

সুরাবলী সিং বললেন, ওই গুহার পেছনেও অন্য একটা মুখ আছে। এই তো হোলির কদিন আগেই দশগাঁয়ের মানুষ মিলে চোদ্দটা দোনলা ও পাঁচটা একনলা গাদা বন্দুক নিয়ে ছুলোয়া করা হয়েছিল। আড়াইশো মানুষ শামিল ছিল সেই ছুলোয়াতে। ঝিঙ্গাঝিরিয়ার বাঘ পেছনের পথ দিয়ে বেরিয়ে একজন ছুলোয়াওয়ালাকে এক থাপ্পড় মেরে তাকে বেড়াল যেমন মাছ মুখে করে চলে যায় তেমনই করে উপত্যকাতে নেমে গেছিল। অতজন শিকারি ও মানুষের চোখের সামনে। শিকারিরা গুলি করতে পারেনি পাছে লোকটারই গায়ে লাগে। সে তো হাত-পা ছুড়ছিল তখনও। গুহাটার পেছনেও যে একটা মুখ ছিল তা তারা জানত না তাই পেছন দিকে কোনও শিকারি ছিল না। তবু শিকারিরা বাঘের পেছন পেছন কিছুটা দৌড়ে গেছিল কিন্তু বাঘ ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। হুজুরু পাহাড়ের ওই গুহাটা একটা ভুলভুলাইয়া।

আমরা সবাই চুপ করে রইলাম। ব্যয়রানের দুষ্টু আত্মা বা হুজুরু পাহাড়ের ভুলভুলাইয়ার কথা কোলকাতায় বসে শুনলে আমরা হয়তো হাসতাম। হয়তো কেন নিশ্চয়ই হাসতাম। কিন্তু ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকোর কীর্তিকলাপ শুনে এবং এই মারা বনবাংলোতে বসে অবিশ্বাস করতে খুবই মনের জোর লাগে।

কবে এই ঘটনা ঘটেছিল?

ঋজুদা কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করল।

বললাম না, হোলির কিছুদিন আগেই। ইতোয়ার ছিল সেদিন।

ভাইয়ালাল বললেন, ঋজুদার প্রশ্নের উত্তরে।

ফাগুন মাসের মাঝামাঝি।

শম্ভুপ্রসাদ বললেন।

সেতো অনেকদিনের কথা। তারপরে এই দু'-আড়াই মাসে কোনও শিকারি আর ওই বাঘকে মারার চেষ্টা করেননি?

ঋজুদা বলল অবাক হয়ে।

কেন। করেছিলেন তো। তারপরেই তো গর্বীর খাদানের জি. এম. এর একমাত্র দামাদ রেনুকুট থেকে এলেন বাঘ মারবার জন্যে। আমেরিকা-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার, বয়স কম, উৎসাহ বেশি। দু'লাখ টাকা দামের রাইফেল নিয়ে এলেন।

ভাইয়ালাল বললেন, অভিজ্ঞতা কম কিন্তু বাহাদুরি একটু বেশিই ছিল। ভেবেছিলেন হয়তো যে, রাইফেলের দাম শুনেই বাঘ ঘাবড়ে যাবে।

বাঘ একটি খারশোয়ার ছেলেকে ধরে রাবণমারা গুম্ফার পেছনের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে কিছুটা খেয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে গেছিল। সেই জি. এম. এর দামাদ সাহেব গুম্ফার পেছনে মড়ির কাছে একটি পাথরের স্তূপের উপরে বসেছিলেন। পেছনেই একটা শিমুল গাছ ছিল। তাই ভেবেছিলেন যে তাঁর পিছন দিকটা সুরক্ষিত আছে। সেই দামাদকেও তো বাঘ বিকেল বিকেলই ধরে খেয়ে ফেলল। বিকেলের নাস্তা বানাল তাঁকে। দু'লাখি রাইফেল ধুলোতে গড়াগড়ি গেল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, সে কী। শিমুলের খোদলের মধ্যে ঢুকে বসা সত্ত্বেও বাঘ তাঁকে ধরল কী করে?

ভাইয়ালাল বললেন, পেছন দিয়ে তো আসেনি বাঘ। দামাদ সাহেব ভাবতেও পারেননি যে বাঘ দিনমানেই এসে হাজির হবে। তিনি রাইফেল শ্যুটিং-এ চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। অনেক মেডেল-টেডেলও ছিল। কিন্তু টার্গেটে রাইফেল-শ্যুটিং আর মানুষখেকো বাঘ মারা যে এক জিনিস নয় তা সম্ভবত তিনি জানতেন না। শিকারে যা দরকার হয় তা নার্ভ, সাহস, টার্গেট শ্যুটার তা কোথায় পাবেন? তিনি রাইফেলটাকে পাথরের উপরে ডানহাতের কাছেই শুইয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে মড়ির দিকে চেয়ে বসেছিলেন। ভেবেছিলেন, অন্ধকার হলেই রেডি হয়ে বসবেন। কিন্তু বাঘ তিন লাফে সেই পাথরের স্তূপের বাঁদিক দিয়ে উঠে তাকে ক্যাঁক করে ধরে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে কোট-পাতলুন খুলে ন্যাঙ্গা করে মজাসে খেল। টুঁ শব্দটা করতে পারল না জি. এম. সাহাবের আমেরিকা ফেরত বহত পড়ে-লিখে দামাদ।

ভাইয়ালাল বললেন, 'অকল' এর নানারকম হয় বোস সাহেব। বই পড়ে যা শেখা যায় তা তো বনে-জঙ্গলে কাজে লাগে না। সব জিনিসই শিখতে হয়। না

হলে, এত লোক থাকতে আপনাকে কোলকাতা থেকে নিয়ে এলেন কেন এঁরা?

দামাদ মানে কী?

আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, ওই তো! ভটকাইটা এখানে থাকলে তোকে সঙ্গে সঙ্গে মানে বলে দিত। তুই বুঝি হিন্দি টিভি সিরিয়াল দেখিস না? দামাদ মানে যে জামাই আর জিজাজি মানে জামাইবাবু তাও জানিস না?

জানতাম। কিন্তু ভুলে গেছিলাম।

আমি বললাম, লজ্জিত হয়ে।

শম্ভুলাল প্রসাদ বললেন, রুদ্রবাবু জঙ্গলের অনেক হিসাব-কিতাব তো জানেন, দামাদ আর জিজাজির মানে না হয় নাই জানলেন।

তারপরেও একজন শিকারি উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর থেকে এসেছিলেন। আরেকজন এসেছিলেন মুঘলসরাই-এর কাছের রবার্টসগঞ্জ থেকে।

প্রথমজনকে ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো ধরেছিল মাচায় ওঠার সময়েই। বিকেলবেলা। অন্যজনকে ধরেছিল সকালবেলা, রোদ উঠে যাবার পরে, শিকারি যখন মাচা থেকে মাটিতে নামছিল তখন। পরপর তিনজন বড় বড় শিকারিকে এরকম বেপরোয়াভাবে মারার পরে স্থানীয় শিকারিদের আর কেউই তাকে ঘাঁটাবার সাহস পায়নি। ফলে, বাঘ এই এলাকাতে কার্ফু আইন জারি করে দিয়েছে। সন্ধের পরে তো কেউ বাড়ি থেকে বেরোয়ই না, দিনমানেও একা বেরোতে খুবই ভয় পায়। দল বেঁধে ছাড়া বেরোয় না।

ভাইয়া বললেন, এত দামি দামি বন্দুক-রাইফেল হাতে শিকারিদেরই যে বাঘ খেয়ে যেতে পারে দিনের বেলাতেই, তার সঙ্গে গাদা-বন্দুক হাতে টকরাবার হিম্মত দেহাতি শিকারিদের হবে কী করে!

সুরাবলী সিং বললেন, এই দেখুন না, আজকে হাটবার। 'মারা'তে বরাবরই মস্ত হাট বসত। এই তো ফরেস্ট অফিসের লাগোয়া ময়দানেই বসে সেই হাট। হাট জমত বিকেল দুটোর পরে আর চলত সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তারপর হাঁড়িয়া-টাঁড়িয়া খেয়ে সবাই 'মস্ত' হয়ে গান গাইতে গাইতে বাড়ি যেতে যেতে রাতের দু'পহর করত। কত হাসি, গান, তামাশা—কি অন্ধকার রাত আর কি উজলা রাত, কোনও তফাতই ছিল না। কত দূর-দূর গ্রাম থেকে সবজি, মোরগা, আন্ডা, বকরি, শুয়োর, জামা-কাপড়, রুপোর গয়না, কাচের চুড়ি, চুলবাঁধা রিবন, মাথায়-মাখা সুগন্ধি তেল, চাল ডাল তেল-এর দোকান, নানারকম নোন্তা ও মিষ্টি খাবারের দোকান বসত সার সার।

আর এখন?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

এখন বেলা বারোটা থেকে চারটের মধ্যেই বেচাকেনা সেরে সূর্য ডোবার অনেক আগেই মস্ত মস্ত দলে ভাগ হয়ে মেয়ে-মরদেরা যে যার গ্রামে চলে যায়।

পথে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। তবু তো দলে থেকেও নিস্তার নেই। ইচ্ছে হলে সে দলের মধ্যে থেকেও কারওকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।

ওদের হাতে টাঙ্গিও কি থাকে না?

ঋজুদা বলল।

থাকে। সবই থাকে। কিন্তু ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো সামনে এসে দাঁড়ালে সকলের প্যারালিসিস হয়ে যায়। এখানের মানুষদের ধারণা, ওটা আসলে বাঘ নয়, ব্যয়রানে মারা-যাওয়া কোনও খারাপ মানুষের দুষ্ট-আত্মা। রেওয়ার রাজার বিরুদ্ধে তো প্রতিশোধ নিতে পারে না! তাই তাঁর এক-সময়ের প্রজাদের উপরে প্রতিশোধ নিয়ে গায়ের ঝাল মেটায়। মেয়েদের উপরে বাঘটার জাতক্রোধ আছে নইলে বেছে বেছে মেয়েদেরই ধরে কেন?

ভাইয়ালাল বলল, এই দেখুন না! আর কিছুদিন পরেই বর্ষা নামবে। বাইগা ও গোন্দদের সকলেরই হোরিয়ালি একটা বড় উৎসব।

আমি জিজ্ঞেস করলাম হোলি?

হোলি তো চলে গেছে। না, হোলি নয়, হোরিয়ালি।

সুরাবলী সিং বললেন, সাহাব হোলি বা হোরি তো বসন্তোৎসব। হোরিয়ালি হচ্ছে চাষবাসের উৎসব। আমাদের ক্ষেত-জমিতে বছরে প্রথমবার হাল দিয়ে যখন আমরা বর্ষা এলে বীজ বুনি, তখন হোরিয়ালি করি আমরা।

ঋজুদা বলল, শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব দেখিসনি তুই? সেইরকমই আর কি?

ও বুঝেছি। বিজ্ঞের মতো বললাম, আমি।

ঋজুদা বলল, হোরিয়ালি সম্বন্ধে কী বলছিলেন?

বলছিলাম, এ বছর হোরিয়ালিও হবে না। চাষবাসও হবে না। মানুষগুলো সব না খেয়ে মরবে। এমনিতেই তো আধপেটা খেয়ে থাকে। গভর্নমেন্টের কয়লা খাদান সিঙ্গরাউলি হয়েছিল এবং সেখানকার সাহেবরা খুব দয়ালু বলেই অনেক মেয়েমরদ সেখানে কাজ পেয়ে বেঁচে গেছে। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামীণ মানুষেরই একটি নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। ধর্ম-কর্ম, নাচ-গান, ক্ষেতি-জমিন, গ্রামীণ আনন্দ উৎসব, রামায়ণ মহাভারত নিয়ে এই স্বল্পে সুখী জীবনে যারা অভ্যস্ত যুগের পর যুগ, তাদের পক্ষে কয়লা খাদানের কুলি-কামিন হয়ে কয়লা মাখা ভূত-পেতিন হয়ে বেঁচে থাকতে কি ভাল লাগে সাহেব? বেশি টাকা রোজগার অবশ্যই করে। কিন্তু নিজেদের শিকড় উপড়ে গেলে বুকের মধ্যেটা হু-হু করে না কি? এই এক শালা বাঘ এতগুলো গ্রামের মানুষজনের জীবনযাত্রাই উলট-পালট করে দিল কিছু দিনের মধ্যে। আপনারা যদি একে মেরে দিয়ে যান সাহেব তবে এই পুরো তল্লাটের মরদ-আওরাত আপনাদের গোলাম হয়ে থাকবে চিরদিন। এই বাঘকে মারার সব তরিকাই এ পর্যন্ত ফেল করেছে। কেউই তো পারল না। এখন আপনারা যদি পারেন।

ঋজুদা পাইপের পোড়া-টোবাকো খুঁচিয়ে ফেলতে ফেলতে বাংলোর বাইরে লাল মাটির পথের দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক গলাতে বলল, এ তো বড় আশ্চর্যের কথা। এইসব জঙ্গল পাহাড়ের শিকারিরা তো আমাদের কানে ধরে শিকার শিখিয়ে দিতে পারেন! তাঁরাই যখন পারলেন না তখন কী করতে পারব আমরা, ভগবানই জানেন।

সব চেষ্টাই হয়েছে বোস সাহেব। মানুষের শব বা মড়ির মধ্যে উরুর ও পেটের মাংস কেটে নিয়ে তাতে ফলিডল পুরে দেওয়া হয়েছে। 'জয়ন্ত'-এর নতুন হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরও শিকারের শখ ছিল। সাভারকার সাহাব, মানে সার্জন সাহাব, তিনি পোটাসিয়াম সাইনাইড না কি, তাও মড়ির মধ্যে দিয়ে দেখেছিলেন। নিজে জিপ গাড়িটি মড়ির কাছে রেখে সারারাত রাইফেল হাতে বসেছিলেন। কিন্তু বাঘ কখন যে চুপিসাড়ে এসে পটাকসে সেই পটাসিয়াম সায়নাইড শুদ্ধ মড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে সাবড়ে দিল তা সার্জন সাহেব বুঝতে ভি পারলেন না। তাঁর সঙ্গে জয়ন্ত হাসপাতালেরই আরও দু'জন শিকারি সাহাব ভি ছিলেন।

ঋজুদা চিন্তান্বিত গলাতে বলল, হুঁ-উ-উ।

এমন সময়ে দূরে দেখা গেল সিঙ্গরাউলির দিক থেকে একটি মোটরকেড আসছে এদিকে। কাল বৃষ্টি হওয়াতে যে পরিমাণ ধুলো ওড়ার কথা ছিল চার পাঁচটি গাড়ি ও জিপের চাকাতে, তা উড়ছে না। দুটি গাড়ির মাথাতে লাল আলো।

সাহেবরা এসে ঋজুদাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন এখানে আসবার জন্য। 'মারা' বনবাংলোতে থাকতে আমাদের যে খুবই কষ্ট হচ্ছে, এখানে খাওয়া-দাওয়াও একেবারে দেহাতি, এয়ারকন্ডিশনার নেই, এই সবকিছুর জন্যেই ক্ষমা চাইলেন বার বার করে ওঁরা। আমাদের জন্যে নানারকম টিনের খাবার 'কেলগ'-এর নানারকম স্যুপ, সিরিয়ালস, টিনের মাছ, টিনের আনারস ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন। বাংলোর বাগানের গাছ থেকে পাড়া বড় বড় পেঁপে, টাটকা মাছ, ঝুড়ি-ভরা কঁক-কঁক করা মুরগি, নানা তরকারি ইত্যাদি।

ঋজুদা বলল, মানুষ তো জামাই-এর জন্যেও এত করে না সেন সাহেব। কিন্তু যে কর্মে এখানে আমাদের আসা, তাতে খাওয়ার অবকাশই যে নেই! খিচুড়িই আমাদের জন্যে যথেষ্ট।

তারপরে বলল, এবারে বলুন তো, আমি যে লিস্টটা দিয়ে এসেছিলাম আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছে, সেই জিনিসগুলো এসেছে কি না?

দাস সাহেব বললেন, হ্যাঁ। হ্যাঁ। সব এসেছে।

সেই লিস্ট এর মধ্যে ছিল দুটি পেট্রোম্যাক্স আলো, দু'জেরিক্যান পেট্রল, খুব লম্বা দুটি সরু কিন্তু শক্ত নাইলনের দড়ি, দু'ডজন ব্যাটারি—এভারেডি রেড। দু'শিশি কার্বলিক অ্যাসিড। এবং একটি জিপ।

সেন সাহেব বললেন, ঋজুদাকে, এই এয়ারকন্ডিশনড গাড়ি আর এই ড্রাইভার

রইল আপনার জিম্মাতে। বলেই ডাকলেন, বাবুলাল।

একজন স্মার্ট প্রৌঢ় উর্দিপরা ড্রাইভার গাড়ির পেছনে মাটিতে দাঁড়িয়েছিল। সে এসে সেলাম করল।

সেন সাহেব বললেন, এর নাম বাবুলাল পাসোয়ান। বিহারের নওয়াদাতে বাড়ি এর। খুব ভাল ড্রাইভার।

ঋজুদা বলল, এই গাড়িতে আমাদের চলবে না। আজ তো আর হবে না, কাল সকাল সকাল একটি নন এসি, মাহিন্দ্র-জিপ, চারদিক খোলা হলে আরও ভাল হয়, আমাদের জন্যে পাঠিয়ে দেবেন। আর ড্রাইভারকে আমরা রাখব না। যেখানে নিজেদের জীবনের জিম্মাদারি নেওয়াই কঠিন কাজ সেখানে অন্য কারও জীবনের দায়িত্ব না-নেওয়াই ভাল।

তারপর আমাকে দেখিয়ে বলল, এই আমার সঙ্গী রুদ্র রায়। এর লেখা হয়তো আপনারা পড়েছেন। এই তো লিখে লিখে আমাকে বিখ্যাত করে দিয়েছে। তা রুদ্র শিকারি তো আমার চেয়েও ভাল। বহুবার, শুধু এ দেশেই না, আফ্রিকাতেও আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। জিপটাও ও আমার চেয়েও ভাল চালায়। জিপ দিলেই হবে। আমরাই চালিয়ে নেব। তবে ট্যাঙ্ক ফুল করে পাঠাবেন। এবং পেট্রলের জিপ। পরশু রাতে সুরাবলী সিং সাহেবের জিপে করে ঘুরেছিলাম। ডিজেলের জিপ। ডিজেলের জিপ ধাড়ি শুয়োরের মতো ধড়ফড় আওয়াজ করে। শিকারে, পেট্রোলের জিপই ভাল হবে।

সেন সাহেব বললেন, অ্যাজ উ লাইক ইট। নর্দার্ন কোলফিল্ডস ক্যান অ্যাফর্ড টু ডু আ লট অফ থিংগস ফর ইও। পাবলিক সেকটর কোম্পানি বলেই ভাববেন না যে আমরা লুজিং-কনসার্ন। এ বছরে তো ইনকামই হয়েছে হাজার কোটি টাকারও বেশি। অথচ তবু ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট এমন ভাব করে আমাদের সঙ্গে যেন আমরা মোমফুলিওয়ালা।

সুরাবলী সিং সাহেব নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর সঙ্গেই যুক্ত এখন। কয়লা খাদানের জন্যে উপরের মাটি সরিয়ে ওপেনকাস্ট মাইনিং করে কয়লা বের করতে হয়। খাদানের জন্যে হাজার হাজার একর জঙ্গল কেটে ফেলতে হয়। সরকার নিয়ম করেছেন যত গাছ কাটা হবে তার অনেকগুণ বেশি গাছ লাগাতে হবে। এই বনসৃজনের ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ যাতে পান নর্দার্ন কোলফিল্ডস সে জন্যে বনবিভাগ একজন রেঞ্জারকে খাদানেই পোস্টিং করে দিয়েছেন। অবশ্য উপরওয়ালারাও দেখভাল করেন।

ফিন্যান্স ডিরেক্টর দাস সাহেব ঋজুদাকে ব্যাখ্যা করে বললেন।

সুরাবলী সিং, ভাইয়ালাল, শম্ভুপ্রসাদ সবাই মিলে রেনকুটের ড্যাম থেকে আনা বড় লাল রুই মাছ ফটাফট কেটে বড় বড় পিস করে কড়া করে ভেজে চিলি সস দিয়ে সেন সাহেব ও দাস সাহেবকে দিলেন। সঙ্গে ওঁদেরই আনা নেসকাফের টিন এবং ব্রিটানিয়ার তরল দুধের প্যাকেট খুলে কফি বানিয়ে দিলেন।

ভাইয়ালাল বললেন, কী দুঃখের কথা হুজৌর, এই মারার দুধ বিখ্যাত। আর এই মানুষখেকো বাঘটার জন্যে জঙ্গলের মধ্যে যে বাথান-টাথান ছিল সব চৌপাট হয়ে গেছে। আপনাদের ব্রিটানিয়া কোম্পানির দুধ খেতে হচ্ছে।

ঋজুদা বলল, ব্রিটানিয়া কোম্পানির দুধ খারাপ কীসে? ওদের নানারকম চিজ, নানারকম বিস্কিট আমার তো খুবই ভাল লাগে। ছেলেবেলাতে খেয়েছি, বিলেত থেকে আসত হান্টলি পামার কোম্পানির বিস্কিট—। কোয়ালিটি প্রায় সেরকমই করেছে ব্রিটানিয়া।

আমি বললাম, তখন বুঝি দেশে বিস্কিট তৈরি হত না?

ঋজুদা বলল, হত। তবে লিলি বিস্কুট। লিলি বিস্কুট খারাপ ছিল না খেতে। আমার কিন্তু পুরো দিশি বিস্কিট—শুকনো লঙ্কা দেওয়া, ছোট ছোট চারকোনা চারকোনা শক্ত ইঁটের মতো, কামড়াতে গেলে কটর-কটর করে লাগত দাঁতে—খুব ঝাল—খুব ভাল লাগত।

সবসুদ্ধ আধঘণ্টাখানেক থেকে ওঁরা সবাই চলে গেলেন। কথা দিয়ে গেলেন যে, সকালে আটটার মধ্যে জিপ এবং ঋজুদার আরও অন্যান্য সব রিকুইজিশান ওঁরা পাঠিয়ে দেবেন। সেগুলো কী, তা আমি জানি না। লিস্ট ঋজুদাই বানিয়েছিল।

ঋজুদা বলল, আমাদের প্লেনের টিকিট দিয়ে একটি গাড়ি পাঠাবেন রবিবার ভোরে। রবিবারে ফিরতেই হবে। এ কদিনের মধ্যে কি পারব বাঘের মোকাবিলা করতে?

সিঙ্গরাউলি গেস্ট হাউসে লাঞ্চ করে যাবেন তো ফেরার সময়ে?

সেন সাহেব বললেন।

প্লিজ। ওসব ঝামেলা একদম করবেন না। আমরা সোজা এখান থেকে বেরিয়ে যাব।

ঋজুদা বলল।

যা বলেন। এয়ারকন্ডিশনড টাটা সাফারি পাঠিয়ে দেব আপনাদের জন্যে, যাতে কষ্ট না হয়। উইশ উ্য অল দ্য লাক মিস্টার বোস।

সেন সাহেব বললেন।

দাস সাহেব বললেন, গুড হান্টিং।

ঋজুদা ও আমি ওঁদের গাড়ি অবধি এগিয়ে দিলাম। ওঁদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলাম। বললাম, থ্যাঙ্ক উ্য ভেরি মাচ।

ওঁরা সকলে চলে গেলে ঋজুদা সুরাবলী সিংকে জিজ্ঞেস করল হুজুরু পাহাড়টা এখান থেকে কত দূরে?

আমি ঠিক বলতে পারব না। আপনি বরং ভাইয়ালালকে শুধোন।

সাহেবরা চলে যাবার পরে ভাইয়ালাল ও শম্ভুপ্রসাদ একটু জম্পেশ করে চা খাচ্ছিলেন বাবুর্চিখানাতে গিয়ে। সুরাবলী সিং সাহেব তাদের চেঁচিয়ে ডাকলেন,

বললেন, হিঁয়া ক্যা খানেপিনেকি লিয়েই আয়া হ্যায় আপলোগোঁনে?

ঋজুদা ওঁদের মুখ রক্ষার জন্যে বলল, বেগর খানা আদমি জিয়েগা কৈসে? অজীব বাঁতে করতে হ্যায় আপ সিং সাহেব।

ভাইয়ালাল ও শম্ভুপ্রসাদ এসে বারান্দাতে দাঁড়ালে ঋজুদা শুধোল, হুজুরু পাহাড় এখান থেকে কতদূরে? আর এমন কাউকে আমাদের সামনে হাজির করতে পারেন কি যে সেদিন হুজুরু পাহাড়ে ছুলোয়ার সময়ে সেখানে ছিল এবং যে ওই ভুলভুলাইয়া গুহাটা আমাদের দেখিয়ে দিতে পারবে?

ভাইয়ালাল একটু ভেবে বললেন, যে ছুলোয়য়ালাকে সেদিন বাঘে ধরে নিয়ে গেছিল গুহার পেছন দিক থেকে, তার ছেলে সম্ভবত একটু পরেই হাটে আসবে বিক্রির সামগ্রী সব নিয়ে। এলেই ওকে ধরব। ও ছিল সেদিন ছুলোয়াতে।

শম্ভুপ্রসাদ বললেন।

কী বিক্রি করতে আসবে ও?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ওরা রায়শোয়ার। ওদের ধড়কারও বলে।

কী জীবিকা ওদের? চাষবাস করে?

তাও করে না যে তা নয়। তবে ওরা খুবই গরিব। জমি-জমা থাকেই না বলতে গেলে। বাঁশের টুকরি, ধামা ইত্যাদি বানিয়ে বিক্রি করে ওরা।

ঋজুদা বলল, ছেলেটার বয়স কত?

এই পনেরো-ষোলো হবে। খুবই সাহসী ছেলে। ওর নাম প্রেমলাল।

হাটে কতটাকার জিনিস বিক্রি করবে ও আন্দাজ? মানে, রোজগার কত হবে?

কত টাকার আর। এখন তো ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকোর জন্যে হাট লাগেও দেরি করে, উঠেও যায় তাড়াতাড়ি। লোকজনও খুব কমই আসে। তাই পনেরো বিশ টাকার বিক্রি হলেও অনেক বিক্রি হবে।

ঋজুদা বলল, ও হাটে এলেই ওকে ডেকে পাঠাবেন। ওকে নিয়ে হুজুরু পাহাড়ে যাব। ও যেতে রাজি হবে? ভয় পাবে না তো?

ভয়-ডর ও ছেলের নেই। ও একাই ওর পিতৃহন্তা বাঘকে মারার জন্যে বিষের তীর আর ধনুক নিয়ে বাঘের চলাচলের পথে উজলা রাতে গাছে বসে থাকে। কোনদিন যে ও ওর বাবারই মতো বাঘের পেটে যাবে তা শংকর ভগবানই জানেন।

তাই? বাঃ। তাহলে আমরা এখানে আসামাত্রই ওই ছেলের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেননি কেন? যখন এ তল্লাটের সব মেয়ে-মরদের হাত-পা বাঘের ভয়ে পেটে সেঁধিয়ে যাচ্ছে তখন অতটুকু ছেলের এমন সাহস তো অবশ্যই প্রশংসার।

সুরাবলী সিং সাহেব দার্শনিকের মতো বললেন, খ্যয়ের ইস দুনিয়ামে সবহি কিসিম কি ইনসান হোতা হ্যায়। ডরপোক ভি হোতে হেঁ ওর বাহাদুর ভি হোতে

হেঁ।

সুরাবলী সিং সাহেব ফরেস্ট গার্ডকে পাঠালেন হাটে বলে আসতে যে, প্রেমলাল এলেই এখানে পাঠাতে।

আমি ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করলাম আজই কি যাবে হুজুরু পাহাড়ে?

হ্যাঁ। আজই যাব। স্কাউটিং করতে। আজ ফিরে এসে রাতে ঘুমোব। তারপর বাকি বাহাত্তর ঘণ্টা ঘুম নেই। দিন-রাত ঘুরব ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকোর খোঁজে। এত মানুষে এতদিন রাতে ঘুমোতে পারে না, হাটে আসতে পারে না, গান গাইতে পারে না, আমরা না হয় তাদের স্বার্থে তিন রাত্তির নাই ঘুমোলাম।

আমি বললাম, তুমি যেমন বলবে।

সুরাবলী সিং এবং অন্যদেরও অবাক করে দিয়ে ঋজুদা বলল, আমি আর রুদ্র একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি। বেলা আড়াইটে নাগাদ আমাদের তুলে দেবেন। মাছের ঝোল ভাত খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব। প্রেমলালকে বলবেন যে, আমরা যে-ক'দিন এখানে আছি ও আমাদের সঙ্গেই থাকবে। মজুরি হিসেবে ওকে দিনে একশো টাকা করে দেব আমি। আর খাবে-দাবেও আমাদেরই সঙ্গে।

সিং সাব বললেন, কিন্তু ও যে ছোট জাত।

ঋজুদা বলল, আমি তো শখ করে বোস লিখি। আসলে আমি মুসলমান। আমার আসল নাম বাহারুদ্দিন বসির।

সিং সাহেব এমন করে তাকালেন ঋজুদার দিকে যেন সাংঘাতিক পাপ করেছে ঋজুদা পরিচয় গোপন করে। কিন্তু কিছু বলতেও পারলেন না নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর বড় সাহেবরা যখন ওঁকে এত খাতির করছেন। কী করেই বা বলেন।

এখানে দু'জনের দুটি ঘর জোটেনি আমাদের। বাঘের ভয়ে বাইরে কেউই শোয় না। নইলে এই মে মাসের শেষে সকলেই তাই বারান্দায় বা উঠোনে চৌপাই লাগিয়েই শুত হয়তো। এখন এত লোক সব গাদাগাদি করে একটি ঘরে রাত কাটায়। জানালার শিক আবার কাঠের। তাই ভরসা করে জানালা খুলেও শুতে পারে না কারণ বাঘ ইচ্ছে করলেই এক থাবড়াতে কাঠের শিক ভেঙে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে আসতে পারে। এই অসহ্য গরমে সব জানালা-দরজা বন্ধ করে এতজন মানুষে কী করে রাত কাটাচ্ছে কে জানে! তার চেয়ে বাঘের হাতে মরাও ভাল ছিল। তবে কাল বৃষ্টিটা হওয়াতে আজ অনেক ঠাণ্ডা হয়েছে।

ঘরে যেতে যেতে ঋজুদা বলল, রেনুসাগরের রুই মাছের চেহারাটা দেখলি? আহা! যেন ব্রহ্মপুত্রের মহাশোল মাছ। এমন মাছের তেল ভাজা, মুড়িঘণ্ট আর দই-মাছ গদাধরদা যা রাঁধত না। এরা মাছ কাটতেই জানে না। তা ছাড়া, এমন করে রাঁধবে, দেখবি মুখেই দেওয়া যাচ্ছে না।

আমি বললাম, আহা গদাধরদার কথা মনে করিয়ে দিও না। মাথা দিয়ে টকটা কেমন রাঁধত বলো তো?

ঋজুদা বলল।

তারপর ঘরের দরজা লাগানোর আগে সিং সাহেবকে বলল, বারান্দাতে গোলমাল একটু কম করতে বলবেন আর টেবিলে খাবার লাগিয়ে ঠিক আড়াইটে, না, দুটোতেই আমাদের ডেকে দেবেন সিং সাহেব।

রাইট স্যার।

চান, আমরা দু'জনেই সকালে এসেই করে নিয়েছিলাম। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেই ছিলাম। শুতে না শুতেই ঋজুদা নাক ডেকে ঘুমোতে লাগল। বড় মানুষদের এই লক্ষণ। ইচ্ছে-ঘুম এঁদের। সবসময়েই এঁরা নিজেদের পুনরুজ্জীবিত করে নিচ্ছেন যাতে জীবনীশক্তির প্রতিটি বিন্দু কাজে লাগাতে পারেন।

হঠাৎ নাকডাকা থামিয়ে ঋজুদা বলল, দুপুরের খাওয়ার পরে যখন বেরোব তখন তুই তোর রাইফেলটা নিস না, গ্রিনার বন্দুকটা নিস, বত্রিশ ইঞ্চি ব্যারেলের। আর দু'ব্যারেলই এল. জি. রাখবি। আর আমি নেব পয়েন্ট ফোরফিফটি-ফোরহান্ড্রেড ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা। দ্যাখ, কপালে থাকলে আজই বাঘবাবাজিকে তাঁর স্বভূমেই পটকে দিয়ে আসব আমরা। একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। বুঝেছিস, রুদ্র। এতগুলো গরিব অসহায় নিরপরাধ মানুষ আমাদের মুখ চেয়ে আছে। এই বাঘটাকে এই বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের মারতে হবে।

কাল রাতেই তো কম্মো ফতে হয়ে যেত যদি না তোমার জন্যে আমার প্রেম উথলে উঠত।

ঋজুদা হেসে ফেলল।

আমি বললাম, বাঘটা খুব লজ্জা পেয়েছে কিন্তু।

কেন? কেন?

ঋজুদা বলল।

তুমি যা জোরে বলেছিলে ইডিয়ট! ও তো আর জানে না যে তুমি আমাকে বলছ! এই বাঘকে অনেক গালাগালি অনেক গুলির নৈবেদ্য অনেকেই দিয়েছে আজ অবধি, কিন্তু ইডিয়ট বলে গাল পাড়েনি এর আগে নিশ্চয়ই কেউ। তার ওপর আবার ইংরেজি শব্দ। বাঘ তো আর ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র নয় যে ইডিয়ট শব্দের মানে বুঝবে।

অনেক হয়েছে। এবার ঘুমিয়ে নে একটু।

ঋজুদা কথাকটি বলেই নাক ডাকাতে লাগল, ফরাসি দেশের জগৎবিখ্যাত পরমবীর নৃপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টে যেমন ঘোড়ার পিঠে যেতে যেতে ঘুমিয়ে পড়তে পারতেন।

ভাবছিলাম বড় বড় মানুষদের মধ্যে কত মিল। সত্যি! যখনই ইচ্ছে হবে তখনই একটু ঘুমিয়ে নিতে পারা, ট্রামে, বাসে, গাড়িতে, প্লেনে এবং ঘোড়ার পিঠেও, এক

ধরনের যোগাভ্যাস। খুব বড় মাপের সাধক না হলে এমনটি করা কারওর পক্ষেই সম্ভব নয়।

৩

ঠিক দুটোর সময়েই ওঁরা আমাদের দরজা ধাক্কা দিয়ে তুলে দিয়েছিলেন। খাবারও তৈরি ছিল। খাবার তো নয়, যেন ফাঁসির আসামীর খাওয়া। এতরকম পদ রাক্ষসের পক্ষেও খাওয়া সম্ভব নয়, তাও যদি বা মনোমতো রান্না হত। তা ছাড়া, তখন খাওয়ার দিকে মন ছিল না আমাদের আদৌ।

বারান্দায় সেই রায়শোয়ার ছেলেটি, যার বাবাকে হুজুরু পাহাড়ে বাঘ ধরে নিয়ে গেছিল, এবং যার নাম প্রেমলাল, দাঁড়িয়েছিল। চেহারা তো নয়, যেন কেষ্ট ঠাকুরটি। প্রথম দর্শনেই তাকে আমাদের খুব ভাল লেগে গেল। সে খেয়ে এসেছে বলা সত্ত্বেও ঋজুদা তাকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে খাবার ঘরের টেবলে আমার আর ঋজুদার মধ্যে খেতে বসাল। তাতে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণরা বেশ ক্ষুণ্ণ হলেন। এসব ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে দেশভাগের পরে অনেকটা দায়ে ঠেকেও, বিহার ওড়িশা উত্তরপ্রদেশ বা আসামের চেয়ে অনেকই ভাল। 'মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান' সত্যিই রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যদ্বাণী বঙ্গভূমিতে সফল হয়েছে। অন্য অনেক রাজ্য ঠেকে শেখেনি বলেই হয়তো এখনও তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি এ বাবদে।

প্রেমলালকে একটা ভাল টাঙ্গি দিতে বলল ঋজুদা। তারপর ড্রাইভারকে বাংলোতে থাকতে বলে, প্রেমলালকে অ্যামবাসাডার গাড়িটার পেছনে বসিয়ে আমি স্টিয়ারিং-এ বসলাম। আর ঋজুদা ঘর থেকে আমার টুয়েলভ বোর-এর ব্রিনার বন্দুকটা আর নিজের ফোরফিফটি-ফোরহান্ড্রেড ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা নিয়ে আমার পাশে এসে বসল সামনের সিটে। সুরাবলী সিং সাহেব এবং ভাইয়ালালও এসে উঠছিল গাড়িতে কিন্তু ঋজুদা ওঁদের আসতে মানা করল। কিন্তু ওঁদের পাঁচ ব্যাটারির টর্চ দুটো চেয়ে নিল।

আমি এঞ্জিন স্টার্ট করলে, ঋজুদা বলল, রাত দশ বাজিতক হামলোগোনে জরুর লওটকে আওবেগা। নেহি আনেসে, আপলোগ খানা খা লিজিয়েগা, ইন্তেজারি মে মত রহিয়েগা সিংজি। ঔর জরা সামালকে রহিয়েগা। আজ তো হাটিয়া না হ্যায়, বাঘোয়া ইসতরফ আ ভি শকতা।

বাংলোর হাতাটা খুবই ছোট। সচরাচর বনবাংলোর যতখানি হাতা থাকে ততখানি জায়গা আদৌ নেই এখানে। কেয়ারি করা ফুলের বাগান আছে, তাও এই প্রখর গ্রীষ্মে তার বাহার নেই। বড় গাছ নেই বললেই চলে।

গেট থেকে বেরিয়ে বিন্দুল-এর পথে আমরা যখন বাঁদিকে ঘুরলাম তখন ঘড়িতে দুটো বেজে পঁয়ত্রিশ। হাট পুরো জমে গেছে। মোরগা-লড়াই, বকরির

ব্যাঁ-ব্যাঁ আওয়াজ, গোরুর গাড়ির বলদের হাম্বা-আ আর হাটে-আসা মেয়ে-মরদের গলার নানা গ্রামের ওঠা-নামা করা কলস্বর মহড়া না-দেওয়া শিল্পীদের বিভিন্ন স্কেলে গাওয়া সমবেত কণ্ঠের সংগীত বলে মনে হচ্ছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শব্দের জগতকে পিছনে ফেলে আমরা নৈঃশব্দ্যের জগতে ঢুকে পড়লাম। প্রেমলালকে বলাই ছিল যে, হুজুরু পাহাড়ের পথ চিনিয়ে সে নিয়ে যাবে আমাদের।

এই দুপুরবেলাতেই যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা বনে। ঝিঙ্গাঝিরিয়া নালা পেরিয়ে গেলাম আমরা। জল এখন নেইই বলতে গেলে। লাল মাটির পথের দু'পাশে গভীর জঙ্গল। যদিও পাতা নেই অধিকাংশ গাছে। আবার বহু গাছে আছেও। আমাদের দেশের সমতলের বন পর্ণমোচী হলেও সবরকম গাছের পাতাই একই সঙ্গে ঝরে না। তাই, সারা বছরই বনের রূপ দেখার মতো থাকে, বিশেষত হরজাই জঙ্গলে, যেখানে অনেকরকম গাছ-গাছালি একই সঙ্গে অবস্থান করে! চিরসবুজ গাছ সমতলে তো বিশেষ দেখা যায় না!

সুন্দরী মেয়ার নদী আমাদের বাঁদিকে পথ বরাবর বয়ে চলেছে। প্রত্যেক নদীর রূপই আলাদা আলাদা। কারও সঙ্গেই কারও মিল নেই। প্রত্যেক নদীর গায়ের গন্ধও আলাদা। যাদের নাক আছে, তারাই এ কথা জানে। তবে এ কথা সত্যি যে, চোখ-নাক-কান এ সবেরই ব্যবহার শিখেছি আমি ঋজুদার কাছে। ড্যাবা-ড্যাবা চোখ, গাধার মতো বড় বড় কান এবং ইন্দিরা গান্ধীর মতো নাক থাকলেই যে তিনি সবই দেখতে বা শুনতে বা শুঁকতে পাবেন এমন কোনও কথা নেই। সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই ধার দিয়ে দিয়ে তাদের ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়াতে শিখতে হয়। গুরুর মতো গুরু পেয়েছিলাম, তাই আমার কথা আলাদা। খুবই ভাগ্যবান আমি।

একদল ময়ূর সামনে দিয়ে পথ পেরোল। পথ পেরিয়েই ভারী ভারী নীলচে চিকন ডানায় দুপুরের লালরঙা রোদকে চারিয়ে দিয়ে কেঁয়া কেঁয়া কেঁয়া করে ডাকতে ডাকতে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভারী শরীর নিয়ে গাছে উঠে পড়ল। অল্পবয়সি, শাড়ি-পরতে অনভ্যস্ত মেয়েরা যেমন মায়েদের শাড়ি পরে হিমসিম খায়, ময়ূরেরাও তাদের মস্ত মস্ত লেজগুলো নিয়ে চলাফেরার সময়ে তেমনই হিমসিম খাচ্ছিল।

এই পথটা কোথায় গেছে প্রেমলাল?

আমি শুধোলাম।

বিন্দুল।

তারপরই ও ডানদিকে হাত তুলে দেখাল ও বলল, ডানদিকে একটু ভিতরে গেলেই রাবণমারা গুম্ফা। ছোট টিলার উপরে অতিকায় কালো পাথরে খোদাই করা। এখানে ষোলোভুজা দুর্গা মায়ের মূর্তি আছে। প্রণাম করে যাবেন সাহেব? ঝিঙ্গাঝিরিয়ার বাঘের ডেরাতে যাচ্ছেন।

তোমার বাবাকে যেদিন হুজুরু পাহাড়ে বাঘে ধরে সেদিনও তো প্রণাম করে গেছিলে তোমরা যাবার সময়ে। যাওনি?

না সাহেব। প্রণাম করে যাইনি বলেই তো অঘটনটা ঘটল।

তাই?

তারপর ঋজুদা বলল, কালকে আবার আসব প্রেমলাল। তখন প্রণাম কোরো তুমি। রুদ্রও করবে। আমি আকাশ বাতাস জঙ্গল সমুদ্রকে পুজো করি, মন্দিরের দেবদেবীকে করি না, কোনওদিনও করিনি। তাবলে এমন ভেবো না যে, যারা করে, তাদের আমি বাধা দিই কখনওই। এসব নিজের নিজের বিশ্বাস, ভাললাগার ব্যাপার!

প্রেমলাল বলল, ঝিঙ্গাঝিরিয়ার বাঘের ডেরা হুজুরু পাহাড়ে যাচ্ছি, পুজো দিয়ে গেলে ভাল হত সাহেব।

ছাড়ো তো প্রেমলাল। কালকেই হবে।

ঋজুদা বলল।

যা বলবেন সাহেব।

বলল, প্রেমলাল।

আমি বুঝলাম যে, ও অখুশি হল।

আরও মিনিট দশেক গাড়ি চালিয়ে যাবার পরে প্রেমলাল বলল গাড়িটা এখানে রাখতে হবে। আর যাবে না। জিপ হলে আরও কিছুটা যেত। এবারে বাঁদিকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

আমরা কথাবার্তা আস্তে আস্তেই বলছিলাম।

আমি বললাম, কতদূর?

খুব বেশি নয়। কাছেই।

প্রেমলালের গলাতে জলের বোতল দুটো আড়াআড়িভাবে ঝুলিয়ে দিয়ে টর্চ দুটোও ওরই জিম্মাতে দিয়ে যার যার বন্দুক রাইফেল লোড করে গাড়ি থেকে নামলাম আমরা। লক্ষ করলাম যে, প্রেমলালের মুখে কোনও ভাবান্তর ঘটল না। যখন এ তল্লাটের মানুষে এই পথকেই বলতে গেলে ত্যাগ করেছে তখন দু'জন অপরিচিত মানুষের সঙ্গে সে এক হাতে টাঙ্গি, অন্য হাতে দুটি টর্চ এবং গলাতে জলের বোতলের মালা নিয়ে পায়ে হেঁটে ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকোর ডেরা হুজুরু পাহাড়ের দিকে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে একটুও ভয় পেল না। যার আর্ত-চিৎকার করা বাবাকে তার চোখের সামনেই এই বাঘ কোমরে কামড়ে ধরে জ্যান্ত অবস্থাতে নিয়ে গেছে, সেই বাঘের সঙ্গে এই পনেরো বছরের অসীম সাহসী ছেলেটির যেন কিছু বোঝাপড়া ছিল। ওর যদি একটা ভাল বন্দুক বা রাইফেল থাকত আর ও যদি তা চালাতে জানত তবে ও নিজেই হয়তো মেরে দিত তার পিতৃহন্তাকে। কারণ আমরা দু'পাতা ইংরেজি পড়লেও, বনজঙ্গলের খবর ও বনজঙ্গলকে ও আমাদের চেয়ে অনেকই ভাল জানে। আমাদের দেশে

আজও যাদের যা-কিছুরই প্রয়োজন তীব্র, তার কোনও কিছুতেই হাত দেওয়ার সামর্থ্য দেশের সেই সাধারণ মানুষদের নেই। কবে যে হবে, তাও অজানা। দুঃখ হয়।

এদিকটাতে শালই বেশি, প্রাচীন মহুয়া ও জংলি আমও আছে কিছু। একটু এগিয়েই হুজুরু পাহাড়টাকে দেখা গেল। কালো পাথরের পাহাড়। ঘন জঙ্গলাবৃত। অনেক গুহা আছে উপরে নীচে। পাহাড়ের গায়ে যে সব গাছ আছে, তাদের অধিকাংশরই পাতা ঝরেনি। গরমে তাদের পাতা ঝরে না, শরতে বা হেমন্তে বা শীতে ঝরে। তাই পাহাড়টা এই আদিগন্ত ঝলসে-যাওয়া পটভূমিতে একটা ছায়াঘেরা মরূদ্যানের মতো। দুপুরের উথাল-পাতাল হাওয়ায় গাছেদের হাজার হাত যেন আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

মৃত্যুই ডাকছে কি?

প্রেমলালই গাড়িতে আসতে আসতে বলছিল যে, রবার্টসগঞ্জের কোনও এক পাগলা সাহেব নাকি এখানে একটা বাংলো করে থাকবেন বলে প্রতি বর্ষায় মুঘলসরাই মির্জাপুর বানারস ইলাহাবাদ এসব জায়গা থেকে নানা গাছের বীজ ও চারা এনে এখানে পুঁতে দিতেন। কুড়ি বছর পুঁতেছিলেন। গাছগুলো সব বড়ও হয়ে গেল কিন্তু রিগান সাহেব রিটায়ার করার এক বছর আগে নিজেই কালাজ্বরে মারা গেলেন। গাছ রইল, পাহাড় রইল, সাহেবের স্বপ্ন রইল ঠিকঠাক কিন্তু সাহেবই রইল না। এসব গল্প প্রেমলাল তার বাবার কাছে শুনেছে। সাহেবদের মধ্যে তবু অনেক সুন্দর পাগলা দেখা যেত, আমাদের মধ্যে পাগল কেউই নেই, সবাই সেয়ানা, সবাই শুধু নিজের লাভটুকুই বোঝে। এই গুহাগুলোকে অক্ষত রেখে তাদের ব্যবহার করে এক দারুণ জঙ্গলের বাড়ি করতে চেয়েছিলেন সাহেব। এই গুহাগুলোর মধ্যে নাকি একটা ঝর্নাও আছে। অল্প হলেও, সারা বছর জল থাকে তাতে। সে কারণে ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো এখানে আস্তানা গাড়ার অনেকদিন আগে থেকেই এই হুজুরু পাহাড় বড় বাঘ ও বড় বড় ভাল্লুকের প্রিয় জায়গা ছিল। নানা জাতের সাপও আছে এখানে অসংখ্য।

প্রেমলালের কথা শুনে বোঝা গেল সুখমন্তির কাছে আসার আগে বাঘ কেন সামনের জলাটাতে জল খেতে আসেনি কাল রাতে।

সাপের কথাতে কালকের সাপটার কথাও মনে পড়ে গেল আমার। ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, কাল যে সাপটা জল খেয়ে গেল, কী সাপ ছিল সেটা ঋজুদা? বাবাঃ প্রায় ষোলো ফিট লম্বা হবে। আর কী জেল্লা তার!

ষোলো ফিট কেন, তারা আঠারো ফিটও হয়। কী সাপ চিনতে পারলি না? সাপদের মধ্যে কুলীন। শঙ্খচূড়। যার কামড়ে প্রাপ্তবয়স্ক হাতিও শুয়ে পড়ে। হাতির শরীরের মধ্যে আর কোথায় বাঁধন দেবে লোকে, এই তো কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়ার পিলখানার মধ্যে একটা হাতির শুঁড়ে শঙ্খচূড় ছোবল মারতে হাতিটা চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে মরে যায়।

ও তাই বুঝি মধ্যপ্রদেশের বনে হাতি থাকে না।

আমি বললাম।

ঋজুদা হেসে ফেলল।

বলল, নাঃ। তুই সত্যিই দিনকে দিন একটা ক্লাস-ওয়ান-গ্রেড-ওয়ান ইডিয়ট হয়ে উঠছিস। ভটকাইটা সঙ্গে না এলে তোর বুদ্ধিতে ধার দেওয়ার কেউ থাকে না তো। তাই তোর এই অবস্থা। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল ছাড়া অন্য অনেক রাজ্যের জঙ্গলেই তো আছে শঙ্খচূড় সাপ। তবে? সে সব জায়গাতে হাতি থাকে কী করে। তবে এটা ঠিক যে, মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে হাতি নেই অথচ বিন্ধ্য, মাইকাল, সাতপুরা এই তিন পর্বতশ্রেণী আছে এখানে। তবু হাতি কেন থাকে না তা নিয়ে গবেষণা হতে পারে। হয়তো করবেনও কখনও কেউ।

আমি প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললাম, আমরা যে কথা বলছি পাহাড়ের কাছে এসে, তা কি ভাল হচ্ছে?

হচ্ছে। আরও জোরে জোরে কথা বল। এ বাঘ তো মানুষকে ভয় পায় না। এ শিকারি-খেকো বাঘ। আমরা যে এসেছি তার সঙ্গে টকরাতে তা তাকে জানানো দরকার। এ বাঘকে মারা কিন্তু সত্যিই কঠিন নয়, যদি না সে আমাকে বা তোকে আগেই মেরে দেয়। যাই বলিস আর তাই বলিস রুদ্র, দুশমন হো তো অ্যায়সা।

শেষ বাক্যটি মনে হল প্রেমলালের খুব পছন্দ হল!

ঋজুদা তাকে পাইপের সুগন্ধি টোব্যাকো দিয়েছিল একটু। ওইটুকুকে খইনির মতো বাঁ হাতের তেলোতে মেরে জিভের নীচে দেওয়ার পর থেকেই প্রেমলালের স্ফূর্তি বেড়ে গেছে। কী যে সুন্দর সুগঠিত চেহারা ছেলেটার। একটা কদম গাছ পেলে তাকে তার নীচে দাঁড় করিয়ে দিতাম কেষ্ট করে।

হঠাৎই প্রেমলাল এবং ঋজুদা দু'জনে একসঙ্গেই থমকে দাঁড়াল। নাক টেনে গন্ধ নিল যেন কীসের।

একদল ছাতারে পাখি, ইংরেজিতে যাদের বলে ব্যাবলার, সবসময়েই babble করে বলে, অথবা সেভেন-সিস্টারস, ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা করে নাচতে নাচতে ডাকছিল কতগুলো পিটিস ঝোপের সামনে। পাখিগুলো হঠাৎই ভয় পেয়ে উড়ে পূর্বদিকে চলে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ময়ূরের তীক্ষ্ণ, তীব্র ডাক ভেসে এল হুজুরু পাহাড়ের উপরের একটি শিমুল গাছ থেকে।

আমি গন্ধটা পাবার চেষ্টা করলাম এবং আশ্চর্য! পেলামও। কুকুর বৃষ্টিতে ভিজলে তার গা থেকে যেমন বোঁটকা একটা গন্ধ বেরোয় গন্ধটা তেমনই তবে কুকুরের যে নয় তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। গন্ধটা তীব্র এবং উৎকট।

ঋজুদা মুহূর্তের মধ্যে প্রেমলালকে ইঙ্গিত করল সামনেরই একটা মহুয়া গাছে উঠে যেতে। টর্চ এবং জলের বোতল দুটো মাটিতে নামিয়ে রেখে, ভারমুক্ত হয়ে প্রেমলাল তড়িঘড়ি টাঙ্গিটাকে কাঁধে ফেলে বাঁদরের মতো তরতরিয়ে গাছে উঠে গেল। কিন্তু সামান্য উঠতেই ঋজুদা তাকে ইঙ্গিতে থামতে বলল। কোনও বড় বাঘ

পেছনের দু'পায়ে ভর করে মাটিতে দাঁড়িয়েই ইচ্ছে করলেই প্রেমলালকে ধরতে পারে এখন। ঋজুদা আমাকে আমার বাম বাহু ধরে বাঁদিকে ঠেলে দিল আর নিজে ডানদিকে চলে গেল, গিয়ে একটা বড় শালগাছের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে এদিকে মুখ করে দাঁড়াল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাই করলাম। মনে হল, বাঘটা কাছেই আছে। ঋজুদা প্রেমলালকে, টোপ দিচ্ছে বাঘকে। বাঘ যে ক্ষুধার্ত তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, সুখমন্তির শরীরের কিছু অংশ পরশুদিন খাওয়ার পরে আজ দুপুর অবধি সে কোনও মানুষ ধরেনি। মানুষ ছাড়া সে আর কিছুই ধরছে না। বন্য প্রাণীর কথা ছেড়েই দিলাম, গৃহপালিত কোনও পশুও ধরছে না। বিপদ তো সে জন্যেই। পরশু তার খাওয়াটাও ভরপেট হয়নি। কিন্তু প্রেমলাল-এর বাবাকে খেল ও বাঘ আর ঋজুদা প্রেমলালকেই টোপ দিল। যদি সত্যিই মেরে ফেলে বাঘ প্রেমলালকে তবে মুখ দেখাতে পারব না আমরা আর কারও কাছে। এ কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম যে বাঘ যদি তার চেহারার একটুও দেখায় আজকে তবে হয় ইসপার নয় উসপার। সে মহা ধুরন্ধর হতে পারে কিন্তু ঋজু বোস আর তার চেলাও কোলকাতা থেকে এতদূরে তার হরকৎ দেখে তাকে হাততালি দিতে আসেনি। নিশ্বাস বন্ধ করে একটা বড় আমগাছে পিঠ ঠেকিয়ে, পিছন দিকটা সুরক্ষিত করে বন্দুকের স্মল অফ দ্য বাট ডান হাতের পাতায় শক্ত করে ধরে ট্রিগার-গার্ড-এর উপরে আঙুল রেখে, ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি সাইড-লক এর উপরে ছুঁইয়ে, বাঁ হাত দিয়ে বন্দুকের লক এর নীচের অংশ এবং উপর দিয়ে ব্যারেল শক্ত করে ধরে একেবারে তৈরি হয়ে রইলাম।

বেশ অনেকক্ষণ কেটে গেল। একটা হুপি পাখি হই হই করে ডেকে উঠল। ঝুঁ-ঝুঁ-বুইই করে একটা কাঁচপোকা উড়তে লাগল প্রেমলালের মাথার ওপরে। হাওয়াটা ঘুরে গেছে। সেই গন্ধটা আর পাওয়া যাচ্ছে না। চারদিক থেকে এখন স্বাভাবিক গলাতেই পাখিরা ডাকাডাকি করছে। একজোড়া কপারস্মিথ টুক টুক টুক টুক করে ডাকছে। সে ডাকছে পাহাড়তলি থেকে। তার দোসর সাড়া দিচ্ছে মাছবান্ধা নালার দিক থেকে। সমস্ত বন কাকলিমুখর হয়ে উঠছে। যদিও সন্ধে হতে এখনও দেরি অনেক।

প্রেমলালকে নেমে আসতে ইশারা করল ঋজুদা। ও গাছ থেকে নেমে আমাদের সম্পত্তি সব তুলে নিয়ে আবার এগোল। সামান্য কিছুটা গিয়েই একটা জানোয়ারচলা পথে এসে পড়লাম আমরা। কাল বৃষ্টি হওয়াতে নানা জানোয়ারের পায়ের ক্ষুরের ও থাবার দাগ সহজেই খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না আমাদের কারওরই।

এবারে নিজের ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে আমাদের চুপ করে থাকতে বলে ঋজুদা নিজেও চুপ করে এগোতে লাগল। সেই পথের উপরে শুয়োর, চিতল হরিণ, শম্বর, এবং কোটরা হরিণ, শজারু ইত্যাদির পায়ের দাগ পেলাম। কিন্তু বাঘের পায়ের দাগ পেলাম না। আশ্চর্য। বাঘ কাল বৃষ্টির পরে এ পথ দিয়ে এলে বা গেলে

তার পায়ের দাগ নরম মাটিতে অবশ্যই পাওয়া যেত, মাছবান্ধা নালার পারেও পাওয়া যেত।

প্রেমলাল এবারে আগে আগে যাচ্ছিল পথ দেখিয়ে। আমরা যখন হুজুরু পাহাড়ের সেই কুখ্যাত গুহাতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন বিকেল চারটে বাজে। গুহার মুখটা মস্ত বড়। সামনে একটা বিরাট চ্যাটালো পাথর, কোনও প্রাগৈতিহাসিক আদিবাসী ছেলের বুকের পাটার মতো। তার উপরে একশোজন মানুষ শুয়ে-বসে হাত-পা ছড়িয়ে পিকনিক করতে পারে। কিন্তু পিকনিক করে এখানে বাঘ একলাই! নানা জানোয়ারের হাড় পড়ে আছে এদিকে-ওদিকে। গুহার মধ্যে টর্চ ফেলল ঋজুদা। দুটি নরকঙ্কালও রয়েছে তার মধ্যে। চামচিকের গায়ের গন্ধর মতো বিটকেল গন্ধ তার সঙ্গে বাঘের গায়ের তীব্র গন্ধ মিশে এক তীব্র মিশ্র গন্ধ বেরুচ্ছে গুহার ভিতর থেকে।

ঋজুদা ফিসফিস করে প্রেমলালকে জিজ্ঞেস করল, গুহার পেছনের মুখটা কোন দিকে?

প্রেমলাল হাত তুলে দেখাল।

গুহাটা লম্বা কতখানি হবে?

এবারে আমি শুধোলাম।

প্রেমলাল ফিসফিস করে বলল, ছেলেবেলাতে আমরা এর মধ্যে খেলা করেছি কত। এক সাধুবাবা থাকতেন তখন এই গুহাতে। শিবরাত্রির দিনে এখানে তখন ছোট মেলাও বসত। পাঁচ বছর আগে সাধুবাবা দেহ রাখেন। তার পরই এই গুহা অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকে কয়েক বছর। গত তিন-চার বছর হল বাঘ ভাল্লুকেরা দখল নিয়েছে। ইদানীং এই ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো ডেরা করেছে এখানে। এখানে একজোড়া ভুত আর পেতনিও থাকে। তারা ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকোর মরা মানুষদের হাড় দিয়ে ডাংগুলি খেলে।

ঋজুদা বলল, শোন রুদ্র। এই আসল ভারতবর্ষ। তোরা হাতে মোবাইল ফোন নিয়ে ঘুরলে আর বাড়িতে ইন্টারনেট বসালে কী হবে। এখনও আমাদের দেশের আশি ভাগ মানুষ এই ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো, ব্যয়রানের কোনও মৃত দাগী আসামীর আত্মার প্রতিভূ আর মানুষের হাড় দিয়ে ডাংগুলি-খেলা ভূত পেতনির রাজত্বেই বাস করে। এরাই আসল ভারতবর্ষ। যতদিন না এদের উন্নতি হচ্ছে, এরা আলোক-প্রাপ্ত হচ্ছে, ততদিন আমাদের অগ্রগতির সব আস্ফালন মিথ্যে হয়েই থাকবে।

গুহাটা লম্বা কতদূর?

তারপরই ঋজুদা শুধোল।

বেশি নয়। আমরা যতদূর এসেছি হাঁটা পথে গাড়ি থেকে তার দশভাগের একভাগ মতো হবে। তবে ভিতরটা সোজা নয়। আঁকাবাঁকা। পেছনে একটা নয়, তিনতিনটে মুখ আছে। তাই আমরা এই ভুলভুলাইয়াতে চোর-পুলিস খেলতাম।

ঋজুদা বলল, হুঁ। চলো এবারে ফিরি। বাঘ এখানে নেই আজ।

তবে গন্ধটা?

প্রেমলাল বলল।

আমিও গলা মেলালাম ওর সঙ্গে।

গন্ধটা গন্ধগোকুলের।

গন্ধগোকুল কওন চিজ হ্যায় স্যাব?

ভাম।

ভাম কওনসি চিজ?

ঋজুদা বলল, বিপদে ফেলল প্রেমলাল। ভাবতাম হিন্দিটা মোটামুটি জানি। এখন দেখছি জানি না।

ভাম তো বঙ্গভূমের প্রাণী। এই মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলেও কি থাকে?

আমি বললাম।

না থাকার কী?

বলেই, ঋজুদা বলল, বড্ড বেশি কথাবার্তা হচ্ছে। চারদিকে নজর রেখে সাবধানে এগো। পেছনেও নজর রাখবি। আমাকে বা তোকে বাঘে খেলে ক্ষতি নেই প্রেমলালকে পাহারা দিয়ে চল।

হঠাৎ ঋজুদার মধ্যে একটু ছটফটানি লক্ষ করলাম। এরকম করে ঋজুদা। তবে কারণ থাকলেই করে। আমি ভাবছিলাম, কারণটা কী হতে পারে।

আর কথাবার্তা না বলে আমরা তিনজনেই গাড়িতে এসে উঠলাম। গাড়িটা খোলাই ছিল। মানে লক করে যাইনি যাবার সময়ে। এইসব অঞ্চলে, থাকলে, সাইকেল-চোর থাকতে পারে। গাড়ি-চোর নেই। আমি স্টিয়ারিং-এ বসলাম। ঋজুদা আমার পাশে। পেছনে প্রেমলাল টর্চ ও জলের বোতল নিয়ে।

জলের বোতলটা নিয়ে ঋজুদা জল খেল। আমি বললাম, আমাকে দাও একটু। আমি খেয়ে প্রেমলালকে জিজ্ঞেস করলাম।

ও বলল, খাব না। তারপরই বলল ও ছোট জাত, একই বোতলে মুখ দিয়ে জল খাবে কী করে। অন্য বোতলটা ওকে দিলাম, কিছু না বলে।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিতেই ঋজুদা বলল, সোজা মারার বাংলোতেই চল।

একটু এদিক-ওদিক দেখে যাবে না? বিন্দুলের পথে একটু গেলে হত না?

আমি বললাম।

নাঃ ফিরেই চল। ঋজুদা বলল।

মাইলটাক গিয়েই একটা বাঁক ঘুরতেই যখন মস্ত মস্ত দুটো সাহাজ গাছ আর দুটো অমলতাস গাছের নরম হলুদ ছায়াতে 'মারা'র বাংলোটা দেখা গেল, চোখে পড়ল বাংলোর সামনে ছোটখাটো একটি ভিড় জমেছে। ঋজুদা স্বগতোক্তি করল, কী হল আবার?

গাড়ি সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই সকলে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল ওরা। হাটুরে মানুষেরা সব। এমন সময়ে সুরাবলী সিং সাহেব বাংলোর বারান্দা থেকে নেমে এসে বললেন, খতরা বন গ্যায়ে ঋজু বোস সাব।

কী হল?

সিং সাহেব বললেন, হাট সেরে এক বুড়ো আর তার যুবতী মেয়ে যাচ্ছিল নইনগরে। তারা মারা থেকে কোয়ার্টার কিমি দূরে রাস্তাটা যেখানে একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে বাঁদিকে হঠাৎ বাঁক নিয়েছে, সেখানে পৌঁছতেই পথের পাশের একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বাঘ মেয়েটাকে ধরে মুখে করে নিয়ে চলে গেছে ডানদিকের জঙ্গলে। বুড়ো টাঙ্গি নিয়ে বাঘের পেছন পেছন দৌড়েওছিল কিছুটা কিন্তু মেয়েকে মাটিতে নামিয়ে রেখে যখন তাকেই ধরবার জন্যে তেড়ে এল বাঘ, তখন প্রাণভয়ে বুড়ো বাংলোতে দৌড়ে এসেছে।

আমি ভাবছিলাম, নিজের প্রাণকে মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালবাসে বোধহয়। নিজের চেয়ে বেশি ভাল আর কাউকেই বাসি না আমরা কেউই।

কতক্ষণ আগে ঘটেছে এ ঘটনা? ঋজুদা শুধোল।

এক্ষুনি। গোন্দ বুড়ো-এসে পৌঁছোল এই দশ মিনিটও হয়নি।

ঋজুদা একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, একটা টর্চ নে। দুটো নেওয়ার দরকার নেই।

তারপর সুরাবলী সিংকে বলল, আপনার বাবুলাল কোথায়? তাকে বলুন, আমাদের দু'জনকে ওখানে একটু পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবে আবার এখানে।

আপনারা ফিরবেন কখন? হেঁটে ফিরবেন? রাতে মোরগা বানাতে বলব তো? আর পরাঠা?

ভাইয়ালাল জিজ্ঞেস করলেন।

একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন ঋজুদাকে ভাইয়ালাল।

ঋজুদা কখন খুব রেগে যায় তা আমি মুখ দেখেই বুঝতে পারি। ভাইয়ালালের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে বসে পড়ল। আমিও উঠলাম অন্যদিকের দরজা দিয়ে। বাবুলাল ততক্ষণে তার গাড়ি ফেরত পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। কোনও ভাল ড্রাইভারই, তা তিনি গাড়ির মালিকই হন, কি কর্মচারী, নিজের গাড়িতে অন্য ড্রাইভার হাত লাগান তা পছন্দ করেন না।

ঋজুদা বলল, চলো ভাই। হাম দোনোকো ছোড়কর গাড়ি লেকর বাংলামে লওট আনা।

তারপর প্রেমলালকে বলল, প্রেমলাল তুম বাংলামে ড্রাইভার সাহাবকি সাথ খাপি কর বাংলামেই রহ যানা।

প্রেমলাল বলল, ম্যায় চলে আপলোগোঁকি সাথ।

ঋজুদা ওর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, এখুনি সন্ধে নেমে যাবে। অন্ধকারে ওই বাঘের হাত থেকে নিজেদের প্রাণই বাঁচানো মুশকিলের। তার ওপর তোমার

দায়িত্ব নেওয়া যায় না। যদি কাল সকালে আবারও ওই বাঘের পেছনে যেতে হয়, যদি আমাদের মধ্যে একজনও অক্ষত অবস্থাতে আজ ফিরে আসি, তবে কালকের কথা কালকেই ভাবব।

ড্রাইবার বাবুলাল মোটাসোটা সুখী মানুষ। এবং মনে হল আক্কেলও কম আছে একটু। সে বলল, কোথায় যাবেন স্যার এই বাঘের পেছনে অন্ধকারে। সিংসাহেব তো ঠাররার বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। রাতে পরাঠা আর মোরগা বানাচ্ছে প্যাহলেওয়ান। নিম্বুকা আচারভি আছে। আর রিকমচ।

প্যাহলেওয়ানটা কে?

সে তো বাওয়ার্চি। জয়ন্তর গেস্ট হাউস থেকে এসেছে।

ঋজুদা কোনও কথা বলল না।

আমি বললাম, ঠাররাটা কী জিনিস?

দিশি মদ। হাটিয়া থেকে নেওয়া হয়েছে।

আর রিকমচ?

ঋজুদা বলল, আরে বোকা। ডালের ধোকাকে বলে রিকমচ।

আমি বাবুলাল ড্রাইভারের বেয়াদপি দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। ঋজু বোস কে? তার পরিচয় এবং কাদের সঙ্গে তার ওঠাবসা কিছুই জানে না বাবুলাল বা রেঞ্জার সাহেবও। তাই এতবড় ধৃষ্টতা সে করতে পারল।

ততক্ষণে সেই বড় বড় ঝুরি-নামা প্রাচীন অশ্বত্থের কাছে পৌঁছে গেছি আমরা। পথটা ঠিক তার তলাতেই নব্বই ডিগ্রি ঘুরে গেছে বাঁদিকে। জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন। ডানদিকে ছোট বড় কতগুলো পাথর আছে। পিটিস আর বেশরম এর ঝোপ। এখানেই বাঘটা লুকিয়ে ছিল সম্ভবত।

ঋজুদা দরজা খুলে নেমে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। হাতের ইশারাতে ওকে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যেতে বলল ঋজুদা। বাবুলালকে তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে নির্দেশ দিতে হল না। সে এমনিতেই একেবারে টিকিয়া-উড়ান চালিয়ে চলে গেল মারা বাংলোর দিকে।

গাড়ি চলে গেল, ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, ডানদিকে রয়েছে বাঘ। তাই তো বলল। না?

হ্যাঁ।

ঋজুদা বলল, শোন রুদ্র। ব্যাপারটা বড় বেশি গড়িয়ে যাচ্ছে। আর গড়াতে দেওয়া যাবে না। যে আগে দেখতে পাবে সেই গুলি করবে। সে ভাইটাল জায়গা পাওয়া যাক আর নাই যাক। আহত হলে তারপর নিজেরা মরেও তাকে তার পিছু নিয়ে গিয়ে শেষ করতে হবে। চোখের সামনে যা খুশি তা করে বেড়াবে ও আর সহ্য করা যায় না।

ঠিকই বলেছ।

আমি বললাম, দাঁতে দাঁত চেপে।

অন্ধকার হতে তখনও আধঘণ্টাটাক দেরি ছিল। পথের উপরে বাঘ যেখানে মেয়েটিকে ধরেছিল সেখানে মাটিতে তার থাবার দাগ এবং মেয়েটির ছেঁচড়ে যাওয়া পায়ের দাগও ছিল।

ঋজুদা বলল, টর্চটা তোর বেল্টের সঙ্গে গুঁজে নে। বলেই, চিতার মতো ক্ষিপ্রতায় এক লাফ দিয়ে ঋজুদা পথ থেকে ডানদিকের জঙ্গলে উঠে গেল। পেছন পেছন আমিও উঠলাম। ঋজুদা বলল চুপিসাড়ে, ডানদিকে ছোটবড় কতগুলো পাথর আছে। পিটিস আর বেশরম এর ঝোপ। এখানেই বাঘটা লুকিয়ে ছিল সম্ভবত হাত দশেক বাঁদিকে। সিঙ্গল ফর্মেশানে যাব না। বাঘ জানুক যে আমরা তার পিছু নিয়েছি। লুকোচুরির কিছু নেই। তবে খুব সাবধান। এ বাঘ নয়, সাক্ষাৎ যম।

ঠিক আছে। আমি বললাম।

আর কথা নয়। দেখতে পেলেই গুলি করবি। আগে গুলি, তারপর কথা।

ঠিক আছে।

আমি বললাম, চোয়াল শক্ত করে।

জায়গাটাতে জঙ্গল খুব গভীর। পাতা ঝরে গেলেও কিছু কিছু গাছে পাতা আছে তা ছাড়া পিটিস আর বেশরম-এর ঝাড়ে ভর্তি। জঙ্গলের তলাটা প্রায় দেখাই যায় না। এদিকে বাঁদর-হনুমান সম্ভবত নেই। থাকলে, আমাদের খুবই সুবিধে হত বাঘের অবস্থান জানতে। জঙ্গল ঘন বলে এখানে রেড বা ইয়ালো-ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গও নেই যে তারা আমাদের সাবধান করবে। ওরা সাধারণত ফাঁকা জায়গায়, টাঁড়-নদীর চরে উড়ে উড়ে বেড়ায়। জঙ্গলের গভীরে না থেকে সীমানা পাহারা দেয়। একটা কুবো পাখি, ইংরেজিতে যাকে বলে Crow-Pheasant, ওড়িয়াতে বলে কন্তাটুয়া, ঢাব ঢাব ঢাব ঢাব করে ডেকে আসন্ন সন্ধ্যার বনকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। আসলে জায়গাটা একটা পাহাড়তলি। সামনেই কিছুদূরে একটা পাহাড় উঠে গেছে। তাকে আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না বটে কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছি।

কয়েক পা যেতেই মেয়েটির রক্তমাখা ছিন্নভিন্ন নীল রঙা শাড়িটা দেখা গেল। একটা কাঁটাঝোপে আটকে আছে। শাড়িটা মোটা বলে এবং ওরা খুব গরিব বলেই বোধহয় শাড়ির নীচে শায়া পরেনি। তার পাশেই খুলে যাওয়া পুঁটলি। যে পুঁটলিতে করে হাট থেকে রসদ কিনে ফিরছিল। বোঝা গেল যে, মেয়েটি সেটাকে বাঘে ধরার পরেও ছাড়েনি। গরিবের সপ্তাহের বাজার ছিল তাতে। কিছু শুখা মহুয়া, জওয়ার, খেসারির ডাল, একটা লাউ, নুন, শুকনো লঙ্কা, কয়েকটা আলু, ছোট শিশিতে সরগুজার তেল—সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে চারদিকে। আর একটা বোতলে কেরোসিন তেলও। আশ্চর্য। বোতলটা ভাঙেনি—। তার মুখে একটা ছিপি, বাঁশের গোড়া কেটে তৈরি।

ঋজুদা কী মনে করে কেরোসিনের তেলের বোতলটা বাঁ হাতে তুলে নিল,

নিয়ে নিজের জিনস-এর হাঁটুর কাছে মস্ত বড় পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। কেন? কে জানে। আর একটু এগোতেই মেয়েটির, বোতাম-ছেঁড়া রক্তমাখা ছোট হাতার ছিটের ব্লাউজ, ভাঙা কাচের চুড়ি, দেখা গেল, পড়ে আছে। কাঁটাঝোপে আটকে আছে করৌঞ্জের সুগন্ধি তেলমাখা চকচকে লম্বা চুলের গোছা। মেয়েটির খুব লম্বা চুল ছিল মনে হয়। আর সেই চুলের সে খুব যত্নও করত বলে মনে হয়। আহা! দেখতে সে কেমন ছিল কে জানে!

আর একটু এগোতেই বাঘের গুড়গুড়ানি শোনা গেল, দূরাগত মেঘগর্জনের মতো। আমাদেরও যেমন ধৈর্য ফুরিয়ে এসেছিল হয়তো ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকোরও তাই। নইলে বাঘ কখনওই শিকারিকে তার অবস্থান জানায় না। বিশেষ করে, মানুষখেকো বাঘ।

আওয়াজটা শুনে, বাঘের অবস্থানের দিক এবং দূরত্বর একটা অনুমান আমরা করতে পারলাম।

ঋজুদা আমার দিকে চাইল। আমি, ঋজুদার দিকে। তারপরই ঋজুদা আওয়াজটার বাঁদিকে, সামনে এগিয়ে গেল আর আমি ডানদিকে। তারপরই নিজের নিজের আগ্নেয়াস্ত্র ডান হাতে ধরে খুব সাবধানে এক পা এক পা করে যত কম সম্ভব শব্দ করে এগোতে লাগলাম। পশ্চিম দিকে এগোচ্ছি আমরা। অস্তগামী ম্লান রোদ গাছপালার মধ্যে দিয়ে এসে চোখে লাগছে। তবে তা আর কয়েক মিনিটই লাগবে মাত্র। তারপরই সূর্য পশ্চিমের পাহাড়টার আড়ালে চলে যাবে।

আমরা বড় জোর পঁচিশ-তিরিশ পা এগিয়ে গেছি এমন সময়ে বাঘ জোরে একবার হুংকার দিয়ে উঠল। এমনই জোরে, মনে হল যেন শালগাছগুলোকে সেই গর্জন মাটি থেকে উপড়ে ফেলে দেবে। বাঘও আমাদের 'ডোন্টকেয়ার' করছে। আর আমরা তো করছিই। যা হবার তা হোক।

বাঘ এখনও যতদূরে আছে, বেশ দূরেই আছে, সেখানে শটগান দিয়ে মারা যাবে না। তবে রাইফেলের রেঞ্জে অবশ্যই আছে। আরও তিনচার পা এগিয়ে গিয়ে আমরা ফ্রিজ করে গেলাম। আমরা যে শিকারি, বাঘ তা জানে না। মেয়েটির বাবা যেমন তার পেছনে টাঙ্গি হাতে ছুটে গেছিল তেমনই একাধিক মানুষ তার কাছ থেকে মেয়েটির মৃতদেহটি নিয়ে যাবার জন্যে এসেছে, এমনই মনে করেছে বাঘ সম্ভবত। আমরা তাই স্ট্যাচুর মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আরও কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। বাঘ আর কোনও আওয়াজ করল না কিন্তু চপ-চপ শব্দ করে মাংসর টুকরো যে মুখে পুরছে, কটাং কটাং করে যে হাড় ভাঙছে তার শক্ত চোয়াল দিয়ে, সেই শব্দ শোনা যেতে লাগল। বোঝা গেল যে, তার খিদে পেয়েছে খুবই। দেরি করার মতো ধৈর্য তার নেই আর।

ঋজুদা আমাকে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে বলে নিজে রাইফেল রেডি-পজিশনে ধরে সেই দিকে নিঃশব্দে সাবধানে শুকনো পাতা এড়িয়ে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যেতে লাগল। ঋজুদা আমার থেকে পনেরো কুড়ি হাত

এগিয়ে গেছে, ঠিক এমন সময়ে কী যে হল তা বোঝার আগেই দেখলাম, চকিতে রাইফেল তুলে গুলি করল ঋজুদা। পাহাড়তলির ঘনবনের মধ্যে সেই চাপা জায়গাতে পয়েন্ট ফোরফিফটি-ফোরহান্ড্রেড রাইফেলের আওয়াজ গমগম করে উঠে সামনের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। এবং প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই ধনুকের মতো অর্ধচন্দ্রাকার হয়ে বাঘ লাফ দিয়ে উঠল উপরে। অনেকখানি উপরে। প্রায় পঁচিশ-তিরিশ ফিট উপরে। তারপরই ধপ আওয়াজ করে বাঘ মাটিতে পড়ল ঝোপ-ঝাড়, শালের চারা সব ভেঙে-ভুঙে।

তারপরই মৃত্যুর মতো নীরবতা।

কিন্তু তা স্থায়ী হল এক মুহূর্ত।

নীরবতার পরই পাটকিলে-রঙা উল্কার মতো উড়ে এল বাঘ আমার দিকে। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, একটা বিজা গাছের নীচে, সে জায়গাটা একটু উঁচু মতন ছিল। বাঘ ঋজুদাকে দেখতে পায়নি, সম্ভবত, আমাকেই দেখতে পেয়েছিল এবং ভেবেছিল গুলিটা আমিই তাকে করেছি। তাই আমাকেই আক্রমণ।

গুলি পেটে লাগলে সাধারণত অমন করেই লাফিয়ে ওঠে উপরে বাঘ বা চিতা। পেটে গুলি লাগলে যন্ত্রণাও খুবই হয় কিন্তু সামনের ও পেছনের দুটি পাই অক্ষত থাকে এবং অক্ষত থাকে মুখও, তাই তখন বাঘ শিকারি এবং ভুলোয়াওয়ালাদেরও যম হয়ে যায়। দুই লাফে বাঘ এসে মাটিতে পড়ল আমার থেকে হাত পনেরো সামনে। বন্দুক রেডিই ছিল। আমি ডানব্যারেল ফায়ার করলাম অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কিন্তু কিছুটা ভয় পাবার কারণে এবং কিছুটা সময়াভাবে বন্দুকটা কাঁধে তোলার সময় পেলাম না, যেমনভাবে গান-ক্লাবে স্কিট-শুটিং করি আমরা, তেমন করে বন্দুক কোমর অবধি উঠিয়েই ট্রিগার টেনেছিলাম।

গুলি তো করলাম কিন্তু বাঘকে রোখা গেল না। বাঘ উড়ে এসে পড়ল আমার উপরে। এত তাড়াতাড়ি ঝড়ের বেগে সে আমার উপরে এসে গেল যে বাঁদিকের ব্যারেল ফায়ার করার সময় আর পেলাম না। কিন্তু বন্দুকটা আড়াআড়ি করে ধরে বাঘ যাতে আমার মাথা বা ঘাড় কামড়াতে না পারে সেই শেষ চেষ্টা করে লক্ষমান বাঘের গতিজাড্যতে এবং ওজনের অভিঘাতে আমি চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। বাঘের দিকে বন্দুকের নল ঘোরাবার উপায় না থাকলেও ট্রিগার-গার্ডে ছোঁয়ানো আঙুলকে নীচে নামিয়ে এনে আমি শূন্যে বাঁদিকের ব্যারেল ফায়ার করলাম। বাঘের নাকের এক হাতের মধ্যে এল. জি.-র দানাগুলো কর্ণবিদারী শব্দ করে বেরিয়ে যেতে বাঘ চমকে উঠে কী ভাবল কে জানে, সে আমাকে এক ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিয়ে আরেক লাফে রাস্তার দিকে চলে গেল। বাঘ আমাকে ছেড়ে যেতেই ঋজুদা দৌড়ে এল আমার কাছে। আমার ডান হাত ও ডান বুকে বাঘের বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় পড়েছিল। মাংস খুলে পড়েছিল এবং রক্তে বুক এবং হাত ভেসে যাচ্ছিল। কিন্তু তখন আমি কোনও রকম যন্ত্রণা অনুভব করিনি। হতভম্ব হয়ে ছিলাম। শক লেগেছিল দারুণ। ঋজুদা বাঘের পেছনে কয়েক পা দৌড়ে গিয়ে দূরে

চলে যাওয়া বাঘের উদ্দেশে তার দ্বিতীয় ব্যারেলটিও ফায়ার করল। সে গুলি লাগল কি না বোঝার উপায় ছিল না। অবশ্যই বাঘকে মারার জন্যে নয়, কারণ বাঘ তখন প্রায় অদৃশ্যই হয়ে গেছিল, বাঘকে ভয় দেখাবার জন্যেই ছুড়েছিল গুলিটা, যাতে সে আর ফিরে না আসে। গুলি করেই রাইফেলটা সঙ্গে সঙ্গে রিলোড করে নিল ঋজুদা।

আমার মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে আমার গলাতে বা ঘাড়ে বা মাথায় যে বাঘের থাবা বা কামড় পড়েনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ঋজুদা বলল, এখানে শুয়ে থাক, রুদ্র। তোর কিসসু হয়নি। আমি এই গেলাম আর এলাম।

দৌড়ে ঋজুদা পথের দিকে চলে গেল। ততক্ষণে পরপর অতগুলো গুলির আওয়াজ শুনে, বাঘ মরে গেছে ভেবে গাড়ির সব কাচ তবুও তুলে সুরাবলী সিং সাহেব, ভাইয়ালাল, এবং শম্ভুপ্রসাদেরা প্রেমলালকে সঙ্গে নিয়ে বাবুলালকে দিয়ে জোরে গাড়ি ছুটিয়ে এদিকেই আসছিলেন।

ততক্ষণে ঋজুদা পথে নেমে এসেছে। ওঁদের নিয়ে ঋজুদা আমার কাছে ফিরে এল তক্ষুনি। আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ঋজুদা ওখান থেকে আসার আগে কেরোসিনের বোতলটা একটা ফাঁকা জায়গাতে ঢেলে দিয়ে পাইপের লাইটার দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটির বাবা গোন্দবুড়ো আরও কয়েকজনকে মেয়েটির লাশ আনতে যখন পাঠিয়েছিল পরে তখন বুঝলাম যে আগুনটা ওদের পথ নির্দেশের জন্যে।

মারাতে পৌঁছে ঋজুদা আমার চিকিৎসাতে লাগল। ফার্স্ট এইড বক্স থেকে বেঞ্জিন ঢেলে দিল ক্ষততে। মনে হল, জ্বালাতে মরে যাব। মনে হল ঋজুদাকে থাপ্পড় মারি, এমনই জ্বালা করতে লাগল।

ঋজুদা বলল, মরবি না, ভয় নেই। খুব জোর বেঁচে গেছিস। অবশ্য কোলকাতাতে ফিরে ভটকাই-এর হাতে তোর অন্যরকম মৃত্যু যে অনিবার্য তাতে কোনওই সন্দেহ নেই। এখুনি মরলে কি চলে রুদ্রবাবু? এখনও কত অ্যাডভেঞ্চার, কত রহস্যভেদ করা বাকি।

আমি এই কষ্টের মধ্যেও হেসে উঠলাম। গাড়িটা মেয়েটির লাশ নিয়ে ফিরে আসতেই ঋজুদা আমাকে তাতে তুলে ড্রাইভার আর সুরাবলী সিং সাহেবকে নিয়ে রওয়ানা হল। আমার ও মেয়েটির রক্তে নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর সাদা সিট-কভার লাগানো গাড়িটার যে কী অবস্থা হল কী বলব।

ওঁরা বললেন, জয়ন্ত-এ খুব বড় ও আধুনিক হাসপাতাল হয়েছে নর্দার্ন কোলফিল্ডস-এর। সিঙ্গরাউলি, জয়ন্ত, গর্বী, নীগাঁহি, বীনা এই সব নাম খাদানের। অনেকগুলো খাদান। ওখানে নিয়ে যেতে পারলে আর চিন্তা নেই।

জয়ন্ত-এ পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগল তা আমার মনে নেই। ঋজুদা ব্যাগ থেকে ভি. এস. ও. পি. কনিয়াক এর বোতলটা বের করতেই সুরাবলী সিং বললেন, জারা ঠাররা পিলা দুঁ উনকো?

নহি, নহি।

বলল, ঋজুদা, একটু বিরক্ত হয়েই। তার ব্র্যান্ডির বোতলটা আমার হাতে দিয়ে বলল, একটু একটু করে চুমুক দিয়ে খা। ধন্বন্তরী ওষুধ। সর্বরোগহারী।

আমি বললাম, মদ খাব? বাবা জানতে পারলে...

ঋজুদা ধমকে বলল, চুপ কর তো। এটা ওষুধ। তোর বাবার সঙ্গে আমি বুঝে নেব। ভারি বাবা দেখাচ্ছে। তোর বাবাকে কখনও বাঘে কামড়েছিল? যত সব ন্যাকামো।

জয়ন্ত-এর হাসপাতাল সত্যিই বিরাট। সেখান থেকে সিঙ্গরাউলিতে ফোন করে দিলেন সুরাবলী সিং সাহেব। ঋজুদার সব রিকুইজিশান, পেট্রলের জিপ সুদ্ধ জয়ন্ত-এ এসে হাজির হল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। সঙ্গে সেন সাহেব, দাস সাহেব এবং তিনচারজন সি.জি.এম. এবং জি.এম.। আমাকে কীসব ইঞ্জেকশান-টিনজেকশান দিলেন ডাক্তারসাহেবরা। টেডভ্যাকও। সার্জন এসে ক্ষত ড্রেস করে নানা বিদ্ঘুটে গন্ধের ওষুধ লাগালেন ক্ষততে। তারপর পেইন-কিলার ইঞ্জেকশান দিয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন ওঁরা। আর কিছু মনে নেই আমার। আমার নাকে তখনও বাঘের মুখের দুর্গন্ধ লালা লেগেছিল, স্পিরিট দিয়ে সিস্টারেরা যতই আমার মুখ পরিষ্কার করে দিন না কেন। আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার বোধ।

উল্কার মতো উড়ে-আসা ঝিঙ্গাঝিরিয়ার বাঘের সেই রূপ কি জীবনে কোনওদিনই ভুলতে পারব? জানি না।

জ্ঞান হারালাম আমি।

৪

সি. এম. ডি. সেন সাহেব এসেছিলেন বেনারস এয়ারপোর্টে আমাদের তুলে দিতে। মাসখানেক আমাকে নার্সিংহোমে থাকতে হবে কোলকাতাতে। কোল ইন্ডিয়া থেকে কোলকাতাতে অ্যাম্বুলেন্স-এর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। হুইলচেয়ারে করে প্লেনে তোলা হল আমাকে। আমার পেটেও থাবার চোট লেগেছে। তখন আমি বুঝতে পারিনি। পেটের উপরের দিকেও অনেকখানি জায়গা ইংরেজিতে যাকে বলে ল্যাসেরেটেড, তাই হয়ে গেছে। পেটের মধ্যের যন্ত্রপাতি কী বিকল হয়েছে না হয়েছে আমাকে কিছুই বলা হচ্ছে না।

হ্যান্ডশেক করে সেন সাহেব নেমে গেলেন প্লেন থেকে। প্লেনের মধ্যে আমি হিরো হয়ে গেলাম। জিরো যদি হিরো হয় তবে জিরোই জানে কীরকম এমব্যারাসড লাগে তার।

মধ্যপ্রদেশের সব খবরের কাগজে, দূরদর্শনে, বেতারে ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো যে মারা গেছে সেই খবর প্রচারিত হচ্ছে গত রাত থেকে। বাঘটা

মারল ঋজুদা কিন্তু যেহেতু আমি আহত হয়েছি আমাকেই হিরো বানানো হয়েছে শুনলাম। আমাদের পুতুপুতু-করা দেশের এই নিয়ম।

প্লেনটা টেক-অফ করলে আমি বললাম, এবার বলো তো ঋজুদা, বাঘটা যে মরেছে তা তুমি জানলে কী করে?

ঋজুদা বলল, চামড়াটাতো সঙ্গেই আছে। যখন কোলকাতাতে গিয়ে কাথবার্টসন অ্যান্ড হার্পারে ট্যান করানোর পর বাঘটা আসবে, তখনই দেখবি। মুখটাকে আর মাথাটাকে মাউন্ট করাবো। তোকেই দেব মাথাটা। নইলে তুই তো ভুলেই যাবি তাকে। তোকে চুমু খেতে চাইল, আর তুই এতই বাজে লোক, যে দিলি না খেতে।

কোথায় পেলে বাঘকে? আরও গুলি করতে হয়েছিল নাকি?

না না। ফোরফিফটি-ফোরহানড্রেডের গুলি তার পেট এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল। তার উপরে তোর ছোড়া এল. জি.-র দানাগুলোর কিছু লেগেছিল ওর বুকে ও ডান কাঁধে।

বাঘটাকে পেলে কোথায়?

যেখানে পাব ভেবেছিলাম।

কোথায়?

হুজুরু পাহাড়ে। তার গুহাতে। মানুষ যেমন মরবার সময়ে নিজের বাড়িতেই মরতে চায় জানোয়ারেরাও বিশেষ করে বাঘ বা চিতা, উপায় থাকলে, আহত হলেই, ওদের ডেরায় ফিরে যেতে চায়।

তারপর বলল, তবে গুহাতে ঢুকতে পারেনি। গুহার মুখে যে চ্যাটালো পাথরটা দেখেছিলি, সেখান অবধি গিয়েই তার উপরে পড়ে গেছিল। বেচারি। আমি জানতাম ওখানেই ও যাবে। কালাহাণ্ডিতে জনসন সাহেবের মারা একটি বাঘও ঠিক এইরকম ভাবেই পেটে গুলি খেয়ে তার গুহার ঠিক বাইরে অবধি পৌঁছে পড়ে গেছিল। কিন্তু তার চামড়া জনসন সাহেব পাননি।

কেন পাননি?

শকুন পড়ে গেছিল। ছুলোয়াওয়ালারা যখন রক্তের দাগ দেখে দেখে পৌঁছেছিল সেখানে তখন বেলা প্রায় এগারোটা।

তোকে হাসপাতালে ঘুম পাড়িয়েই আমি ফিরে গেছিলাম জিপ চালিয়ে 'মারা'তে। সুরাবলী সিং ঠাররা খেতে খেতে গাড়িতে এসেছিলেন আস্তে আস্তে। তবে পরে শুনেছি উনিও ওসব খান না। উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যেই খেয়েছিলেন। আমার সঙ্গে VSOP আছে তা উনি জানবেনই বা কী করে!

তারপর? পরাঠা আর মোরগা খেলে ডিনারে?

ওরা খেয়েছিল। তুই হাসপাতালে পড়ে আছিস আর আমি ভোজ খাব? কী যে বলিস। তবে ওখানে কাজের মানুষের চেয়ে তো খাওয়ার মানুষই বেশি ছিল।

তারপর বলল, কিছুই খাইনি বললে মিথ্যে বলা হবে। আমিও তোরই মতো

কনিয়াক খেয়েছিলাম একটু মুরগির মাংসের সঙ্গে। তুই কী চিন্তাতেই যে ফেলেছিলি! তোর কিছু হয়ে গেলে তোর মা-বাবাকে মুখ দেখাতাম কী করে বলত?

হয় তো নি।

তবে একটা কথা ভেবে ভাল লাগছে। তুই আমাকে অনেকবার বাঁচিয়ে ফিরেছিস। এই প্রথমবার তুই আহত হলি আর অক্ষত আমি তোর খিদমদ্গারি করলাম।

তারপর বলো। শেষটুকু বলো।

রাত থাকতে থাকতে আমি প্রেমলালকে নিয়ে আমার রাইফেল এবং তোর বন্দুক দুই নিয়ে হুজরু পাহাড়ের নীচে জিপ নিয়ে যতখানি যাওয়া যায় ততখানি গিয়ে, প্রেমলালকে কী করে বন্দুক ধরতে হয়, কী করে বন্দুকে নিশানা নিতে হয় তা ভাল করে বুঝিয়ে, সাইড সেফটি ক্যাচটা দেখিয়ে গুলি ভরে ওর হাতে তোর বন্দুকটা দিলাম। পুবের আকাশ ফরসা হওয়া মাত্র জিপ থেকে নেমে ওকে বললাম, আগে আগে যেতে। গুলিভরা বন্দুক হাতে আনাড়ির সামনে থাকাটা হাইলি ডেঞ্জারাস।

পাহাড়ে পৌঁছেই অবশ্য আমি আগে আগে চললাম। খুবই সাবধানে। পাহাড়ে গুহার কাছে পৌঁছে আমি দেখার আগেই বাঘের লেজটা দেখতে পেয়েছিল প্রেমলাল। আনন্দে চিৎকার করে উঠল ও। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, বাঘ লম্বা হয়ে শুয়ে আছে আরামে, স্বস্তিতে। বেচারির অনেক দুঃখের জীবন অনেক মানুষের দুঃখের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হল।

চামড়া যখন ছাড়ানো হচ্ছিল তখন দেখলাম যে গাদা বন্দুকের একটা মস্ত সিসের গুলি বেচারির ডান পা আর কাঁধের সংযোগস্থলে হাড়ের মধ্যে আটকে আছে আর ডান পায়ের পেশিতে সফিসটিকেটেড শটগান থেকে ছোড়া এল. জি.-র দুটি দানা। সাধে কি বেচারি তার স্বাভাবিক খাদ্য তো বটেই গৃহপালিত গোরু-টরুও ধরতে পারত না। যে অবিবেচক মানুষেরা তাকে এমন শাস্তি দিয়েছিল তাদেরই জ্ঞাতি-গুষ্টিকে খেয়ে সে সেই শাস্তি ফিরিয়ে দিত এতদিন। তবে কাঁধের ঘা-টার এমনই অবস্থা হয়েছিল যে ও আর বেশিদিন মানুষও ধরতে পারত না। না-খেয়েই হুজুরু পাহাড়ের গুহার মধ্যে মরে থাকত। বাঘের মতো মহান জানোয়ারের পক্ষে সেরকম মৃত্যু বড় মর্মান্তিক হত। তাও সে মরার সময়ে যুদ্ধ করে যে মরেছে, এইটুকুই সান্ত্বনার।

এই বাঘের জন্যে যে পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন মধ্যপ্রদেশ সরকার সেটা নেবে না তুমি?

আমি বা তুই নিয়ে কী করব বল? যে ওটা পেলে জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং যার বীরত্বর জন্যেও সেই পুরস্কার প্রাপ্য সেই প্রেমলালকেই দিয়ে দিতে বলেছি। সেই চিঠি দিয়ে দিয়েছি সেন সাহেবের কাছে। ও খালি হাতে যে

সাহসের পরিচয় দিয়েছে তাতে ওরই ন্যায্য অধিকার ওই পুরস্কারে। অতটুকু ছেলে। ওরাই তো আসল ভারতীয়। ওকে বলেছি জওয়ান হতে। আর্মিতে জয়েন করতে। তা ছাড়া, ওর বাবাকে তো ওই ঝিঙ্গাঝিরিয়ার বাঘই খেয়েছে। ওই পুরস্কারে তাই ওর ডবল অধিকার।

আমি বললাম, খুবই ভাল করেছ কাজটা ঋজুদা তুমি।

আমি তো ভালই করি কিন্তু কোলকাতা ফিরলে মিস্টার ভটকাই তোর ভাল করে কি করে না সেটাই এখন দেখার। তারা তো সব আসছে দমদম-এ, থুড়ি নেতাজি সুভাষ এয়ারপোর্টে, তোকে রিসিভ করতে।

তারা মানে? কারা?

হোল ব্যাটালিয়ান, তোর মা-বাবাও আসছেন। এমনকী তিতির আর গদাধরও।

তুমি কী যে করো না! এত সিন ক্রিয়েটেড হবে।

শুধু কি ওঁরাই। মিডিয়াও থাকবে। সব কাগজের রিপোর্টারেরা, টিভির বিভিন্ন চ্যানেলের লোকেরা, ক্যামেরা বাগিয়ে। আফটার অল, ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো নিজেই তো পুরো দেশের মিডিয়ার খবর হয়েছিল গত ন'মাস, তুই তার হাত থেকে ওই গরিব মানুষদের বাঁচালি তাতে তুই খবর হবি না?

আমি বাঁচালাম? না তুমি!

তুইই তো বাঁচালি! তোর স্যাক্রিফাইসই বেশি।

ও। তোকে একটা কথা বলা হয়নি। আমি যখন প্রেমলালকে নিয়ে শেষরাতে হুজুরু পাহাড়ে দিকে যাই তখন কিন্তু ও রাবণমারা গুম্ফাতে নেমে অন্ধকারেই যোলোভুজা দুর্গাকে প্রণাম করে গেছিল। আসলে কে যে বাঁচালেন বা বাঁচাল, তা নিয়ে সন্দেহ থাকতেই পারে। বাঘ যদি তখনও বেঁচে থাকত, রাতভর রক্তক্ষরণে মারা না যেত, তবে এই গল্পের শেষ তো অন্যরকমও হতে পারত!

তা অবশ্য ঠিক।

আমি বললাম।

ঋজুদা এবং ডাকু
পিপ্পাল পাঁড়ে

ঋজুদার বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে আমাদের সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। ভারত মহাসাগরের স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জে জলদস্যুদের পুঁতে রাখা গুপ্তধনের মালিকানা নিয়ে যে খুনের পর খুন হয়েছিল তারই কিনারা করে আমরা ফিরে আসার পরই এই জমায়েত, আমাদের সাকসেস সেলিব্রেট করার জন্যে। তিতির যদিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারেনি স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জে, কারণ সে তখন দিল্লিতে ছিল, ও এসেছিল সেই সন্ধ্যাতে ঋজুদার বাড়িতে বিশেষ অতিথি হিসেবে।

আজ রাতের মেনুতে গদাধরদার করণীয় কিছুই নেই। হাজারিবাগের আজ্জু মহম্মদ তার বাবুর্চিসমেত হাজির। আজ মোগলাই খানা। মাটন বিরিয়ানি, মধ্যে বটি কাবাবের গোল গোল বটিকা। গুলহার কাবাব, চিকেন চাঁব, পাঁঠার তেলের চৌরি, লাব্বা, পায়া আর কবুরার চচ্চড়ি। মাটন রেজালা, সিনা ভাজা। এক এক পদ খাবার শেষ হতে না হতে হামদর্দ দাবাইয়া কোম্পানির এক এক বটি 'পাচনল'। সমস্ত গুরুপাক খাদ্য নিমেষে হজম করানোর জন্যে।

বিরিয়ানির হাণ্ডি বসেছে রান্নাঘরে। উমদা বিরিয়ানি রান্না করাটাই শুধু আর্ট নয়, সেই বিরিয়ানি হাঁড়ি থেকে পরতে পরতে বের করাও, যাকে বলে 'হাণ্ডি নিকালনা' একটি বিশেষ আর্ট।

গদাধরদার ওসব অ-হিঁদু রান্নাবান্নাতে ঘোর আপত্তি। সে রান্নাঘরের বাইরের দিকে বারান্দাতে হাওড়া স্টেশনের কুলিরা ট্রেন না-থাকলে যেমন করে কোমর, আর মাটি থেকে তোলা দু'পায়ে গামছা কষে বেঁধে বসে আরাম করে, যেমন করে বসাকে শ্রীমান ভটকাই নাম দিয়েছেন 'পোর্টার আসন' (যোগাসনের তালিকায় তার নবতম অবদান) তেমন আসনে বসে প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে দু' ঠ্যাং দোলাচ্ছে আর গুন-গুন করে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুরে গাইছে এবং তারই মাঝে মাঝে গুণ্ডি পানের লাল তরলিমা পাশের পিকদানিতে পিচকিরির রঙের মতনই ছুড়ছে।

আমরা সব ঋজুদাকে ঘিরে বসে গল্প করছি। তিতির আফসোস করছে স্যেশেলস-এর সুন্দর দ্বীপপুঞ্জে আমাদের সফল অ্যাডভেঞ্চার এবং রহস্য উদ্ঘাটনের সঙ্গী হতে পারেনি বলে।

ভটকাই যেন তিতিরের জ্যাঠামশাই, এমনি করে বলল, শুধু কেতাবি বিদ্যেই সব নয় জীবনে, বুঝেছ তিতির দেবী, স্কোয়ার হতে হয়, স্কোয়ার। এ স্কোয়ার পেগ ইন এ রাউন্ড হোল।

আমরা সকলেই ভটকাই-এর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলাম।

ভটকাই বোকার মতন বলল, কী হল? তারপর তার দু' কান লাল হয়ে গেল। সে বলল, ভুল বললাম?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই। কোনও স্কোয়ার খোঁটা কি গোল গর্তে পোঁতা যায়? আর স্কোয়ার হওয়ার সঙ্গে স্কোয়ার পেগ-এরই বা সম্পর্ক কী?

ভটকাই বলল, সরি সরি ভুল হয়ে গেছে।

ওর ক্ষমা চাওয়ার কায়দাতে আমরা আবারও হেসে উঠলাম।

তিতির বলল, তা ছাড়া ভটকাই, ইংরেজিতে 'এ' বললে যাঁরা ইংরেজ, অথবা যাঁরা ইংরেজি জানেন, তাঁরা বুঝতেই পারবেন না। 'এ' হচ্ছে বাঙালি ইংরেজি, A'র উচ্চারণ সবসময়েই 'আ'। এটা মনে রাখবে।

ভটকাই নিজের অপ্রতিভতা কাটিয়ে উঠে বলল, ও ঋজুদা! মোগলাই খানা খাওয়ার নেমন্তন্ন করে এনে স্পোকেন ইংরেজির ক্লাসে ঢুকিয়ে দেবে জানলে আমি আসতামই না।

আমি বললাম, শেখার আবার স্থূল-অকুস্থূল কী রে! যার শেখার ইচ্ছে আছে সে চিতাতে উঠতে উঠতেও শেখে।

ঋজুদা আজ্জু মহম্মদকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের সীমারিয়ার সেই ডাকাত—রবিনহুড পিপ্পাল পাঁড়ের বাবা-মা কেমন আছে? তার দলের লোকেরা কি তাদের দেখাশোনা করে?

তা করে বইকি। বহত পড়ে-লিখে মানুষদের চেয়ে ওই ডাকাত-টাকাতদের মধ্যে ইনসানিয়াৎ অনেকই বেশি।

তিতির এতক্ষণে মুখ খুলল, বলল, ঋজুকাকা, এই পিপ্পাল পাঁড়ে লোকটি কে? এর কথা তো আগে শুনিনি।

এসব অনেকদিন আগের ঘটনা। যখন আমি আর আমার জঙ্গলের বন্ধু গোপাল নিয়মিত হাজারিবাগে যেতাম, তোরা হয়তো তখন জন্মাসইনি, সেই সময়কার ঘটনা।

ইসস। আমাদের সঙ্গে দেখা হলে কী ভালই না হত।

তিতির বলল।

আজ্জু মহম্মদ, হাজারিবাগের মহম্মদ নাজিমের বড় ছেলে, বলল, ক্যা বোল রহি হ্যা বহিন? জানসে বাঁচ গ্যয়ি তুম যো পিপ্পল পাঁড়েসে নেহি ভেটিন। ইকদফে হামকো মিলাথা পুরানা চাতরাকি রাস্তেমে। ইয়া আল্লা! চার পায়েরসে সাইকিল চালাকর বহুত মুশকিলসে জান বাঁচাকর পিচ রোডমে আকর পৌঁছা। আভভি ভি ইয়াদ আনেসে জি ঘাবড়াতা হ্যায়।

তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কখনও ঋজুকাকা?

তিতির শুধোল।

নেহি ভেটনেসে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়েকো...

তাহলে আমাদের বলো না ঋজুকাকা, ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের সঙ্গে তোমার প্রথম দেখা হওয়ার কথা।

এমন করে বলছ তিতির যেন ঋজুদার সঙ্গে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের বিয়েই হয়েছে। যেন শুভদৃষ্টি!

ভটকাই-এর ইয়ার্কিতে আমরা সকলে তো হেসে উঠলামই, আজ্জু মহম্মদও হেসে উঠল জোরে। তার মুখে জরদাপান ছিল। সুগন্ধি পানের রস ছিটকে গিয়ে লাগল ভটকাই-এর কপালে। আমরা ওর হেনস্থা দেখে আরেকবার হেসে উঠলাম।

আজ্জু মহম্মদ লজ্জা পেয়ে বলল, আমি একটু বাওয়ার্চিখানাতে যাচ্ছি। আজমল বাবুর্চি বলেছিলাম আগে ফিরনিটা বানিয়ে রাখবে, দেখি, গিয়ে কী করল!

তিনি হিন্না আতরের গন্ধ ঘরে রেখে চলে গেলেন রান্নাঘরে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা চেপে ধরলাম ঋজুদাকে।

পাইপটা ধরিয়ে, ঋজুদা বলল, কী যে বলব! এতে বাহাদুরির কী আছে জানি না।

আহা! বলোই না।

আমরা সমস্বরে বললাম।

ঋজুদা মিনিট দু'তিন ফিল-করা পাইপটাতে টান লাগিয়ে বলল, তখন তো আমরা ছাত্র। হাজারিবাগের বরহি রোডে গোপালদের ছবির মতন বাড়িতে আছি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝির কথা। হাজারিবাগ শহর থেকে যে লালমাটির পথটা চলে গেছিল গোরস্থান, বনাদাগ, গোন্দা বাঁধ, টুটিলাওয়া, সীমারিয়া হয়ে বাঘড়া মোড়, সেই পথে তখন ঝুঁণ্ডকে-ঝুঁণ্ড ময়ূর দেখা যেত। তিতির-বটেরের তো গোনা-গুনতি ছিল না। তা ছাড়া ভাল্লুকেরও আড্ডা ছিল সে অঞ্চলে। কেন? তা বলতে পারব না।

ময়ূর না ন্যাশনাল বার্ড! মারা তো বারণ।

ন্যাশনাল বার্ড ডিক্লেয়ার্ড হয়েছিল ষাটের দশকের গোড়াতে অথবা পঞ্চাশের দশকের শেষে। তখন মারাটা বে-আইনি ছিল না। ওই পথটা ছিল করোগেটেড টিনের মতো। প্রতি দু' ইঞ্চি বাদে বাদে ঢেউ উঠেছিল পথে। সাইকেলে বা গাড়িতে সে পথে যাওয়া বিস্তর অসুবিধার ছিল। তাই আমরা আগের দিন বিকেলের বাসে বন্দুক-কাঁধে করে চড়ে পড়ে, টুটিলাওয়াতে নেমে পড়ে, গোপালের বন্ধু ইজহারুল হক-এর ডেরাতে গিয়ে পৌঁছলাম। ইজহারুল নিজেও খুব শৌখিন মানুষ ছিল এবং ভাল শিকারিও। থাকত অবশ্য হাজারিবাগে কিন্তু টুটিলাওয়াতে অনেক জমিজমা ছিল। জোতদার যাকে বলে।

বাস থেকে নামতে নামতে সন্ধে। নাজিম সাহেব খিচুড়ির ইন্তেজাম করে ফেললেন। ফার্স্ট-ক্লাস খিচুড়ি, সঙ্গে ইজাহারের খিদমদগারের জোগাড় করা খাঁটি ঘি, বেগুনের ভাজা, কাঁচালঙ্কার আর পেঁয়াজের কুচি দেওয়া, আলুরও ভাজা। উপাদেয়। এই সব আজমল-ফাজমল নাজিম সাহেবের ধারে-কাছে আসত না বাওয়ার্চি হিসেবে, আজ নাজিম সাহেব বেঁচে থাকলে।

ভটকাই নাকটা উপরে তুলে ল্যাব্রাডার গান-ডগ-এর মতন গন্ধ শুঁকল বার তিনেক। তারপর স্বগতোক্তি করল, আমাদের আজমল মিঞাতেই চলবে ঋজুদা। বিরিয়ানির যা খুশবু ছেড়েছে না! আহা। এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল।

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম ওর কথা শুনে।

তিতির বলল, ভটকাই বড় ইন্টারাপট করে। বলো তো ঋজুদা।

হ্যাঁ। পরদিন অন্ধকার থাকতে থাকতে আমরা আমাদের বন্দুক আর গুলির বেল্ট নিয়ে, মাথায় টুপি চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম তিনজনে তিনদিকে। কথা হল যে, সকাল আটটাতে যেখানে টুটিলাওলা থেকে চাতরাতে যাওয়ার পুরনো পথটা বেরিয়ে গেছে, সেই মোড়ে এসে জমায়েত হব। সেখানে নিজামুদ্দিনও উপস্থিত থাকবে তার দলবল নিয়ে। শিকার করা পশু ও পাখি, যদি পাওয়া যায়, কুড়িয়ে নিয়ে আসবে বনে গিয়ে।

নাজিম সাহেব বললেন আমাকে চাতরার পুরনো পথে যেতে, কারণ সেখানে ভাল্লুক বাবাজির সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। একজোড়া অতিকায় ভাল্লুক নাকি সেই পথে মৌরসি-পাট্টা গেড়ে আছে। তবে বহতই খতরনাক তারা। যদিও সে পথ এখন পরিত্যক্ত কিন্তু যদি কেউ কখনও যায় কোনও কাজে, ছোটখাটো ঠিকাদার, ফরেস্ট গার্ড, জঙ্গলের কূপ-কাটনেওয়ালা, তবে তাদের কারও নাক, কারও কান, কারও চোখ খুবলে নেয়, কখনও কখনও বিনা নোটিসে 'রে রে' করে তেড়ে এসে কুস্তিও লড়ে। যতই 'খেলব না' 'খেলব না' করে কেউ চেঁচাক, আদৌ শোনে না। যার সঙ্গে কুস্তি লড়ে তাদের সর্বাঙ্গ ফালা ফালা হয়ে যায়। প্রাণ থাকে না।

নাজিম সাহেব বললেন, বহত সামহালকে যাইয়েগা ছঁওড়া-পুত্তানলোগ।

আরে তখন আমার যা বয়স আর যা শরীর তাতে স্বয়ং যম কুস্তি লড়তে এলেও তাকে কাবু করে দেবার হিম্মত রাখি। ভয় ব্যাপারটা শিশুকাল থেকেই আমার চরিত্রানুগ নয়। তাই বললাম, বে-ফিক্কর রহিয়ে।

নাজিম সাহেব তখন বললেন, আপকি বত্রিশ ইঞ্চি ব্যারেলকা গ্রিনার বন্দুক হ্যায় ঔর আপকি নিশানা ভি বঁড়িয়া। ভাল্ কি লিয়ে কুছ ভি ফিক্কর নেহি। মগর ইস রাস্তাহিকি আসপাস ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে আভভি ছিপা হুয়া হ্যায়।

সে আবার কে? পিপ্পাল পাঁড়ে?

ইয়া আল্লা! দশদিন হল হাজারিবাগে এসেছেন অথচ ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের নাম শোনেননি?

না তো!

আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

আজিব বাত।

তারপরই বললেন, যোভি হো। সামহালকে রহিয়ে গা। বহতই খতরনাক হ্যায় উ ডাকু। পুলিশ কুছ নেহি কর পায়া হ্যায়। বহতই আদমিকো জান সে মার ডালা।

নাজিম মিঞার মুখে সে কথা শোনার পর আমার ভাল্লুক শিকারের শখ টিমে হয়ে গিয়ে পিপ্পাল পাঁড়ে শিকারের সাধটা চেগে উঠল।

তারপর? তিতির বলল। 'ছঁওড়া-পুত্তান' মানে কী?

মানে যে ঠিক কী, তা আজও আমি জানি না। তবে নাজিম সাহেব আমাকে আর গোপালকে ওই বলে ডাকতেন আদর করে।

তখনও অন্ধকার ছিল। বেশ ঠাণ্ডা। তখন হাজারিবাগ জেলার ঠাণ্ডা যে কেমন ছিল তা আজ তোরা বুঝবি না। আজ থেকে কত বছর যে আগের কথা। বনজঙ্গল ছিল নিবিড়। ভারতে তখন গিনিপিগ-এর মতন মানুষের বংশবৃদ্ধি হয়নি।

ভটকাই বলল, তোমরা তখন কত বড়?

কত আর বড়। তোরা এখন যত বড় তার চেয়ে সামান্যই বড় হয়তো।

কী দুঃসাহস!

তিতির স্বগতোক্তি করল।

ভটকাই বলল, কী ওয়ান্ডারফুল বাবা-মা পেয়েছিলে ভাবো একবার। দুধের ছেলেদের একে ভাল্লুক তায় ডাকাতের মুখে ছেড়ে দিয়েও তাঁরা নির্বিকার। আমাদের আর কী হবে! রবীন্দ্রনাথ সেই বলেছিলেন না? রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি, সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী।

উলটো বললি।

আমি বললাম।

ওই হল। সোজা করে নে তাহলেই তো হল, না কি!

তারপর? বলো ঋজুদা।

এই ভটকাই, শাট-আপ।

তিতির ধমক দিল।

ইয়েস। বলল, ভটকাই, শাটিং-আপ।

আলো ফুটছে আস্তে আস্তে পুবের আকাশে। তবে তখনও কুয়াশা আছে ভারী। দিনের পাখিরা জাগছে একে একে। গ্র্যাশার, ব্যাবলার, কপারস্মিথ, টিয়া, টুই, মুনিয়া, মিনিভেট।

বনমোরগের ডাকে চারদিক তো সরগরমই। তিতিরের টিটির-টিটির, ময়ূরের কেঁয়া-কেঁয়া, কালি তিতিরের টিঁউ-টিঁউ। তারও আগে জেগেছে, বনমোরগেরও আগে, র‍্যাকেট টেইলড ড্রঙ্গোরা, কাচের বাসন ভাঙার মতন স্বর নিয়ে। সারারাত বন-পাহারা সেরে রেড-ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ টিটিটি-হুট-টিটিটি-হুট-হুট-হুট

করে ডাকতে ডাকতে চলে যাচ্ছে মানুয়ানা টাঁড়ের দিকে।

যদিও খুব শীত, তবু কিছুটা চলতেই শরীর গরম হয়ে উঠল। আমার গায়ে একটি ছাই-রঙা ফ্লানেলের জার্কিন। আস্তে আস্তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দু'দিকে নজর রাখতে রাখতে চলেছি কারণ এই সময়েই মাংসাশী প্রাণীরা, যেমন বাঘ, চিতা রাতের টহল সেরে নিজের নিজের ডেরায় ফেরে।

এমন সময়ে আমার থেকে বেশ কিছুটা সামনে মানুষের গলার স্বর পেলাম। তবে দেখা যাচ্ছিল না কিছুই। একে আধো অন্ধকার, তায় পথটা কিছুটা সামনে গিয়েই বাঁক নিয়েছে বাঁদিকে। এখন বসন্তও নয়, গ্রীষ্মও নয় যে, মেয়ে ও শিশুরা মহুয়া কুড়োতে আসবে জঙ্গলে, ভোররাতে। আধো-অন্ধকারে কারওরই জঙ্গলের গভীরের এই পরিত্যক্ত, দিনমানেই নির্জন পথে আসার কথা নয়, আমাদের মতন শিকারি অথবা ডাকাত-টাকাত ছাড়া। তাই কৌতূহলী হয়ে থেমে পড়ে পথের বাঁ পাশের একটা ঝাঁকড়া আমলকী গাছের পেছনে আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলাম, যারা কথা বলছে তাদের গলার স্বর ক্রমশই চড়ছে। তারপরই একটা আর্তচিৎকার শুনলাম এবং পরক্ষণেই ধ্বপ ধ্বপ করে মানুষের দৌড়ে আসার আওয়াজ এদিকে।

আমি তাড়াতাড়ি বন্দুকের ডানদিকের ব্যারেলে একটি বল ও বাঁদিকের ব্যারেলে একটি এল.জি. পুরে নিয়ে গাছটার আড়াল নিয়ে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম বন্দুক রেডি-পজিশনে রেখে।

পাঁচ সেকেন্ডও কাটেনি, এমন সময় একটি তীব্র আর্তচিৎকার কানে এল এবং একটি অট্টহাসি। মনে হল কেউ কাউকে জোরে লাথি মারল বা ধাক্কা দিল আর মুখে বলল, 'যা, যা, কামিনা, তুরন্ত ভাগ তেরা জান লেকর! আজ স্রিফ তুহর কান ঔর নাকই কাট লিয়া, ফিন কভভি বদতমিজি কিয়াতো জানহি লে লুঙ্গা।'

দুটি লোক, ধুতি-পরা, গায়ে সাদা-কালো দেহাতি কম্বল জড়ানো, পায়ে নাল লাগানো নাগরা জুতো, মাথাতে বাঁদুরে টুপি, তোরা যাকে ইংরেজিতে বলিস 'ব্যালাক্লাভা', তাই পরে, মরি-কি-পড়ি করে দৌড়ে আসছে। তার মধ্যে একজন মাথার টুপিটা খুলে ফেলেছে আর যেখানে তার কান থাকার কথা সেখানে একটি সাংঘাতিক ভয়াবহ রক্তাক্ত ক্ষত। পেছনের জন নাকে হাত দিয়ে দৌড়ে আসছে আর ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে তার নাক থেকে।

তাকে দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু সেই বাঁকের আড়াল থেকে কেউ একজন খুব জোরে জোরে হো হো করে হাসছে যেন ফুলে ফুলে আর বলছে, 'আজ স্রিফ তু দোনোকো কান ঔর নাকহি কাটকে ছোড় দিয়া। যা, মহল্লামে যাকর ঘর-ঘরমে দিখা। ঔর বোল যো ডাকু পিপ্পাল পাঁড়েনে আজ নাক ঔর কানকি সবজি বানাকে মংগকি ডাল কি সাথ খায়েগা দোপেহরমে। যোভি হামে পাকড়ানেকি লিয়ে আয়েগা, উসলোগোঁকি হাল অ্যাইসিই হোগা।'

নাক-কান কাটা লোকদুটোর জামাকাপড় বেশ দামি। তারা পেছনে না-তাকিয়ে

প্রাণভয়ে দৌড়ে আমি যেখানে আড়াল নিয়ে ছিলাম, তারই সামনে এসে দাঁড়াতেই তাদের হেনস্থার রকমটা পুরোপুরি জানা গেল।

ওরা আমাকে দেখতে পায়নি। এ অন্যর রক্তাক্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠছে আর হিক্কা তোলার মতন শব্দ করছে। আয়না তো নেই যে, নিজেদের ছিরি নিজেরা দেখবে! দেখলে, অবশ্য ওইখানেই অজ্ঞান হয়ে চিতপটাং হত।

একজন বলল, আমার বন্দুকটাও কেড়ে নিল।

নাক-কাটা, নাকি সুরে খোনার মতো বলল, চালানা নেই আতা তো তু শালে বন্দুক পাকড়কে আয়াথা কিউ?

ঔর তুমহারা ক্যা চাক্কু চালানা আতা? উওভি তো লে লিয়া!

হায়! হায়! বলে কেঁদে উঠল খোনা।

বলল, হামারা আমরিকান চাক্কুয়া। আমরিকান। হুঁ।

লোকদুটো চলে গেলে আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে ডাকু যেদিক থেকে এসে পথে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে অট্টহাসি হাসছিল সেই দিকে বন্দুক রেডি-পজিশনে ধরে এগিয়ে চললাম পথের একেবারে বাঁদিক ঘেঁষে।

বলেই, ঋজুদা নামিয়ে রাখা পাইপটা তুলে নিয়ে পাইপটা ধরাল।

তুমি কি সেইদিনই ধরলে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়েকে?

ভটকাই প্রশ্ন করল।

ঋজুদা মাথা নাড়িয়ে জানাল, না রে না।

বলো, বলো ঋজুদা।

তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, পুরোটাই যদি আজই শুনে ফেলিস তাহলে বিরিয়ানির হান্ডি যে কাঁদবে। এদিকে রান্না তো হয়ে গেছে। ওই দ্যাখ পেছনে চেয়ে ভগ্নদূত দাঁড়িয়ে।

আমরা একই সঙ্গে পেছনে চেয়ে দেখি গদাধরদা এসে ব্যাজার মুখে দাঁড়িয়েছে। আমরা মুখ ফেরাতেই বলল, সেই মিঞায় শুদোতিচে যে হান্ডি নিকলাবে কি না? কতার মাতা মুণ্ডু তো কিছুই বুইঝতেচি না।

ঋজুদা আমাদের দিকে নীরব ভর্ৎসনার চোখে চেয়ে গদাধরদাকে বলল, গদাধরদা, কথাটা 'হান্ডি নিকলানো' নয়, 'হাণ্ডি নিকালনা'।

বিরক্ত গদাধরদা বলল, ওই হল্লো। মানেটাতো বইলবে।

গল্পটা এখুনি-এখুনি না শুনলে তো রেশ কেটে যাবে ঋজুদা। আমি বললাম।

আর এখুনি-এখুনি না খেলে যে বিরিয়ানিটাই মাঠে মারা যাবে।

ভেতর থেকে আজ্জু মহম্মদ বেরিয়ে এসে বলল, বিলকুল ঠিক।

ঋজুদা বলল, হবে, পরে হবে। এখন ছোট্ট করে শুনলে তো। পরে পুরোটা শোনাব।

মোচলমান তারই খাস রান্নাঘরে মৌরসি-পাট্টা গেড়ে বসে এক বিরাট হাণ্ডিতে বিরিয়ানি রান্না করছে, মধ্যে আবার গোল গোল ছোট ছোট বটি কাবাব মিশিয়ে

দিয়েছে। কাবাব-টাবাব করতে গদাধরদা নিজেও জানে কিন্তু এই বটি কাবাবের নাম সে বাপের জন্মে শোনেনি। গুলহার কাবাবও বানিয়েছে। পার্ক সার্কাস থেকে বড়কা চর্বিওয়ালা খাসি নিয়ে এসে তার চাঁব আর রেজালাও বানিয়েছে। কিন্তু...

রান্নাঘরটাকে একেবারে নোংরা করে দিয়েছে। মনোকষ্টে গদাধরদা গিয়ে একেবারে রান্নাঘরের লাগোয়া বারান্দার রেলিং ধরে উদাস চোখে নীচের পথের দিকে তাকিয়ে থাকছে, নইলে পরক্ষণেই ভটকাই এর নাম দেওয়া 'পোর্টার' আসনে বারান্দাতে বসে গুণ্ডিপান খাচ্ছে নয়তো রেগেমেগে কিঞ্চিদ্ধ্যাকাণ্ড আবৃত্তি করছে।

যাই হোক, জম্পেশ করে কবজি ডুবিয়ে বটি কাবাব দেওয়া বিরিয়ানি, চাঁব আর রেজালা খেয়ে ওঠার পর আমরা ঋজুদাকে ধরে পড়লাম ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের গল্পটি বলবার জন্যে। আজ্জু মহম্মদও এসে বসল আমাদের সঙ্গে, নিজে খেয়ে, আজমল বাবুর্চিকে ও গদাধরদাকে খাবার পরিবেশন করে।

গদাধরদা নাকি দাড়িওয়ালা বিহারি মোচলমানের রান্না খেতে আপত্তি করছিল। ঋজুদা তাকে ডেকে বলল, দেখো গদাধরদা, আমাদের হিন্দু ধর্মের মতো মহান, গভীর ধর্ম নেই। হয়তো এমন উদার ধর্মও পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু এর এই জাতপাতের বিচার, মানুষকে মানুষ-জ্ঞান না-করার শিক্ষার জন্যেই এই ধর্মের এত দুর্দশা। তুমি কি একথা জানো যে, কত নমঃশূদ্র, আর অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষ তোমাদের এই ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে মুসলমান অথবা ক্রিস্টান হয়ে গেছে? মানুষে মানুষে কোনও ভেদ নেই। কে কোন দেবতা বা নিরাকারকে পুজো করে না করে তাতে কী আসে যায়? সব মানুষেরই তো একই চেহারা। তাদের সকলের খিদে-তেষ্টাও এক। তুমি আমার গদাধরদা হয়ে, আমার বাড়িতে থেকে এমন ব্যবহার করে অতিথিকে অপমান করতে পারো না।

ভটকাই বলল, গদাধরদা, তুমি জানো না কি যে 'সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই?'

আমরা হেসে উঠলাম ভটকাই-এর কথা শুনে।

ঋজুদা বলল, বেচারা গদাধরদা যদি অতই জানত তবে তোর স্কুলের মাস্টারমশাই হত। আমার লোকাল গার্জেন হয়ে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন 'ড্যাগ-মাস্টারি' করত না।

তারপর বলল, যাও গদাধরদা, আজমল ভাইয়ের সঙ্গে বসে ভাল করে খাও। আর বিরিয়ানি আর বটি কাবাব কী করে রাঁধে, ভাল করে শিখে নাও। গুলহার কাবাবটাও শিখে নিও।

আমি বললাম, রেজালা আর চাঁব কি দোষ করল?

আমি তো কিছুই জানি না রাঁধতে। বলেই, গদাধরদা চলে গেল।

তিতির বলল, ঋজুদা এবারে পাইপে তিনটে টান দিয়ে তোমার রকিং-চেয়ারে একটু চোখ বন্ধ করে দুলে নিয়ে শোনাও আমাদের ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে আর

তোমার এনকাউন্টারের গল্পটা।

তারপর বলল, আজ্জুবাবু বলছিলেন...

আজ্জুবাবু নয়। হয় বলবি জনাব আজ্জু মহম্মদ, নয় বলবি আজ্জু মিঞা।

তাহলে আজ্জু মিঞা বলছিলেন, ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে নাকি তোমায় শাসিয়েছিল যে তোমার আর তোমার বন্ধু গোপালকাকুর খুপরি উড়িয়ে দেবে।—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ঋজুদা একটু হেসে বলল, লোকে আমাদের সম্বন্ধে যত জানে, আমরা নিজেরাই তত জানি না। হয়তো বেচারি পিপ্পালও জানত না।

ভটকাই বলল, আরে এ তো একেবারে 'শোলে'র গব্বর সিং। 'ইয়ে দুশমনি বড়া মাঙ্গা পড়েগি ঠাকুর'।

মাঙ্গা নয়, ম্যাহেঙ্গা।

তিতির বলল।

ওই হল্লো। মানেতো বুঝেছ?

ঋজুদা চুপ করেই ছিল।

আজ্জু মহম্মদ বলল, হ্যাঁ বলিয়ে ঋজুবাবু। ম্যায় ভি শুন লেঁতে হ্যায় জারা। হামারা ভি তো কভভি শুননে কা মওকা নেহি না মিলা!

কাহে? তুমহারা আব্বা কভভি বাতায়া নেহি?

আব্বা থোরি হামলোগোঁসে বাত-চিত করতেঁ থে। আপ যব আতেথে তব তো বাঁতোকা ফোয়ারা খুল যাতা থা। হামলোগোঁনে থোরি উনকি ইয়ার থে। বাত-চিত যো হোতা থা সো আম্মাকি সাথ হি। হামলোগোঁনে থোরি শুনতা থা কিসসা?

ঋজুদা চেয়ারটা হেলিয়ে দিয়ে বলল, খ্যয়ের, অব তো শুনলো ইয়ে বদমাসলোগোঁকি সাথ।

বলিয়ে ঋজুবাবু। হাম শুনলেনেসে হাজারিবাগ, টুটিলাওয়া ঔর সীমারিয়াকি বহতই আদমিকো শুনায়েঙ্গা হাজারিবাগ লওট যা কর।

বাংলা, আজ্জু মিঞা বুঝতে পারবে?

ভটকাই বলল।

হাঁ হাঁ। বিলকুল সমঝ যাবে। সমঝ তো লেতা হ্যায়, মগর বাংলা বোলি ইতনা আতি নেহি।

ঠিক্কে হ্যায়। যো লজ তুম সমঝমে না পাওগে মুঝকো বাতানা, ম্যায় তুমকো হিন্দুস্থানিমে সমঝা দেগা।

ঋজুদা বলল।

নাও এবার শুরু করো। ব্যারেল গরম করতেই করতেই বেলা গেল, তা বন্দুক ছুড়বেটা কখন?

ভটকাই বলল।

ঋজুদা বলল, তোরা ভটকাই-এর মুখে সেলোটেপ এঁটে দে। নইলে আমি

কিছুই বলব না।

তিতির বলল, আজ তুমি আর একটাও কথা বলেছ তো খুব খারাপ হবে ভটকাই।

ঋজুদা বলল, আরে আজ্জু, তুমহারা পান-সিগারেট সব মজুত তো হ্যায় না?

হিঁয়াকা পান ঝজুবাবু, জমতা নেহি। হাজারিবাগ যেইসা উতনা আচ্ছা মঘাই মিলতা কাঁহা! হুঁয়া তো পটনা সে আতা না!

ক্যা বাত করতা হায় তু আজ্জু? কলকাত্তামে বাঘ কি দুধ মাঙ্গো উ ভি মিলেগা। মঘাই পান কা কেয়া কম্মি?

বলেই বলল, ভটকাই, যাতো, মাধবকে বলে আয় জগুবাবুর বাজারে গিয়ে পণ্ডিতজির দোকান থেকে ষোলো খিলি মঘাই পান সেজে আনতে। চমন বাহার দেবে। শঁফ, কাত্থা, চুনা, আর কালি-পিলি পাত্তি জরদা।

কী জরদা?

কালি-পিলি-পাত্তি।

পয়সা দিয়ে আসব?

আরে মাধবকে তুই কি পয়সা দিবি? ওই তো আমার ক্যাশিয়ার। কলকাতার বড়লোকদের দেখে দেখে আমিও নিজে হাতে খরচ করা ছেড়ে দিয়েছি। মাধবই খরচ করে, সেই হিসেব রাখে। ক্রেডিট কার্ড রাখি সঙ্গে গোটা তিনেক অবশ্যই কিন্তু ক্যাশ রাখি না। ওটাই এখন ফ্যাশন। বিড়লা-গোয়েঙ্কা-টোডি-সরকার কেউই নিজের টাকা ছোঁয় না হাতে।

সরকার? কওনসি সরকার?

আজ্জু মহম্মদ জিজ্ঞেস করল।

বড়ে সরকার। কলকাতামে বড়ে সরকার তো একই পরিভার হ্যাঁয়। আনন্দবাজারকি সরকার।

হাঁ?

হাঁ জনাব। ঋজুদা বলল।

আগে বাড়িয়ে। আজ্জু মহম্মদ বলল।

ভটকাই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আমি ফিরে না আসা অবধি যদি এক পাও আগে বাড়ো তবে কিন্তু পরে তোমার নিজের পায়ের শুশ্রূষা করতে হবে।

ঋজুদা হেসে বলল, তাড়াতাড়ি আয়। তুই না-আসা অবধি আরম্ভ করব না।

প্রমিস?

প্রমিস।

বেশ কিছুক্ষণ পাইপ খেয়ে ঋজুদা বলল,

হাজারিবাগে তোরা তো কেউই যাসনি।

ঋজুদা বলল।

আমি গেছিলাম।

আমি বললাম।

ও হ্যাঁ। 'অ্যালবিনো' বাঘ শিকারের নেমন্তন্ন পেয়ে যখন গেছিলাম গাড়িতে মুঁলিমালোয়াতে।

হাজারিবাগ জেলাতেই গেছিলি। শহরে তো আর থাকিসনি।

তা অবশ্য থাকিনি। পাস করেছিলাম।

হাজারিবাগ শহরের মতো সুন্দর শহর ছোটনাগপুরে বেশি নেই। সুন্দর এখনও আছে, তার কারণ রেললাইন এখনও পৌঁছয়নি সেখানে। পুব দিক থেকে হাজারিবাগ রোড স্টেশনে নেমে সারিয়া হয়ে নবাব শের শাহর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড পৌঁছে, বগোদর হয়ে হাজারিবাগে আসা যাবে গাড়িতে বা বাসে। আর কোডারমা স্টেশনে নেমে, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের বরহি থেকে ঝুমরি-তিলাইয়া ও তিলাইয়া ড্যাম হয়ে হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্ক-এর পাশ দিয়ে, পদ্মার রাজার বাড়ির পাশ দিয়েও এসে পৌঁছনো যায়। ওপথে দূরত্ব খুবই কম। আবার রাঁচি হয়েও আসা যায়। রাঁচি-হাজারিবাগ রোড হয়ে, রামগড় পেরিয়ে। ওপথে দূরত্ব অবশ্য বেশি পড়ে। কিন্তু তা হলেও, একবার পৌঁছতে পারলে সব পথকষ্ট উশুল।

হাজারিবাগের তিনদিকে তিন পাহাড়। কানহারি, সিলওয়াড় আর সিতাগড়া। এই সিতাগড়াতে যখন মানুষখেকো বাঘ বেরিয়েছিল তখন আমি, গোপাল আর সুব্রত, নাজিম সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে সেই বাঘ মারার জন্যে অনেক হরকৎ করেছিলাম। বাঘটা অবশ্য মেরেছিল সুব্রতই আমরা হাজারিবাগ থেকে কলকাতাতে চলে আসার পরে। একটা গোরু মেরেছিল বাঘটা। সুব্রত আর ইজাহারুল হক দু'জনে শাল গাছে মাচা বেঁধে বসেছিল দিনে দিনেই। সেই বাঘ মারার গল্প আছে 'সিতাগড়ার মানুষখেকো'তে।

যা বলছিলাম, আমি গোপাল আর নাজিম সাহেব, আজ্জুর বাবা নাজিম সাহেব, ইজাহারুল-এর জমিদারি টুটিলাওয়াতে গেছিলাম শিকারে। সেবারে গিয়ে শুনলাম পুরো এলাকা জুড়ে একজন ডাকাত দৌরাত্ম্য করছে গত দু'মাস ধরে। তার বাড়ি নাকি গয়া জেলার হান্টারগঞ্জে। টোপি-পরানো গাদা বন্দুক দিয়ে সে শিকার করে বেড়াত হান্টারগঞ্জ জৌরি-সিজুয়াহারা থেকে ওদিকে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড-এর উপরের ডোভি আর তার থেকে এদিকে চাতরা, এমনকি বাঘড়া মোড় পর্যন্ত।

এত জায়গার নাম বললে যে, সবই গুলিয়ে গেল।

আমি বললাম।

আচ্ছা দাঁড়া, ওই প্যাডটা আন, একটা ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ভটকাই টেবল থেকে ঋজুদার নিজের আঁকা লেটারহেড সমেত চিঠি লেখার প্যাডটা নিয়ে গেল আর কলমদানিটা। ঋজুদার কলমদানিতে রোজ কলম বদল হয়, ফুলদানিতে যেমন ফুল। কম করে গোটা দশেক নানারকম নানাদেশি কলম না থাকলে এক লাইনও লিখতে পারে না ঋজুদা। চিঠিও না। পৃথিবীর সব কলমই

আছে ঋজুদার কাছে। ইংলিশ ওয়াটারম্যান, আমেরিকান পার্কার এবং শেফার্স, জাপানি পাইলট, সুইস সারানডাশ, যুগোশ্লাভিয়ান হার্টিগ, জার্মান পেলিকান এবং মঁ ব্লাঁ। তবে মঁ ব্লাঁই সবচেয়ে প্রিয় ঋজুদার। কলমদানি থেকে মেরুন-রঙা একটি মঁ ব্লাঁ কলম তুলে নিয়ে মোটা নিব দিয়ে ঋজুদা লম্বা লম্বা টানে একটা ম্যাপ এঁকে নীচে নীচে জায়গাগুলোর নাম লিখে আমাদের দিকে এগিয়ে দিল।

ম্যাপটা এরকম। ভাল করে বুঝেনে।

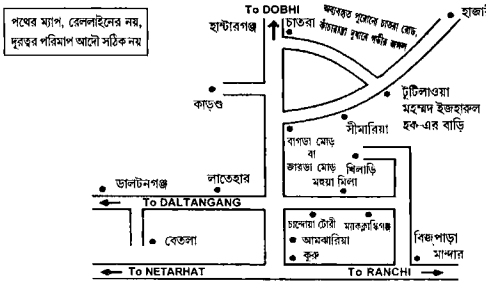

ততক্ষণে ভটকাই ফিরে এসেছে নীচে ঋজুদার ড্রাইভার-কাম-ম্যানেজার-কাম-ক্যাশিয়ার মাধবদাকে পান আনতে বলে দিয়ে। ভটকাইও দেখল ম্যাপটা মনোযোগ দিয়ে। তারপর আজ্জু মিঞার দিকে এগিয়ে দিল। ঋজুদা হেসে ফেলল। বলল, আজ্জুর এসব জায়গা নখদর্পণে। ও নাজিম মিঞার ছেলে। বাবার সঙ্গে সাত বছর বয়েস থেকে ও শিকারে যাচ্ছে।

ভটকাই লজ্জিত হয়ে বলল, সরি, সরি, মিঞাসাহেব।

এবারে বলো। ম্যাপ দেখা হয়েছে আমাদের। তিতির বলল।

ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। আমার আর গোপালের বয়সও তখন কুড়ির নীচে। গোপাল আর সুব্রত আমার চেয়ে এক দেড় বছরের বড় ছিল। সুব্রতর বাবা শ্রী সত্যচরণ চ্যাটার্জি তখন হাজারিবাগ জেলার পুলিশ সাহেব। চেহারাও তেমন ছিল। লম্বা-চওড়া, ইয়া-ইয়া গোঁফ। তখন ঘোড়ায় চড়ে ইনসপেকশানে যাবার দিন চলে গেছে। জিপে করেই যেতেন। তখন হাজারিবাগ জেলার এলাকা ছিল বিরাট। পুরোটাই জঙ্গল-পাহাড়ময়।

এ কথা শুনে আমরা খুবই উত্তেজিত হলাম যে আমাদের চেয়ে বয়সে সামান্য বড় একটা দেহাতি ছেলে পুরো জেলা কাঁপিয়ে দিয়েছে ডাকাতির পর ডাকাতি করে। আর শুধু হাজারিবাগ জেলাই তো নয়, গয়া জেলাতেও তার আধিপত্য। এমনকি যার নামে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়, সেই চ্যাটার্জি সাহেব এস. পি. ও লবেদম হয়ে যাচ্ছেন ওইটুকু পুঁচকে ছোঁড়াকে ধরতে।

আমরা যদি পিপ্পাল পাঁড়েকে ধরতে পারি তো পটনার সব কাগজে ছবি পর্যন্ত বেরোবে এবং সরকার থেকে ইনাম তো মিলবেই।

গোপাল উত্তেজিত হয়ে বলল।

ইনাম মানে কী?

ভটকাই বলল।

আরে! হিন্দি ছবির পোক ইনাম মানেও জানো না?

তিতির বলল।

পোক মানে? কী সব খারাপ ভাষা ব্যবহার করছ মেয়ে হয়ে!

পোক মানে, পোকা।

অ। তবে আমি জানি ইনাম মানে কী।

তবে জিজ্ঞেস করলে যে?

রুদ্র জানে কিনা পরখ করছিলাম।

আমি বললাম, আবার শুরু করলি ভটকাই।

এমন সময়ে মাধবদা পান হাতে এসে ঢুকল। চালু ভটকাই পাছে আবার উঠতে হয় দরজা খুলতে তাই দরজাটা ভেজিয়েই রেখেছিল।

আরে গদাধরকে পানটা দাও মাধব। রুপোর রেকাবিতে একটু আতরজল ছিটিয়ে এনে দেবে। ওপরে ভিজে মলমল-এর ঢাকনিও দিয়ে দেয় যেন। নইলে পান তো শুকিয়ে যাবে। সব পান তো আর এখুনি খাবে না আজ্জু।

হায়! হায়! ইত্তেজামকি কোঈ কম্মি নেহি।

আজ্জু মহম্মদ, তারিফ-করা গলাতে বলল ঋজুদাকে।

ঋজুদা পাইপে এক টান লাগিয়ে বলল, না হোগা কেইসে? ম্যায় তো তুমহারা আব্বাকা চেলাই না হ্যায়। ইয়ে সব খাতিরদারি তারিকা তো উনোনেই শিখলায়া হামলোগোঁকো। আহ! ক্যা জিন্দাদিল, মনমৌজি আদমি থে তুমহারা আব্বাজান। তুমলোগোঁনে কুছ নেহি হো উনকি সামনা।

ম্যায়নে থোরি বোলা কভভি যো, ম্যায় আব্বাকি বরাবর হুঁ।

বলল, মিঞাসাহেব।

বলো ঋজুদা, থামলে কেন?

ভটকাই ডিরেইলড ট্রামকে লাইনে ফেরাল।

আমরা পৌঁছবার পরদিন বিকেলে সুব্রতও এসে পৌঁছল। পুলিসের জিপে করে। সঙ্গে আজাহারও। আজাহার ওরও বন্ধু ছিল। গোপালের তো ছিলই।

নাজিম সাহেব, তাঁর ডিপারে-দেওয়া হেডলাইটের মতো বড় বড় চোখ দু'খানি জ্বেলে দিয়ে বললেন, লাও! আভভি তো খত্‌রাই বন গ্যয়া।

কেন?

তিতির জিজ্ঞেস করল ঋজুদাকে।

আরে! ডাকাত যদি একবার জানতে পারে যে, পুলিশসাহেব, যিনি ডাকাতের

খুপড়ি নিজে হাতে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে প্রায়ই চাঁদমারিতে গিয়ে রিভলভারের হাত আরও ভাল করছেন, তাঁরই বড় ছেলে এই জঙ্গলে ডাকুর সঙ্গে টকরাতে এসেছে, তাহলে সুরবোতোর দারুণই বিপদ। সঙ্গে আমাদেরও। আমরা যদি বলি যে, আমরা ভাল্লুকের আর বাঘের সঙ্গে খেলতে এসেছি, ওর সঙ্গে খেলব না তবে কি ও ছাড়বে? বলবে, ফিল্মচারে এ ম্যাচ থাক আর না থাক খেলতেই হবে। ইয়ে তো সাচমুচহি খাতরা কি বাত ইয়ার! সুরবোতোকে যদি ও ধরে নিতে পারে তবে তো কেল্লা ফতে। ওকে জানে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে স্বয়ং পুলিশ সাহেবকে পর্যন্ত একেবারে ল্যাজেগোবরে করে দিতে পারবে তখন পিপ্পাল পাঁড়ে।

সুরবোতোটা আবার কে?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

আজ্জু মহম্মদ বলল, খোকাবাবুই থা সুরবোতো বাবুকি ঘরওয়ালা নাম।

আমরা হেসে উঠলাম।

ঝজুদা বলল,—হাসবার কী আছে? ওরা বাপ-বেটাতে প্রথম দিন থেকেই সুব্রতকে সুরবোতোবাবু বলে। তিতিরের ছোট মামি যেমন উত্তেজিত হলেই দরজাকে 'দজরা' জরদাকে 'জদরা' বলে। কী? বলে না?

তিতির হাসল। বলল, হ্যাঁ। ঠিক বলেছ। বলে।

তারপর?

ভটকাইও বলল, তারপর?

প্রথম দিন সারা সকাল আমি আর গোপাল টুটিলাওয়ার চারপাশের জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করে নালার বালিতে, পথের লাল ধুলোতে কোন কোন জানোয়ারের পায়ের দাগ দেখা যায়, তা খুঁজে বেড়ালাম। টুটিলাওয়া যেন পাখিরই স্বর্গরাজ্য। ময়ূর, তিতির, বটের, কালি-তিতির, আসকল, পাকা বটফল খেতে-আসা ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো সবুজ-পায়রা বা হরিয়ালে পুরো এলাকাটা ভর্তি। উড়ো-পাখিদের পায়ের দাগ অবশ্য মাটিতে পাওয়া যায় না, ময়ূর বটের বা তিতিরের যেমন পাওয়া যায়। কালি-তিতিরও ঝোপে বসে থাকে, মাটিতে অধিকাংশ সময়েই থাকে না। পায়ের দাগেই বুঝলাম মস্ত একদল শুয়োরও আছে। ধাড়ি-মাদি-বাচ্চা মিলিয়ে প্রায় দেড়শো-দুশোর দল।

কাড়ুয়া আর আসোয়া দুই ভাই জঙ্গলের অন্য দিকটা সার্ভে করে ফিরে এসে বলল, শম্বর, নীলগাই, চিতল হরিণ, কোটরা তো আছেই তবে ভাল্ অর্থাৎ ভাল্লুকেরই আড্ডা ও জায়গাটা। সবসময়ে সাবধানে জঙ্গলে ঢুকবেন। তা ছাড়া চিতাও আছে এক জোড়া, বেশ বড়। আর বড় বাঘ একটা।

সুব্রত জিজ্ঞেস করল, কত বড়?

কাড়ুয়া বলল, মনে হচ্ছে সীতাগড়া বাঘের মতোই বড় হবে। বলেই নিজের কোমরের কাছে ডান হাতের পাতা ঠেকিয়ে বলল, বড়কা বাঘোয়া বাবু, ডাবল বাঘোয়া।

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। কিংকর্তব্যম্? যে জঙ্গলে বাঘের হদিশ

পাওয়া গেছে সে জঙ্গলে অন্য জানোয়ারের খোঁজ কোনও শিকারিই করে না।

তবে?

কাড়ুয়া বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হেসে বলল আমাকে, একঠো বড়কা শুয়ার পিটা দে ঝজুবাবু। মজা আয়ে গা।

গোপাল বলল, বানায়গা কাঁহা। মানে, রাঁধবে কোথায় শুয়োর?

কাহে? হিঁয়াই।

সুব্রত ধমকে বলল, ভ্যাট।

তারপর বলল, নাজিম সাব ঔর ইজাহার সাব ক্যা হারাম খাইয়ে গা?

সঙ্গে সঙ্গে ভুল বুঝতে পেরে, জিভ কেটে বলল কাড়ুয়া, তব জঙ্গলহিমে বানা লেগা। গাঁওওয়ালা ভি সব খায়েগা।

এই গ্রামে অধিকাংশই মুসলমানের বাস তবে হিন্দু একেবারেই নেই, তা নয়। মুসলমানেরা সব জায়গাতেই সংখ্যাতে জিওমেট্রিক প্রগ্রেশনে বাড়ে। তাই এতদিনে এখন হয়তো মুসলমান আর হিন্দুর অনুপাত ৪: ১ হয়ে গেছে। কেয়ারে আজ্জু ভাই?

ঝজুদা শুধোল আজ্জু ভাইয়াকে।

সো, হোনে ভি শকতা।

আজ্জু মহম্মদ বলল।

কাড়ুয়া বলল, আর যদি কেউ নাও খায় তবে আমরাই রাম-লক্ষণ (কাড়ুয়া-আসোয়া) দু'ভাইয়ে সেঁটে দেব। পুরো শুয়োর।

কেন? আমরা কী দোষ করলাম? আমরা শুয়োর খেলে তো আর আমাদের 'হারাম' হবে না।

গোপাল বলল।

তাই তো। রামচন্দ্রও তো বন্য বরাহ খেতেন। তা ছাড়া, জঙ্গলের শুয়োর ফল-মূল-জঙ্গলি কচু এসব খায়। তারা তো আর ধাঙ্গর বস্তির শুয়োরের মতো গু খায় না।

ভটকাই ফুট কেটে বলল।

ল্যাঙ্গোয়েজ! ল্যাঙ্গোয়েজ!

তিতির বলল।

গু-এর ইংরিজি কী? গু কে গু বলব না, তো কী বলব তবে?

জিনিসটাকে আরও নাড়িয়ে দিয়ে বলল, হতভাগা ভটকাই।

বাথরুম বললি না কেন?

আমি বললাম।

ইডিয়ট। বাথরুম কি খাওয়ার জিনিস? তোর তো বুদ্ধিই ওরকম।

ভটকাই রিটর্ট দিল।

তিতির বলল ভটকাইকে, বলতে পারতে পার্জিংস।

ফর্জিং? সে কি? সে তো হাওড়ার ঢালাই কারখানাতে হয়। ডাবু ধরে বসে

থাকে একদল আর অন্য দল লোহা গলিয়ে ঢালে।

ভটকাই বলল অবাক হয়ে।

ধ্যাৎ। বললাম, পার্জিংস purgings শুনলি ফরজিং। তিতির বলল।

তারপরে বলল, বলতে পারতে night soil।

নাইট-সয়েল মানে বুঝি গু?

আঃ ভটকাই। চেঞ্জ দ্য সাবজেক্ট।

ঋজুদা ধমক দিয়ে বলল।

তারপর গোপাল বলল, তাই হবে। আমরা জঙ্গলেই ক্যাম্প ফায়ার করে নদনদে চর্বি-ভরা সাকলিং-পিগ-এর বার-বি-কিউ করব। আর পরদিন pork vindaloo রাঁধব। বাজরার রুটির সঙ্গে জমে যাবে একেবারে।

বাঃ। বাঃ। ফাসক্লাস।

আমি বললাম। মানে, তোদের ঋজুদা বলল আর কী!

ঋজুদা তারপর একটুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে রইল। বোধহয় অনেক পুরনো কথা মনে পরে গেল তার। তারপর বলল তারিফের গলাতে, গোপালটা রাঁধত ভারি ভাল। আর দারুণ দারুণ সব মনগড়া নাম দিত ওর সব রান্নার। আমি ছিলাম দলের মধ্যে সবচেয়ে বড় অকর্মা। শুধু খেতে পারতাম আর তারিফ করতে পারতাম।

সেটাও তো খুবই দরকার। প্রশংসা না পেলে কোনও কাজই কি কারও করতে ইচ্ছে করে? না, ভাল লাগে?

তা অবশ্য ঠিক। প্রশংসাই হচ্ছে আসল উদ্দীপক ব্যাপার।

তা যাই হোক, আমরা সকাল থেকে বারোটা অবধি জঙ্গল চষেছিলাম। পা-ব্যথা করছিল। তাই গোপাল কাড়ুয়ার হাতে তার বন্দুকটা দিয়ে আর দুটি অ্যালফাম্যাক্স-এর পৌনে তিন ইঞ্চি এল.জি. দিয়ে বলল,—যা কাড়ুয়া, যেমন চেহারার শুয়োর খেতে ইচ্ছে করে তেমনই মেরে নিয়ে আয়। বিকেল-বিকেল।

দুটি গুলি দিলেন যে!

একটি শুয়োর মারার জন্য আর অন্যটা শুয়োর যাতে তোদের ঢুঁ না মারতে পারে সে জন্যে।

আমরা হেসে উঠলাম।

ও ও। আমি ভেবেছিলাম দুটো মারার জন্যে বুঝি দুটো দিলেন।

ঠিক আছে। তাই হবে। তোমাদেরটা তোমাদের মতো মেরো, আমরা যেটা খাব সেটা যেন ছোট এবং চর্বি-নদনদে হয়। নইলে ভাল বার-বি-কিউ হবে না।

বে-ফিক্কর রহিয়ে হুজৌর। পাক্কা চার বাজি নিকলেগা ঔর সুরজ বুড়তে বুড়তেহি লেকর আয়েগা।

ওরা চলে গেলে, নাজিম সাহেব এবং ইজহারুল কনফারেন্সে বসলেন আমাদের সঙ্গে। ঠিক হল, বাঘের হদিশ যখন পাওয়া গেছে ওখান থেকে দু' মাইল

গভীরে ওল্ড চাতরা রোডের ওপাশে তখন কাল সকালে একটা হাঁকা করলে কেমন হয়?

ইজাহার বলল,—হাঁকাতে শম্বর যদি বেরোয়, তবে একটা শম্বর মেরে দিলে বস্তির গরিব মানুষেরা আনন্দ করে খেতে পারে। অবশ্য বাঘ মারার পরেই। ওরা তো আর হাটে পাঁঠা কিনে খেতে পারে না। মুরগিও পায় না খেতে। 'প্রোটিন' বলতে তো ওদের এই শিকারই একমাত্র প্রোটিন।

ঠিক আছে।

আমরা তিনজনে একসঙ্গে বলে উঠলাম।

সেই মতো প্ল্যানও হয়ে গেল। দুপুরের খাওয়ার পরে শীতের রোদের মধ্যে বেতের চেয়ার পেতে বসে একটা ছকও করে নিলাম। নিজামুদ্দিন এবং তার চেলাদেরও ডাকা হল। তাদের নাম, একরাম আর বুধাই। যেসব জায়গাতে বাঘ দিনের বেলা শুয়ে থাকতে পারে তার একটা আন্দাজ দিল কাড়ুয়া। সেই পাহাড়টার উলটোদিক থেকে হাঁকোয়া করলে বাঘ ঘুম ভেঙে পাহাড়ের ওই পাশ দিয়ে নেমে এসে নীচের মহুলান-নালা পেরিয়ে এদিকে আসার খুবই সম্ভাবনা। যেখান দিয়ে বাঘের নদী পেরুবার সম্ভাবনা প্রবল সেইখানেই ঘাট গজ মতো দূরে দূরে চারটে মাচা বানাতে হবে। আর দু'পাশে 'স্টপার' রাখতে হবে, যাতে বাঘ ডানদিকে, বাঁদিকে চলে যেতে চাইলে তারা গাছে বসে আওয়াজ করে বাঘকে মাচা যেদিকে বাঁধা, সেদিকেই যেতে বাধ্য করে।

ইজাহার বলল, সে নিজামুদ্দিনের সঙ্গে থাকবে হাঁকাওয়ালাদের ঠিক মতো চালনা করার জন্যে। শিকারিদের মাচাতে বসবে না। ইজাহার পাহাড়ের মাথায় একটা মস্ত শিমুল গাছের নীচে দাঁড়াবে যাতে তাকে নদীর দিক থেকে এবং পাহাড়ের ওদিক থেকেও দেখা যায়। মানে, আমরাও দেখতে পারি আর নিজামুদ্দিনরাও দেখতে পারে। ইজাহারের গায়ে লাল-রঙা জ্যাকেট থাকবে, যাতে সহজেই তাকে দেখা যায়। কাঁধে থাকবে থ্রি-সেভেন্টি-ফাইভ ম্যাগনাম রাইফেল। তবে ইজাহার সত্যিই চায় যে, বাঘটা আমি, গোপাল এবং সুব্রত আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনই মারি। নাজিম সাহেব বসবেন মধ্যের মাচাটায়। বাঘ মারার জন্যে যতটা নয়, আমাদের (উনি আমাদের 'ছঁওড়াপুত্তান' বলে ডাকতেন) দেখভাল করার জন্যে এবং যৌবনের 'মস্তি'তে যাতে আমরা বাহাদুরি করতে গিয়ে প্রাণ না হারাই তাও দেখতে। 'ফাদার-মাদার কি দোয়া' ইন গ্রেট কোয়ানটিটি, সঙ্গে করে, উনি সশরীরে আমাদের যম-এর যম হয়ে স্বমহিমায় মধ্যিখানে একেবারে বিরাজ করবেন।

রাতে নাজিম সাহেব, সকালে নিজেরই শিকার-করা বনমোরগের মাখা-মাখা ঝোল, আর তিতিরের কাবাব বানালেন। পটনা থেকে আনানো বাখ্‌খরখানি রোটি, মোটা কাপড়ে মুড়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তাই দিয়ে খেলাম। আহা! কী স্বাদ! সঙ্গে পুদিনার চাটনি। সীমারিয়া থেকে লোক পাঠিয়ে বালুসাহিও আনিয়েছিল

ইজাহার। সুইট-ডিশ হিসেবে। কাড়ুয়া, আসোয়ারা গ্রামেই খাবে মহাভোজ। তাদের শিকার করা শুয়োরটিকে কাটাকুটি তারা জঙ্গলেই করেছে। আমাদেরটা গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। শেয়াল কুকুর হায়না বা চিতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। আমরা কাল বার-বি-কিউ করব। শুনলাম যে, কাড়ুয়াদের শুয়োরটা দাঁতাল এবং মস্ত বড়। কাল মহুয়া খাওয়া হবে, শুয়োরের মাংসের ঝোল দিয়ে গোঁল্‌দনি বা সাঁওয়া ধানের ভাত খাওয়া হবে তারপর ওরা সারারাত নাচ-গান করবে। তার উপরে বাঘ যদি মারা পড়ে, তবে তো কথাই নেই। আমাদের কাছ থেকে মোটা বখশিস পেয়ে ওদের আনন্দ আরও ভরাট হবে।

রাতের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। বাইরে যাওয়াই যায় না এমনই ঠাণ্ডা। হাজারিবাগ, রাঁচি আর গয়া জেলাতে তখন এমন ঠাণ্ডা পড়ত যে, তা বলার নয়। তবু জঙ্গলে এসে ক্যাম্পফায়ারের পাশে না বসলে মন খারাপ হয়ে যায়। তখন তো আমরা ছাত্র। শীতের ভাল জামাকাপড়ও তেমন ছিল না। কিন্তু টগবগে যৌবন ছিল। যা থাকলে, শীতকে শীত, গরমকে গরম, মনেই হয় না। কোনও কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হয় না তখন।

ক্যাম্পফায়ারের সামনে বসে আছি আমরা তিনজনে। জুতোসুদ্ধ পা আগুনের কাছে রেখে। ফুটফাট করে আগুনে কাঠ পুড়ছে আর ফুলকি উঠছে কাঠ নাড়া দিলেই। আগুনের শিখার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ কেমন যেন আটকে যায় আগুনে। ঘোর লেগে যায়। আগুনের মধ্যে সূর্যের সাতরং খেলা করে আর তা দেখতে দেখতে মন চলে যায় কোথায় না কোথায়। কত বিচিত্র সব ভাবনা আসে।

ভাবছিলাম, কাল বাঘটা কি বেরোবে হাঁকাতে? না বেরোলে এত মানুষের এত শ্রম এবং আমাদের অর্থদণ্ডও বৃথা যাবে। হাঁকাওয়ালাদের তো 'রোজ'-এর টাকা দিতে হবে। সে আমরাই দিই আর ইজাহারই দিক। তবে যাঁরাই কখনও শিকার করেছেন তাঁরাই জানেন যে, 'নিশ্চিত' বলে কোনও ব্যাপার নেই শিকারে। Failures are the pillars of success। জেঠুমনি বলতেন। এই কথাটা শুধু শিকারের বেলাতেই প্রযোজ্য নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই এই কথাটি প্রযোজ্য। শিকার করতে করতে এমন এমন জিনিস শিখেছি যা আমার পরবর্তী জীবনের পাথেয় হয়েছে। পেছন ফিরে তাকালে খুবই ধন্য মনে করি নিজেকে। সেই সব রাত ও দিনের প্রতি গভীর এক কৃতজ্ঞতার বোধও নড়েচড়ে ওঠে।

এখন কৃষ্ণপক্ষ। একফালি চাঁদ উঠবে। তাও সেই মধ্যরাতে। চারদিকে ফুটফুটে অন্ধকার। তবে আকাশভরা তারা আছে। দুটো পেঁচা ঝগড়া করছে উড়ে উড়ে, ঘুরে ঘুরে, কিচি-কিচি-কিচর-কিচর-কিচর। পাশে ঝাঁটিজঙ্গলের উপরে ঘুরে ঘুরে ডিড-উ্য-ডু-ইট পাখি ডাকছে: ডিড-উ্য-ডু-ইট? ডিড-উ্য-ডু-ইট? ডিড-উ্য-ডু-ইট?

কে যে কী করেছে তা আমরা জানি না। কাকে যে সারারাত ওই হাড়কাঁপানো

শীতের রাতে ওরা উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে এই প্রশ্ন করে যায়, বড় জানতে ইচ্ছে করে। বন-পাহাড়ে এমন অনেক রহস্য চিরদিনই ছিল, আছে, এবং থাকবেও যার উত্তর সম্ভবত কেউই পাবে না কোনও দিনই।

জনাব ইজাহারুল হক, নাজিমুদ্দিন এবং হাঁকাওয়ালাদের নিয়ে পুবের আকাশ লাল হওয়া মাত্রই বেরিয়ে গেছে। গভীর জঙ্গলে জঙ্গলে দু' মাইল যাবে তারপর মহুলান-নালা পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে হাঁকাওয়ালারা পাহাড়ের ওপারে নেমে যাবে। আর ইজাহার কাছিম-পেঠা পাহাড়টার শিরদাঁড়ার উপরের সেই প্রাচীন শিমুল গাছের নীচে বড় বড় কালো পাথরের যে স্তূপ আছে, তার উপরে তার লাল-জ্যাকেট পরে বসে থাকবে। মাচায়-বসা আমাদের কাছ থেকে 'রেডি আছি' এই সংকেত পেলে, সে তার লাল রুমাল নেড়ে পাহাড়তলির হাঁকাওয়ালাদের সঙ্গে থাকা নিজামুদ্দিন আর তার দুই চেলা একরাম আর বুধাইকে নির্দেশ দেবে যাতে হাঁকা শুরু করে ওরা।

ওরা রওয়ানা হয়ে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে আমরা চা আর বিস্কিট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ওদের এক ঘণ্টার lead দিলাম এই জন্যে যে, হাঁকাওয়ালারা খুব তাড়াতাড়ি হাঁটলেও ওদের পাহাড়ের ওপারে গিয়ে পৌঁছতে কমপক্ষে ঘণ্টা দেড়েক লাগবেই। আমরা আধঘণ্টার মধ্যে মহুলান-নালার এপাশে-বাঁধা মাচাতে পৌঁছে যাব।

চেলা বুধাইকে রেখে গেছে নিজামুদ্দিন আমাদের মাচাতে নিয়ে যাবার জন্যে। ওরাই গতকাল বিকেলে গিয়ে মাচা বেঁধেছে। কাড়ুয়া আর আসোয়া ইজাহারের সঙ্গেই গেছে। ইজাহারের গান-বেয়ারার হয়ে গেছে আসোয়া।

আর কাড়ুয়া থাকবে নিজামুদ্দিনের সঙ্গে। অত্যন্ত অভিজ্ঞ আর ভাল শিকারি কাড়ুয়া। যদি কোনও বিপদ হয়, যদি বাঘ হাঁকাওয়ালাদের লাইন ভেঙে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করে, তাই হাঁকাওয়ালাদের সঙ্গেও এক বা একাধিক ভাল শিকারির থাকাটা খুবই প্রয়োজন। কাড়ুয়া সঙ্গে তার টোপিওয়ালা মুঙ্গেরি গাদা বন্দুকটি তো এনেইছে—উপরন্তু নিজামুদ্দিনের একনলা লাইসেন্সড বন্দুকও আছে ম্যানটন কোম্পানির।

ইজাহারের বাড়ি ছাড়ার দশ মিনিটের মধ্যে আমরা ঘন হরজাই জঙ্গলে পৌঁছে গেলাম গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে, কুলথি আর কিতারির ক্ষেত পেরিয়ে। এদিকে বেশিই অসন গাছ। পন্নন, করম, প্রাচীন জংলি আম, ঢওটা, ডিটোর, কুসুম, পঁইসার, মহুয়া, শিমুল ইত্যাদিও আছে। মহুলান গাছ হয় উঁচু পাহাড়ে। মহুলান গাছের পাতা চালান যায় দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে মন্দিরে। 'দোনা' বানাতে লাগে নাকি! এখানে একটাও নেই। অথচ নালার নামটা যে কেন মহুলান হল তা বোঝা গেল না।

নালাতে পৌঁছে আমরা মাচাতে উঠে বসলাম। একটা কাঠের মই বানিয়ে

রেখেছিল ওরা। সেটা দাঁড় করানো ছিল মধ্যের মাচা-বাঁধা গাছের সঙ্গে, যেটাতে নাজিম সাহেব বসবেন। নাজিম সাহেবের সঙ্গে তাঁর নতুন-কেনা আমেরিকান .৪০৪ জেফরি রাইফেল। সুব্রতর .৪০৫ আমেরিকান উনচেস্টার রাইফেল। আন্ডার লিভার। দুটিই সিঙ্গল ব্যারেল। সুব্রতর রাইফেলে প্রতিটি গুলি ছোড়ার পর ঘটা-ঘং-ঘটা-ঘং আওয়াজ করে ম্যাগাজিনে গুলি রি-চার্জ করতে হয়। বাঘ মারতে ওই রাইফেল নিয়ে যাওয়া সত্যিই বিপজ্জনক। যদি প্রথম গুলিতেই বাঘ অক্কা না পায় তবে বাঘ রাইফেল রি-চার্জ করার শব্দ শুনে শিকারি কোথায় আছে তা সঙ্গে সঙ্গে জেনে যেতে পারে এবং আক্রমণও করতে পারে।

গোপাল আর আমার তখন কোনও রাইফেল-টাইফেল ছিল না। আমার ছিল ডাবল ব্যারেল গ্রিনার বন্দুক। ডাব্লু-ডাব্লু গ্রিনার বত্রিশ ইঞ্চি ব্যারেল। আর গোপালের আঠাশ ইঞ্চি ব্যারেলের ম্যানটন বন্দুক। ডাবল ব্যারেল। দু'জনের .১২ বোরের। গোপাল আমার চেয়ে দৈর্ঘ্যে অনেকই কম ছিল। বত্রিশ ইঞ্চি ব্যারেলের বন্দুক ওর পক্ষে কায়দা করা মুশকিলও ছিল।

বুধাই বসল নাজিম সাহেবের সঙ্গে। আমরা সবাই ঠিকমতো মাচায় বসে গেলে এবং একে অন্যের অবস্থান ঠিকমতো দেখে নেবার পর নাজিম সাহেব তাঁর গলার লাল-সবুজ চেক-চেক মাফলার নাড়িয়ে পাহাড়ের টঙে বুড়ো শিমুলের নীচে কালো পাথরের স্তূপে বসে থাকা ইজাহারকে সংকেত দিলেন। ইজাহারও সংকেত পাওয়া মাত্র দাঁড়িয়ে উঠে পেছন ফিরে ওদিকে লাল রুমাল নাড়ল নিজামুদ্দিন একরাম আর কাতুয়াকে নির্দেশ দিয়ে যে, হাঁকোয়া শুরু করো।

মাচাতে বসার আগে নাজিম সাহেব আমাদের বলেই দিয়েছিলেন যে, যে আগে বাঘকে রেঞ্জের মধ্যে এবং সুবিধেমতো পাবে সেই অন্যের জন্যে অপেক্ষা না করে গুলি চালাবে। বাঘ যদি আহত হয়, সঙ্গে সঙ্গে না-পড়ে গুলি খেয়ে, তাহলে তারপরই অন্যরা তাদের রেঞ্জের মধ্যে এলে গুলি করতে পারে। তবে কোনও ক্রমেই রেঞ্জের বাইরে থাকলে এবং ভালভাবে মারার সুযোগ না থাকলে, দূর থেকে গুলি করবে না।

হাঁকোয়া শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজনা বাড়তে থাকে। হাতের পাতা ঘেমে ওঠে। নিশ্বাস দ্রুত হয়ে যায়।

আমরা কেউই কারওকে দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু কে কোন দিকে এবং কতদূরে আছে তা জানতাম।

কথা বলা বারণ। অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে পাখির ডাকের মতো 'কু' শিষ দিয়ে তা করতে হবে। এবং কোনওমতেই হাঁকোয়া শেষ-না হয়ে যাওয়া অবধি, হাঁকাওয়ালারা মাচা-বাঁধা গাছের একেবারে নীচ অবধি না এলে মাচা থেকে নামা চলবে না।

অভিজ্ঞ শিকারি মাত্রই জানেন যে, বাঘ অথবা চিতা অনেক সময়ে হাঁকাওয়ালাদের একেবারে সামনে সামনে হেঁটে আসে এবং হাঁকোয়া যখন প্রায়

শেষ হয়ে এসেছে, যখন হাঁকাওয়ালাদের দেখা যাচ্ছে, তখনই তারা শিকারিকে সমূহ বিপদে ফেলে আড়াল থেকে বেরোয়। তখন হাঁকাওয়ালাদের বাঁচিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বাঘ বা চিতাকে গুলি করা-না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের অভিজ্ঞ মানুষের পক্ষেই সম্ভব। আমাদের মাথা গরম, তার উপরে ছেলেমানুষ।

সুব্রত বসেছিল বাঁদিকের শেষ মাচাতে। তারপরে গোপাল। তারপরে নাজিম সাহেব ও বুধাই এবং ডানদিকে সবচেয়ে শেষে আমি। চারটি মাচার দূরত্ব ছিল ষাট গজ মতো করে। তার মানে, সুব্রত আমার থেকে প্রায় আড়াইশো গজ দূরে ছিল।

হাঁকা আরম্ভ হয়ে গেছে। তুমুল চিৎকারে অদৃশ্য শত্রু ও স্ত্রীর ভাইকে যথেচ্ছ এবং যাচ্ছেতাই গালাগালির সঙ্গে ক্যানেস্তারা বাজিয়ে, শিঙে ফুঁকতে-ফুঁকতে এবং টাঙ্গির হাতল দিয়ে গাছের কাণ্ডতে বাড়ি মারতে মারতে হাঁকাওয়ালারা পাহাড়ে উঠে আসছে। বাঘ তখন পাহাড়ের ওদিকের ঢালে না এদিকের ঢালে আছে, তা কেউই জানে না।

স্টপার ছিল চারজন, নদীর ওপারের গাছে আমার এবং সুব্রতর ডাইনে ষাট গজ দূরে। বাঘ যদি আমাদের মাচার দিকে না এসে ডাইনে বাঁয়ে ভাগলবা হবার চেষ্টা করে তাহলে তারা গাছের ডালে টাঙ্গি দিয়ে ঠকঠক করে আওয়াজ করবে অথবা হাততালি দেবে, অথবা কাশবে, যাতে বাঘ বিরক্তি এবং ভয়ে, যাত্রাপথ বদলে আমাদের দিকেই আসে।

হাঁকাওয়ালারা পাহাড়ের মাথাতে উঠে এসেছে। এবারে দেখা যাচ্ছে তাদের। তার মানে, বাঘ ওদিকের ঢালে ছিল না। কাতুয়া আর আসোয়ার খবর যদি ঠিকই হয় তাহলে বাঘ এদিকের ঢালের কোথাও আছে। পাহাড়ের এদিকের গায়ের মাঝখানে একটা খাঁজ। তার মধ্যে একটা ঘন জঙ্গলাবৃত গিরিখাত। এবং সেই খাতটা এসে ঠেকেছে মহুলান-নালাতে। ওই গিরিখাতের মুখের সামনেটাকে পুরো ঘিরে মাচা বাঁধা হয়েছে এমনই মনে করে যে, বাঘ তাড়া খেয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ওই গিরিখাতের আশ্রয়ে পৌঁছে সেখান দিয়ে এগিয়ে এসেই ওই ঝামেলার পাহাড়কে ত্যাগ করতে চাইবে। এবং পাহাড় ছেড়ে যাবার সময়ে সে যখন কালো পাথর-ভরা মহুলান-নালাটি পেরুবে তখনই সেই সামান্য জল থাকা, অপেক্ষাকৃত ন্যাড়া জায়গাতে বাঘকে আমরা দেখতে পাব এবং সুবিধেমতো গুলি করব।

প্ল্যানে কোনও খুঁত ছিল না। এখন বাঘটা এলে হয়।

বাঘ শিকারে এই অলিখিত নিয়ম চালু আছে চিরদিনই যে, যে-শিকারি সবচেয়ে আগে বাঘের শরীর থেকে রক্তপাত ঘটাবে সে বাঘ তারই। মানে, যদি কোনও আনাড়ি শিকারিও বাঘের ল্যাজে বা অন্য কোনও বাজে জায়গাতে গুলি করে তাকে আহত করে তাকে সাক্ষাত যম-এ রূপান্তরিত করে এবং তার দোসর অন্য শিকারি প্রাণ বিপন্ন করে—এমনকি নিজের প্রাণ দিয়েও সেই আহত বাঘকে পায়ে হেঁটে গিয়ে মারে, তবুও সেই বাঘ, বাঘের শরীরের প্রথম রক্ত-ঝরানো

শিকারির বাঘ বলেই গণ্য হবে।

হয়তো এই নিয়মের কোনও মানে নেই। আবার আছেও। sportsmanship বলতে অনেক কিছুই বোঝায়। এই শব্দটি আগে ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, শিকার ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সম্মানের ছিল। একজন sportsman-কে সকলেই sportsman বলেই শ্রদ্ধা করতেন। ক্রিকেটের মাঠে ক্রিজ-এ দাঁড়িয়ে যদি ব্যাটসম্যান বোলারের কোনও মারাত্মক বলে পরাজিত হতেন কিন্তু দৈবক্রমে আউট হওয়া থেকে বেঁচে যেতেন, তখন তিনি আঙুল তুলে বোলারকে সম্মান জানাতেন। ব্যাটসম্যানও যদি কোনও কঠিন বলকে মুন্সিয়ানার সঙ্গে খেলে বাউন্ডারি পার করতেন তখন বোলার তাঁকে অভিনন্দন জানাতেন। sport ব্যাপারটা আনন্দের ছিল, আদর্শের ছিল, চরিত্র-গঠনের ছিল, মারামারি আর টাকা রোজগারের কল ছিল না। বিজ্ঞাপনদাতাদের হইহই ছিল না সেই সব ক্ষেত্রে, ছিল না sponsor-দের রবরবা। এখন কোনও sports-ই আর sport নেই। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলেও বাঙালি খেলোয়াড় ক্রমশ কমে আসছে। এখন যেন-তেন-প্রকারে জিততে হবে, কি খেলার মাঠে, কি জীবনে, তা চুরি-জোচ্চুরি করেই হোক, কি যে ভাবেই হোক—ইংরেজিতে যাকে বলে by hook or by crook! এবং এখন জীবনের সব ক্ষেত্রেই nothing succeeds like success!

এই অবধি বলেই, ঋজুদা চুপ করে গেল। মনে হল ঋজুদার মন খারাপ হয়ে গেল এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ এনে ফেলে। মুখ নিচু করে পাইপের ছাই ঝেড়ে অ্যাশট্রেতে ফেলতে লাগল প্রয়োজনের চেয়ে বেশিক্ষণ ধরে।

তিতির বলল, ক্ষমা করে দাও এখনকার এই তথাকথিত টাকা-সর্বস্ব খেলার মাঠের 'সৈন্যদলকে'। আর শহর ছেড়ে আবার ফিরে চলো টুটিলাওয়াতে। আমরা যে হাঁকাওয়ালাদের হল্লা-গুল্লা শুনতে পাচ্ছি, বাঘটা যে এখুনি বেরিয়ে পড়বে তোমাদের সামনে। এখন পাইপ খেলে কি চলে?

মনে হচ্ছে তোমার চা চাই ঋজুদা। কটায় দিতে বলব গদাধরদাকে?

না না এখুনি কি? এক ঘণ্টা তো মোটে হল খেয়ে উঠেছি। গদাধরদাকে বলে আয় ঠিক চারটের সময় দেবে।

তারপরই বলল, একটু পরই যা না বাবা। বেচারা এত আপত্তি সত্ত্বেও বাবুর্চির রান্না বিরিয়ানি খেয়ে মুষড়ে আছে, হয়তো একটু ঘুমোচ্ছে, কেন বিরক্ত করবি এখন।

দাঁড়াও না, কেসটা কী একটু দেখি আসি।

বলেই ভটকাই উঠে গেল। গেল, আসলে পরিবেশটাকে হালকা করতে।

একটু পরই ফিরে এসে বলল, একেই বলে স্পোর্টসম্যানশিপ!

কেন?

আরে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে যা গল্পটা করছে না। টেপ-রেকর্ডারটা দাও না ঋজুদা, টেপ করে রাখি।

ভাগ। গদাধরদা হিন্দি-উর্দুর 'হ'ও জানে না 'উ'ও জানে না।

আরে সেইটাই তো হচ্ছে মজা। একজন হাজারিবাগী হিন্দি চালাচ্ছে অন্যজন দোকনো-বাংলা। আহা!

কীরকম?

গদাধরদা—একটো মদনটাকি পাকি চেল, বুজেচো আজমল ভাই, তা লৌকো ডাঙ্গাতে ভিড়িয়ে আমি তো দেগে দিনু বন্দুক তার উপরে।

আজমল মিঞা—হাঁ! বন্দুকোয়া চালা দিয়া আপনে গদা ভাইয়া? মগর উও জানোয়ার থা কেয়া? বাঘোয়াসে ভি খতরনাক? মদনটাকি কি বারেমে ম্যায় তো কভভি শুনা নেহি। বহতই জঙ্গলমে খানা পাকায়া আজতক। ইয়া আল্লা! মগর মদনটাকি পাকি কি নাম তো কভভি শুনা নেহি।

গদাধরদা—আরে মরণ! শুনবে কেমন কইরে। মদনটাকি কি আমাদের সোঁদরবন ছাড়া অন্য জায়াগাতি দেকা যায় না কি! আরে কি বলো কিগো ওই দাড়িওয়ালা বাঘোয়া-ফাগোয়া। বাঘের কতা বলতিচি নাকি? কোতায় বাঘ আর কোতায় মদনটাকি। গোবিন্দ। গোবিন্দ।

আমরা ভটকাই-এর অঙ্গভঙ্গী সহকারে গদাধরদা আর আজমল ভাই-এর কথোপকথনের বয়ান শুনে হেসে গড়াগড়ি খেলাম। আজ্জু ভাই হয়তো পুরোটা বুঝতে পারল না কিন্তু হাসির বেলাতে পুরোই হাসল।

হাসি থামলে, বলল, ভটকাই ভাইয়া, পানকি রেকাবি জারাসে লাও ইধর।

ঋজুদা পাইপে দু'টান লাগিয়ে দিল, হাসির হররা থামলে।

তিতির বলল, এবার আবার ব্যাক টু টুটিলাওয়া।

ঋজুদা আজ্জু মহাম্মদকে বলল, দেখা আজ্জু? কৈইসা সব চেলা বানায়া?

হাঁ ঋজুবাবু। স্রিফ চিলাই তো নেহি। চেলি ভি হ্যায়।

বিলকুল।

বলল, ভটকাই ঋজুদার পক্ষে।

ঋজুদা বলল, হাঁকাওয়ালারা সব কাছিম-পেঠা পাহাড়টার শিরদাঁড়াতে পৌঁছনোর পর নিজামুদ্দিন, একরাম আর কাডুয়ার সঙ্গে আজাহার আর আসোয়াও দলে ভিড়ল। তারপর মেদিনী কাঁপিয়ে রণহুংকার দিতে দিতে তারা নেমে আসতে লাগল পাহাড় বেয়ে।

এতক্ষণ ময়ূর, বনমোরগ আর তিতিরের ডাকে বন সরগরম হয়েছিল। এবার সেই গিরিখাত থেকে একবার বাঘ ডাকল। সমস্ত বন-পাহাড় গমগম করে উঠল। হাঁকাওয়ালাদের চিৎকার চেঁচামেচি সব স্তব্ধ হয়ে গেল এক মুহূর্তে। পাখিরাও থেমে গেল। বাঘকে বনের রাজা এমনি এমনি বলে না। সে যে সত্যিই রাজা তা তার রাজত্বে গিয়ে তাকে দেখলে বা ডাক শুনলে তবেই বোঝা যায়। চিড়িয়াখানার বাঘের খাঁচার লোহার শিক-এর ফাঁক দিয়ে ছাতা গলিয়ে যে সব মাখন-মাখন জামাইবাবু শালির কাছে নিজেকে অসমসাহসী বলে প্রমাণ করতে চায়, তাদের

এই রকম জঙ্গলে এনে ছেড়ে দিতে হয়।

ভটকাই বলল, এমনি ছাড়লে হবে থোরি। গোটা ছয়েক একস্ট্রা পায়জামা দিয়ে তবে না ছাড়তে হবে।

—চুপ কর ভটকাই।

আমি বললাম। তারপর?

বাঘটা একবার বিরক্তির ডাক ডেকেই থেমে গেল। কিন্তু বাঘ ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই দুড়দাড় শব্দ করে একদল শম্বর ঝোপঝাড় ভেঙে ওই গিরিখাত থেকেই উঠে এল। এসে নদী পেরোল আমাদের সামনে দিয়ে পাঁচটা ডো এবং একটা স্ট্যাগ।

সে সব আবার কী জানোয়ার?

ভটকাই ইন্টারাপট করল।

আরে পুরুষ হরিণকে বলে stag আর হরিণীকে বলে doe. তাও জানিস না? তুই জানিসটা কী?

আমি বললাম।

doe, a deer, ray, a drop of golden sun... শোনোনি Sound of Music-এ?

তিতির বলল।

হ্যাঁ তো। মনে পড়েছে। আমি খালি ভুলে যাই সব।

ভটকাই বলল, অ্যাপলজেটিকালি।

সরি ঋজুদা, বলো।

তিতির বলল।

স্ট্যাগটা আমার মাচার সামনে বেরোল। কিন্তু বাঘ মারতে এসেছি, তাই গুলি করলাম না।

কেন?

বাঃ গুলির শব্দ শুনে বাঘ সাবধান হয়ে যাবে না।

ও। তাই তো।

শম্বরগুলোর পরে এক জোড়া মস্ত ভাল্লুক ধীরে সুস্থে বেরিয়ে এল। ভাল্লুক, বাঘকে কেয়ার করে না। গায়ে বাঘের মতো জোর সব ভালুকের না থাকলেও গোঁয়ার্তুমিতে কম যায় না। সাহসেরও অভাব নেই তাদের। বাঘও ওদের ঘাঁটায় না, যদি না বাঘের মারা পশুর মড়ির কাছে এসে ওরা ঝামেলা করে।

যে ডাকটা বাঘ ডাকল সেটা রাগের চিৎকার নয়, ব্যথার চিৎকারও নয়, শুধু বিরক্তিতে আমরা যেমন আঃ করে উঠি সেই আওয়াজ। তাতেই গোপাল যেদিকে বসেছিল সেই দিকের একটা মস্ত তেঁতুলগাছ থেকে গোটা কয় ছোট বাঁদর ভয় পেয়ে ধপাধপ করে মাটিতে পড়ে গেল ডাল ছেড়ে হাত ফসকে। মাটিতে পড়েই পড়ি-কি-মরি করে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড় লাগাল। দুটো তো বাঘ যেদিকে, সেদিকেই দৌড়ে গেল অন্ধর মতো।

এদিকে হাঁকাওয়ালাদের মিলিত চিৎকার আর আওয়াজে কান ফাটার উপক্রম হল আমাদের। কিন্তু বাঘটা যেখানে আছে, সেখানে হাঁকাওয়ালারা নামতে পারবে না। আত্মহত্যা করার ইচ্ছে না থাকলে সেই ঘোরান্ধকার নিশ্ছিদ্র খাদে কোনও শিকারিও যাবে না। সেই খাদের অন্য কোনও মুখ যদি থেকে থাকে তবে বাঘ সেদিক দিয়ে বেরিয়ে চলেও যেতে পারে।

আসলে নিজামুদ্দিন, একরাম আর বুধাই অথবা বাঘটাও এই অঞ্চল যত ভাল জানে, কুসুমভা থেকে আসা কাড়ুয়া আর আসোয়া অত ভাল চেনে না। অথচ থাবার দাগ দেখে তার হদিশ করেছিল তারাই। মাচাগুলো যদি নিজামুদ্দিনের সঙ্গে পরামর্শ করে করা হত এবং বাঘ-এর 'রাহান-সাহান' আরও ভাল করে নজর করে দু'-একদিন পরে বাঁধা হত, তবে হয়তো ভাল হত। কিন্তু ডাকু পিপ্পাল পাঁড়েই সব গোল পাকাল। সেও তো বাঘ। এই বাঘকে শিকার করার পরেই না সেই বাঘের পেছনে যাওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

এই সব ভাবছি, এমন সময়ে হঠাৎ বাঘ এসে নদীর অফফ-হোয়াইট বালি আর কালো পাথরের মাঝখানে তিরতির করে বয়ে যাওয়া জলের সামনে দাঁড়াল। বাঘের মতো বাঘ বটে। তাকে দেখে, আমার অবস্থাও গাছ থেকে পড়ে-যাওয়া বাঁদরের মতোই হল। অতবড় বাঘ যে এখনও পৃথিবীতে আছে সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিল না আমার। ক্যামেরাটা বাঁদিকে আর বন্দুকটাকে ডানদিকে রেখেছিলাম। কিন্তু বাঘকে দেখে এমনই 'থ' বনে গেলাম যে, না পারলাম বন্দুক ওঠাতে, না ক্যামেরা। অথচ বাঘ আগে দেখিনি বা মারিনি, তা তো নয়!

বাঘটা দাঁড়িয়েছিল আমার আর নাজিম সাহেবের মাঝামাঝি জায়গায়। দু'জনের মাচা থেকেই তিরিশ গজ মতো দূরত্বে। গুলি করলে এবং গুলি জায়গা মতো লাগলে বাঘ হয়তো ওখানেই পড়ে যেত। বাঘ মারার মতো কঠিন কাজ যেমন নেই, তেমন সোজা কাজও নেই।

সারারাত শিশির পড়াতে গাছেদের পাতা তখনও ভিজে রয়েছে একটু একটু। সোনার মতো রোদ এসে পড়েছে সেই চকচকে পাতাদের গা থেকে পিছলে। হাজারিবাগ জেলার বাঘেদের গায়ের রং একটু পাটকিলে হয়। পাটকিলের ওপর কালো ডোরা। মুখের নীচে একটু দাড়ি মতো। রোদের মধ্যে তার কানের সাদা গোল দাগ দুটো আর মাথা আর চোখের নীচের সাদা অংশ চমৎকার দেখাচ্ছে। বাঘটা জেনেছে যে, কিছু লোক ঝামেলা করতে এসেছে কিন্তু ও জানে না যে গাছের উপরে পরপর চারজন শিকারি বসে আছে এই সুন্দর সকালে তাকে মারবার জন্যে। এবং তাকে যুদ্ধ করার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়েই।

পায়ে দাঁড়িয়ে যদি আমরা তাকে মারতে চাইতাম তবেই না বোঝা যেত! পৃথিবীতে কোনও প্রাণী যে তারও বিপদ ঘটাতে পারে, এক বুনোকুকুরের দল ছাড়া, বা তারও ভয় পেতে হবে এমন কোনও প্রাণী যে আছে আদৌ, একথা বাঘ ভাবতে পর্যন্ত পারে না। তাই সে কোনও সংকোচ, ভয় বা দ্বিধা না করে নদীতে

এসেই পেছনে যে শোরগোল তা বুঝতে পেরেই একটা বড় কালো পাথরের আড়াল নিয়ে ওদিকে ঘুরে তাকাল। গোলমালটা এবার কাছে চলে এসেছে।

হঠাৎ নাজিম সাহেব তাঁর নতুন .৪০৪ রাইফেল দিয়ে গুলি করলেন, বাঘের গায়ে নয়, বাঘের থেকে দশহাত সামনে জলের উপরে। আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, কোঈভি গোলি মত চালাইয়েগা।

বুধাই ওঁর চেয়েও গলা চড়িয়ে আমাদের নাম ধরে ধরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ঋজুবাবু, গোপালবাবু, সুরবোতোবাবু গোলি মত চালানা। কিন্তু বাঘ বুধাই-এর বাণী শোনার জন্যে দাঁড়াল না। তার যা দেখার ও বোঝার সে বুঝে নিয়েছে। এক লাফে সে আমার সামনে দিয়ে স্টপারদের লাইনের ডানদিকের গভীর জঙ্গলে চলে গেল। সেই জঙ্গল একটি পাহাড়ের পায়ের কাছে। বাঘ যে সেই পাহাড়েই আপাতত যাবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। তাকে মারতে চাইলে এখুনি উলটোদিক থেকে সেই পাহাড়ে হাঁকা করলে তাকে আবারও মারার সুযোগ পাওয়া যাবে।

ততক্ষণে ইজাহারুল হক নদীতে নেমে এসেছে। সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, ঈ কা বাত নাজিম মিঞা? বাঘোয়া মারনাহি নেহি থা তো হামলোগোঁকো ইতনা জারমে সুব্বে সুব্বে অ্যায়সি পরিসান কাহেলা কিয়া আপনে? আজিব আদমি হ্যায় আপ।

ইজাহারের চেয়েও বেশি বিরক্ত হয়েছিল নিজামুদ্দিন, একরাম, কাড়ুয়া আর আসোয়া। হাঁকাওয়ালারা খুশিই ছিল কারণ অতবড় বাঘকে আহত করলে বাঘ যদি হাঁকাওয়ালাদের লাইন ভেঙে পেছনে চলে যেতে চাইত তবে তাদের মধ্যে একাধিক জন আহত তো হতই মরেও যেতে পারত। বাঘ তো কোনও ট্রাফিক পুলিশের হাত মানে না। সে কখন যে কোন দিকে যাবে, তা শুধু সে নিজেই জানে।

মাচা থেকে আগে নাজিম সাহেব নামলেন। তারপরে একে একে আমরা। সকলে একসঙ্গে হলে নাজিম সাহেব একটা গোল পাথরে বসে পকেট থেকে সিগারেট পাকানোর কাগজ বের করে পাকাতে লাগলেন। ক্যাপস্টান টোব্যাকো কাগজে পাকিয়ে খেতেন উনি। সিগারেটটা পাকানো হলে, লাইটার জ্বেলে কুটুং করে আগুন ধরালেন।

বাত ক্যা হ্যায়?

বাঁ হাতের তিনখানা আঙুল নেড়ে গভীর বিরক্তির সঙ্গে বলল, গোপাল।

নাজিম সাহেব বললেন, জী তো খুশ হো গ্যয়া? বাঘ দিখকর? ক্যা? হুয়া ক্যা নেহি?

হাঁ উতো হুয়া, মগর...

মগর-ফগর নেহি। শিকারি হো কর দুসরা শিকারিকো ইজ্জত দেনা চাহিয়ে। ঈয়ে শের মারনেকা লিয়ে নেহি থা। সালাম করনেকো লিয়ে থা। হামলোগোঁনে সালাম বাজায়া। ইনশাল্লাহা! উসকি উম্মর হাজার সাল বনে। ইয়ে শের হিন্দুস্তাঁকা ঘামণ্ড হ্যায়। আপলোগোঁকি বাল-বাচ্চা-পোতা-পোতিকো দেখনে কি লিয়ে

ইসকো বাঁচাকে রাখনাহি চাহিয়ে। বন্দুক রাইফেল কি ঘোড়া দাবানেমেহি শিকারি নেহি বন পাতা ইনসান। যো ইনসান জানতি হ্যায়, ঘোড়া কব দাবেগা, ঔর কব নেহি, শিকারি ওবহি হ্যায়।

বলেই চুপ করে গেলেন নাজিম সাহেব।

এটুকু বলেই ঋজুদা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। সেদিনের সেই টুটিলাওয়ার জঙ্গলের শীতের সকাল যেন তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

বুঝলাম না।

বলল, ভটকাই।

আমরাও যে খুব ভাল বুঝলাম এমন নয়।

ঋজুদা বলল, তোদের একটু আগে স্পোর্টসম্যানশিপ-এর কথা বলছিলাম, এই হল সেই স্পোর্টসম্যানশিপ। যদি সম্মান করার মতো প্রতিপক্ষ হয় তবে তাকে সম্মান জানানোই প্রকৃত স্পোর্টসম্যানের লক্ষণ।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, দ্যাখ, আজকে বাঘ বাঁচাবার জন্যে কত কিছু হরকৎ হচ্ছে, অভয়ারণ্য, বাঘ-প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড-ওয়াইল্ড-লাইফ-ফান্ড ইত্যাদি কত কি হয়েছে। তখন তো বাঘের সংখ্যা ছিল অগণ্য। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। কিন্তু তখন শিকারিদের মধ্যে যদি নাজিম সাহেবের মতো অনেক শিকারি থাকতেন তবে বাঘেদের সংখ্যা এমন ভাবে কমে যেত না। না সরকার মাথা ঘামিয়েছে তখন এ নিয়ে, না শিক্ষিত শিকারিরা। আর দ্যাখ, আজ্জু মহাম্মদের বাবা নাজিম সাহেব তো ইংরেজি-মিডিয়াম স্কুলে লেখাপড়া করেননি, কলেজেও যাননি। অথচ কত বড় শিক্ষিত মানুষ ছিলেন তিনি!

তা নাজিম সাহেব গুলিটা করেছিলেন কেন?

বাঃ! বাঘকে ভয় পাওয়াতে। মাচা চেনাতে। শিকারিরা যে গাছে বসে থাকে অমন লুকিয়ে, তা জানাতে। যাতে ভবিষ্যতে অমন ভুল সে আর না করে।

বাঘটার অত বয়স আর এটুকুও শেখেনি!

তিতির বলল।

তা কী আর করা যাবে। বাঘটা হয়তো তোর মতো ভাল স্কুলে পড়েনি। সবাই কি আর সবই জানে। তুই এই বয়সেই যা জানিস অনেকে বুড়ো বয়সে পৌঁছেও তা জানে না। কিন্তু বাঘটা বুড়ো একেবারেই ছিল না। অভিজ্ঞও ছিল না। কৈশোর আর যৌবনের চৌকাঠে পৌঁছেই তার ওই চেহারা। তাহলে বোঝ, সে কেমন বাবার ছেলে ছিল।

ভটকাই বলল, 'বাঘকা বেটা, সিপাহিকো ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া,' 'বাপ'কে 'বাঘ' বানিয়ে দিয়ে।

বাঘটা যে বয়স্ক নয় তা তোমরা বুঝতে পেরেছিলে?

তিতির জিজ্ঞেস করল ঋজুদাকে।

আমরা থোড়াই বুঝেছিলাম। বুঝেছিলেন, নাজিম সাহেব। অনেক

ছেলেমানুষকেই বুড়ো মনে হতে পারে দেখে, আবার অনেক বুড়োকে ছেলেমানুষ।

অনেক এঁচড়ে পাকাও থাকে। ছেলেমানুষ হয়েও যারা বুড়ো।

কীরকম?

যেমন ভটকাই।

আমি বললাম।

তিতির বলল, টুটিলাওয়ার বাঘের গল্প তো শেষ হল এবার ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের গল্পটা বলো। সেটাই তো আসল।

সবই আসল। আজমল-এর বটিকাবাব দেওয়া বিরিয়ানি আর গুলহার কাবাব আর চাঁব আর রেজালা যা খেয়েছি না! একেবারে আইঢাই করছে শরীর। তোমরা সব এখানে বসে গল্প করো, চা খাও, সঙ্গে টা, আমি গিয়ে একটু শুয়ে নিই। আজ্জু মিঞাও শোবে না কি?

না। আমি বরং একটু নাখুদা মসজিদ ঘুরে আসি। আজকে একবারও নামাজ পড়া হল না অথচ আজ জুম্মাবার। মগরিব-এর নামাজটা অন্তত পড়ে আসি। আব্বা বেঁচে থাকলে রাগ করত খুব।

নিশ্চয়ই যাবে। দিনের মধ্যে ঈশ্বর বা আল্লাকে বেশিবার মনে করতে পারলে তো ভালই, একবার অন্তত তো করাই উচিত মনে মনে। যাও ঘুরে এসো। মাধবকে নিয়ে যাও। তোমার পানও নিয়ে যাও।

তারপরই বলল, ও ভাল কথা, রাতে কী খাবে?

আজ্জুভাই উঠে নাগরা জুতোতে পা গলাতে গলাতে বলল, কুচ্ছো নেহি। স্রিফ চারবটি পাচনল, হামদর্দ দাবাখানা কি।

সে কি! তা বললে হয়! রাবড়ি একটু খেতেই হবে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। এই সৈন্যদলের জন্যে মুরগির ফিশ-ফাশ করবে গদাধরদা। তোমার আজমলকেও তো ভাল করে খাওয়াবে গদাধরদা। সে কি এতই অভদ্র?

আমরা কিন্তু কালই যাব ঋজুবাবু ভেস্টিবিউলে। কোডারমাতে নেমে, বাসে যাব হাজারিবাগ। আজকাল তাতেই সুবিধা। তো,অব চলে হাম।

যাও।

কিন্তু আজমলকে দেখিয়ে আনবে না কলকাতার নাখুদা মসজিদ?

সাহি বাত। ঠিকই তো। আবার কবে আসবে কলকাতায়।

ভটকাই বলল, আমি ডেকে আনছি।

ওরা চলে গেলে ঋজুদা সত্যি সত্যিই শুতে চলে গেল। আজকাল ঋজুদা যেন কেমন বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।

ঋজুদা শুতে গেলে ভটকাই বলল, কান খুলে মন দিয়ে শোনো ছুঁওড়াপুত্তানেরা। তোমরা আমার কথার মধ্যে একটাও কথা বোলো না আমি তোমাদের ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের সঙ্গে আমার এনকাউন্টারের গল্পটা বলছি।

গত শনিবারে আজ্জু মহম্মদের বিরিয়ানি পার্টির আগে যেখানে থেমেছিল ঋজুদা, সেখান থেকে এই শনিবারে শুরু হল। ঋজুদা বলল, টুটিলাওয়ার জমিদার ইজাহারুল হক-এর বাড়ি থেকে যখন আমরা বেরোলাম চারজনে তখন চারটে বাজে। নাজিম সাহেবের দোয়াতে দুপুরের খাওয়াটা খুবই বেশি হয়ে গেছিল। তিত্তরের কাবাব, হরিণের চাঁব, সীমারিয়ার পাঁঠার কলিজা ভাজা, মুরগির কারি আর বাসমতি চাল-এর ভাত। মুসলমানেরা কখনওই টক খায় না। কেন খায় না, তা আরও বড় হবার পরে জেনেছিলাম।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। শীতের বিকেলের বন থেকে এক আশ্চর্য মিশ্র গন্ধ ওঠে। মিশ্র বলছি এই জন্যে যে, তাতে মিষ্টি, তিক্ত, কটু, কষায় সব রকমের গন্ধ মিশে থাকে। পথের ধুলোর মিষ্টি গন্ধ তাতে যোগ হয়। আমাদের দেশের মাটির গন্ধ, ভারতবর্ষের গন্ধ, এমন গন্ধ কোনও দেশের মাটিরই নেই।

সূর্যটা ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কার অদৃশ্য হাত যেন দুটি কানের পেছনে বরফের পুলটিস লাগিয়ে দেয়। মনে হয়, সেই হাত দুটি ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে যেমন করে সেদিন সকালে সেই অচেনা লোক দুটোর কান এবং নাকও কেটে নিয়েছিল, তেমনি করেই আমাদের নাক ও কানও বুঝি কেটে নেবে।

সীমারিয়ার দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে চাতরা যাবার পুরনো অব্যবহৃত পথটার সামনে এসে আমরা দু'দলে ভাগ হয়ে গেলাম। এই পথেই গতবারে দূর থেকে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়েকে দেখেছিলাম আমি।

সুব্রতকে নিয়েই বিপদ বেশি। কারণ তার বাবাই তখন পুরো হাজারিবাগ জেলার পুলিশ সাহেব, অর্থাৎ এস.পি.। আর তখনকার হাজারিবাগ জেলা ছিল মস্ত বড়। এখন তো কোডারমা-টোডারমা আরও কত জেলা হয়েছে! তখন ছোটনাগপুরের মধ্যে ছিল মাত্র চারটি জেলা—রাঁচি, হাজারিবাগ, সিংভূম আর পালামৌ। যে-অঞ্চলে ডাকাতি করে মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে গত ছ'মাস হল, যে-অঞ্চলে অন্তত বার চারেক সশস্ত্র পুলিশের বিরাট বাহিনীর সঙ্গে পিপ্পাল পাঁড়ে ও তার দলবলের সংঘর্ষ হয়েছে এবং তাতে চারজন পুলিশ নিহত হয়েছে এবং পনেরোজন আহত, পাঁচজন ডাকাতও নিহত হয়েছে, আহত কত হয়েছে জানা যায়নি, কারণ তারা আহত সঙ্গীদের ফেলে যায়নি, নিয়ে গেছিল সঙ্গে করে।

চাতরার এক ডাক্তার, পুলিশের গুলিতে আহত ডাকাতদের চিকিৎসা করবেন না বলাতে তাঁকে গুলি করে মেরে দেয় পিপ্পাল পাঁড়ে। সেই এম.বি.বি.এস. ডাক্তার, নামধারী দুবে, নাকি গরিবদের উপরে খুবই অত্যাচার করত। তাই তাকে মেরে দেওয়ায় পিপ্পাল পাঁড়ের শাপে বর হয়েছে। চাতরার সব গরিব পিপ্পাল পাঁড়ের দলে চলে গেছে। সরকার থেকে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের মাথার জন্যে দশ

হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। পঞ্চাশের দশকের দশ হাজার টাকা আজকের দশ লাখ টাকার সমান।

এই প্রকৃত গরিব-দরদি গুণটি আছে বলেই পিপ্পাল পাঁড়েকে পুলিশ সহজে কবজা করতে পারছে না। সে ডাকাত বটে কিন্তু সে নিজের জন্যে ডাকাতি করে না। ডাকাতি করে অত্যাচারীদের বাড়িতে, খুন করে অন্যায়কারীদের। এবং লুটের মাল সব গরিবদের মধ্যেই বিলিয়ে দেয়, অস্ত্রশস্ত্র কিনতে ও নিজেদের খাওয়া-দাওয়ার জন্যে যে টাকা লাগে, তা রেখে। তাই স্থানীয় কোনও মানুষের কাছ থেকে পিপ্পাল পাঁড়ে বা তার দলবলকে ধরবার জন্যে পুলিশ কোনও সাহায্য পায় না। তা ছাড়া পুলিশ চিরদিনই আমাদের দেশে গরিবদের উপরেই অত্যাচার করেছে আর বড়লোকদের সেলাম ঠুকেছে। তাই গরিবের সমর্থন তারা পায় না।

এই অবধি একটানা বলেই, ঋজুদা নিভে-যাওয়া পাইপটা ধরিয়ে বলল, তোরা কি কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তর দপ্তর' পড়েছিস? না পড়ে থাকলে অবশ্যই পড়বি। আর পড়বি 'আনন্দমঠ'। যে উপন্যাস থেকে আমরা 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র আর গান পেয়েছি।

তা কমলাকান্তর দপ্তরে কী আছে?

বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তিনি সেখানে এক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন, 'আইন! সে তো তামাশামাত্র! বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে!'

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে কত বছর হয়ে গেছে কিন্তু আইন আজও তাই আছে বলতে গেলে। যার পয়সা নেই, সে বিচার পায় না। আইন নিজের হাতে নেওয়াটা বে-আইনি। একথা সকলেই জানে। কিন্তু যেখানে আইন গরিবদের দেখে না, ভিন্ন মত ও দলের মানুষদের কাছে আইনের দরজা যখন বন্ধ, তখনই সমাজে পিপ্পাল পাঁড়েদের আবির্ভাব হয়, প্রাচীন ইংল্যান্ডের রবিনহুড-এর মতো, অথবা আজকের ভারতের নকশালদের মতো। যা কিছুই ঘটে, তার পেছনে কারণ থাকেই। ক্রিয়া হলেই প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। তাই আইনের চোখে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে জঘন্যতম অপরাধী হলেও তার সম্বন্ধে সবকিছু জানাশোনার পর তার প্রতি আমার এক দুর্নিবার আকর্ষণ জন্মে গেছিল। তাকে গুলি করে মারার চেয়েও তাকে জানার এক অদম্য ইচ্ছা জেগেছিল মনে।

তা তো হল কিন্তু তোমার বন্ধু সুব্রত চ্যাটার্জির কথা কী যেন বলতে গিয়ে অন্য পথে চলে গেলে কেন?

ঋজুদা হাসল।

বলল, বয়স হচ্ছে যে, তা বেশ বুঝতে পারছি। কথার খেই হারিয়ে যায়। তা ছাড়া এই সব কথা তো আজকেরও নয়। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকের কথা। সব কথা ঠিকমতো মনেও নেই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, সুব্রত যেহেতু হাজারিবাগের পুলিশ

সাহেবের ছেলে, তাকে যদি পিপ্পাল পাঁড়ে একবার ধরে ফেলতে পারে তাহলে সারা পুলিশ ফোর্সকে চরম বেইজ্জতি করা হবে। তারপর সুব্রতকে খুন করার হুমকি দিয়ে তার যেসব সঙ্গী পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে তাদের ছেড়ে দেবার দাবিও জানাতে পারে। ভরসার কথা এই যে, সুব্রত, নাজিম সাহেবের খোকাবাবু, যে হাজারিবাগের এস. পি. মিস্টার সত্যচরণ চ্যাটার্জির বড় ছেলে তা ইজাহারের খিদমদ্গারেরা আর কাতুয়ারা ক'ভাই ছাড়া কেউই জানে না। কিন্তু পিপ্পাল পাঁড়ের চর তো সবজায়গাতে ছড়ানো আছে। কথাটা তার কানে যাওয়াটা আশ্চর্যের নয়। হাঁকোয়া শিকারে আশেপাশের নানা গ্রামের যে সব মানুষেরা হাঁকোয়া করছে তাদের কারও কানে কথাটা গেলেও বিপদ ঘটতে পারে।

এই অবধি বলেই, থেমে গিয়ে ঋজুদা রিমোট কন্ট্রোল কলিং বেল-এর সুইচটা টিপল।

কী হল আবার?

দুঃসাহসী ভটকাই জিজ্ঞেস করল ঋজুদাকে।

গদাধরদা এসে দাঁড়াতেই ঋজুদা বলল, আরেক কাপ করে চা খাওয়াবে না গদাধরদা আমাদের?

নিঃচ্ছয়।

বলল গদাধরদা। বলেই, চলে যাচ্ছিল। ঋজুদা বলল, শোনো, সঙ্গে একটু চিজ-স্টিও দিও। 'হট-ব্রেড' থেকে এনেছিলাম যে সকালে। ওদের জন্যই তো এনেছিলাম।

গদাধরদা বলল, আর চিকেন পেটিট?

ঋজুদা। তুমি চেপে যাচ্ছিলে।

দুঃসাহসী অসভ্য ভটকাই আবার বলল।

ঋজুদা হেসে বলল, আমার কী? আজেবাজে জিনিস খেয়ে পেট ভরা। তোদের জন্য আজ গদাধরদা কী রাঁধছে জানিস ডিনারে?

কী?

তোরাই জিজ্ঞেস কর।

আমি বললাম, কী গো গদাধরদা! খোলসা করে বলবে তো। আগে তো আমরা আসতেই নিজেই গড়গড় করে মেনু বলে দিতে।

সে তোমরা দু'জনে যখন আসতে, মানে তুমি আর তিতির। এই ভটকাই দাদা তো একাই সব কথা বলে, অন্যে কী বলবে।

ভটকাই বলল, ছিঃ। ছিঃ। উ্য টু ব্রুটাস!

গদাধরদা বলল, চিকেনের মোমো, ভেটকি স্যালাড, হোয়াইট সস দিয়ে, আর পর্ক-এর গুলাশ।

এখানকার শুয়োর নয়। অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার বন্ধু স্টিভ পাঠিয়েছে জাহাজে করে। গুলাশটাও হাঙ্গেরিয়ান স্টাইলে রান্না। হাঙ্গেরিয়ান কনসাল অমিয়দার

কুক-এর কাছে গিয়ে শিখে এসেছে তোদের খাওয়াবে বলে। 'গুলাশ' অবশ্য বিফ-এরই ভাল হয়। তা হিঁদুর ছেলেমেয়েদের জাতটা গদাধরদা নিজে হাতে মারতে রাজি নয়।

কে অমিয়দা? ঋজুদা?

আরে অমিয় গুপ্ত। কলকাতার শেরিফ ছিলেন না? বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ-এর চেয়ারম্যান।

ও।

মহা বিজ্ঞর মতো বলল, ভটকাই।

কোন স্টিভ ঋজুদা? স্টিভ ওয়া?

তিতির বলল।

আজ্ঞে না। ওয়া নয়। স্টিভ হলেই কি ওয়া হতে হবে?

গদাধরদা চলে গেলেই আমি আর তিতির বললাম, ঋজুদা শুরু করো আর ভটকাই দয়া করে চুপ করো।

হ্যাঁ। সেই কারণেই নাজিম সাহেব সুব্রতকে নিয়ে তিতির-বটের মারার জন্যে উলটোদিকের টাঁড় আর ঝাঁটিজঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। আমি আর গোপাল গিয়ে ঢুকলাম ওল্ড চাতরা রোড-এ, যেপথে সেবারে কাক-ভোরে পিপ্পাল পাঁড়ের দেখা পেয়েছিলাম আমরা।

ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময়ে গোপাল বলল, আমাদের ফিরতে রাত হবে। খাসির উমদা বিরিয়ানি, মধ্যে বটি কাবাব দেওয়া আর তিতিরের রোস্ট যেন রেডি থাকে নাজিম সাহেব। আমরা ডাকাত শিকারে যাচ্ছি। বহুতই পরিশ্রম করে ফিরব।

আর না ফিরলে?

আমি বললাম, শোকসভার বন্দোবস্ত করবেন। ইয়াদগারির।

বলেই, আমি আর গোপাল ওই রাস্তাতে ঢুকে পড়লাম। গোপাল বন্দুকের ক্ল্যাম্পে টর্চটা ফিট করে নিল। আমার টর্চটা জার্কিনের বাঁ পকেটে ছিল। ডান পকেটে ছ'টা গুলি। সবই এল. জি। দু' ব্যারেলে দুটো পোরা আছে। আমরা কিছুই শিকার করব না। বাঘই দেখি আর হরিণ কি পাখি, গুলির শব্দ করব না। আমরা পিপ্পাল পাঁড়ের খোঁজেই যাচ্ছি। মনে মনে আমি আর গোপাল ঠিক করেছিলাম।

তারপর? বলো ঋজুদা। আমার শুনতেই হাত ঘেমে যাচ্ছে। ওই বয়স থেকেই তুমি আর তোমার বন্ধুরা কীরকম ডেয়ার-ডেভিল ছিলে। ভাবলেও ভয় করে।

তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, কেন? তোরাই বা কি কম ডেয়ার-ডেভিল? স্কুলে পড়তে পড়তেই তো রুদ্র, তুই আর ভটকাইও আমার সঙ্গে দেশ-বিদেশ কম জায়গাতে জীবন বিপন্ন করিসনি? যারা পারে, তারা পারে প্রথম থেকেই।

বলো, তারপরে।

আমি বললাম।

সেই রাস্তাটা ব্যবহার হয় না। গাড়ি বা বাস কিছুই চলে না। কখনও-সখনও চোরা-শিকারিরা জিপ নিয়ে এসে ঢোকে রাতে। তাও ডাকাতের ভয়ে আজকাল তারাও আসে না। প্রাণ যাবার ভয় তো আছেই, বন্দুক-রাইফেলও বেহাত হয়ে যাবে। বন্দুক-রাইফেল বেহাত হওয়ার হ্যাপা প্রাণ যাওয়ার হ্যাপার চেয়েও অনেকই বেশি।

মাঝে মাঝেই ঘাস গজিয়ে গেছে। জঙ্গল দখল নিয়েছে। পথের দু'পাশ থেকে জঙ্গল এগিয়ে আসছে পথকে গ্রাস করে। উপরেও গাছগাছালির ডালপালার চাঁদোয়া। তারই ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে বিদায়ী সূর্যের আলোতে লাল হয়ে-যাওয়া আকাশের টুকরো-টাকরা দেখা যাচ্ছে। একটা কোটরা হরিণ খুব ভয় পেয়ে ডাকতে ডাকতে ডানদিকের জঙ্গলের গভীরে দৌড়ে গেল। ময়ূর ডেকে উঠল ক্রেঁয়া-ক্রেঁয়া করে, বুকের মধ্যে চমক তুলে। দূর থেকে বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটে হুতুম প্যাঁচা দুরগুম দুরগুম দুরগুম করে ডেকে উঠল। আস্তে আস্তে পাখ-পাখালির স্বর, কলকাকলি, স্তিমিত হয়ে আসছে। অন্ধকারও নেমে আসছে, আর সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রকোপই বাড়ছে।

টর্চ না-জ্বালিয়ে যেতে পারলেই ভাল ছিল। টর্চ জ্বাললেই দূর থেকে তা দেখা যাবে। কোথায় পিপ্পাল পাঁড়ের পাহারাদার বা স্নাইপার ঘাপটি মেরে আছে তা কে জানে!

আধমাইলটাক যেতেই বনের মধ্যে থেকে মনে হল যেন সামনে জঙ্গল কিছুটা জায়গাতে ফাঁকা হয়ে এসেছে। হয়তো কখনও বনবিভাগ কপিস-ফেলিং করেছিল। অন্ধকার সুড়ঙ্গর বাইরের দিকে এগোলে যেমন আলোর আভাস চোখে পড়ে প্রথমে, তারপর ক্রমশ আলো বাড়তে থাকে, সেই সুড়ঙ্গেরই মতো অন্ধকার পথের মধ্যে দিয়ে যথাসাধ্য নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে যেতে তেমনই মনে হল আমাদের।

অপেক্ষাকৃত ফাঁকা এলাকাতে পৌঁছবার আগে আমরা গাছের নীচের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সামনে এবং ডাইনে-বাঁয়ে ভাল করে নজর করে দেখলাম। তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। তবুও আমরা পথের দু'পাশে দু'জনে অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখ যখন দেখে না, তখন কান শুনলেও শুনতে পারে।

মিনিট তিন-চার অমন দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ যেন শুনতে পেলাম যে দূরে একজন মানুষ খুব জোরে জোরে কাশছে। অনেকক্ষণ ধরে কাশল মানুষটি। এদিকে কোনও গ্রাম আছে বলে শুনিনি। দেখাও যাচ্ছে না কোনও গ্রামের চিহ্ন। এই গভীর জঙ্গলে পরিত্যক্ত পথের পাশে একলা মানুষ কী করতে আসতে পারে সবরকম জানোয়ারে-ভরা এই গভীর জঙ্গলে? আর ডাকাত তো আছেই!

গোপাল আর আমি ফিসফিস করে পরামর্শ করে আরও মিনিট দশেক ওখানে অপেক্ষা করব ঠিক করে পথের পাশের একটি শিলাস্তূপের পাথরের উপরে বসলাম। পাথর নয়তো বরফের চাঙর। পেছন জমে গেল। ইতিমধ্যেই শিশির

পড়তে শুরু করেছে।

আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করলে কেন?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

করলাম, কারণ তখনও পশ্চিমাকাশে যদিও লাল মুছে গেছিল, অস্পষ্ট সাদাটে ভাবটা ছিল, পিপ্পাল পাঁড়ের কোনও স্কাউট কোনও গাছের উপরে মাচাতে যদি বসে থাকেও, পুরো অন্ধকার হয়ে গেলে সে বা তারা আমাদের অত সহজে দেখতে পাবে না। আমরাও তো শিকারি। সবরকম সাবধানতা নিয়েই আমরা এগোব। যে ঝুঁকি এড়ানো যায়, তা এড়ানো গেলে, এড়ানোই ভাল। জেঠুমনি সবসময়েই বলতেন।

গাঢ় অন্ধকার নেমে এলে আমরা দু'জনে ছাড়াছাড়ি হয়ে খুব সাবধানে এক পা এক পা করে, যেদিক থেকে কাশি শুনেছিলাম সেই দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। খুবই আস্তে আস্তে। শিশির পড়তে শুরু করেছে তাই শুকনো পাতার উপরে পা পড়ায় তখন আর মচমচানি উঠছে না।

তারপরে?

তিতির বলল।

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মিটার এগিয়ে যাওয়ার পরে এক বিপদের সূত্রপাত হল। একটি ল্যাপউইঙ্গ, এদিকে ইয়ালো-ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গই বেশি, অন্ধকারে তো আর ডানার রং চেনার উপায় ছিল না, হট্টিটি-হুট, হট্টিটি-হুট করে আমাদের মাথার ওপরে ডাকতে ডাকতে উড়তে লাগল। জঙ্গলের মধ্যে বা ফাঁকা জায়গাতে মানুষ বা শ্বাপদ চলাচল করলেই ওরা এমন করে ডেকে বনের প্রাণীদের সাবধান করে যে দেয় তা তো তোরা জানিসই। বনের প্রাণীদের সাবধান করে করুক কিন্তু পিপ্পাল পাঁড়েও যে সাবধান হয়ে যাবে, সেই ছিল বিপদ।

তারপর? তোমরা কী করলে?

আমরা থেমে গেলাম। কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে গেলাম যেখানে যে ছিলাম।

মনে হল, যেদিক থেকে কাশির শব্দ শুনেছিলাম সেদিক থেকে একাধিক মানুষের অস্পষ্ট কথাবার্তাও ভেসে আসছে। আরও একটু এগোতেই বোঝা গেল ওই দিকে একটি দোলা মতো জায়গা আছে। সেখানে জলও নিশ্চয়ই আছে। সেখানে আগুনও জ্বালিয়েছে কারা যেন।

আমরা খুব সাবধানে সেদিকে এগোতে লাগলাম লেপার্ড-ক্রলিং করে। ওই শীতেও পরিশ্রমে আর উত্তেজনায় আমাদের জামা ও মাথার চুল ভিজে গেল।

আরেকটু এগোতেই দেখি পাঁচ-ছ'টি মোষ এক জায়গাতে শুয়ে-বসে জাবর কাটছে আর একজন মানুষ তাদের সামনে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে। পাছে বাঘ এসে হামলা করে। এই আগুন মোষেদের নিরাপত্তার জন্যে।

আর যাই হোক, এরা সম্ভবত ডাকাত নয়, মনে হল আমাদের।

লোকটি জড়ো করা শুকনো ডালে আগুন জ্বালতেই সেই আগুনে সে আমাদের

দুই মূর্তিমানকে দেখতে পেল। পেয়েই, ভয়ের চোটে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় জন্যদশেক মানুষ আমাদের দিকে এগিয়ে এল। তাদের দু'জনের হাতে জ্বলন্ত কাঠ ছিল, অন্য সকলের হাতেই টাঙ্গি। মশালের মতো জ্বলন্ত কাঠ হাতে করে তারা এগিয়ে এল। টাঙ্গির ইস্পাতের ফলাগুলো মশালের আগুনে ঝকঝক করে উঠল।

আমাদের হাতে বন্দুক দেখে তারা অবশ্য একটু ঘাবড়ে গেল। ভাবল হয়তো, বাঘের রাজ্যে এই ঘোগরা আবার কারা?

তারপর?

গোপালই তাড়াতাড়ি বলল, বুদ্ধি করে, তিতির মারতে ঢুকেছিলাম টুটিলাওয়া-সীমারিয়ার সড়ক ছেড়ে এই বনে। পথ ভুলে গেছি। টুটিলাওয়াতে যাব কোন পথে?

ওরা বলল, আইয়ে আইয়ে খোকাবাবুলোগ, জারা বৈঠকে যাইয়েগা। ঠাণ্ডা বহতই হ্যায়।

তারপর বলল, আমরা তো এখানে থাকি না। আমরা থাকি চান্দোয়া-টোড়িতে। কাল থেকেই গাছ কাটব। আমরা সব কাঠুরে। কাঠ কেটে টুকরো করে মোষের গাড়িতে লাদাই করে চান্দোয়া-টোড়িতে নিয়ে যাব। সেখানে ঠিকাদারের কাঠ-চেরাই কল আছে। আবার ফিরে আসব। আজই আমরা এসে পৌঁছেছি। কালকে পাতার ঘর বানিয়ে নেব। আজ রাতটা আগুনের পাশে বসেই কাটাতে হবে।

তারপর বলল, আপনারা কি খাবেন কিছু?

কী খাব?

আমরা গরিব লোক বাবু। রাতে আমরা শুখা-মহুয়া সেঁকে খাব একটু নুন দিয়ে।

একজন বলল, আমার কাছে একটু ছাতু আছে। চানার ছাতু।

তোমরা দিনে ক'টাকা মজুরি পাও?

একট টাকা হুজৌর। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি কাজ। যাদের মোষের গাড়ি আছে তারা গাড়ি ভাড়া পাবে চব্বিশ ঘণ্টাতে দু' টাকা। তাদের গাড়ি চালানো ও কাঠ লাদাই করার মজুরিও তারই মধ্যে।

তোমাদের এই ঠিকাদারের নাম কী?

তাঁর নাম মালদেও পাণ্ডে। তিনি মস্ত বড়লোক হুজৌর। চান্দোয়া-রাঁচি-ডালটনগঞ্জ লাইনে তাঁর বাস চলে। ঘোড়া আছে। রংদার দোতলা মোকান।

এখানে যে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের রাজত্ব তা কি তোমরা জানো?

তা জেনেই তো আসা! যদি পাঁড়েজির সঙ্গে মোলাকাত হয়ে যায় তো আমাদের কপাল ফিরে যাবে।

কেন?

পাঁড়েজির বড় দয়া গরিবদের উপরে। নিজেও তো গরিবেরই ছেলে। অত্যাচারিত। দেখা হলেই উনি আমাদের অনেক টাকা-পয়সা দেন। আমাদের অভাব-অভিযোগের কথা মন দিয়ে শোনেন।

তোমাদের ঠিকাদার মালদেও পাণ্ডে পিপ্পাল পাঁড়ের কথা জানে কি?

জানে বইকী। জানে বলেই তো নিজে না এসে আমাদের লাগিয়েছে। জানে বলেই তো জান-এর ভয়।

তোমরাও তো ডাকু বনে যেতে পারো। ভাল খাবে, ভাল পরবে।

আমি বললাম।

ওদের মধ্যে বয়স্ক যে নেতা গোছের মানুষটি, সে হাসল। বলল, হাঃ! আমাদের কি সেই হিম্মৎ আছে বাবু! ডাকু কি ইচ্ছে করলেই কেউ হতে পারে! ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের বয়স মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশ। এইরকম মালদেও পাণ্ডেরই মতো এক জঙ্গলের ঠিকাদার তার বাপকে খুন করেছিল, দিদিকে আর মাকে পুড়িয়ে মেরেছিল। তারপরই না, পালিয়ে-বাঁচা পিপ্পাল পাঁড়ে ডাকু হয়ে যায়। তার মাথার উপরে দশ হাজার টাকা ইনাম। তবু সরকার তাকে ধরতে পারছে না। তবে একদিন তো ধরা সে পড়বেই। জ্যান্ত আর মৃত। কতদিন লড়বে সরকারের বিরুদ্ধে?

ধরাই যদি পড়বে তবে ডাকু হল কেন?

হল, আমাদের মতো জন্মদুখি মানুষদের চোখে একটু স্বপ্ন জাগাতে, যুগ যুগ ধরে এই সব অত্যাচারী জমিদার আর পয়সাওয়ালাদের এই গোলামি করা যে ঠিক নয়, সেই কথা বোঝাতে।

আরেকজন বলল, আমরা তো মানুষ নই হুজৌর। আমরা জানোয়ার। নইলে এত কষ্ট সয় আমাদের! পিপ্পাল পাঁড়ে কী করে মাথা উঁচু করে মানুষের মতো বাঁচা উচিত তাই শিখিয়ে দিল আমাদের। আমরা যদি নাও পারি এই দাসত্বর বাঁধন ছিঁড়তে, আমাদের ছেলেমেয়েরা হয়তো ভবিষ্যতে পারবে। এই বা কম কী!

তোমরা পিপ্পাল পাঁড়েকে দেখেছ?

দেখব না কেন? সে তো আমাদেরই ছেলে। বাচ্চা ছেলে। কিন্তু আমাদের প্রণম্য। আমরা প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে যে আমাদের ঘরে ঘরে একজন করে পিপ্পাল জন্মাক।

তারপর ওদের মধ্যে একজন বলল, আপনারাও তো ছেলেমানুষ, খোকাবাবু, আপনারাও দেখছি বহুত হিম্মৎদার। এই বয়সি ছেলেদের এমন জঙ্গলে রাতের বেলা ঘুরে বেড়াতে দেখিনি কখনও, যদিও আমরা জঙ্গলেরই মানুষ। অবশ্য আমাদের কাছে তো বন্দুক থাকে না।

গোপাল বলল, অত্যাচারের নানা রকম হয় চাচা। শহরেও আমাদের উপরে অত্যাচার করার লোকের অভাব নেই। গরিব বড়লোক শব্দগুলোর মানেও এক এক জায়গাতে একেক রকম। অত্যাচার, অন্যায়, সব জায়গাতেই আছে, থাকে,

তবে তাদের চেহারা আলাদা আলাদা এই যা।

আমি বললাম, তা ছাড়া হিম্মৎ ব্যাপারটা তো পিপ্পাল পাঁড়ের কাছ থেকে শেখবারই। আমাদের আপনারা একবার তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারেন?

ওরা একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

তারপর সেই সর্দার-মতো মানুষটি বলল, তার রাহান-সাহান সে যে নিজেই জানে না। খোঁজ লাগাতে হবে। আপনারা কোথায় আছেন?

আমরা উঠেছি ইজহারুল হক-এর বাড়ি টুটিলাওয়াতে।

ওরা এবার চনমনে হয়ে উঠল।

একজন বলল, তাঁরাও তো বহতই অত্যাচারী।

আরেকজন বলল, ইজাহার সাহেব মানুষ ভাল। তাঁর পূর্বপুরুষেরা খারাপ ছিলেন। তারপর বলল, ওখানেই নাকি হাজারিবাগের পুলিশ সাহেবের ছেলে এসে উঠেছিল। আপনারা, মানে আপনাদের মধ্যে কি...।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না না, আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। আমার এই বন্ধুর বাবার বাড়ি আছে হাজারিবাগ শহরে, গয়া রোডে। পুলিশ সাহেবের ছেলে এসেছিল ঠিকই, তবে সে তো আজই বিকেলে চলে গেছে ফিরে।

এই সরল মানুষগুলোর কাছে মিথ্যেকথা বলতে ভারী ছোট লাগছিল নিজেকে। কিন্তু কী করা যাবে। সুব্রতকে তো বাঁচাতে হবে।

যদি চলে গিয়ে থাকেন তো বেঁচে গেছেন হুজৌর। আমরা শুনেছি যে পিপ্পাল পাঁড়ে পুলিশ সাহেবকে 'শিখল্যাবার' জন্যে তাঁর ছেলেকে গুম করে দেবে বলে ঠিক করেছিল। তা করলে, আমাদের সকলেরই বিপদ হত হুজৌর। পিপ্পালের তো কিছু হবে না।

কেন? তোমাদের কীসের বিপদ?

তার কাছে ঘেঁষা তো পুলিশের কর্ম নয়। পুলিশ পড়বে হাতিয়ারহীন, গরিব, অসহায় আমাদেরই উপরে। কত রকম অত্যাচার যে হবে! পিপ্পাল আর কতজনকে বাঁচাবে? তাই আমরা সেই কথাই আলোচনা করছিলাম। পুলিশ সাহেবের বেটা যত তাড়াতাড়ি পুলিশ সাহেবের বাংলোতে ফিরে যায়, ততই তার মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল।

গোপাল বলল, সে চলে গেছে।

তারপর বলল, কালকে আমরা আবার আসব দিনের বেলাতেই। পিপ্পাল পাঁড়ের সঙ্গে দেখা কি হবে?

আপনারা মানে?

মানে, আমরা দু'জন।

কাল এলে কী করে হবে? খোঁজ তো লাগাতে হবে। সে তো কখনওই দু'রাত কোনও এক জায়গাতে থাকে না।

কাল ছেড়ে পরশু আসুন বরং দিনের বেলাতে। তবে খালি হাতে আসবেন।

বন্দুক-টন্দুক নিয়ে আসবেন না। আর এ কথা কারওকে বলবেন না। কারওকেই। তাহলে কিন্তু পিপ্পাল আমাদেরই খতম করে দেবে।

আমি বললাম, আমরা অত নীচ নই। তাই আসব আমরা পরশু, দিনের বেলাতে।

গোপাল ন্যাকামি করে বলল, এখন পথ চিনে ফিরে যাই কী ভাবে?

সেই সর্দার একজনকে বলল, এই গাঙ্গোয়া, একটা জ্বলন্ত কাঠ হাতে নিয়ে খোকাবাবুদের পথটা দেখিয়ে দিয়ে আয়।

বারবার খোকাবাবু বলাতে আমাদের রাগ হয়ে যাচ্ছিল।

লোকটার গায়ে একটা ছেঁড়া ফতুয়া, পরনে মোটা খেটো ধুতি। পায়ে টায়ার-সোলের চটি। একবেলা খেতে পায়। এই আমার দেশের গড়পড়তা মানুষ। আর আমাদের ফুটানির শেষ নেই। তাও আমাদের আরও চাই, আরও চাই।

ভাবছিলাম, আমি।

তারপরে?

ভটকাই আর তিতির সমস্বরে বলল।

আর কী? পথ তো আমরা জানতামই। গাঙ্গোয়া আমাদের সঙ্গে কিছুটা আসার পরই আমরা বললাম, বুঝতে পেরেছি। আমাদের সঙ্গে টর্চ আছে, ঠিক চলে যাব। তোমার কাঠ নিভে গেলে এই বাঘের জঙ্গলে তোমারই ফিরতে অসুবিধে হবে তুমি ফিরে যাও।

ও বলল, পররনাম হুজৌর।

আমি আমার মানিব্যাগ খুলে, জন্মদিনে জেঠুমনির দেওয়া যে একশো টাকার নোটটি সযতনে ইনস্যুরেন্স-এর মতো রেখে দিয়েছিলাম গত ন'মাস ধরে, সেটা গাঙ্গোয়ার হাতে দিয়ে...

দিতেই সে ভীষণ প্রতিবাদ করে উঠল।

আমি বললাম, আগামীকাল তোমরা সকলে ডাল আর ভাত খেয়ো।

গাঙ্গোয়ার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল খুশিতে।

বলল, সকালে ফরেস্ট-গার্ড আসবে মার্কা-মারা গাছ দেখিয়ে দিতে। তারপরই কাজ শুরু হবে। সকালে নয়, আমরা রাতে খাব। মাটির হাঁড়িতে ডাল-ভাত ফুটিয়ে নেব। শুধু ডাল-ভাতই নয় মহুয়াও খাব, নাচব, গাইব। আপনারা কি আসবেন?

গোপাল বলল, দেখি।

গাঙ্গোয়া ফিরে গেলে আমরা টর্চ জ্বেলেই চাতরার পুরনো পথ দিয়ে ফিরে যেতে লাগলাম। অনেকক্ষণ কোনও কথা সরল না আমাদের মুখে।

আমি বললাম, ওরা কি রোজ ভাত খায় না?

রোজ? কী বলো তুমি! বিয়ে-চুড়োতে খায়।

আর ডাল?

ডালও তো বিলাসিতা। বাজরা বা মকাই-এর রুটি খায়। সরগুজার তেল দিয়ে কখনও কিছু তরকারি রাঁধে। বনের মূল ও ফল খায়। শুকনো মহুয়া। পশুর জীবনের সঙ্গে ওদের জীবনের বিশেষ তফাত নেই ঋজু।

আমি চুপ করে পথ চলতে লাগলাম।

ফিরে গিয়ে কী কী উমদা খাবার খাব আমরা, তাই ভাবছিলাম।

ভাবছিলাম, একশো টাকা দিয়ে একদিন ডাল-ভাত খাওয়ালেই এদের সমস্যার কোনও সুরাহা হবে না। যেদিন আমার দেশের সব মানুষ দু'বেলাই ডাল-ভাত খেতে পারবে, সেদিন যত তাড়াতাড়ি আসে, ততই ভাল। এদের জন্যে অশিক্ষিত ডাকু পিপ্পাল পাঁড়েও যেমন ভাবছে, আমাদের সকলেরও ভাবতে হবে। আমরা দেশের কতজন? এরাই তো আসল দেশ, আসল ভারতবর্ষ। যতদিন এদের অবস্থা না ফিরছে ততদিন দেশ একটুও এগোতে পারবে না।

গোপাল বলল, সুব্রতকে আজ রাতারাতিই হাজারিবাগে ফেরত পাঠাতে হবে।

আর আমরা?

আমরা থেকে যাব। দেবদর্শন করে দেবতাকে প্রণাম করে তারপরই ফিরব।

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। জেঠুমনি প্রায়ই বলতেন এই লাইন দুটি, গায়ত্রী মন্ত্রেরই মতো।

ভটকাই বলল, তাতো হল কিন্তু তুমি তো বাঘটার কথা আর কিছুই বললে না, তাকে টপকে চলে গেলে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের কাছে। অতবড় বাঘটা মারতে না পেরে আপসোস হচ্ছিল না।

হচ্ছিল। আবার হচ্ছিলও না। বাঘটা কেন মারলাম না তাতো তোদের বলেইছি। সব শিকারিদের দলেই একজন করে মহম্মদ নাজিম থাকলে দেশ থেকে আজ কি বাঘ লোপ পেতে বসত।

॥ ৪ ॥

ঋজুদা পাইপটা অ্যাশট্রে থেকে তুলে নিয়ে নতুন করে টোব্যাকো ভরল।

তিতির বলল, বলো ঋজুকাকা, তারপর কী হল? তবু বাঘটার কথা আরেকটু বলো।

হবে আর কী? আমাদের মন সত্যিই খুবই খারাপ হয়ে গেছিল। অতবড় বাঘ কি আর মারার সুযোগ পাব?

তখন অবশ্য আমাদের কারওরই জানা ছিল না যে, তার কয়েক বছর পরেই সুব্রত আর ইজাহার দু'জনে মিলে সীতাগড়া পাহাড়ে যে মানুষখেকো বাঘটা অত্যাচার শুরু করেছিল, পিঞ্জরাপোলের এবং সীতাগড়া পাহাড়ের নীচের গ্রামগুলির গোরু-মোষ এবং মানুষ মেরে, সেই বাঘটাকেই মারবে। সে বাঘ, এই

বাঘের চেয়েও অনেকই বড়। দশ ফিট ছ ইঞ্চি ছিল।

বিটউইন দ্য কার্ভস?

তালেবর ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

না। বিটউইন দ্য পেগস।

ঋজুদা বলল।

ঋজুদার গল্প শেষ হতে হতে আজ্জু মহম্মদ ফিরে এসেছিল নাখুদা মসজিদ থেকে মগরিব-এর নামাজ সেরে। আমাদের পাশে চেয়ার পেতে বসে গল্প শুনছিল। ঋজুদার এ সব গল্প, আমাদের চেয়ে তার তো আরও বেশি ভাললাগার কথা। কারণ, তার বাবা মহম্মদ নাজিম ওই সব নাটকের প্রধান ভূমিকাতে ছিলেন এবং ওই সব বনাঞ্চল তার জন্মভূমি হাজারিবাগেরই কাছে। অথচ তার বাবার মুখে এই সব গল্প শোনার সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত ছিল।

ঋজুদা, এই সব পুরনো দিনের গল্প বলতে বলতে প্রায়ই থেমে যায় আজকাল। মাঝে মাঝে বলে, দুসস্ এসব কথা মনে করতেও আর ভাল লাগে না। সবাই যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে, কে ভেবেছিল!

ঋজুদার বন্ধু গোপাল সেন হঠাৎই সেরিব্রাল স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক-এ চলে গেছেন কিছুদিন আগে। তার অল্পদিন পরেই সুব্রত চ্যাটার্জি বা নাজিম সাহেবের সুরবোতো বাবুও, ব্লাড ক্যানসারে। আর নাজিম সাহেব নিজে তো গেছেন আরও আগেই।

ঋজুদা তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, এই সব গল্পগুলো তুই কিন্তু লিখিস রুদ্র। আমারও কবে কী হয়ে যাবে। এই সব গল্প বলার তো আর কেউই থাকবে না। যারা তোদের ঋজুদার গল্প শুনতে তোরই কল্যাণে ভালবাসে, তারা, তোর লেখার মাধ্যমে অন্তত পড়তে পারবে। পড়ে, আনন্দিত হবে।

তিতির বলল, আজে-বাজে কথা বলো না তো ঋজুকাকা! তোমার বন্ধুরা আগে আগে চলে গেছে বলে তোমাকেও যেতে হবে তার কী মানে আছে?

না, কোনও মানে নেই। তবে মানুষের জীবন তো! ঈশ্বর মানুষকে অনেকই জ্ঞানগম্মি দিয়েছেন কিন্তু কোন মুহূর্তে যে কাকে যেতে হবে, সেই খবরটুকুই জানতে দেননি। এই মুহূর্তেই হয়তো যমদূত আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনছে আর মিটিমিটি হাসছে।

তারপরই তিতিরের দিকে ফিরে বলল, আচ্ছা তিতির, তুই কি টলস্টয়ের সেই বইটা পড়েছিস?

আমাদের মধ্যে তিতিরই পড়াশুনোতে ভাল বলে ঋজুদা সবসময়ে ওকেই জিজ্ঞেস করে এসব। তাতে আমাদের খারাপ যে একটু লাগে না, তা নয়। তবে কথাটা তো সত্যিই যে তিতির আমাদের চেয়ে অনেকই বেশি জানে-শোনে।

তিতির বলল, কোন বইটার কথা বলছ ঋজুকাকা?

টলস্টয়ের 'হোয়াট মেন লিভ বাই'। একটি চটি বই। একটা বড় গল্পই বলতে

গেলে।

তিতির মাথা নাড়ল।

ভটকাই বলল, আমি পড়েছি। যদিও আমাকে তুমি জিজ্ঞেস করোনি, করেছ তিতিরকেই, তবুও নির্লজ্জের মতোই বললাম।

পড়েছিস! তুই! বলিস কী রে ভটকু? কে তোকে পড়তে দিল?

আমাকে আর কে কী পড়তে দেয়! তোমারই মতো তো সকলেরই ধারণা যে আমি একটা হাঁদা ছেলে!

তবে ওই বই পেলি কোথায়?

আমাদের পাশের বাড়ির গোপেন মেসোমশাই মারা গেলেন গতমাসে, মিনিবাস চাপা পড়ে। তখন বেঁটে কাকা এই বইটি গোপেন মেসোর স্ত্রী, মানে মণিকাকিমাকে এনে দেন পড়বার জন্যে। কিন্তু মণিকাকিমা কৃষ্ণভামিনী স্কুলে ক্লাস ফাইভ অবধি পড়েছে মোটে। ইংরেজি বই পড়ে মানে বুঝলে তো? তবে বাংলা-নভেল-এর পোকা একেবারে। সুনীল গাঙ্গুলি, নিমাই ভট্টাচার্য, শংকরের বই গোগ্রাসে গেলে। তাই আমাকেই একদিন মণিকাকি বলল, বাবা ভটকু, তোর বেঁটে কাকা বইটা এনে দিল একটু পড়ে গল্পটা আমাকে বলে দিবি না? ইংরেজি যে!

তা, তোর বেঁটে কাকাকেই তো বলতে পারতেন উনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

দুসস। কী যে বলিস!

ভটকাই বলল, এমন ভাবে। যেন আমি জলের সঙ্গে তেল মিশাতে বলেছি।

কেন? দুসস্ কেন?

আরে বেঁটে কাকার সঙ্গে পাড়ার মেয়ে মণিকাকিমার 'লভ' ছিল ছেলেবেলাতে। পাড়ার সকলেই জানে। বেঁটে কাকার দুপুরবেলা একা মণিকাকিমাকে এ গপ্পো পড়ে শোনানোতে বিস্তর অসুবিধে ছিল। তাই তো অগতির গতি আমি!

ঋজুদা বলল, কার সঙ্গে কার 'লভ' ছিল তা আমাদের না জানলেও চলবে। কিন্তু আমি জানতাম যে, তোদের পাড়াতে তুইই সবচেয়ে কম শিক্ষিত। এখন দেখছি তোর চেয়েও...

ইয়েস। আমার চেয়েও কম শিক্ষিত অনেকেই আছে।

তা যাই হোক ভটকাই। ওই গল্পটা পড়েছিস যখন তুই, তিতির আর রুদ্রকে একসময়ে গল্পটা শুনিয়ে দিস।

তারপরে বলল, যে-মানুষেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না তাদের সকলেরই পড়া উচিত ওই গল্প। ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে যে বিজ্ঞানের বা যুক্তির কোনওরকম ঝগড়া নেই, তোরা আরও বড় হলে, আরও অনেক পড়াশুনো করলে, জানতে পারবি। যাদের পড়াশুনো কম, তারাই পুঁটি মাছের মতো অল্প জলে ফরফর করে। যারা

সত্যিই জ্ঞানী, তাদের চলা জলের গভীরে, গহনে, জলের উপরে চেয়ে বোঝা পর্যন্ত যায় না তা।

আমি বললাম, আবার ফিরে চলো ঋজুদা টুটিলাওয়াতে। আমরা ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের গল্প শুনতে চাই।

হ্যাঁ। সেদিনই রাতে, খাওয়া-দাওয়ার পরে সুরবোতো বাবুকে হাজারিবাগে পাঠিয়ে দিলেন নাজিম সাহেব ইজাহারের সঙ্গে। খোলা জিপে।

খোলা জিপে কেন?

তা না হলে পিপ্পাল জানবে কী করে যে সুব্রত সেই জিপে নেই। জিপে সুব্রতর রাইফেল নিয়ে ইজাহার আর নাজিম সাহেবের রাইফেল নিয়ে ইমতিয়াজ বডিগার্ড হিসেবে সঙ্গে গেল। ইজাহার জিপ চালাবে, পাশে গুলি ভরা রাইফেল শুইয়ে রেখে। সুব্রতকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে এস. পি. সাহেবের বাংলোতে, ওরা আবারও রাতেই ফিরে আসবে এবং এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবে।

সুব্রতকে বর-রওয়ানা করিয়ে দেওয়ার মতো করে উলু দিয়ে রওয়ানা করিয়ে দেওয়া হল। তারপর আমি আর গোপাল বললাম নাজিম সাহেবকে এবার আমরা দু'জনে একটু ঘুরে আসি।

কোত্থেকে?

দু' চোখ ডিপার করে বললেন, নাজিম সাহেব।

দেখি, পিপ্পাল পাঁড়ের সঙ্গে দেখা হয় না কি? কে যেন বলছিল যে ঠিকাদারের লোকেরা ওল্ড চাতরা রোডের পাশে আজই বিকেলে এসে ডেরা করেছে। গাছ কাটার জন্যেই ওরা এসেছে। ঠিকাদারের হয়ে। সবাই তো স্থানীয় লোকই। ওদের সঙ্গে একটু মিলে-মিশে দেখে আসি পিপ্পাল পাঁড়ের রাহান-সাহান জানা যায় না কি?

নাজিম সাহেব বললেন, একদিনে অনেকই ধকল গেছে। তা ছাড়া, রাতে আপনাদের আমি পিপ্পাল পাঁড়ের সঙ্গে টকরাতে যাবার জন্যে কখনওই ছাড়ব না। এ সখের শিকার নয় খোকাবাবুরা। এতে, জানকি খাতরা।

গোপাল রাগের গলাতে বলল, খোকাবাবুকো খোকাবাবু বলিয়ে গা। হামলোগোঁনে খোকাবাবু না হ্যায়।

তা বাঘ শিকারে কি জানকি খাতরা নেই?

আমি বললাম।

নাজিম সাহেব আমাকে ডেঁটে দিয়ে বললেন, আরে বাঘ তো ফাস-ক্লাস জেন্টিলম্যানই না হ্যায়! কিন্তু পিপ্পাল কী করতে পারে আর কী পারে না, তা কেউই বলতে পারে না। না, না। এক খোকাবাবুকে তো চালান করে দিলাম। কিছু একটা হয়ে গেলে আপনাদের মা-বাবাকে আমি কী বলব গিয়ে? খরগোস আর তিতির মারার নাম করে এসে ডাকাতের সঙ্গে টকরানো! ওই সব বদতমিজি করতে হয় তো নিজেরা একা একা এসে নিজেদের দায়িত্বে করবেন। নাজিম মিঞা উপস্থিত থাকতে ওই রকম দুঃসাহস বরদাস্ত করবে না। সাহস ভাল ছঁওড়াপুত্তান।

দুঃসাহস কখনওই ভাল নয়। জবরদস্ত পুলিশসাহেব চ্যাটার্জিসাহেবের এতবড় ফোর্সই চোখের-জলে নাকের-জলে হয়ে গেল আর আপনারা তো বাচ্চা ছেলে। চালিয়ে, কাল হামলোগোঁনে ভি লওটকে যায়েগা।

গোপাল মুখ গোঁজ করে বসে রইল। আমাদের না হল বাঘ মারা, না ডাকাতের সঙ্গে মোলাকাত।

তারপর?

তারপর আর কী? সেই যাত্রা হাজারিবাগ হয়ে কলকাতা ফিরে আসতে হল।

আমরা সবাই হতাশ হলাম ঋজুদার গল্প শুনে।

এ আবার গল্প হল নাকি!

ভটকাই বলেই ফেলল আমাদের সকলের মনের কথাটা।

হল না?

না। অ্যাকশান হল না, গুলি চলল না, কারওর খুপড়ি উড়ল না, গুলিতে হাত-পা খোঁওয়া গেল না একজনেরও, তো কীসের গল্প হল? ধ্যাত। সময়টাই নষ্ট হল আমাদের।

ঋজুদা হাসছিল।

বলল, সে যাত্রা দেবদর্শন হল না বলে কি পরেও আর কখনও হল না।

আমাদের এমন টেনশনে না-রেখে বলেই ফেলো না পুরোটা ঋজুকাকা!

তিতির বলল।

আরে ঘটনা যেমন যেমন ঘটেছিল আমি তো তেমন তেমনই বলব...না কী? আশ্চর্য তো!

আমি বললাম, আরে ধৈর্য ধরো না, হবে।

এমন সময়ে গদাধরদা চাকা-লাগানো ট্রলির ওপরে, চা-এর পেয়ালা পিরিচ আর চকোলেট-ক্রিম বিস্কিট নিয়ে এল। চা-এর পটে চা, দুধের পটে দুধ, চিনির পটে চিনিও নিয়ে।

আসা মাত্র তিতির কাজে নেমে পড়ল।

চা খাওয়া হলে ঋজুদা বলল, তখন আমার আর গোপালের ক্লাস টেন। টেস্ট পরীক্ষা দিয়েই অল্প ক'দিনের কড়ারে গেছিলাম। কলকাতা ফিরতেই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে কোথাওই যাওয়া চলবে না বলে ফতোয়া জারি হল। অ্যাডিশনাল ম্যাথস পরীক্ষা যেদিন শেষ হল সেদিনই গোপালদের বাড়ির উলটোদিকে একটা মাদ্রাজি কফির দোকানে বসে দোসা আর কফি খেতে খেতে আমরা ঠিক করলাম, চাতরাতে যাব সোজা। সেখানে গোপালের বাবার বিড়িপাতার এক মস্ত ব্যবসাদার মক্কেল আছে। তার কাছে গিয়ে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করব। আমি বললাম, নাজিম সাহেব প্রায়ই একটা কথা বলেন না, 'গুরু গুড় চেলা চিনি'। আমরা এবারে প্রমাণ করব যে প্রবাদটা সত্যিই।

আরও আগে বাড়ো ঋজুদা। সোজা চাতরাতে।

হ্যাঁ।

রেজাল্ট বেরোবার অনেকেই দেরি। দু'জনে তো বন্দুক কাঁধে করে রাঁচি এক্সপ্রেস-এ চড়ে পড়লাম। তখনও হাটিয়াতে হেভি এঞ্জিনিয়ারিং-এর কারখানা হয়নি। রাঁচিতে নেমে রাতু রোড বাসস্ট্যান্ডে এসে চাতরার বাস ধরলাম। বিজুপাড়া হয়ে, কুরু হয়ে, চাঁদোয়া-টোড়ি হয়ে বাঘড়া বা জাবড়া মোড় হয়ে আমরা যখন চাতরাতে লগনপ্রসাদ অ্যান্ড কোং-এর গদিতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধে হয় হয়। তখন তো আজকালকার মতো দ্রুতগামী বাস ছিল না। পথঘাটও ভাল ছিল না।

মাঝবয়সি লগনবাবু আমাদের খুব খাতির করে তাঁর অতিথিশালাতে ওঠালেন। ট্রেনে রাত জেগে এসেছি এবং সারাদিন বাসে এসেছি বলে গায়ে ব্যথা হতে পারে ভেবে দু'জনের জন্য দু'জন খিদমদগার ঠিক করে দিলেন। পুরি-সবজি তৈরি হতে লাগল। খাঁটি ঘিয়ের গন্ধে ভুরভুর করছিল চারদিক।

আমরা যে ডাকাতের সঙ্গে এনকাউন্টার করতে এসেছি তা তো আর ওঁকে বলিনি। বললে, গোপালের বাবা জেনে যেতেন। বলেছিলাম, শিকার করতেই যাচ্ছি।

লগনবাবু বললেন, আমি তো জৈন হচ্ছি, জীবনে মোশা ভি মারিনি মোশয়, শিকারের কিসছু জানি না। আমি সফর আলির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব আর সঙ্গে দিয়ে দেব লটকাকে। ওদের নিয়ে যান আপনারা দু'জনে। আর একজন নোকর দিয়ে দেব রান্না-বান্না খিদমদগারি করার জন্যে। মিলিটারি ডিসপোজালের জিপটা নিয়ে যান। আপনারা দু'জনেই তো গাড়ি চালাতে জানেন।

ব্যস্‌স! ব্যস্‌স! আর কিছুরই দরকার নেই।

আমরা একসঙ্গে বললাম।

রাতে খাওয়াটা জোর হল। নানারকমের আচার, আলুর চোকা, বেগুন ভাজা, কুলের চাটনি, তারপর রসগোল্লা আর রাবড়ি। তখন দুধ খাঁটি ছিল। আর চাতরার মিষ্টির খুব নামও ছিল। ঠিক হল, নাস্তা করেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। বাঘড়া মোড় হয়ে সীমারিয়াতে গিয়ে সেখানে লগনবাবুর ব্রাঞ্চ অফিসেই থাকব।

বিড়ি হয় কেন্দু পাতা দিয়ে। জঙ্গলের কাজ শুরু হবে কিছুদিনের মধ্যে। তখন জঙ্গলের মধ্যে মধ্যেও নানা জায়গাতে ওঁদের ক্যাম্প পড়বে কেন্দু পাতা সংগ্রহর জন্যে।

॥ ৫ ॥

এখানে দেখতে দেখতে হয়ে গেল তিনদিন। মানে, সীমারিয়াতে।

সফর আলি মানুষটার বয়স হবে চল্লিশ। বেঁটে-খাটো, শক্ত সমর্থ। কট্টর মুসলমান, দিনে পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ে। ফজিরের নামাজ থেকে শুরু করে

দশার নামাজ অবধি। চোখের দৃষ্টি খুব প্রখর। যদিও চোখ দুটো কুতকুতে। তার চোখের দিকে চেয়ে কথা বলা যায় না। মাথায় সাদা ফুল-কাটা টুপি। একটু তোতলা। কাঁধে একনলা মুঙ্গেরি বন্দুক। সম্ভবত বেপাশি।

আর 'লটকা' মানুষটির বয়েসও ওই রকমই। বেজায় মোটা। কালো ভুচুং। পরনে, ঢোলা, লালচে-হয়ে-যাওয়া পায়জামা আর হাতা-গোটানো সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি। পায়ে চটি। তা থেকে গোড়ালির দিকের আধখানা পা বাইরে বেরিয়ে থাকে। হাতে একটি রোগা লাঠি। মুখে সবসময়ে পান-জরদা। কপালে সিঁদুরের টিপ। সকালে চান করে উঠেই সে কালীপুজো করে। কানে একটি জবাফুল গোঁজে। আর মেটে সিঁদুরের টিপ পরে। আর কথায় কথায় বলে, 'লেহ্ লটকা'।

একজন গোঁড়া মুসলমান আর একজন গোঁড়া হিন্দুর মধ্যে আমরা দু'জনে একেবারে স্যান্ডউইচড হয়ে আছি।

ডিম মুরগি খাব, আবার শিকার করা মাংসও খাব। তাই আমাদের প্রথম দিনই দুপুরের নিরামিষ খাবারের পরে ডাকবাংলোতে পাঠিয়ে দিয়েছে চন্দনমল পুগালিয়া। লগনবাবুর সীমারিয়ার ডিপোর কর্মচারি। সফর আলি, লটকা এবং আমাদের খিদমদগার রামখিলাওন সকলেই আমরা সীমারিয়ার ডাকবাংলোতেই আছি। জিপটা আমাদের সঙ্গেই আছে। চন্দনমল, পেট্রল পাম্পে আমাদের নিয়ে গিয়ে মালিকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। বলেছে, যখনই তেল লাগবে বা অন্য যা কিছু লাগবে তা যেন দিয়ে দেন উনি লগনচাঁদ অ্যান্ড কোম্পানির অ্যাকাউন্টে খরচ লিখে। এও বলেছে যে, কোম্পানির অডিটর এরা। কলকাতা থেকে শিকারে এসেছেন। দেখবেন, যেন কোনও অসুবিধা না হয়।

আমি ঋজুদাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, মুলিমালোঁয়া থেকে সীমারিয়া কত দূর? আমরা যখন 'অ্যালবিনো'র রহস্য ভেদ করার জন্যে গেছিলাম মুলিমালোঁয়াতে তখন কি সীমারিয়াতেও গেছিলাম?

হ্যাঁ! সীমারিয়ার উপর দিয়েই গেছিলাম। এখন তো সব ভিড়ে-ভিড়াক্কার হয়ে গেছে। পিপ্পাল পাঁড়ের সঙ্গে যখন আমাদের টক্কর হয়েছিল সে তো চল্লিশ বছর আগের কথা। তখন সীমারিয়া বা টুটিলাওয়া খুবই শান্তির জায়গা ছিল। পৃথিবীর সব জায়গাতেই শান্তি ছিল। মানুষ বেড়ে গিয়ে, জনসংখ্যা গিনিপিগ-এর মতো বেড়ে গিয়েই সব কিছু শেষ হয়ে গেল। মানুষের বাসের যোগ্য আর রইল না। জঙ্গলও সব শেষ হয়ে গেল।

তা ঠিক।

তিতির বলল।

অথচ জনসংখ্যা কমাবার জন্যে কারও কোনও মাথাব্যথাই নেই।

অশিক্ষিত, অভুক্ত মানুষ যত বাড়ে, ততই তো রাজনৈতিক দলেদের সুবিধা। ততই তো তাদের একটা ধুতি দিয়ে, চারটে রুটি দিয়ে, এক বোতল দিশি মদ দিয়ে, দশটা-বিশটা টাকা দিয়ে পাঁচবছর অন্তর ভোট কিনতে সুবিধা। দেশের

মানুষ সবাই শিক্ষিত এবং সচ্ছল হয়ে গেলে তো ধোঁকা দিয়ে ভোট পাওয়াটা অসুবিধের হয়ে যাবে। দেশে প্রকৃত উন্নতি হয়ে যাবে যে! আর তা হলে ঋজুদার বন্ধু সুব্রতদার ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, এই ধড়িবাজ মানুষগুলোর কী হবে? রাজনীতিই যাদের একমাত্র পেশা।

ভটকাই বলল।

ও বাবাঃ। তুই দেশের জন্যও এত ভাবিস ভেটকু?

ঋজুদা বলল।

ভাবা তো সকলেরই উচিত ঋজুদা, তাই না? তা ছাড়া দেশকে ভালবাসতে তো তোমার কাছ থেকেই শিখেছি। দেশ তো আমাদের প্রত্যেকেরই সম্পত্তি। আর আমাদের বলে মনে করলে ভাল তো বাসতে হয়ই!

তিতির বলল, ঠিক বলেছ ভটকাই!

তারপর, বলো ঋজুদা।

আমি বললাম।

হ্যাঁ। ভোরবেলা বেরিয়ে একটু আধটু শিকার করি আমাদের সকলের খাওয়ার জন্যে, তিতির, বটের, ময়ূর, শুয়োর, কোটরা হরিণ, বন-মুরগি। হাঁটা হয় বেশ কয়েক মাইল। সঙ্গে সফর আলিও যায়। লটকা বাংলোতে থেকে ম্যানেজারি করে। স্যালাড বানায়। সীমারিয়ার কালুর দোকান থেকে বালুসাহি আনিয়ে রাখে, এবং রাবড়ি, বানোয়ারির দোকান থেকে মিষ্টি পান। রোজই 'বিনিপয়সার ভোজ'। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুম লাগাই লম্বা তারপর সন্ধে লাগার আগে আগেই বানোয়ারির পানের দোকানের সামনের বেঞ্চে গিয়ে বসি দু'জনে। উলটো দিকের লাল্লুর দোকান থেকে চা আনিয়ে খাই আর বানোয়ারির দোকানের পান।

কলেজে ওঠার আগেই তোমরা পান খেতে?

তিতির বলল।

আরে, পান খাওয়ার জন্যে কি আর যেতাম। প্রত্যেক ছোট জায়গায় পানের দোকানই হচ্ছে 'গসিপ-সেন্টার'। কত লোক আসছে যাচ্ছে। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ বাসে, কেউ বা সাইকেলে, ক্বচিৎ-কদাচিৎ কেউ গাড়িতে বা জিপে। পরচর্চার এমন জায়গা আর হয় না। অনেক কাপ চা আর পান না খেলে কোন অছিলাতে আমরা সেখানে বসে থাকি! তা ছাড়া, আমরা যে পরদেশি কোকিল তা তো স্থানীয় সকলেই জানে। নানা কথা, নানা আলোচনা কানে আসে। তার মধ্যে পিপ্পাল পাঁড়ের নতুন কীর্তিও ডালপালা বিস্তার করে আসে। যারা দোকানে আসে, তাদের মধ্যে পিপ্পাল পাঁড়ের চরও নিশ্চয়ই থাকে। নইলে তারাও বা খবর পাবে কী করে? কোন বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে আসছে, কে গেঁজেতে করে বিস্তর টাকা নিয়ে গোরু কিনতে যাচ্ছে কোন হাটে, কে জঙ্গল ডাকতে যাচ্ছে হাজারিবাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের অফিসে, যেখানে জঙ্গলের নীলাম ডাকা হবে, সেখানে বিস্তর ক্যাশ টাকা ডিপোজিট দিতে। এই সব খবর না পেলে, ডাকাতি

করে পাবে কী? কখনও বা কোনও জমিদার বা বানিয়া কার ওপরে কী অত্যাচার করল তারও বৃত্তান্ত চুঁইয়ে আসে বানোয়ারির এই পানের দোকানে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বানোয়ারির পানের দোকানে বসে থাকতে থাকতে রাত কত হয়েছে তার খেয়ালই ছিল না স্থানীয় মানুষদের গল্প-গাছাতে এমনই মগ্ন হয়ে উঠেছিলাম আমরা। ইতিমধ্যে দেখি, সফর আলি গুটি গুটি আসছে দোকানের দিকে। পরনে নীল-সাদা খোপ-খোপ লুঙ্গি তার ওপরে নীলরঙা ফুল শার্ট, মাথায় সাদা টুপি, পায়ে নাল লাগানো মোষের মোটা চামড়ার জুতো।

বানোয়ারির দোকানটা ছিল মস্ত একটা সাগুয়ান গাছের নীচে, চাতরা, হাজারিবাগ আর বাঘড়া মোড়-এর রাস্তার চৌমাথাতে। সফর আলি এসে বলল, লটকা আপলোগোঁকি আনেকি লিয়ে বোলিন। খানা বন গ্যয়া। ঠাণ্ডা হো রহা হ্যায়।

সফর আলি যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলছে তখনি সাইকেলে করে একটি লোক এল চাতরার দিক থেকে। এসেই পা দুটো দিয়ে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে বলল, দো পান। কালি-পিলি জরদা দে কর। ছিপছিপে লোক। বয়স চল্লিশ হবে। পরনে দেহাতি খদ্দরের একটা হলদে পাঞ্জাবি আর পায়জামা।

বানোয়ারি তাড়াতাড়ি পান দিল। তাকে যেন একটু নার্ভাস দেখাল।

পিচিক করে কিছুটা পানের পিক ফেলে, আর কিছুটা খুশবুদার জরদা দেওয়া পিক গিলে, সফর আলিকে সে বলল, আররে! মিঞাসাব তু এথি ক্যা করলথু হো?

লোকটা আসতেই সবাই চুপ করে গেছিল। এবং বানোয়ারির তড়িঘড়ি পান দেওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকতা ছিল। লোকটা যে দুগগি-তিগগি কেউ নয়, তা তার চোখ দুটোই বলে দিচ্ছিল। আর ব্যক্তিত্বও।

সফর আলি লোকটাকে দেখে চমকে উঠল মনে হল।

বলল, ম্যায় মেহেমান লোগোঁকা সাথ আয়া।

কাঁহাসে আয়া তুমহারা মেহমান লোগোঁনে?

কলকাত্তা সে। কম্পানিকি অডিটর সাবকি লেড়কা ঔর উনহিকি দোস্ত।

তবতো বহত পয়সাওয়ালা আদমি হোগা। তু ইসি লিয়ে চামচাগিরি করলথু। ক্যা অডিট করনে কি লিয়ে আয়া ই ছঁওড়াপুত্তান লোগ?

আমাদের খুব রাগ হয়ে গেল। নাজিম সাহেব আমাদের ছঁওড়াপুত্তান বলেন সেটা অন্য ব্যাপার। এমন আনজান লোক আমাদের এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে?

সফর আলি প্রতিবাদ করে বলল, ম্যায় ক্যা করুঁ? শেঠনে ভেজা, তবহি না আয়া। ম্যায়তো নোকরিহি না করতা হ্যায়।

লোকটা বলল, সাচ্চি বাত। মগর কওন হ্যায় তুমহারা শেঠ? কাঁহাকি শেঠ?

চাতরাকি। ঔর কাঁহাকি শেঠ মিলেগা মুঝে। ম্যায়তো চাতরামেই না রহতা হ্যায়।

নামতো বাতাও মেহেরবানি করকে, তুমহারা শেঠকি।

শেঠ লগনচাঁদ মালপানি।

আচ্ছি বাত।

তো হিঁয়া ঠাহরা হ্যায় কাঁহা? চন্দনমলকি ডিপোমে?

নেহি। ডাকবাংলা মে।

আচ্ছা বাত। তো অডিটর লোগোঁনে ক্যা অডিট করনেকে লিয়ে আয়া হিঁয়া?

শিকার খেলনেকে লিয়ে আয়া। ইনলোগোঁনে তো পড়তা হ্যায় কলিজমে। অডিটর থোরি বন গিয়া।

বলেই, আমাদের দু'জনের আলাপ করিয়ে দিল সফর আলি, লোকটার সঙ্গে। আমাদের বলল, ঈভি বহতই ভারি শিকারি হ্যায়। পইলে গিরিডিমে অভ্রকি খাদানমে কাম করতা থা...

ইয়েভিতো বোলো মিঞা, যো তুমভি কাম করতা থা ওহি খাদানমে...

বলতেই, সফর আলি যেন মিইয়ে গেল।

বলল, ছোড়ো পিপ্পাল সব পুরানা বাঁতে।

আমি আর গোপাল চমকে উঠলাম 'পিপ্পাল' শুনে। এই কি তবে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে?

লোকটি বলল, ম্যায় থোড়ি ভুলনে শকতা মিঞা। সব-কুছহি মেরি ইয়াদ রহতা হ্যায়। ভুলনা ইতনা অ্যাহসান তো নেহি না হ্যায়!

সফর আলি যেন খুবই ভয় পেয়ে গেল।

বলল, চালিয়ে চালিয়ে খোকাবাবুলোঁগ।

হুঁওড়াপুওানলোঁগ হিঁয়া কওনসি শিকারকি লিয়ে আয়া হুয়া হ্যায়? পাণ্ডুক কি শিকার?

এই কথাতে দোকানসুদ্ধ লোক চাপা হাসি হেসে উঠল।

গোপাল আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, সব গাঁওয়ার। কোনও ভদ্রতা জানে না।

পাণ্ডুক মানে কী?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

পাণ্ডুক মানে, ঘুঘুপাখি।

গোপাল দোকানসুদ্ধ লোককে হাসতে দেখে গলাতে সামান্য তেতো মিশিয়ে লোকটাকে বলল, চিবিয়ে চিবিয়ে, আউর করে ক্যা? হিঁয়া পাণ্ডুক ছোড়কর কুছ হ্যায়ই নেহি। না জংগলমে, না বস্তিমে।

অ্যায়সি বাত?

সেই লোকটা মানে, পিপ্পাল, বলল। মনে হল, জায়গা মতোই বিঁধিয়েছে গোপাল।

জি হাঁ। অ্যায়সি হি বাত।

গোপাল বলল, তার ইয়ার্কির জবাবে গম্ভীর হয়ে।

আপলোগোঁনে কওনসা হাতিয়ার সে খেলিয়ে গা শিকার?

আবারও প্রশ্ন করল, লোকটা।

আমারও ততক্ষণে রাগ হয়ে গেছে। আমি বললাম, স্রিফ হাঁতোসে।

লোকটা বলল, হাঁতোমে বহতই তাগৎ হোগা আপলোগোঁকি।

জি হাঁ। সিরিফ হাঁতোমেহি নেহি। প্যায়েরোমেভি কাফি তাগৎ হ্যায়।

গোপাল বলল।

বহতই খুশি কি বাঁতে, বহতই খুশি কি সন্দেশ হ্যায় ঈ। হিন্দুস্তাঁ কি ঘর-ঘরমে এইসি নওজোয়ানোকি জরুরৎ পড়ি হ্যায় আজ।

তারপরই সাইকেলটা টেনে নিয়ে, লাল-কালো চেক-চেক মাফলারটা গলাতে ভাল করে জড়িয়ে, সফর আলিকে হাত তুলে বলল, খুদাহ হাফিজ। ইনশাল্লা; ফিন মিলেঙ্গে। মিলনাতো হোগাই ইকদফে। কমসে কম।

তারপর, আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, নমস্তে খোকাবাবুলোঁগ। জি খোলকর পাণ্ডুক মারিয়ে। ক্যা জঙ্গলমে, ক্যা বস্তিমে। হিঁয়াতো স্রিফ পাণ্ডুক হি পাণ্ডুক ঔর ক্যা?

গোপাল বলল, শুনাতো থা যো বাঘোয়াভি হ্যায়। মগর মিলা স্রিফ পাণ্ডুক ঔর খরহা।

আচ্ছা?

বলেই, লোকটা সাইকেলে উঠে চলে গেল।

লোকটা চলে যেতেই সফর আলি বানোয়ারির দোকানের সামনের বেঞ্চে থপ করে বসে পড়ে বানোয়ারিকে বলল, ইক প্যাকেট কেঞ্চি সিগারেট লানা ভাই।

চলে-যাওয়া লোকটার জ্বলজ্বলে চোখ দুটো তখনও যেন চিতাবাঘের চোখেরই মতো আমাদের দিকে চেয়েছিল।

কেঞ্চি সিগারেটটা আবার কী জিনিস?

ভটকাই বলল।

সে তোরা দেখিসনি। আমাদের ছেলেবেলাতে ওই সব সিগারেটই পাওয়া যেত। Scissors বা কাঁচি, পাসিংশো। ভাল সিগারেট বলতে গোল্ডফ্লেক, ফাইভ-ফাইভ-ফাইভ।

তারপর বলো।

ভটকাই বলল। থামলে কেন ঋজুদা?

হ্যাঁ। ঋজুদা বলল, দোকানি বানোয়ারি সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, গিরিডিমে ক্যা হিসাব-কিতাব থা পিপ্পালসে তুমহারা মিঞা? লাগতা হ্যায় কি, পিপ্পাল কী কুছ হিসাব পড়ি হ্যায়। উধার-শুধার লিয়া থা ক্যা রুপাইয়া?

উধার মানে কী? উধার-শুধার?

তিতির বলল।

উধার মানে, ধার। উধার-শুধার মানে ধার-টার।

সফর আলি বলল, পিপ্পাল আভভিইনা বহত রহিস আদমি বনা। উসটাইম মে উসকো ম্যায় বহতই পিটতা থা অভ্র খাদানমে।

উসকো পিটতা থা? কাহে লা?

সমবেত পরচর্চাকারীরা অবাক হয়ে সমস্বরে শুধোলেন।

বদমাস থা ইক নাম্বারকি। ঔর হামারা মালিক বোলতা থা উসকো পিটনে কি লিয়ে। হামারা মালিক ভি আচ্ছা আদমি নেহি থা। উসকা দুসরা হিসাব কিতাব ভি থা।

পানের দোকানি বানোয়ারি উৎকর্ণ হয়ে জিজ্ঞেস করল।

উস বাদই তো পিপ্পালকি পিতাজি গিরিডি ছোড়কর ঝুমরি তিলাইয়া চলে গ্যয়ে। উসকি বাদ হাজারিবাগ জিল্লামে আয়া হোগা। মুঝে পতা নেহি থা।

শুধু বানোয়ারিই নয়। অন্য অনেকেই বলল, জারা সামহালকে রহনা চাহিয়ে মিঞা। নেহিতো তুমকো সীমারিয়া ছোড়কর চলা যানা চাহিয়ে জলদি। বাঘড়া মোড় সে লেকর সীমারিয়া, টুটিলাওয়া বনাদগ হোকর ইকদম হাজারিবাগ তক পিপ্পালকি রাজ হ্যায়।

আমি বললাম, কিঁউ? ক্যা হোগা?

বহত কুছ হোনে শকতা খোকাবাবু। পিপ্পাল করনে নেহি শকতা এইস্যা কোঈ কামই নেহি হ্যায়। সামহালকে রহিয়েগা। আপ দোনোঁকোভি উ গুম কর দেনে শকতা হ্যায়। বহতই কামিনা আদমি হ্যায়।

গোপাল বলল, কাহে? হামলোগোঁসে উসকি ক্যা মতলব?

গুম কর দেকে বহতই মোটা রুপাইয়া মাঙ্গেগা আপলোগোঁকি পিতাজিসে। ঔর ক্যা?

আমি বললাম, রুপাইয়া নেহি মিলনেসে?

নেহি মিলনেসে আপলোগোঁকি লাশ লেনেকে লিয়ে আনে পড়েগা উনলোগোঁকি কলকাত্তাসে।

আমি বললাম, যেন খুবই ভয় পেয়েছি এমনই ভাব দেখিয়ে, আরে! ইতো বড়ি খাতরা বন গ্যয়া।

জী খোকাবাবুলোঁগ। আভ্ভি খাতরা বনা নেহি, মগর বননে শকতা।

আমি আরও ভয় পেয়েছি ভাব করে বললাম, কাল হি সুব্বে ভাগেগা হামলোগ হিঁয়াসে।

ঐসাহি করনা। নেহিতো কমসে কম ঈ মিঞাকো চাতরাওয়ালা সুব্বেকি বাসমে বৈঠা দিজিয়ে।

সফর আলি বলল।

গোপাল বলল, দেঁখে, ক্যা করে! শোচেগা।

তারপর আমরা তিনজন হেঁটে ডাকবাংলোর দিকে এগোলাম।

তারপর?

ভটকাই বলল।

একটু থেমে, পাইপে কটি টান দিয়ে ঋজুদা আবার শুরু করল।

সপ্তমী কী অষ্টমী হবে। শুক্লপক্ষর রাত। চাঁদটা উঠেছে। এপ্রিলের প্রথম। কিন্তু তখনও সন্ধের পরে বেশ ঠাণ্ডা। রাতে একটা কম্বল লাগে। পথের লাল ধুলোয় আর পথপাশের গাছগাছালির গায়ের থেকে একটা মিশ্র গন্ধ উঠছে। দুটো পেঁচা ঝগড়া করতে করতে আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়তে উড়তে, যেন আমাদেরই পাইলটিং করে নিয়ে চলতে লাগল। দূরের বস্তি থেকে একসঙ্গে তিনচারটে কুকুর ডেকে উঠল। আমরা ওঠার পর পরই বানোয়ারির দোকানের বাইরের বাঁশ থেকে ঝোলানো হ্যাজাকটা নিভে গেল।

দোকানের ঝাঁপও বন্ধ হল। সাইকেলে বা পায়ে হেঁটে পরচর্চা-করনেওয়ালারা একে একে যার যার বাড়ির দিকে চলে গেল।

রাত সাড়ে আটটাতে জঙ্গলের মধ্যের ছোট্ট জায়গাতে অনেকই রাত। বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ডালটনগঞ্জ, রাঁচি আর হাজারিবাগ থেকে দিনে তখন সবসুদ্ধু গোটা দশেক বাস যেত-আসত। ট্রাক তখন ছিলই না বলতে গেলে। মোষের বা গোরুর গাড়িতেই বেশি মাল যেত-আসত। ওই সময়ে সীমারিয়া বা টুটিলাওয়াতে সাইকেল রিকশা ছিল না কোনও। চড়বে কে? অত বড়লোক কজন সেখানে?

সফর আলি বলল, আপলোঁগ ইতনা দের নেহি করনেসে তো হামকো পান দুকানমে যানা নেহি পড়তা থা। ঘড়িভিতো আপলোগোঁকি হাতোমে বান্ধা হুয়া হ্যায়, মগর ওয়াক্ত কিতনা হুয়া উও দিখনেমে হুরজা ক্যা থ্যা?

আমি বললাম, গলতি হো গ্যয়ে।

ওয়াক্ত মানে কি ঋজুকাকা?

তিতির বলল।

ওয়াক্ত উর্দু শব্দ। ওয়াক্ত মানে সময়, টাইম।

গোপাল বলল, খ্যয়ের, যো হুয়া সো আচ্ছাই হুয়া।

কাহে?

কাঁচি সিগারেটে এক জব্বর টান লাগিয়ে সফর আলি বলল।

আরে দেরি না করলে চাচা তুমিও আসতে না আর আমাদেরও ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের সঙ্গে মোলাকাত হত না। আমার ছেলেবেলা থেকেই অনেক ডাকাতের গল্প শুনেছি কিন্তু চোখে কখনও দেখিনি ডাকাত। এই প্রথম।

চেহারা দিয়ে কী বোঝা যায়। অনেক মানুষ আছে, ডাকাতের মতো দেখতে কিন্তু অতি সজ্জন। আবার অনেক ডাকাত আছে পির-এর মতো দেখতে। মানুষের বাইরের চেহারাটা কিছুই নয়, ভিতরের চেহারাটাই আসল। তবে ওকে আমি দোষ দিইনা কোনও, বরং ওকে সমর্থনই করি। ও আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ অত্যাচারিত গরিব মানুষের আশা। ওকে এ অঞ্চলের মানুষে পুজো করে। এত

অন্যায় অত্যাচার সয়েছে মানুষ, জমিদার, ক্ষমতাবান, পয়সাওয়ালাদের হাতে, পোলিটিকাল পার্টির ক্যাডারদের হাতে, মুখ বুজে, যুগের পর যুগ, যে, পিপ্পাল-এর মধ্যে তারা সকলেই তাদের অপমান অসম্মানের প্রতিশোধের ভাষা খুঁজে পায়।

তুমি তো মুসলমান সফর চাচা। আর পিপ্পাল তো হিন্দু ব্রাহ্মণ।

তাতে কী? ওসব জাত-পাত সবই ফালতু। পৃথিবীতে জাত মাত্র চারটে।

মাত্র চারটে?

মানে?

আমি, তিতির আর ভটকাই একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম ঋজুদাকে।

ঋজুদা হেসে বলল, আমি আর গোপালও ঠিক এমনি করেই তোদেরই মতো একই সঙ্গে সফর আলিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

তো কী বলল? সফর আলি?

ভটকাই বলল।

ভটকাই, বেশ অনেকক্ষণ একটানা শোনা হয়েছে গল্প আবার তুই শুরু করলি। চুপ কর।

আমি বললাম।

ভটকাই নিজেই ডানহাতের তর্জনি নিজের ঠোঁটে ছুঁইয়ে রেখে চুপ করে গেল।

সফর আলি বলল, চারটে জাত। একটা হল ক্ষমতাবান অত্যাচারী, সেই ক্ষমতা অর্থ থেকে, পদ থেকে, বা রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকেও আসতে পারে। আর দ্বিতীয় হল অত্যাচারিত।

আর?

গোপাল বলল।

আর খারাপ এবং ভাল।

তারপর বলল এই চারটি জাত ছাড়া পৃথিবীতে কোনও জাত-পাতই নেই। আর সবই বানানো। গা-জোয়ারি জাত।

একটু চুপ করে থেকে ঋজুদা বলল। আজও মনে পড়ে, সীমারিয়ার সেই রাতটির কথা। শুক্লা-সপ্তমীর নির্মেঘ চাঁদভাসি নীলকাশে অগণন স্নিগ্ধ তারারা ফুটে আছে। একটা মস্ত শিরিষ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদটা দেখা যাচ্ছে, আধখানা ডিমের কুসুমের মতো। শেষ চৈত্রের হালকা হিমেল রাত। আমের বোল-এর আর মহুয়ার গন্ধ ছমছম করছে নিবাত পরিবেশে।

এই রে! নিবাত শব্দটা কি হিন্দি ঋজুকাকা?

তিতির বলল, মুশকিলে পড়ে।

ঋজুদা হেসে বলল, এই সব সাহেব-মেমসাহেবদের নিয়ে পারি না।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, এই যে লেখকমশাই মিস্টার রুদ্র রায়, আপনি একটু সাহায্য করুন না আমাকে।

আমি বললাম, বাত মানে যে শুধুমাত্রই গেঁটে বাতই তা ভেবো না। বাত মানে

কথা, সংবাদও...

'বাতিয়া বানাও নেহি বার বার মুসে'

ভটকাই গেয়ে উঠল হঠাৎ।

ঋজুদা বলল, বাঃ! তুই দেখি রুদ্রকে সব ব্যাপারেই হারাতে চাস।

ভটকাই গম্ভীর গলাতে বলল, তুমিই না সবসময়ে বলো যে, জীবনে যাই করবি তাতেই এক নম্বর হওয়ার সাধনা করবি।

তা বলে, তুই সেমসাইডে গোল করবি?

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।

হ্যাঁ। বাত মানে কথা, বাত মানে গেঁটে বাত, বাত মানে হাওয়াও।

হাওয়া?

তিতির অবাক হয়ে বলল।

ইয়েস। নির্বাত সংস্কৃত শব্দ। তা থেকে নিবাত। কেন তোরা কি পড়িসনি কোথাও? বঙ্কিমচন্দ্রও পড়িসনি? বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিককে? 'নিবাত, নিষ্কম্প' অনেক জায়গাতে ব্যবহার করেছেন উনি।

এবারে বলো ঋজুদা। ডাকাত ছেড়ে ব্যাকরণে ঢুকে পড়ছ তুমি। ব্যাকরণকে আমরা ডাকাতের চেয়েও বেশি ভয় পাই।

হ্যাঁ।

তারপর গোপাল বলল, ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে যে সাইকেলে চড়ে বানোয়ারির দোকানে এসে জরদা পান খেয়ে আড্ডা মেরে গেল। কেউ কোতোয়ালিতে এই খবর দেবে না? পুলিশের চর নেই এখানে?

আছে। নিশ্চয়ই আছে। তারা পুলিশের কাছ থেকে পয়সাও নেয় আবার পুলিশকে ভুল খবরও দেয়। কারণ, মনে মনে ওরা সকলেই পিপ্পাল পাঁড়ের দলে।

এটা কি উচিত? মানে পয়সা নিয়ে কাজ না করা?

গোপাল বলল, এটা কি অসততা নয়?

সততা, ইমানদারি, এসব কথা তো ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে অভিধান থেকে বড়খোঁকা।

সফর চাচা আমি লম্বা চওড়া বলে আমাকে বড়খোঁকা আর গোপালকে ছোটখোঁকা বলছে। গোপাল যদিও বয়সে আমার চেয়ে এক বছরের বড়ই। এতে চটছেও গোপাল। কিন্তু আমি কী করব!

সফর আলি তারপরে বলল, সততা, ইমানদারি আর বোকামির মতলব এখন একই হয়ে গেছে।

আমরা আর কথা না বলে সীমারিয়ার ডাকবাংলোর দিকে এগিয়ে চললাম।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল বাংলোর ফটকের বড় শিমুল গাছটাকে। শিমুলের ফুল পড়ে পড়ে লাল গালচের মতো দেখাচ্ছে জায়গাটা আর আমেরিকান আর্মির ডিসপোজাল থেকে কেনা জিপের বনেটটার উপরে চাঁদের আলো পড়ে চকচক

করছে।

লটকা। হো লটকা।

সফর আলি চেঁচিয়ে ডাকল।

রামখিলাওন বাবুর্চিখানা থেকে উত্তর দিল, বহত জাদা ভাঙ পি লিয়া আজ লটকা বাবু। আপলোঁগ নহি রহেনেসেই এইসা হি করতা হ্যায় উনোনে।

ভাবলাম, ভাল লোকাল গার্জেনদের খপ্পরেই পড়লাম দেখছি। এক মিঞা ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের 'জানি দুশমন' আর অন্য জন মহাদেবের 'জানি চেলা'।

সফর আলি বলল, আপনারা খেতে বসে পড়ুন খোকাবাবুরা। আমি উজু করে, এশার নামাজটা পড়েই আসছি।

গোপাল বলল, লটকা বোধহয় আজকে আর খাবে না। সে এতক্ষণ ভাঙ-এর কল্যাণে রম্ভা-মেনকার নাচ দেখছে স্বপ্নে, মন্দাকিনী নদীর তীরে।

॥ ৬ ॥

ভোর তখনও হয়নি। তবে পুবের আকাশ সাদা হয়েছে সবে। এখনও রাতে একটু একটু শিশির পড়ে এই জঙ্গুলে জায়গাতে। আমি আর গোপাল তৈরি হয়ে বারান্দাতে এসে দাঁড়ালাম। জিপটার বনেটের ওপরে শিশির পড়ে রয়েছে। সিটের কোনাগুলোও ভিজে রয়েছে।

আমি বললাম, গোপাল তুমি দেখো, ওরা তৈরি হল নাকি। আমি ততক্ষণে জিপটা স্টার্ট করি।

একটু পরেই লটকা আর সফর চাচা তৈরি হয়ে বাইরে এল। সফর চাচার মাল বলতে লাল-সবুজ লুঙি-মোড়া কাপড়-চোপড় আর একটি পেতলের বদনা।

বদনা মানে কী?

তিতির আবারও বলল।

বদনা বা গাড়ু আমাদের ঘটিরই মতো। কিন্তু মুখটা ঘটির চেয়ে ছোট এবং সরু শুঁড় থাকে, যার মধ্যে দিয়ে জল বেরোয়। মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে অনেকই বুদ্ধিমান। কারণ, বদনা, ঘটির চেয়ে অনেক বেশি ভাবনা চিন্তা করে বানানো হয়েছে।

বলেই বলল, তোরা 'গল্‌তাকিয়া' কাকে বলে জানিস?

'গল্‌তাকিয়া'?

আমরা সমস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করলাম।

হ্যাঁ। 'গল্‌তাকিয়া'। আবদুল হালিম শরর সাহেবের 'পুরাতন লক্ষ্মৌ' বলে একটি বই আছে। তার বাংলা অনুবাদও পাওয়া যায়। বইটা পড়বি। পড়লেই জানতে পারবি।

তারপর বলল, আমরা যখন বালিশের উপরে পাশ ফিরে শুই তখন আমাদের

গালের নীচেটা ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে না কেমন?

ঠেকেই তো।

ভটকাই বলল।

লক্ষ্মৌ-এর নবাবেরা ছোট্ট-ছোট্ট খুব পাতলা গোল-গোল বালিশ ব্যবহার করতেন গালের নিচে দিয়ে শোবার জন্যে। বালিশের বা তাকিয়ার উপরে এই ছোট ছোট 'গল্‌তাকিয়া' ব্যবহার করতেন, সিল্কের ওয়াড় পরানো, আতর মাখানো।

জীবনে কী করে বাঁচতে হয়, তা ওরা জানে।

তিতির বলল।

কী করে মরতে হয়, তাও জানে। ভোগের চরম করতেও যেমন ওদের ফালতু লজ্জা নেই, ত্যাগের চরম করতেও মুসলমানেরা দু'বার ভাবে না। ওরা জিতলে যেমন উল্লসিত হয়, হারলেও তেমন বিমর্ষ হয় না! আমার তো অন্তত তাই মনে হয়।

ঋজুদা বলল।

ভটকাই জোরে জোরে তিনবার বলল। গল্‌তাকিয়া! গল্‌তাকিয়া! গল্‌তাকিয়া!

মুখস্থ করে রাখ। আমি কাল সকালেই আমাদের পাড়ার পদ্মা বেডিং স্টোর্স-একটা গল্‌তাকিয়ার অর্ডার দেব।

দিলে, একটা কেন দিবি? দু'গালের জন্য দুটো দিবি। আমি বললাম।

ঠিক বলেছিস।

হ্যাঁ। এবার বলো, ঋজুকাকা। তা সফর আলি তার জামাকাপড় নিল কেন সঙ্গে?

রাতেই আমরা ঠিক করেছিলাম যে সফর আলির মনে যখন মৃত্যুভয়ই জেগেছে তখন আমরা নিজেরাই ওকে চাতরা পৌঁছে দিয়ে আসব।

মৃত্যুভয়? মৃত্যুভয়ের কথা বলেছিল নাকি?

তিতির বলল।

হ্যাঁ। রাতে পানের দোকান থেকে আসতে আসতে বলছিল, পিপ্পালের, আমার উপর অনেকই রাগ আছে। নানা কারণে। সে সব কথা আমি আপনাদের বলতে পারব না। অথচ যা কিছুই আমি করেছিলাম তা আমার মালিকেরই নির্দেশে। চাকরদের যে কী জ্বালা, তা চাকরেরাই জানে।

তখন আমরা বললাম যে, এ কথা জানার পর তো চাচা আপনাকে একা ছাড়া যাবে না। লটকাও চলুক আমাদের সঙ্গে। আমরা ফেরার সময়ে ওল্ড চাতরা রোড দিয়ে ফিরে এসে টুটিলাওয়ার কাছে উঠে তারপর সীমারিয়াতে আসব। পথে কিছু শিকার যদি মিলে যায়। জঙ্গল তো সে পথে গভীর খুবই।

পথে সফর আলি বলল, আপনারা ছেলেমানুষ, ওই পথে আপনাদের আমি একা ছাড়ব না। তাহলে চলুন! সকলে মিলেই যাব। ভোরেভোরে বেরিয়ে ওই পথ

দিয়েই চাতরা পৌঁছব। জিপ রয়েছে সঙ্গে, কার তো নয়, পথ অব্যবহৃত হলেও পৌঁছে যাবে। ভয় একটাই। ওই পথেরই ডানদিকে বাঁদিকে কোথাও পিপ্পাল পাঁড়ের আস্তানা আছে। আস্তানা গেড়ে যখন আছে তখন দেখবেন আজকালের মধ্যেই কাছাকাছি কোনও বড় শেঠ-এর বাড়িতে বা গদিতে ডেক্যাইতি হবে।

আমরা যেন পিপ্পাল পাঁড়ের সঙ্গে দেখা হোক, তা মোটেই চাই না এমন ভাব দেখিয়ে চিন্তিত হবার ভান করে বললাম, তাহলে তো চিন্তার কথা হল। তার সঙ্গে যদি মোলাকাত হয়ে যায়?

গোপাল বলল, সে হতে পারে কিন্তু অব্যবহৃত বলেই তো ওল্ড চাতরা রোডে শিকারও পাওয়া যায় খুব। ইজাহার বলছিল না সেবারে। কাল একেবারে ভোরেভোরে বেরোব আমরা। আজকে একটু শিকারই খেলা যাক।

লটকা তখন বলল, আমি তো বসে বসে খেয়ে খেয়ে আরও মোটা হচ্ছি। শিকার খেলতে এসে শিকার খেলাই দেখলাম না। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। রামখিলাওন একা থাকুক, রান্নাবান্না করে রাখবে। আজকে সীমারিয়ার হাট আছে। কচি পাঁঠা কাটবে। পাঁঠার মাংস, ভাল করে ঘি গরমমশলা ফেলে আর ডুমো ডুমো করে আলু ফেলে দিয়ে রান্না করবে আর ঘি-ভাত। সঙ্গে মুচমুচে-করকে আলুভাজা। মেটের বহতই ঝাল চচ্চরি। তারপর রাবড়ি আর প্যারা তো আছেই।

গোপাল বলল, সফর চাচা হয়তো ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের হাতে মরলেও মরতে পারে কিন্তু তুমি লটকা দাদা, মরবে খেয়েই।

লটকা দু' হাত দু'দিকে তুলে বলল, লেহ্ লট্কা। তারপর বলল, জিতা রহো গোপালবাবু। ঐসা মওতহিতো মুঝে চাহিয়ে। ইস দেশমে সব্বেতো ভুখাহি মরতা হ্যায়। ম্যায়নে জি-খোলকর খা কর মরেগা, এক ঝট্কামে লেহ্ লট্কা।

লটকার ওজন প্রায়, দু' মণ হবে। যখন হাঁটে, দুটি উরু দুটি উরুর সঙ্গে লেগে যায়। যখন কথা বলে, তার লাল মোটা জিভটা মুখের ভিতর থেকে কোটরের মধ্যের সাপের মাথার মতো মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসে।

রওয়ানা তো হওয়া গেল দুর্গা দুর্গা করে।

লট্কা দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, জয় মাতাজি কি জয়।

তার ইতিমধ্যেই ধুঁয়ো-ওঠা ঠাণ্ডা জলে চান হয়ে গেছে। পুজোও হয়ে গেছে। কপালে মেটে-সিঁদুরের ফোঁটা। কিছুটা চুইয়ে নাকের ওপরে পড়েছে। বাঁ কানে একটি জবাফুল গোঁজা। কোত্থেকে যত্র তত্র জবাফুল পায়, কে জানে! কিন্তু পেয়ে যায়।

গোপাল এই প্রশ্ন করাতে জবাবে কাল বলেছিল, মাতাজি কি দয়া রহনেসে বাঘোয়াকা দুধভি মিলতা হ্যায় ঔর ইয়ে ফুল কওনসি বড়ি বাত হ্যায়।

সফর আলি চান সারেনি কিন্তু ফজিরের নামাজ সেরে নিয়েছে।

লটকার হাতে একটা বাঁশের কঞ্চি। ওর যা চেহারা, তাতে আস্ত বাঁশ নিলেও মানিয়ে যেত। কঞ্চিটাকে ওর হাতে দেখে, গোপাল বলল, লরেল অ্যান্ড হার্ডি।

টুটিলাওয়ার কাছে ওল্ড চাতরার পথের মোড়ে আমরা যখন পৌঁছলাম তখন রোদ সবে উঠেছে। শিশির ভেজা পাতায় পাতায় ঝিলমিল করছে রোদ আর সেই হাওয়াটা ছেড়েছে, মহুয়া, করৌঞ্জ আমের মুকুল আর শালফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ যে হাওয়া নিয়ে গান বেঁধেছিলেন: 'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া'।

আমি জিপ চালাচ্ছিলাম। আমার বন্দুকের শুধু গুলি ভরিনি। বন্দুকটা পাশেই শোয়ানো ছিল। গোপাল আর সফর আলি গুলি পুরে নিয়েছিল তাদের বন্দুকে। আমার বুশশার্ট-এর উপরে ক্রস-বেল্টে গুলি গোঁজা ছিল। প্রয়োজনে বন্দুকটা তুলে নিয়ে গুলি ভরতে পনেরো সেকেন্ড লাগবে।

গতবার আমি আর গোপাল যে জায়গাটাতে সেই কাঠুরেদের দেখেছিলাম, সে জায়গাটা পেরিয়ে এলাম। আমি ইংরেজিতে বললাম গোপালকে, কান উ্য প্লেস দিস স্পট?

সার্টেনলি আই ড্যু।

গোপাল বলল।

লট্কা বলল, হামলোঁগোকা আংরেজি আতা নেহি। আংরেজি বাত-চিত মত কিজিয়ে গা। সমঝমে নেহি আতা। গালি দে রহা ক্যা আপলোঁগ হামলোঁগোকি?

আমি হেসে বললাম, নেহি নেহিজি। খ্যয়ের ঠিক্কে হ্যায়। ঔর ইংরেজি বোলি নেহি বোলেগা হামলোঁগ।

হ্যাঁ। ঐসাহি কিজিয়েগা।

বাঁদিকের জঙ্গল থেকে একদল ময়ূর বেরিয়ে জিপের সামনে দিয়ে পথ পেরোল ধীরেসুস্থে। সফর আলি বন্দুক উঠিয়ে ছিল। গোপাল বন্দুকের নল হাত দিয়ে সরিয়ে দিল।

কাহে লা?

সফর আলি বলল।

আরে ইস জঙ্গলমে ডাকু রহনেসে খাতরা না বন যায়েগা। ঔর খাতরাতো আপহিকি না হ্যায়। আভ্ভি হিঁয়া গোলিকা আওয়াজ নেহি না করনা চাহিয়ে।

সফর আলি বাঁ হাতটা দাড়িতে বুলিয়ে বলল, সাহি বাত।

আরও মিনিট পনেরো যাবার পরে পথ একেবারে সরু হয়ে এল। দু'পাশ থেকে জঙ্গল পথটাকে গলা টিপে মারার মতলব করেছে। পথের মধ্যে মধ্যে পুটুস-এর ঝাড় জন্মে গেছে। পথ, জায়গায় জায়গায় ভেঙে গিয়ে খোয়াই-এর মতো হয়ে গেছে। এই জঙ্গল হরজাই জঙ্গল। ফলে, সেগুন কম। পন্নন, পাঁইসার, গামহার, শিরিষ, জংলি আম, তেঁতুল, সালাই হলুদ, পলাশ এবং আরও নানারকম নাম না জানা জ্বালানি কাঠ-এর গাছ আছে। মনে হল, জিপ নিয়ে বুঝি এই বৈতরণী আর পেরুনো যাবে না।

জিপটা দাঁড় করিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে গোপালকে ফিসফিস করে বললাম, আমি স্টিয়ারিং-এ বসে আছি। তুমি আর সফর আলি পায়ে হেঁটে একটু এগিয়ে গিয়ে

দেখো, জিপ নিয়ে আর এগুনো যাবে কি না?

লটকা আমাকে বলল, এ বাবু, হাম না উতরায়েব।

সফর আলি চাপা স্বরে বলল, কাহে লা?

ইতনা সরু রাস্তেমে হামারা তোঁদ ফাঁস যায়েগা।

আস্তে হলেও, আমরা হেসে উঠলাম।

এই বাক্যটির মানে কী হল ঋজুদা? তোঁদ মানে কী?

তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, লটকা ছিল রসিক চূড়ামণি। সে বলল, আমি ওই সরু পথ দিয়ে হেঁটে যেতে গেলে আমার ভুঁড়ি জঙ্গলে আটকে যাবে। তাই, আমি জিপেই আছি।

আমি তর্জনী ঠোঁটে ছুঁইয়ে কথা বলতে বারণ করে সিটে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলাম। সেখানে জঙ্গল এমনই গভীর যে, শেষ চৈত্র আর প্রথম বৈশাখের পর্ণমোচী বনের মধ্যেও আলো যেন ঠিকমতো পৌঁছচ্ছে না।

গোপালরা গেল তো গেলই। ফেরার নাম নেই। সামনে কিছুটা দেখে এসে তো বলবে যে, এগোব কী না! প্রায় দশ মিনিট যখন হয়ে গেল তখন আমার চিন্তা হতে লাগল। ভাবলাম, আমিও গিয়ে দেখি, কী ব্যাপার হল। যেই জিপ থেকে ডান পাটা বের করেছি অমনি লটকা পেছন থেকে তার শালপ্রাংশু কালো বাহু দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, মুঝে একেলা ছোড়কর মত যানা বাবু। ডরকে মারে ম্যায় রো পড়ে গা।

মানে কী হল?

ভটকাই বলল।

আরে একটুও বুঝতে পারলি না? যেওনা বাবু। তুমি আমাকে একা রেখে গেলে, আমি ভয়ের চোটে কেঁদে ফেলব।

তিতির বলল।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

তারপর?

তারপর আর কী? আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না। লটকার যা চেহারা, যেমন লম্বা, তেমন চওড়া, তার উপর দু' মণ ওজন। বড় বাঘের সঙ্গে নির্জন পথে তার দেখা হলে বাঘই ভয়ে হার্ট ফেইল করে মারা যাবে আর সে বলে কিনা ভয়ে কেঁদে ফেলবে।

তারপর?

ইতিমধ্যে গোপাল আর সফর আলি হন্তদন্ত হয়ে ফিরে আসছে দেখা গেল। পথের সামনেই বাঁদিকে একটি বাঁক তাই ওদের আগে দেখতে পাইনি। ওরাও এসে পৌঁছল আর পথের ওপাশ থেকে মানুষের গলার শব্দ পাওয়া গেল। বোঝা গেল যে, একটি বয়েল গাড়ি অর্থাৎ ষাঁড়ে-টানা গাড়ির ষাঁড়দের গাড়োয়ান তার নিজস্ব ভাষাতে তাদের লেজ মুলতে মুলতে কিছু বলছে। গাড়িটা ঘোরাচ্ছে পথের

উপরে। এমন সময়ে চিহাঁ—হ-হ-হ করে একটা ঘোড়ার হ্রেষা রব শোনা গেল। কে যেন উঁচু থেকে বলল, আররে, এ ফাণ্ডরা! ঘোড়ে চিল্লাতা কাহে লা? তুমহিকো দিখকর?

জি হাঁ।

গাড়োয়ান বলল।

তারপরই প্যাঁ-ক-এক, প্যাঁ-এ-এ-ক আওয়াজ করে কতগুলো রাজহাঁস একসঙ্গে ডেকে উঠল।

লটকা তার ডান হাতের পাতা গোল করে বলল, বড়কা বড়কা আণ্ডা হোগা। ওমলেট বড়িয়া বনে গা বাবু। ঔর বড়া বওককি রোস্টোয়া।

অর্থাৎ বড় বড় ডিম দিয়ে ওমলেট খুব ভাল হবে আর বড় হাঁসের রোস্ট যা হবে, তার জবাব নেই।

আমি ভাবছিলাম, জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া এল কোথা থেকে?

গোপাল এসে বলল, পিপ্পাল পাঁড়ের আস্তানাতে এসে পৌঁছে গেছি আমরা। পাঁচ ছটা ঘোড়া বাঁধা আছে নীচে। দূরে পাতায়-ছাওয়া তিন চারটে অস্থায়ী ঘর। রান্না বসেছে। উনুন থেকে ধুঁয়ো উড়ছে। একটা মস্ত মহুয়া গাছের মাঝামাঝি ডালে বেশ বড় একটা মাচার উপরে দু'জন লোক বসে আছে। একজন ডানদিকে, মানে পুবে মুখ করে, অন্যজন পশ্চিমে মুখ করে। দু'জনের মধ্যে একজন গাছের ডালে হেলান দিয়ে হুঁকো খাচ্ছে।

ওই বয়েল-গাড়িটা?

সফর আলি বলল, সম্ভবত সীমারিয়া থেকে কাল বিকেলের দিকে ওদের রসদ নিয়ে এসেছিল। আজ ভোর হতেই ফিরে যাচ্ছে। বাঘের ভয়ে, রাতের বেলা যায়নি।

তার মানে ওখান থেকে জঙ্গলে জঙ্গলে সীমারিয়াতে যাবার কোনও পথ আছে। যে পথ দিয়ে বয়েল-গাড়ি আরামে যেতে পারে। পথের এই দিকটাই একেবারে অব্যবহার্য হয়ে গেছে তাই পিপ্পাল ডেরা করেছে এখানে।

কথাবার্তা আমরা খুব আস্তে আস্তেই বলছিলাম।

সফর আলি আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বলল, ক্যা কিজিয়েগা?

জঙ্গলেই যাব। কেন আমাদের কাল 'পাণ্ডুক' শিকারি বলে খুব ঠাট্টা করেছে বারবার, খোকাবাবু! খোকাবাবু! বলেছে। ওর সঙ্গে টক্কর দিয়ে তবেই যাব। হাতে বন্দুক থাকলে যমকেও ভয় করার কিছু নেই।

গোপাল বলল, তাহলে রাত নামার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। দিনের আলোতে তো এগোনোই যাবে না। ওই মাচানের লোক দুটোর কাছে বন্দুক আছে। ওরা স্কাউট। আমাদের দেখতে পেলেই দূর থেকে কড়াক-পিউ করে দেবে। জিপও স্টার্ট করে এই পথে ব্যাক গিয়ারে ফেলে ঘুরোতে, তারপর ফার্স্ট গিয়ারে গেলে প্রচুর শব্দ হবে। আসার সময় শব্দ হয়তো ওরা পায়নি। হাওয়াটা

ওদিক থেকে এদিকে বইছে।

লটকা বলল, হায় রাম। দিনভর হিঁয়েপর বৈঠ রহনা হোগা? না দানা, না পানি। তবিয়ৎ হামারা সুখ যায়ে গা।

আমি ভাবলাম, ওই শরীর শুকোতে একমাসের উপোস লাগবে।

গোপাল বলল, এক কাজ করা যাক। তুমি স্টিয়ারিং-এ বোসো, আমরা তিনজনে ঠেলছি। গিয়ার নিউট্রাল করে দাও। ঠেলে, পেছনে নিয়ে, আবার ঠেলে সামনে নিয়ে, আরও কিছুটা ঠেলে এগিয়ে গিয়ে চলো স্টার্ট করে সীমারিয়া ফিরে যাই। তারপর বেলা পড়লে আবার আসব। সফর আলির এমন বিপদ। তা ছাড়া, আমাদেরও এমন অপমান-এর একটা ফয়সালা তো করতে হবে।

মনে হল, আমাদের কথা শুনে সফর আলি একটু অবাকই হল। তার জীবনের ভয়ের কারণে আমরা এত বড় ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি দেখে তার অবাক না হয়ে উপায়ও ছিল না। আমাদের 'পাণ্ডুক মারা' শিকারি বলতে যেটুকু অপমান হওয়ার কথা, আমাদের তার চেয়ে অনেক বেশিই হয়েছে বলেই বুঝতে তার অসুবিধে হল একটু। তাকে চিন্তান্বিতও দেখাল।

আমরা যে আসলে শিকারে আসিনি, ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের সঙ্গেই টকরাতে এসেছি, এ কথা তো আর কারওকে বলতে পারছি না। গোপালের বাবা অথবা তাঁর মক্কেল বা অন্য কেউও এ কথা ঘুণাক্ষরে জানলে আমাদের আসতেই দিতেন না।

সফর আলি শুধু একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করে বলল, আপলোগ বাঁচ্চে হ্যায়। কলকাত্তা কি বড়ে খানদান কি আওলাদ হ্যায়, আপলোগ শিকারকি সঁখ বিতানেকি লিয়ে হিঁয়া আয়া, আপলোগোঁনে কাহে হামারি মামলে মে ফাঁসিয়েগা ঝুঠ্ঠো।

মানে, আপনারা ছেলেমানুষ, কলকাতায় বড় ঘরের ছেলে, শিকারের সঁখ মিটাতে এসেছেন, আপনাদের কী দায় পড়েছে আমার জন্যে এই বিপদে মিছিমিছি জড়াতে।

গোপাল বলল, দায় না পড়লেও তো মানুষকে শুধুমাত্র মনুষ্যত্বের কারণেও কিছু কিছু কাজ করতে হয় আলি সাহেব। নইলে আমরা মানুষ কীসের?

এমন ভাবেই গোপাল ডায়ালগটা ঝাড়ল উর্দু-মিশ্রিত হিন্দিতে যে আমার মনে হল যেন হিন্দি সিনেমার হিরোই কথা বলছে।

জিপটা ঠেলে ব্যাক করে তারপরেও ঠেলে বেশ কিছুটা এগিয়ে নিয়ে স্টার্ট করতেই লট্কা বলল, লেহ্ লট্কা আভ্ভি আভ্ভিতো জান বাঁচ গ্যয়া। সামমে হাম ঔর নেহি আওবেগা। ভুখভি লাগলথু জোর।

তারপরই সুর করে দু'লাইন গান গেয়ে দিল হাতে তাল দিয়ে, 'দুদু মুঠি চুড়াহ দিহ, তানি তানি দহি দিহ, ঝাচামাচা! ঝাচামাচা! ঝাচামাচা!'

বুঝলাম যে, 'ঝাচামাচা'-টা করতাল-এর আওয়াজ-এর ধ্বনির অনুকরণ।

সফর আলি বন্দুকটি কাঁধে শুইয়ে খোদার কাছে দোয়া মাঙ্গার মতো করে দুটি

হাত উপরে তুলে, মির সাহেবের শের আবৃত্তি করলেন,

'মুদ্দয়ি লাখ বুরা চাহে তো ক্যা হোতা হ্যায়?
ওবহি হোতা হ্যায় যো মঞ্জুরে খুদা হোতা হ্যায়।'

মানে কী হল?

ভটকাই বলল।

মানে হল, লাখো লাখো শত্রু তোমার খারাপ চাইলে কী হবে, খোদা তোমার জন্যে যা মঞ্জুর করে, মানে, বরাদ্দ করে রেখেছেন, তাই হবে, তাই হবে।

এটা কেন বললেন?

তিতির বলল!

বললেন, কেন না তাঁর ব্যক্তিগত বিপদের সঙ্গে ছেলেমানুষ, কলকাতা থেকে-আসা আমরা যে এমন করে স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়ব এ তো খোদারই দোয়া। এবং আশীর্বাদ। অর্থাৎ, ঈশ্বর তোমার সহায় হলে তোমার কোনও ভয় নেই।

লটকা বলল, এ বাবু, ওয়াক্ত কিতনা হুয়া আভভি?

কাহে?

নেহি, সীমারিয়ামে গিরধরকি দুকান মে সাড়ে সাত বাজিমে বড়ি আচ্ছা হিংকি কচৌরি ঔর চানা কি ডাল বনতা হ্যায়, সাথমে বড়ি মিঠি কালাজামুন! বড়হি ভুখ লাগলথু বাবু!

গোপাল হেসে বলল, চলো, ভুখ সব্বেকি লাগা হ্যায়।

আমি জোরে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে একেবারে 'টিকিয়া-উড়ান' ছোটালাম জিপ। খিদে আমাদের সকলেরই লেগেছিল। খিদের চেয়েও যেটা বেশি পীড়িত করছিল আমাকে, তা রাতের বেলার ক্রিয়া-কৌশল। ভগবান করলে, আমরা আজই পিপ্পাল পাঁড়েকে ধরব। ভাবছিলাম, ধরতে পারলে সুব্রতর বাবা, হাজারিবাগের পুলিশ সাহেব মেসোমশাই আমাদের নিয়ে কী করবেন। আর তা না দেখে, আমাদের জিগরি দোস্ত সুরবোতো বাবু আর গার্জেন-ফিলসফার নাজিম সাহেবই বা কী বলবেন আমাদের!

॥ ৭ ॥

গিরধর-এর দোকানে হিং-এর কচুরি, ছোলার ডাল আর কালাজামুন খেতে গিয়েই জানা গেল যে, কাল মাঝরাতে পিপ্পাল পাঁড়ে এবং তার দলবল শেখ রমজান মিঞার বাড়িতে হামলা করেছিল। রমজান মিঞার ছাগলের ব্যবসা এবং সুদের ব্যবসা ছিল। সে বহু দূর দূর ট্রাকে করে ছাগল পাঠাত। তা ছাড়া অনেক জমি ছিল। কোঠা বাড়ি, জিপ গাড়ি। অনেক গরিবকে খরার সময়ে টাকা ধার দিয়ে প্রচণ্ড চড়া সুদ লাগিয়ে তাদের জমি-জিরেত, গয়নাগাঁটি, গোরু-মোষ সব কবজা করে আসছে সে বহুদিন হল। তার উপরে তার দুটো সেয়ানা ছেলে ইমরান আর

আক্রাম গরিবের উপরে নানারকম অত্যাচারে তার বাবারও উপর দিয়ে যায় নাকি। রমজান মিঞার সর্বস্ব তো লুটে নিয়েইছে পিপ্পাল, লোহার সিন্দুক ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে তার থেকেও সবই নিয়ে গেছে। তার বড় ছেলের ডান কান আর ছোট ছেলের বাঁ কানটা কেটে নিয়ে গেছে।

পিপ্পাল পাঁড়ে কি কানের লতির চচ্চড়ি খায় নাকি?

আমি বললাম।

গোপাল বলল, হতে পারে। আমরা কচুর লতির তরকারি খাই আর ও কানের লতির চচ্চড়ি খেতেই পারে, কালোজিরে, কাঁচালঙ্কা আর হলুদ দিয়ে। তা ছাড়া, তার বিবি ও দুই পুত্রবধূরই সামনে রমজান মিঞার লুঙ্গিটাও খুলে নিয়েছে। তার মধ্যে সোনা-রুপোর সব গয়না বেঁধে নিয়ে গেছে। যতক্ষণ না সব কাজ শেষ হয়েছে, ততক্ষণ রমজান মিঞাকে দু' কান হাতে ধরিয়ে উদোম করে মেয়েদের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। অন্য কোনও শারীরিক ক্ষতি করেনি তার। শুধু যাবার সময়ে, পেছনে এক লাথি আর মাথায় একটা উড়নচাঁটি মেরে চলে গেছে।

আমি আর গোপাল যতই পিপ্পাল পাঁড়ের কথা শুনছি ততই তার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। একটা ওরিজিনাল লোক বটে। এরকম ডাকুর সঙ্গে টক্কর দিয়েই তো আরাম।

তিতির বলল, ঋজুকাকা, তোমরা সেবারে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা দিলে সবে। এখনকার মা-বাবারা তো স্কুল-ফাইন্যাল পাশ ছেলেদের নিয়ে পুতুপুতু করে নিজেরাই গাড়ি বা ট্যাকসিতে করে তাদের ভর্তি করাতে নিয়ে যায়। খোকাবাবুরা কী করবে, কী পরবে, কী খাবে সেই চিন্তাতেই তো তাদের ঘুম চলে যায় চোখের আর তোমরা ওই বয়সেই এমন ডেয়ার-ডেভিল হলে কী করে।

ডেয়ার-ডেভিল যারা, তারা ছেলেবেলা থেকেই হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সাহস বরং কমে আসে।

গোপাল বলত, আমার বাবাও যদি জেঠুমনির মতো হতেন। জেঠুমনি আমার আদর্শ পুরুষ।

কেন অমন বলত গোপালকাকা?

বলত, কারণ জেঠুমনি বলতেন, শুধু পড়াশোনা করে কিছু হবে না। সব কিছু করতে হবে। স্কোয়ার হতে হবে জীবনে। শুধু বাঙালি মায়েরাই ছিলেন এমন আগে। এখন বাবারাও তেমন হয়েছেন।

কেমন?

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন না? 'সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করোনি'। তখন সাত কোটি ছিল সাতশো কোটি হতে বেশি দেরি নেই। তবে পুতুপুতু করে খোকাদের আঁচলের তলায় আগলে রাখার দিন চলে গেছে। আমার এক বন্ধু ছিল বিনোদানন্দ ঝা। সে বলত, 'আররে ঋজু, বাঙালি, আদমি বনতা বাঙালকা বাহার যা কর'। কথাটা বোধহয় মিথ্যে বলত না।

যে সব বাঙালিরা প্রবাসে আছেন, বাংলার বাইরে চাকরি, ব্যবসা ও শিল্প করেছেন, তাঁরা অধিকাংশই সফল। তোদের এখন এই সব নিয়ে ভাবনার সময় এসেছে।

তুমি এবার নিজেই ডিরেইলড হচ্ছ ঋজুদা, লাইনে ফেরো।

ভটকাই বলল।

হ্যাঁ। আসল কথাটা তো বলা হয়নি তোদের।

কী কথা?

আরে গিরধর-এর দোকানে নাস্তাপানি করে যখন বানোয়ারির দোকানে পান খেতে গেছি, তখনই ব্যাপারটা জানা গেল।

আর কত পান খাবে?

সে কথা আর বলিস না। দেড়মাস লেগেছিল পানের লাল ছোপ দাঁত থেকে ওঠাতে আর ঠোঁটদুটো ফেটে চৌচির হয়ে গেছিল।

এবারে বলো, কী তোমার কথা।

হ্যাঁ। যে পিপ্পাল-এর সঙ্গে গতরাতে আমাদের দেখা হয়েছিল, সে পিপ্পাল ডাকু নয়।

মানে?

হ্যাঁ। তার নাম পিপ্পালপ্রসাদ। সে লোকটা গুণ্ডা প্রকৃতির। কথায় কথায় হাত চালিয়ে দেয়, তিরিক্ষি-তিরিক্ষি কথা বলে, বিনা কারণে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করে। তবে সে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে আদৌ নয়। ডাকুর নাকি ছোটখাটো চেহারা, মানে রোগা-পাতলা। নিরামিষ খায়। লম্বাতে নাকি গোপালের মতো হবে। ভারি মিষ্টি ব্যবহার, মিতভাষী কিন্তু কেউ ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই কি বেগড়বাই করলে তার রাইফেল বা রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে খুপরি উড়িয়ে দিতে এক মুহূর্ত দেরি করে না।

শুনে তো আমরা থ! আমার তখনই মনে পড়ল, সেই কাক-ভোরে দেখা তার চেহারাটার কথা।

সফর আলি স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলল বানোয়ারিকে, তুম ঠিক্কে বোল রহা হ্যায় ভাইসাব?

আররে! পান এগিয়ে দিতে দিতে বানোয়ারি বলল, যো ডাকু কি শরপর দশ হাজারি ইনাম লাগা হুয়া হ্যায় তার এমন বোকামি হবে যে নিরস্ত্র অবস্থায় সাইকেল চড়ে এবং একা একা আমার দোকান থেকে পান খেতে আসবে? তা ছাড়া ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে পান খায়ই না। সে খুব ধার্মিক লোক। সকাল সন্ধে মা দুর্গার পুজো করে। কখনও দুর্বল বা নিরপরাধীর উপরে অত্যাচার, এমনকি খারাপ ব্যবহারও করে না। পিপ্পালপ্রসাদ অভ্র খাদানে যা পয়সা করেছে তার চেয়ে বেশি করেছে গোমো-বারকাকানা লাইনে ওয়াগন ভেঙে কয়লা চুরি করে। তারপরে যেখানে রেললাইনই নেই ধারেকাছে, সেই সীমারিয়াতে এসে মস্ত বাগানওয়ালা বাড়ি করে থেবড়ে বসেছে। চাতরার দিকে তার মস্ত ভাণ্ডারও আছে। বড়লোক খুব। কিন্তু

অত্যন্তই অসভ্য। ওর সঙ্গে ডাকুর কোনও তুলনাই চলে না।

পিপ্পাল পাঁড়ের মাথার উপরে দশ হাজার ইনাম কেন?

ওর নামে পঁচিশটা খুন, পঞ্চাশটা ডাকাতির মামলা ঝুলছে। পঁচিশটার মধ্যে পাঁচটা খুন পুলিশ। তিনজন কনস্টেবল, একজন জমাদার আর একজন এ.এস.আই।

বানোয়ারি বলল।

কোথাকার এ.এস.আই?

বারিয়াতুর। তাই তো যে পিপ্পালকে জ্যান্ত বা মৃত হাজির করতে পারবে কোতোয়ালিতে তাকেই দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। পরে। বিশেষ অনুষ্ঠান করে। টাকাটা দেবেন চিফ-মিনিস্টার সত্নারায়ণ সিনহা।

॥ ৮ ॥

পান খেতে খেতে বাংলোতে ফিরে দেখি, রামখিলাওন বসে মশলা বাটছে মাংস রান্না করবে বলে। কিন্তু আমরা যেতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ইক খাত আয়া হুজৌর।

চিঠি?

কে আমাদের চিঠি লিখতে পারে?

কলকাতার চিঠি নয়তো?

গোপাল চিন্তিত মুখে বলল।

চাতরা সে শেঠনে ভেজিন ক্যা?

লট্কা জিজ্ঞেস করল রামখিলাওনকে।

রামখিলাওন বলল, নেহি লটকা বাবু। ইক আনজান আদমি ঘোড়ে পর আয়াথা ইয়ে খাত লেকর। খাত দেকর তুরন্ত ঘোড়েপর চল দিয়া। ওঁর ঈ দেখিয়ে লাড্ডু দেকে গিয়া আপলোঁগোকি লিয়ে।

লাড্ডু! ম্যায় আভ্ভি খায়গা। বলেই, লটকা বলল, কাঁহা, রাখখা কাঁহা?

সফর আলি হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল, খেয়ো না। নিশ্চয়ই বিষ মিশানো লাড্ডু।

রামখিলাওন বলল, আমি তো তোমার জন্যে জলখাবার করিনি। আমি তো আপনাদের অনুমতি ছাড়াই চারটে খেয়ে নিয়েছি। চমৎকার লাড্ডু। বিষটিষ তো মেশানো নেই!

দিয়েছে কে?

চিঠি আছে। আমি কি লেখাপড়া জানি। ওই যে, টেবিলের উপরে আছে পড়ে দেখুন।

সফর আলি চিঠিটা তুলে নিয়ে খাম খুলে পড়ল। কোনও সম্বোধন নেই, কারও নাম নেই। তুলোট কাগজে দোয়াতের কালিতে কলম ডুবিয়ে লেখা।

পররনাম!

গতবছর শীতে আপনারা এই জঙ্গলেই কাঠুরেদের একশো টাকা দিয়ে গেছিলেন। সেই রাতে খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান খুব হয়েছিল। আমিও এসেছিলাম। তখন আপনারা এলে দেখা হত।

এবারে আবার এ জঙ্গলে এসেছি সাতদিন হল। সকালে অত কষ্ট করে ওই পথ দিয়ে এলেন কেন? একটা শর্টকাট আছে টুটিলাওয়া থেকে তিনমাইল আগে। একটা মস্ত শিমুল গাছের পাশ দিয়ে গোরুর গাড়ির চাকার দাগ আর ঘোড়ার খুরের দাগ দেখতে পাবেন। ওই পথ দিয়ে আজ সন্ধেবেলাতে আসুন। আলাপ তো হবেই, তার সঙ্গে হরিণের মাংসও থাকবে শুখা-শুখা। আমি যদিও নিরামিশাষী।

বন্দুক নিয়েই আসবেন। ভয় নেই। আমি কেড়ে নেবে না। বন্দুক রাইফেলের অভাব নেই আমার। তবে করণপুরা থেকে কী করে একটা বড় দাঁতাল হাতি এসেছে এই জঙ্গলে। বোধহয় দল থেকে বিতাড়িত। মাঝে মাঝে ওই পথটি আগলে দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের ঘোড়াগুলো খুবই ভয় পায়। ওই হাতির জন্যই আনতে বলছি বন্দুক। যদি পথে ঝামেলা করে।

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একজন নিরস্ত্র অনুচর ওই সিমুল গাছটির নীচে আপনাদের অপেক্ষাতে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার নাম শিউপূজন। ওকে জিপে তুলে নেবেন, তাহলে চিনে আসতে অসুবিধে হবে না। যদি চা খান তাহলে সঙ্গে করে চায়ের পাতা একটু নিয়ে আসবেন। আমাদের চা-পাতা ফুরিয়ে গেছে।

আশা করি আজ সন্ধেতে দেখা হবে।

চাতরা থেকে একটু লাড্ডু এনেছিলাম। আপনাদের জন্য পাঠালাম।

পররনাম ইতি—শ্রী পিপ্পাল পাণ্ডে।

তারপর? বলো ঋজুদা। তীরে এসে তরী ডুবিয়ো না।

ভটকাই বলল।

আজ্জু বলল, আব্বা জানতে থে কি আপলোঁগোকি ইসব হরকৎকি বারে মে?

জরুর। মগর বাদমেহি না জানা উনোনে।

অজিব বাত হ্যায়। কভ্ভি হামলোগোঁকি বতায়া নেহি থে।

তারপর একটি মিটিং বা কনফারেন্স যাই বলো, হল। লটকা এবং রামখিলাওন বলল, আপলোগোঁকি কানসে ভুজা বনাকর খায়েগা পিপ্পাল। মত যাইয়ে মরনেকে লিয়ে।

গোপালেরও ইচ্ছা ছিল না যাবার। ভয়ে নয়। গোপাল ভিতু ছিল না। ও বলল, কী দরকার! হেরে তো আমরা গেছিই। আমরা কোথা দিয়ে গেছি, এঞ্জিন বন্ধ করে, ঠেলে গাড়ি ব্যাক করে দূরে এসে এঞ্জিন স্টার্ট করেছি, কখন এসেছি, কখন গেছি সবই সে জানে। ইচ্ছে করলে তখনই সে এবং তার দলবল আমাদের মেরে

দিতে পারত। বন্দুকগুলো নিয়ে নিতে পারত। কিন্তু তা না করে সে আন্তরিকভাবে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। লাড্ডু পাঠিয়েছে। গতবার তুমি যে একশো টাকা দিয়েছিলে কাঠুরেদের সে কথা উল্লেখ করেছে। সে রাতে নাজিম সাহেব আমাদের আটকে না দিলে, মোলাকাত হয়েই যেত। আবার গিয়ে কী হবে! সে যে আলতু-ফালতু ডাকাত নয়, হাজারিবাগ-এর রবিন হুড তা তো বোঝাই গেছে।

তবুও যে ডাকাতের মাথার উপরে দশ হাজার টাকার পুরস্কার ঝুলছে তার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করাও তো একটা অভিজ্ঞতা!

আমি বলেছিলাম।

লটকা বলল,কাহেলা ঝুঠঠো জানকি খাতরে মে ফাঁসিয়েগা? চালিয়ে, ম্যায় আজ রাতমে আপলোঁগোকি লিয়ে ছাত্তুকি লিট্টি পাকায় গা। সাথমে নই আমকি খাট্টা-ধনিয়া-পাত্তি ঔর হারা-মিরচা ডালকর। খাসিকি মাস-ভিতো রহিবেই করে গা। রাবড়ি ভি তো হ্যায়। ঔর চাহিয়ে ক্যা?

সফর আলি রেগে বলল, ম্যায় আভ্ভি যাকর চন্দনবাবুকি বাতাতা যো তুম হিঁয়া আকর মেহমানলোঁগোকি তংক কর রহ্যা হ্যায়।

তারপর বলল, তোর মতো পেটুক আমি জন্মে দেখিনি। আরও যদি খাওয়া-দাওয়া করিস তো তোর পেটটাই ফাঁসাবো একদিন।

গোপাল বলল, পেট না ফাঁসালেও প্যাংক্রিয়াটাইটিস হতে পারে যে কোনও সময়ে।

লট্কা বলল, লেহ্ লট্কা। ক্যা টাইটিস বোলা খোঁকাবাবু আপনে?

প্যানক্রিয়াটাইটিস।

সফর আলির দিকে চেয়ে মুখে আরও দুটো পান আর একমঠো কালি-পিলি জরদা ফেলে লটকা বলল, বহত কিসিমকি বিমারিকি কা বারেমে শুনা মগর এইসি টাইটিসকি নাম কভ্ভি নেহি শুনা।

গোপাল বলল, সন্ধেবেলা চলো, পিপ্পাল পাঁড়ের জন্যে ভাল মিষ্টি-টিষ্টি কিনে নিয়ে।

তাহলে? যাবে না বলছিলে যে?

যাব নাই তো।

মানে?

মানে, ওই শিমুলতলিতে ওই লোকটির হাতে মিষ্টি দিয়ে চলো চলে যাই হাজারিবাগ। কতদিন চমনলাল-এর খিচুড়ি খাই না, নাজিম সাহেবের হাতের বিরিয়ানি আর চাঁব আর পায়া আর লাব্বা। ওখানে গিয়ে জিপ ছেড়ে দেব। আলি সাহেব এবং লটকা রাতটা আমাদের অতিথি হয়ে হাজারিবাগেই কাটিয়ে কাল সকালে ফিরে এসে রামখিলাওনকে তুলে নিয়ে ফিরে যাবেন চাতরা।

বাঃ। জিপটা চালিয়ে আসবে কে?

তাহলে চন্দনমনলবাবুকে বলে একজন ড্রাইভার নিতে হয়। তাহলে ওঁদের

হাজারিবাগ অবধি যেতেও হবে না। ড্রাইভার আমাদের হাজারিবাগ ছেড়ে রাতেই না হয় ফিরে আসবে এখানে। তারপর কালকে আলি সাহেব, লটকা আর রামখিলাওন চাতরা ফিরে যেতে পারবেন বাস-এ। কিন্তু..

আবার কিন্তু কী?

গোপাল বলল।

এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া করা কি ঠিক হবে? যাকে বলে এক্সপিরিয়েন্স অফ আ লাইফ টাইম।

গোপাল বলল, আমরা তো তাকে ধরে নিয়ে যেতে বা মারতেই এসেছিলাম। মন থেকে তা যখন করতে সায় পাচ্ছি না, অথবা অন্যভাবে বললে বলতে হয় সাহসও পাচ্ছি না তার অতন্দ্র প্রহরা দেখে, তখন মিছিমিছি দেখা করতে গিয়ে লাভ কী? তার মহত্ত্ব সম্বন্ধেও তো আমাদের কারও কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া সে যা করছে তাকে নীতিগতভাবে আমরা সমর্থন করলেও আইন নিজের হাতে নেওয়াটা তো দণ্ডনীয় অপরাধ অবশ্যই। যে পঁচিশটা খুন করেছে, সে খুন যে উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকুক না কেন, আইনের চোখে সে তো অপরাধী বটেই। তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র দেখা করতে যাওয়ার কি কোনও মানে হবে?

ওরা তিনজনেই গোপালের মতেই সায় দিল। আমি একা হয়ে গেলাম।

তাহলে চলো, চন্দনমলবাবুকে বলে আসি ড্রাইভারের জন্যে। আমরা কয়েকদিন হাজারিবাগে থেকে, কুসমভাতে শিকার করে, মোরব্বা ক্ষেতে তিতির-খরগোস মেরে সারিয়া হয়ে ট্রেনে ফিরে যাব কলকাতা।

চন্দনমলবাবুর কাছে লটকা বা সফর আলি তো যেতে পারবে। যদি এখানে আর নাই থাকা হয়, এই সারাদিনটা এই সীমারিয়ার ডাকবাংলোতে আলসে-বিলাসে কাটানো যাক, গাছের ছায়াতে, চড়াইদের লড়াই দেখে।

মন্দ বলোনি ঋজু।

গোপাল বলল।

আমরা সফর আলিকে বলে দিলাম যে, ফেরার সময়ে গিরধরের দোকানে বলে আসতে, ভাল মিষ্টি, ভাল করে প্যাক করে যেন রাখে, কালাকাঁদ আর গোলাবজামুন চার চার করে আট কেজি। আমরা সন্ধের সময়ে টাকা দিয়ে তুলে নিয়ে যাব।

সফর আলি বলল, চল রে লটকা। হামারা বাত গিরধর সায়েদ মানেগা নেহি। ইতনা আচ্ছা তো জানতা নেহি না মুঝকো।

গোপাল দুটো দশ টাকার নোট দিয়ে বলল, ঈ লিজিয়ে চাচা। অ্যাডভান্স দে দিজিয়ে গা। রুপাইয়াসে জাদা জান-চিন ঔর কওন চিজ সে হোতা বানিয়ালোগোঁকো ইস দুনিয়ামে!

ঈ বাত তো সাহি।

লটকা বেঁচে গেল নড়াচড়া করার হাত থেকে।

সে বলল, আনেকা ওয়াক্ত, জারা কালি-পিলি জরদা লেকর আনা চাচা। পান কাফি হ্যায়, জরদা খতম হোনেওয়ালা হ্যায়।

সন্ধের মুখে মুখে সফর আলি আর লটকার এবং রামখিলাওন-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গিরধর-এর দোকান থেকে মিষ্টি উঠিয়ে হাজারিবাগের দিকে যাব বলে বেরোলাম। জিপের এঞ্জিন স্টার্ট করার আগে সফর আলি হাত মিলিয়ে বললেন, সত্যি করে বলুন তো খোকাবাবুরা আপনারা কি শিকার খেলতেই এসেছিলেন, না ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের সঙ্গে টক্কর দিতে?

গোপাল বলল, শিকার করতেই তো এসেছিলাম, কিন্তু..

সফর আলি বুঝি-হাসি হাসলেন একটু। তারপর দু'জনের সঙ্গেই হাত মিলিয়ে বললেন, খুদাহ্ হাফিজ। ইনশাল্লা, ফিন ভেট হোগা।

জরুর।

আমরা বললাম।

লট্কা, বাঘের দুই থাবার মতো দু' হাত জড়ো করে বলল, পররনাম খোকাবাবু লোগ। এইসা হিম্মৎদার খোকাবাবু হাম কভ্ভি না ভেটিন।

মানে, এমন সাহসী খোকাবাবু আমি কখনও দেখিনি। রামখিলাওনও বলল, পররনাম বাবু। ফিন আইয়েগা।

শিমুলতলিতে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের লোকটি কিন্তু ঠিক দাঁড়িয়েছিল। আমরা জিপ দাঁড় করিয়ে জিপ থেকে নেমে তাকে ভাল করে বুঝিয়ে ব্রুকবণ্ডের রেড-লেবেল চা পাতার একটা বড় প্যাকেট এবং মিষ্টির হাঁড়ি দিয়ে বললাম, পিপ্পালবাবু যেন আমাদের ক্ষমা করেন। আমাদের সোজা হাজারিবাগ চলে যেতে হচ্ছে। একজন বন্ধুর অসুখের খবর পেয়ে। পরের বার এলে অবশ্যই দেখা হবে।

তারপরে বললাম, এতগুলো জিনিস একা নিয়ে যাবে কী করে?

ও বলল হাতের লাঠি দেখিয়ে, এটাতে বাঁকের মতো ঝুলিয়ে নেব।

হাতি পড়ে যদি পথে।

পড়লে পড়বে বাবু। আমাদের তো হাতি, বাঘ, পুলিশকে নিয়েই ঘর করতে হয়। অত ভাবলে কি আমাদের চলে।

ভাল করে বুঝিয়ে বলবে তো?

জরুর। তবে পিপ্পাল খুব আশা করেছিল আপনাদের। নিজের হাতে খিচুড়ি রাঁধছে সে বিকেল থেকে ইন্তেজাম করে।

আমরা বললাম, মাপ করো ভাই।

গোপাল একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বলল। খইনি খেয়ো।

না না। পিপ্পাল শুনলে খুব রাগ করবে।

ভালবাসার জিনিস কখনও ফেরাতে নেই।

হাজারিবাগে রাত সাড়ে আটটারও আগে পৌঁছে যাওয়া উচিত। কিন্তু টুটিলাওয়া ছাড়িয়ে মাইল পাঁচ সাত যাবার পরই পুলিশের ট্রাকের একটা কনভয় পাস করল বলে জিপ সাইড করে দাঁড়াতে হল। দশ ট্রাক ভর্তি আর্মড পুলিশ। আমাদের সঙ্গে বন্দুক দেখে একজন অফিসার, কোতোয়ালির ছোট দারোগা হবেন, নেমে এসে আমাদের চ্যালেঞ্জ করলেন।

গোপাল বলল, আমরা এস. পি. চ্যাটার্জি সাহেবের ছেলে সুব্রতবাবুর দোস্ত। হাজারিবাগে নিজেদের বাড়িতে যাচ্ছি।

শুনেই তক্ষুনি ছেড়ে দিলেন ছোট দারোগা আমাদের।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। পিপ্পাল পাঁড়ে কি জানতে পেরেছিল যে মস্ত বড় ফোর্স আসছে তার মোকাবিলা করতে? তাই কি আমাদের হোস্টেজ হিসেবে ধরে রেখে সে পুলিশের সঙ্গে দরকষাকষি করত?

গোপালও সে কথাই ভাবছিল, মুখ দেখে মনে হল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

সাড়ে আটটার আগেই গয়া রোডের উপরে গোপালদের ছবির মতো বাড়ি পূর্বাচল-এ পৌঁছে গেলাম আমরা। তারপর ড্রাইভারকে বকশিস দিয়ে বললাম, তুমি রাতটা এখানেই থেকে যাও না।

ও বলল, চন্দনমলবাবু জানেন, যে রাতেই ফিরব। চিন্তা করবেন। চলেই যাই।

যা ভাল মনে করো।

চমনলাল আমাদের দু'জনকে অনেকদিন পরে একসঙ্গে দেখে খুব খুশি হল।

গোপাল অর্ডার দিল, মুঙ্গকা ডালকি খিচড়ি বানানা।

তারপর বলল, কপালে নেই ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের নিজহাতে বানানো খিচুড়ি খাওয়া, তার কী আর হবে!

আমি বললাম, গোপালবাবু, কপালে গোপাল করে!

গরম জলে স্নান করে, গল্প-টল্প করে, খেয়ে-দেয়ে শুতে শুতে এগারোটা বাজল।

॥ ৯ ॥

সকালে উঠে আমরা বাইরের বারান্দাতে বসে আছি, চমনলাল চায়ের পট, দুধ, চিনির পট সব ট্রেতে করে সাজিয়ে এনে রাখল টেবল-এর উপরে। চায়ের ব্যাপারে গোপাল খুবই শৌখিন। ছিল। সব ব্যাপারেই সে শৌখিন ছিল খুবই।

চা ঢালছে কাপে গোপাল এমন সময়ে করম মালি এল, গেট খুলে।

সে বলল, নমস্তে বাবু।

আজকে এত দেরি করে এলে করম? আমরা যে আসব তা অবশ্য তুমি জানতে না। গোপাল বলল।

না বাবু। আমি তো রোজই ছটার সময়েই আসি। নইলে কি আর বাগান এত সুন্দর থাকত?

তবে আজ দেরি করলে বড়?

কোতোয়ালিতে সারা শহর ভেঙে পড়েছে বাবু। তাই দেখে এলাম আমিও।

কী দেখে এলে?

ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে আর তার আটজন সঙ্গীর লাশ। ভোর তিনটের সময় এসেছে লাশ। হাজারিবাগ কোতোয়ালি থেকে দশ ট্রাক রাইফেলধারী পুলিশ গেছিল। আর চাতরা থেকে এসেছিল পাঁচ ট্রাক। দু' ট্রাক এসেছিল চান্দোয়া-টোড়ি থেকে। উনিশটা গুলি লেগেছে শরীরে। গোলিসে বিলকুল ভুঞ্জ দিয়া। তিনদিক থেকে পিপ্পালকে ঘিরে ফেলে গুলি করে মেরেছে পুলিশ। রাত একটার সময়ে খোদ পুলিশ সাহেব জিপে করে গেছিলেন।

কোথায় লড়াই হল?

সীমারিয়া আর টুটিলাওয়ার মধ্যের জঙ্গলে। ডাকুর ডেরাতে।

পাঁচজন পুলিশও মারা গেছে। কোতোয়ালির ছোট দারোগা গজানন ঝাঁও মারা গেছেন।

আমি দেখলাম, ডান হাতে চা ঢালতে থাকা গোপালের হাতটা কেটলিসুদ্ধু কাঁপছে।

আমি চুপ করে রইলাম।

গোপাল বলল, তোমারটা তুমি ঢেলে নাও ঋজু।

বৈশাখের ভোরের ফুলগন্ধবাহী হাওয়া বইছিল গোপালদের 'পূর্বাচল'-এর উক্যালিপটাস গাছেদের সুগন্ধি ঝরা-পাতা আর নানা ফুল আলতো হাতে ঝাঁট দিয়ে।

চায়ের কাপ মুখ দিয়েও নামিয়ে রাখলাম। সম্ভবত আমাদের দেওয়া চাটা খাওয়ার অবকাশ আর হয়নি পিপ্পালের। ভাবছিলাম, পুলিশের চোখে, সমাজের চোখে সে জঘন্য অপরাধী কিন্তু হাজার হাজার গরিব, মূক, সহায়হীন অত্যাচারিতদের কাছে সে ছিল আশার আলো। এই পৃথিবীতে সে জঘন্য অপরাধীদের কলঙ্ক গায়ে মেখে মরল বটে কিন্তু স্বর্গের দ্বারে তার জন্যে মঙ্গলধ্বনি বাজছে এতক্ষণে।

গোপাল হঠাৎ বলল, কত মানুষ জন্মাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, কে তাদের খোঁজ রাখে। কিছু কিছু মানুষ, খুব কমই মানুষ, কোনও বিশেষ কাজ নিয়ে পৃথিবীতে আসে। তারা নিজেদের জন্যে বাঁচতে আসে না এখানে, অন্যদের জন্যে মরতে আসে। এরাই তো মানুষের মতো মানুষ। কী বলো?

আমি আর কী বলব। আমার গলা বন্ধ হয়ে এসেছিল। কিছুই না বলে আমি লালমাটির প্রান্তর পেরিয়ে দূরের সবুজ মোরব্বা ক্ষেতের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম। দু'জনের চায়ের পেয়ালাই পড়ে রইল।

চমনলাল এসে বলল, চায়ে তো ঠাণ্ডা হো গ্যয়ে। ফিন লা রহা হ্যায়।

গোপাল তার বাঁ হাতের পাঁচখানা আঙুল দেখিয়ে মুখে কোনও কথা না বলে, তাকে ইশারাতে বলল, পরে।

ঋজুদার ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের গল্প শেষ হয়ে যাবার পরে হাজারিবাগের সেই দুঃখভরা বৈশাখী সকালটি যেন আমাদের সকলেরই বুকের মধ্যে উঠে এল।

আমরা সকলেই চুপ করে বসে রইলাম।

এমনকি নাজিম সাহেবের বড় ছেলে আজ্জু মহম্মদও।

ঋজুদা বলল, অনেকেই কথা, অনেককেই বলার জন্যে ভিড় করে এল আমাদের দু'জনেরই বুকের মধ্যে। কিন্তু আমরা নীরবেই বসে থাকলাম।

গোপাল বলল, আমাদের যাওয়া উচিত ছিল ওর কাছে। মরে যাবার সময় কী ভাবল পিপ্পাল পাঁড়ে আমাদের? ছিঃ!

আমি বললাম, ভাবল, আমরাই বিশ্বাসঘাতক। ভাবল আমরাই খবর দিয়েছি হাজারিবাগের কোতোয়ালিতে, ওর ডেরার হদিশ জানিয়েছি।

গোপাল ভারি গলাতে বলল, জানো ঋজু, এর চেয়ে ওর পাশে থেকে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে মরে যাওয়াই ভাল ছিল আমাদের। মরতে তো একদিন সকলকেই হবে কিন্তু কে কী ভাবে, কোন বিশ্বাস বুকে নিয়ে মরল, সেটাই আসল কথা।

আমি চুপ করে রইলাম।

কী বলব! কাকে বলব!

যাকে অনেক কথাই বলার ছিল, সে তো তখন শব হয়ে গেছে।

ডেভিলস আইল্যান্ড

'এলেম নতুন দেশে।

এ এ এ লেম, এলেম নতুন দেশে।

তলায় গেল ভগ্নতরী, কূলে এলেম ভেসে।'

বলে গান ধরে দিল তিতির। ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো শিকার করতে ঋজুদার সঙ্গী শুধু আমিই ছিলাম কিন্তু এবারে ঋজুদার সঙ্গে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বেড়াতে এসেছি তিতির, ভটকাই এবং আমি, ঋজুদা অ্যান্ড কোম্পানি ইন ফুল স্ট্রেংথ।

কলকাতা থেকে বেরোবার আগে ঋজুদার বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে প্রতিবার বাইরে কোথাও যাওয়ার আগে আমাদের যেমন একটা গেট-টুগেদার হয়ই, ভটকাই-এর ঠিক-করে-দেওয়া মেনুমতো জম্পেশ করে খাওয়া-দাওয়াও হয়, এবারেও তেমনিই হয়েছিল। সেই গেট-টুগেদারেই ঋজুদা গদাধরকে বলে দিয়েছিল, দ্যাখো, মিস্টার গদাধর এবারে আর আমাদের জন্যে খামোকা চিন্তা কোরো না। এবারে শুধু বেড়াতেই যাচ্ছি আমরা। শুধু খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো আর ঘুম। অনেকদিন হল এই তিনজনকে নিয়ে শুধুই বেড়াতে যাইনি কোথাওই।

কী করব আমরা সেখানে ঋজুকাকা? সত্যিই কি শুধু খাব-দাব আর ঘুমোব? তিতির জিজ্ঞেস করল।

বলতে গেলে তাইই। তবে আমার পুরনো বন্ধু ন্যাভাল কমোডর বাটলিওয়ালা বহুদিন হল নেমন্তন্ন করে রেখেছে। আমাদের একটা ভাল বোট দিয়ে দেবে নেভির। তাই ভাবলাম, তোদের মধ্যে কেউই যখন দেখিসইনি আন্দামান, তোদের ভাল করে ঘুরিয়েই আনি। নারির ওয়েস্টার্ন কম্যান্ডে চলে যাবার কথা আছে বদলি হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই।

নারিটা কী বস্তু? নারী তো জানি।

ভটকাই ধন্ধে পড়ে বলেছিল।

নারি হচ্ছে বাটলিওয়ালার ফার্স্ট নেম।

হেসে বলেছিল, ঋজুদা।

বালতিওয়ালা?

বালতিওয়ালা পদবি যে পারসিদের হয় না তা নয়, তবে নারি, বাটলিওয়ালাই। ঋজুদা বলেছিল।

আজ সকালে সিনক আইল্যান্ডস-এর সমুদ্রের মধ্যে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, সত্যি! ভাগ্যিস এসেছিলাম আমরা। এ এক স্বর্গরাজ্য। আমরা তো ভারত মহাসাগরের বুকে স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জে গেছিলাম জলদস্যুদের গুপ্তধনের রহস্য উদ্ঘাটন করতে। রংবেরং-এর প্রবালে ভরা নানা দ্বীপে, কিন্তু সে তো বিদেশে। আন্দামান তো আমাদের। স্বদেশ। নিজের দেশ, নিজের দেশ। তার সঙ্গে অন্য কোনও দেশের তুলনা চলে!

ভোররাতে উঠে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে সমুদ্রের মধ্যে এই অপরূপ সিনক আইল্যান্ডে এসে পৌঁছেছি আমরা। না এলে, সত্যিই বড় মিস করতাম। সমুদ্রে তখন ভাঁটি দিয়েছে। ছ' বোনেরই মতো, সুনীল স্বচ্ছ জলের মধ্যে যেন হাত ধরাধরি করে নাচছে বড় সুন্দরী এই ছটি দ্বীপ।

তিতির সালোয়ার কামিজ পরে এসেছে কাঁঠালি-চাঁপা রঙা। সুইমিং ট্রাঙ্ক আমরাও কেউই আনিনি। সুইমিং-ট্রাঙ্ক পরে আসব কালকে, যখন জলিবয় আইল্যান্ডে যাব। সমুদ্রে যখন ভাঁটি দেয় তখন সিনক আইল্যান্ডস-এর ছটি দ্বীপের এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে পায়ে হেঁটে চলে যাওয়া যায় রংবেরং-এর কোরালদের বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে। কত রকম মাছ যে চলে যাচ্ছে স্বচ্ছ জলের মধ্যে দিয়ে তাদের পিছল শরীরের হঠাৎ ছোঁয়া লাগিয়ে আমাদের পায়ে!

ভটকাই-এর একেবারে বাকরোধ হয়ে গেছে। ভয়ে বাকরোধ অনেকেরই হয় কিন্তু সৌন্দর্যেও যে বাকরোধ হতে পারে তা ভটকাইকে দেখেই প্রথম বুঝলাম। তিতির চিৎকার করে উঠেছিল, অ্যান আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড প্লেস। আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ঋজুদা তার ষ্টু-হ্যাটের নীচের ছায়া-ঘেরা পাইপ-ধরা মুখে এক ভারী তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে বলল, কী? তোদের বলেছিলাম না? পছন্দ?

পছন্দ? সারাটা জীবন ওখানে থাকার বন্দোবস্ত করতে পারো ঋজুকাকা, তোমার বন্ধু কমোডর বাটলিওয়ালাকে বলে? তিতির বলল।

দু'পায়ে সাদা বালি আর নীল জল ছিটকিয়ে ভটকাই বলল, যেখানে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে নীল সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে পৌঁছনো যায় সেই সব দ্বীপের নাম সিন্‌ক আইল্যান্ড হয় কী করে! অবাক কাণ্ড। ডুবে যাওয়ার তো কোনও ব্যাপারই নেই এখানে।

ঋজুদা খুব জোরে হেসে উঠে বলল, ওরে গর্দভচন্দ্র, 'Sink' নয়, 'Cinque'। ফরাসি শব্দ। মানে ছয়। ফরাসি-বিশেষজ্ঞ তিতিরকে জিজ্ঞেস কর না...বিশ্বাস না হয়। এই সিনক আইল্যান্ডস একটা ম্যারিন স্যাংচুয়ারি। আমাদের দেশে বাঘের জন্যে যেমন আছে করবেট, পালামৌ, মানস বা সুন্দরবন, হাতির জন্যে বক্সা বা পেরিয়ার, তেমনি হাজারো রকমের মাছ, রংবেরং-এর প্রবাল এবং নানারকম

নানারঙা জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বাঁচাবার জন্যেই নানারকম প্যাংকনটকে, অ্যালগকে, ফাঙ্গিদের নির্বিঘ্ন করার জন্যে, এই অভয়াঞ্চল।

বলেই বলল, এবার তাড়াতাড়ি পা চালা উলটোদিকে। জোয়ার আসছে; যে দ্বীপে আমরা নেমেছি সেই দ্বীপে পৌঁছতে সাঁতরাতে হবে পরে তা না হলে।

আগে বলবে তো! সুইমিং ট্রাঙ্ক নিয়ে আসতাম। আমরা সমস্বরে বললাম।

বলেইছি তো! সে হবে কাল যখন জলিবয় আইল্যান্ডে যাব। সেখানে স্নরকেলিং আর স্কুবা ডাইভিংও করতে পারিস। ইকুইপমেন্টস সব ভাড়া পাওয়া যায়।

ম্যা গোঃ। পরের স্নরকেল আর স্কুবা-ডাইভিং-এর ইকুইপমেন্টস নিয়ে নামব সমুদ্রে! আমি নেই।

ঠিক আছে, সাঁতার তো সব সমুদ্রেই কাটা যায়, হাঁটা কি যায় সব সমুদ্রে? সমুদ্রে হাঁটার সুযোগ, এ জীবনে আর আসবে না—মনের সুখে হেঁটে নে।

তিতির হেসে বলল, কেন আসবে না? চিনিয়েই যখন দিলে ঋজুকাকা আমি এখানেই হানিমুন করতে আসব।

তা আসিস। সত্যি। হানিমুনের এমন জায়গা পৃথিবীতে কমই আছে। এ জন্মে বিয়ে করা তো আমার কপালে নেই, নইলে আমিও এখানে আসতাম।

সত্যি! আমি চুপ করে মোহাবিষ্টের মতো তাকিয়ে ছিলাম। হালকা নীল আকাশ, তার ছায়া-পড়া ঘননীল সমুদ্র, সাদা আর গেরুয়া বালি, হলদেটে, ছাইরঙা আর সবুজাভ সব প্রবালের ছড়া জলের নীচে নীচে, যেন বহুরঙা জলজ নেকলেস। 'পল্যুশান' শব্দটাই এখানে জানে না কেউ। আমাদের অদেখা অথচ এমন সুন্দর দেশ যে আমাদের ভারতেই ছিল তা ঋজুদা আমাদের আন্দামানে না নিয়ে এলে কি জানতে পারতাম?

আমরা ফিরে গিয়ে যে দ্বীপে আমাদের বোট থেকে নেমে সকলে প্রথমে গিয়ে পৌঁছেছিলাম তার বালিতে বসলাম সতরঞ্চি পেতে একটা গাছতলাতে। কী গাছ এটা কে জানে। এ এক আশ্চর্য দেশ! এখানের প্রায় গাছই আমার অচেনা। হোটেল থেকে প্যাকড-লাঞ্চ দিয়ে দিয়েছিল, স্যান্ডউইচ, কিছু ফল, জোড়া ডিমসেদ্ধ, কোল্ড চিকেন, হ্যাম, সঙ্গে মাস্টার্ড। আর স্প্রাইট। স্প্রাইট ঋজুদার খুবই প্রিয়। সবাই যা করে, ঋজুদা তা করে না। হাসতে হাসতে বলে, 'অকল লাগাও, দিখাওপে মত যাও।' ঋজুদার চেলা হিসেবে আমরাও স্প্রাইট ভক্ত হয়ে উঠেছি।

খেয়ে-দেয়ে আমাদের তারপরই রওনা দিতে হবে কারণ বিকেলের দিকে প্রায় রোজই এই সমুদ্রে ঝড়-বৃষ্টি আসে। সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেতে হবে ছোট মোটর বোটে করে। ছোট বোট বলেই সাবধানের মার নেই। এ বোটটি আমরাই ভাড়া করে এনেছি। ওয়ানডুর থেকেও আসা যেত কিন্তু তাতে সমুদ্রযাত্রা সংক্ষিপ্ত হত। তা ছাড়া ছাব্বিশ মাইল পথ পোর্ট ব্লেয়ার থেকে। মাইল মানে, নটিক্যাল মাইল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে লাঞ্চ-প্যাকেটের মধ্যে সমস্ত টুকরো-টাকরা ভরে গাছের

নীচের জায়গাটা পুরো সাফ-সুতরো করে দিয়ে আমরা বোটের দিকে চললাম। ততক্ষণে জোয়ারের জলে অনেকখানি ভরে গেছে সমুদ্র। টার্ন আর স্যান্ড পাইপার পাখিরা বালির ওপরে ওড়াওড়ি করছে। তাদের উড়ন্ত শরীরের মুঠিভরা নরম সাদা, ওই হালকা আর গাঢ় নীল পটভূমিতে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

যেহেতু এই সিনক আইল্যান্ড বা জলিবয় আইল্যান্ড সবই ম্যারিন স্যাংচুয়ারি, ওখানে কোনও রকম নোংরা ফেলে আসা একেবারে বারণ। রোজ পুলিশেরাও আসে বোটে করে নজরদারি করতে।

সাদা কাঠের ছোট্ট বোর্ড লাগানো আছে বালির উপরে পোঁতা বেঁটে খোঁটার উপরে 'Leave only your foot prints behind.'

ঋজুদা বলল এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষাটা আমাদের দেশের মানুষদের এখনও নেওয়া বাকি। শুধুমাত্র নিজেদেরটাই বুঝি আমরা। অন্যর প্রতি কিছুমাত্র consideration নেই। নিজেদের পিকনিক, নিজেদের আনন্দ হলেই হল, আমাদের পরে অন্যরাও যে আসবেন তাঁরাও যে পরিষ্কার দেখতে চান এসব জায়গা এই বোধটা জাগতে আমাদের মধ্যে আর কতদিন লাগবে কে জানে।

তিতির বলল, যা বলেছ। পুলিশরাও এখানে ভেসে না এলে হয়তো জায়গাটা এমন পরিচ্ছন্ন থাকত না। বড় লজ্জার কথা জাতি হিসেবে আমরা যেন এখনও প্রাপ্তবয়স্ক হইনি। কবে যে হব, কে জানে!

ছোট নৌকোতে করে বোটে পৌঁছতে হল। দুটি কারণে বোট দ্বীপ পর্যন্ত আসতে পারে না। প্রথম কারণ, জল কম। দ্বিতীয় কারণ, দ্বীপের চারপাশের কোরালদের ক্ষতি না-করা। ওই ছোট ছোট নৌকো, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তালের ডোঙার মতো, তারই নাম গ্লাস-বটম বোট। নৌকোর তলাতে দু ফিট বাই চার ফিট মোটা ঘোলা কাচ বসানো একটা। সেই স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়েই নৌকোতে বসে নীচের প্রবাল, মাছ, নানারঙা উদ্ভিদ দেখা যায়।

ঋজুদা বলছিল গ্লাস-বটম বোট দেখতে হয় প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াইয়ান আইল্যান্ডের ওয়াইকিকি আর ভারত মহাসাগরের স্যেশেলসে। তেমন বোট হয়তো আমাদের দেশেও হবে একদিন। কিন্তু কবে যে হবে তা ভগবানই জানেন।

আমাদের বোট ছেড়ে দিয়েছে। জোরে হাওয়া বইছে এখনই তবে আকাশে মেঘ নেই। ভয়ের কিছু নেই। বোটের মাথাতে ত্রিপল বেঁধেবুঁধে চাঁদোয়ার মতো করা। রোদ-জল থেকে যাত্রীদের বাঁচাবার জন্যে। ভাবছিলাম স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জে কত সুন্দর সুন্দর আর কতরকম বোটই না দেখেছিলাম। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর তুলনা নেই কিন্তু আমরা গরিব বলেই আমাদের সব ব্যাপারই সাদামাঠা? তবে কোনও কোনও ব্যাপারে আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানেরও হয়তো খামতি আছে কিছুটা।

ঋজুদা একদিন বলেছিল আমাদের শান্তিনিকেতনে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে যে,

'Art is born out of superflirty.' কথাটা নাকি আসলে রবীন্দ্রনাথেরই। রবীন্দ্রনাথের কাছে এক বিদেশি এসেছিলেন। তাঁরা দুজনে বসে নন্দনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময়ে জানালা দিয়ে দেখা গেল রাধু মালি দুটি ক্যানেস্তারায় জল ভরে বয়ে নিয়ে আসছে বাঁকে করে। তার চলার গতিতে ছলাৎ ছলাৎ করে উপচে পড়ছিল ভর্তি-ক্যানেস্তারার জল। সেদিকে অতিথির দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাকি রবীন্দ্রনাথ সেই বিদেশিকে বলেছিলেন যে, ক্যানেস্তারাগুলি খালি থাকলে জল উপচে পড়ার উপায়ই থাকত না। প্রয়োজন পূরিত হবার পরেই যা উপচে পড়ে তাই আর্ট এর উপচার। কথাটা, শোনা-কথা ঋজুদার।

ঋজুদার শোনা-কথাটা যে আমরা খুব একটা বুঝেছিলাম তখন এমন নয়, তখন আমাদের বয়স আরও কম ছিল, কিন্তু শুনতে ভাল লেগেছিল। পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও এসব কথা শুনতে ভাল লাগে। বোঝার আভাস পাওয়া যায়. আর তা গেলেই এইসব কথা যা আজকাল খুব কম মানুষকেই বলতে শুনি, আরও শোনবার একটা ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগে। এই মস্ত গুণ ঋজুদার। তার চেয়ে আমরা প্রত্যেকেই বয়স, জ্ঞান, বিদ্যা এবং বুদ্ধিতে অনেকেই ছোট হলেও সে আমাদের কখনওই ছোট ভাবে না। আমাদের সঙ্গে সমান সমান ব্যবহার করে। আমাদের প্রত্যেককে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়, ভটকাই-এর ফাজলামোও অসীম ধৈর্যর সঙ্গে সহ্য করে আর তাই আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে অবচেতনে ঋজুদার মতো হয়ে ওঠার একটা উচ্চাশা ক্রমশই গড়ে উঠতে থাকে, সেই উচ্চাশা ক্রমশ দীপ্তি পায়। এই কথা যে কত বড় সত্যি তার মস্ত বড় প্রমাণ ভটকাই। আমাদের দলভুক্ত হবার পর এবং বিশেষ করে ঋজুদার ছত্রছায়াতে এসে মাত্র কয়েক বছরেই ওর উন্নতিটা সত্যিই চোখে পড়ার মতো। ও নাকি স্কুলের লেখাপড়ার পরীক্ষাতেও আগের থেকে অনেক ভাল ফল করছে ইদানীং। ওদের পাশের বাড়ির বিল্টু বলছিল।

ঋজুদা সবসময়ই বলেছে আমাকে আর তিতিরকে, শুধু বই-মুখস্থ পড়াশোনা করলে জীবনে কিছুই হতে পারবি না, square হতে হবে, চৌকশ, তবেই না জীবনে অন্যদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবি। 'দশজনের একজন' হতে পারবি।

টক্কর দিতে পারব কী না জানি না, তবে শুধু ভটকাইরই নয়, আমাদেরও যে ঋজুদার সঙ্গে সঙ্গে থেকে অনেকই উন্নতি হয়েছে সব দিক দিয়েই সেটা নিজেরাও বুঝতে পারি।

ঋজুদা একটা কথা প্রায়ই বলে আমাদের হাসতে হাসতে: 'জ্ঞানের সীমা চিরদিনই ছিল, অজ্ঞতার কোনও সীমা কখনও ছিল না।'

সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ আমাদের সামনে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। সূর্যের আলো পড়ছে নীল সমুদ্রের সবুজ দ্বীপের ওপরে। সেই দ্বীপের রং তো শুধু সবুজ নয়। সবুজের যে কত রকম, হলুদের, লালের, সাদারও, তা কী বলব! কত রকমের যে গাছ-গাছালি সেই দ্বীপে—ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে—বোট যতই এগিয়ে

যাচ্ছে সেই দিকে।

ওগুলো কি গাছ ঋজুদা, সাদা কাণ্ড, লম্বা, সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে?

তিতির শুধোল।

ঋজুদা ঘুরে বসে, ভাল করে দেখে বলল, ওড়িশার লবঙ্গীবনের গেণ্ডুলি, আর পালামৌর চিলবিল গাছের মতো দেখতে না অনেকটা? এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে গাছের মেলা। আর যেহেতু ওদের অধিকাংশই endemic, ওদের অন্য কোথাও দেখতেও পাবি না। একদিন তোদের সকলকে নিয়ে যাব চ্যাথাম আইল্যান্ডে।

চ্যাথাম আইল্যান্ডে কী আছে? আইল্যান্ড তো অনেক আছে, রসস আইল্যান্ড, ভাইপার আইল্যান্ড ইত্যাদি। চ্যাথামে কী?

ভটকাই বলল।

কী থাকবে? কাঠচেরাই-কল আছে। কাঠ চেরাই হয় সেখানে। সরকারি saw-mill আছে মস্ত। সব গাছই এক সঙ্গে চিনিয়ে দিতে পারব তোদের সেখানে নিয়ে গেলে।

আমি বললাম, মরা গাছ কে দেখতে যাবে। গাছ মরে গেলে তো গাছ থাকে না, সে কাঠ হয়ে যায়। যাকে বলে শুষ্কং কাষ্ঠং।

সে তো গাছেদের কবর ভূমি, শ্মশান ভূমি। ওখানে যাব না। তুমি আমাদের জ্যান্ত গাছ চেনাও ঋজুকাকা।

তিতির বলল।

ঋজুদা হেসে বলল, কথাটা ভালই বলেছিস। এবং কথাটা ঠিকও বটে।

তিতির আবার বলল, বলো না ঋজুকাকা, ওই সাদা গাছগুলো কী গাছ? দ্যাখো, এখন আগের থেকে অনেকই কাছে এসে গেছে।

ঋজুদা বলল, সাদা দেখাচ্ছে, আলোর জন্যে। আসলে ওগুলো রুপোলি আর ছাই রঙে মেশা। গাছগুলোর নামও Silver-grey. আর ওই দ্যাখ, ওই পুবের দিকে, ওই গাছগুলোকে কাছ থেকে দেখলে তবে বুঝতে পারবি কী মসৃণ তাদের গা। নাম কী জানিস ওই গাছগুলোর?

কী?

Satin-wood.

বাঃ।

হ্যাঁ। আর ওই দক্ষিণ দিকে চেয়ে দ্যাখ, ওই গাছগুলোর নাম Marble Wood.

Marble Wood.

আমি অবাক হয়ে বললাম।

হ্যাঁ।

বলল, ঋজুদা।

তারপর বলল, চল, আশা করি ডেভিলস আইল্যান্ডে যখন তোদের নিয়ে যাব

তখন তোদের আরও অনেকরকম গাছ দ্যাখাতে পারব আন্দামানের।

ডেভিলস আইল্যান্ডে এখানকার সবরকমের গাছ আছে?

তিতির বলল।

ঋজুদা হেসে বলল, তুই একটি পাগলি। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে সবশুদ্ধ প্রায় ছশো প্রজাতির গাছ আছে। তার মধ্যে মাত্র চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ রকমের গাছের পরিচর্যা করা হয়। যে সবের বাণিজ্যিক মূল্য আছে আর কি। বাণিজ্যিক মূল্য অবশ্য তেমন আছে মাত্র ঊনত্রিশ-ত্রিশ রকমের গাছের। অন্যরা কম বেশি ব্রাত্য। চ্যাথাম আইল্যান্ডে গেলে বাণিজ্যিক গাছগুলোকেই দেখতে পাবি।

যাব না আমরা গাছেদের মর্গ-এ।

ভটকাই প্রতিবাদী গলাতে বলল।

তুমি এমনি করেই আমাদের গাছ চেনাও, আর ডেভিলস আইল্যান্ডে যখন যাব তখন তাদের কাছ থেকে গায়ে হাত দিয়ে দেখব।

তিতির বলল।

হাসল ঋজুদা। বলল, বেশ। তাই দেখিস।

তারপর বলল, এই মোটর বোটে বসে মনে হচ্ছে না যে দ্বীপটা, গাছগুলো সব দ্রুত পেছনে দৌড়ে যাচ্ছে এই নরম কোমল আলোতে? সুন্দরবনেও গোসাবা, বা বিদ্যা বা মাতলা অথবা হাড়িয়াভাঙ্গা নদীতে বোটে বসে দ্বীপগুলোকে এইরকম সুন্দর লাগে। সুন্দরবনের মতো এমন সুন্দর ও ভয়াবহ জায়গা পৃথিবীতে খুব কমই আছে অথচ আমরা এমন একটি জায়গাকে পৃথিবীর পর্যটকদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখলাম। সুন্দরবনের গভীরে গেলেই মনের মধ্যে এক ধরনের uncanny, আধিভৌতিক অনুভূতি হয়, তীব্র ভয়-মিশ্রিত ভাল লাগার অনুভূতি, এমনটি আমার আর কোনও বনে গিয়েই হয় না, হয়নি। সুন্দরবনকে আমি চিরদিনই ভয় পেয়ে এসেছি।

সেই জন্যেই কি আমাদের নিয়ে একবারও যাওনি সুন্দরবনে তুমি?

ফাজিল ও দুঃসাহসী ভটকাই বলল।

ঋজুদা কিন্তু হাসল না। বলল, যাইনি, তোদের মারাত্মক বিপদের মধ্যে ফেলতে চাইনি বলেই। নিজের না হয় যা হবার হবে। তোদের দায়িত্বও তো আমারই।

তিতির বলল, আহা! সুকুমারমতি সব, কুসুমকোমল বালক-বালিকা যেন। আমরা একেবারেই অনভিজ্ঞ অনভিজ্ঞা!

তারপর বলল, কোন বিপদের মধ্যেই না তুমি নিয়ে গেছ বল আমাদের? মানুষ খেকো বাঘ কি আমরা ট্যাঁকস্থ করিনি অনেকবার?

ঋজুদা বলল, সে কথা নয়রে, সে কথা নয়। সুন্দরবন সুন্দরবনই। পৃথিবীতে সুন্দরবনের সঙ্গে আর কোনও বনেরই তুলনা চলে না।

আমরা একা একাই যাব একবার। তুমি নিয়ে না গেলে।

ভটকাই বলল।

আত্মহত্যা করতে চাস তো যাস।

ঋজুদা বলল।

তিতির বলল, একটা সোজা কাজের জন্যে অত কমপ্লিকেশানের কী দরকার। তুমি আমার সঙ্গে জয়িতাদের বাড়িতে চলো একদিন। চোদ্দোতলা বাড়ির খোলা বারান্দাতে তুলে দেব। নীচে লাফ দিয়ে পড়লেই তো কার্যসিদ্ধি হতে পারে, সে জন্যে সুদূর সুন্দরবনে, কীড়ে-মাকড়ের কামড় খাবার জন্যে, সাপ ও স্যালাসান্ডারদের ছোবল খাওয়ার জন্যে এবং অবশেষে বাঘের পেটে গিয়ে ধন্য হবার দরকার কী?

ঠিক আছে। তোদের নিয়ে যাব একবার সুন্দরবনে।

ঋজুদাকে থামিয়ে দিয়ে তিতির আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলল, দ্যাখো দ্যাখো, পাখিটাকে। ওটা কী পাখি ঋজুকাকা?

আমরা ঘাড় উলটোদিক করে সোজা উপরে চেয়ে দেখলাম, একটা বাজ জাতীয় পাখি, তার বিরাট ডানা মেলে, দুই ডানাতে বিকেলবেলার সামুদ্রিক রোদকে ছিটকোতে ছিটকোতে চক্রাকারে উড়ছে মাথার উপরে।

আমরা চুপ করে রইলাম। পাখিটাকে কেউই চিনতে পারলাম না। অনেক সময়েই নিজেদের জ্ঞান ভারে একেবারে পণ্ডিতপ্রবর বলে মনে হয় নিজেদের। তবে আনন্দর কথা এই যে, আমরা যে পরম মূর্খ তা আমরা সকলেই জানি। তবে ঋজুদার কাছে থাকলে শেখার যে অনেকেই বাকি এই কথাটাই নতুন করে মনে হয়। আশ্বস্ত হই আমরা প্রত্যেকে।

ঋজুদা আমাদের সকলকেই চুপ করে থাকতে দেখে বলল, লক্ষ করেছিস, পাখিটার পেটটা রুপোলি। ওদের নাম সিলভার-বেলিড হক। এরা সমুদ্রের ও বড় জলার পাশে পাশে থাকে, বড় মাছ ধরার জন্যে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হয় পাখিগুলো। সামুদ্রিক বাজ।

॥ ২ ॥

কী নাম বললে? ভটকাই জিজ্ঞেস করল ঋজুদাকে।

চিড়িয়াটাপ্পু।

কী বিদঘুটে নাম রে বাবা। টাপ্পু মানে কী?

টাপ্পু মানে, মনে হয় পাহাড় বা পাহাড় চুড়ো। ঠিক জানি না। ঋজুদা বলল।

কোন ভাষা এটা?

তাও বলতে পারব না। সম্ভবত আন্দামানি। নিকোবরি নয়।

কাল সকালে তা হলে আমরা যাচ্ছি সেখানে? অনেক চিড়িয়া আছে বুঝি?

তাই তো শুনেছি। চিড়িয়ার কলকাকলিতে মুগ্ধ হব। শুনেছি, যাওয়ার পথটিও

ভারী সুন্দর। এর আগে তিন-তিনবার আন্দামানে এসেছি কিন্তু চিড়িয়াটাপ্পুতে যাওয়া হয়নি। একা যেতে ইচ্ছে করেনি। এবারে তোরা এসেছিস, তাই যাওয়া যাবে সকলে মিলে।

তুমি বলেছিলে আন্দামানের মেগাপড পাখির কথা। দ্যাখা যাবে সেই পাখি চিড়িয়াটাপ্পুতে গেলে?

এবারে আমি বললাম।

নাঃ। ভারত মহাসাগরের স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জে যখন আমরা জলদস্যুদের গুপ্তধনের রহস্য সন্ধানে গেছিলাম তখনও কি নেনে পাখিদের দেখতে পেয়েছিলাম? স্যেশেলসের নেনে পাখিদের মতো এরাও প্রায় নিশ্চিহ্নই হয়ে গেছে। যে সামান্য ক'টি আছে তা আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অগণ্য দ্বীপের কোন দ্বীপে আছে তা কে জানে!

অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে এদের বংশ বাড়ালে হয় না?

না। এ পাখি endemic.

মানে?

মানে এদের শুধু এখানেই দেখা যায়। এখানের অনেক গাছও তাই। Endemic। অন্য জায়গাতে নিয়ে গিয়ে লাগালেও বাঁচানো যায় না।

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সবসুদ্ধ কতগুলো দ্বীপ আছে ঋজুদা?

সব দ্বীপ এখনও গোনাই হয়নি। অনেক দ্বীপই আছে uncharted.

তারপরই বলল, মেগাপড পাখির কথাতে মনে পড়ল যে, ওই পাখিরই মতো এখানকার আদিবাসীরাও endemic.

এখানের আদিবাসী কারা?

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কতরকম মানুষের, মানে আদিবাসীদের বাস। যেমন ধর ওঙ্গে, আন্দামানি, জারোয়া বা নিকোবরের শোম্পেনদেরও পৃথিবীর অন্য কোথাওই দেখতে পাবি না। এ এক আশ্চর্য সুন্দর দ্বীপমালা। আমার তো ভারত মহাসাগরের স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জ থেকেও ভাল লাগে এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে।

তবে একটা কথা, আমি বললাম, আন্দামানে স্যেশেলস-এর মতো সুন্দর সৈকত নেই, নেই অত নানারঙা কোরাল-এর বাহার। চান করার সুখ নেই, যা আমাদের ওড়িশার পুরীতে পর্যন্ত আছে।

সেটা অবশ্য ঠিক। তবে এর সৌন্দর্যর রকম আলাদা। এর সৌন্দর্যর মধ্যে এক ধরনের উদাসী ভয়াবহতা আছে।

ঋজুদা বলল।

তিতির বলল, যাই বল ঋজুকাকা, সেলুলার জেল কিন্তু ফ্যানটাসটিক। আমি যে বাঙালি সে জন্যে ভারী গর্ব হচ্ছিল। এই কালাপানি পার করিয়ে এনে যত বন্দিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে ব্রিটিশরা নিত্য-নৈমিত্তিক অমানুষিক

অত্যাচার করত তাদের মধ্যে অধিকাংশই যে বাঙালিই একথা জেনে কোন বাঙালির গর্ব না হয় বল? এই সত্যটা ভারতের অন্য সব প্রদেশের মানুষেরা কি জানেন?

ভটকাই ফুট কাটল, জানলেও কি মানেন?

তা ঠিক।

আর তাঁদের অপরাধটা কী ছিল? যার জন্যে এই দ্বীপে নির্বাসন? চুরি করেননি, ডাকাতি করেননি, খুন করেননি এমনকী ঘুষও খাননি। দেশকে ভালবেসেছিলেন, শুধুমাত্র এই ছিল তাঁদের অপরাধ।

ঋজুদা বলল, সত্যি!

কাল সন্ধেবেলা সেলুলার জেলে 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ডে'র শোটা দেখে এসে রাতে আমার ঘুম হয়নি ঋজুকাকা। অত অত্যাচারও করতে পারে মানুষ মানুষের উপরে?

তিতির বলল।

অত্যাচার করলে কী হয়? ওঁদের একজনও কি মাথা নুইয়েছিলেন?

না। তা কেউই নোয়াননি!

ভটকাই বলল।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন: 'A man can be destroyed but he cannot be defeated.' ঋজুদা বলল।

শুধু মানুষ বলো না। 'মানুষের মতো মানুষ' বলো। সব মানুষই কি এক ধাতুতে গড়া?

না, তা তো নয়ই! ভটকাই বলল।

ঋজুদা বলল, মির সাহেবের একটি বিখ্যাত শায়রি আছে।

কী? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হঁয়া সুরত-এ আদম বহত হ্যায়, আদম নেহি হ্যায়।'

ভটকাই বলল, মানে?

মানে, মানুষের চেহারার জীব এখানে গিজগিজ করছে, মানুষ নেই।

চুপ করে রইলাম তিনজনেই। ঋজুদা পাইপটাতে টোব্যাকো ভরে নিয়ে আবার আগুন জ্বালাল। সকাল থেকে খায়নি একবারও। তিন কাপ চা খাবার পরে তার প্রাণ এখন পাইপ চাইছে।

আমরা পোর্ট ব্লেয়ারের বে-আইল্যান্ড হোটেলের লবিতে বসেছিলাম। বাঁদিকে পোর্ট ব্লেয়ার। সামনেই সমুদ্রের মধ্যে একটি পাহাড়। তার ডান কোণে একটি লাইটহাউস। ঘড়ির কাঁটা ধরে আলোটা ঘুরে যায় রাতের বেলা। এই হোটেলের উপরে যখন আলোটা ঝাপটা মারে তখন সমুদ্রমুখী সব ঘরের মধ্যেটা আলোকিত হয়ে যায় এবং পরমুহূর্তেই অন্ধকার। সন্ধের পর থেকে পরদিন ভোর অবধি এমনি করেই ঘোরে আলোটা। আমার খুব ইচ্ছা করে, দূর সমুদ্রের মধ্যের কোনও লাইটহাউসে কয়েকটা দিন কাটাই। এই লাইটহাউস তো পোর্ট ব্লেয়ারের কাছেই,

মানে, লোকালয়ের কাছেই। তাই সেই ভয়াবহতা বা রহস্য নেই।

কাল রাতে আমরা যখন খাওয়ার আগে সমুদ্রের একেবারে উপরেই হোটেলের লবিতে বসেছিলাম তখন হঠাৎই ভটকাই চেঁচিয়ে উঠেছিল, দ্যাখ, দ্যাখ রুদ্র।

চমকে উঠে দেখি, একটা প্রকাণ্ড বড় সাদা-রঙা আলো-ঝলমল জাহাজ ওই লাইটহাউসটির ওপাশ থেকে ঘুরে সামনের সমুদ্রের খাঁড়িতে ঢুকল। পোর্ট ব্লেয়ারে যাবে। জাহাজটা এত বড় কিন্তু একেবারে নিঃশব্দে চলছে আর দেখে মনেই হচ্ছে না যে, আদৌ চলছে।

যে বেয়ারা একটু আগেই আমাদের ফ্রেশ-লাইম-সোডা দিয়ে গেছিল, সে-ই এসে ভটকাইকে বলল, খোকাবাবু, এহি হ্যায় হর্ষবর্ধন।

আমি বিস্ময়ে চেয়েছিলাম। তিতিরও, কলকাতা—পোর্ট ব্লেয়ার আর পোর্ট ব্লেয়ার—কলকাতা করা বহুদিনের নাম-শোনা হর্ষবর্ধনের দিকে। তারপরেই হর্ষবর্ধন পাঁচ সেকেন্ডের জন্যে ভোঁ দিল। সমস্ত দ্বীপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, উলটোদিকের পাহাড়ে, সেই ভয়ঙ্কর ভোঁ-এর অনুরণন উঠল। জঙ্গলে বড় বাঘ ডাকলে যেমন যেমন হয়, এই কালো, ভারী জলের আন্দামান উপসাগরে হর্ষবর্ধনের ডাক শুনে তেমনই এক অনুভূতি হল আমাদের। 'অনুভূতি' শব্দটা বোধহয় ঠিক হল না, বলা উচিত অভিঘাত। অভিঘাতই হল।

আমাদের আসাটা হঠাৎই ঠিক হয়েছিল বলেই প্লেনে এসেছি। জাহাজে এলে, অনেক আগে থেকে বুকিং করতে হয়। কিন্তু তাতে এলে, বেশ কয়েকদিন মজা করতে করতে ধীরে-সুস্থে আসা যেত, যাকে বলে, 'সমুদ্রযাত্রা' তাও হত। তবে সে ক্ষেত্রে অনেকদিন আগে প্ল্যান করে আসতে হত। তবে প্লেনে আসারও চমক আছে। নিঃসীম সমুদ্র পেরিয়ে এসে হঠাৎই যখন চাপ চাপ গাঢ় সবুজ অরণ্যে-ভরা ছোট-বড় দ্বীপের রাজ্যের উপরে প্লেনটা এসে উপস্থিত হয় তখন যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। প্রায় সকলেই নিজের নিজের সিট ছেড়ে একবার এদিকের জানালা আরেকবার ওদিকের জানালা করে, আর স্টুয়ার্ডেসরা তাদের সামলাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সেই যে একবার পাঁচ সেকেন্ড ভোঁ দিল তো দিল, তারপর নিঃশব্দে বে-আইল্যান্ড হোটেলের সামনের খাঁড়ি থেকে বাঁদিকের অন্ধকারে মিশে গেল হর্ষবর্ধন। নিকষকালো অন্ধকার আর নিকষকালো কালাপানি যেন নিঃশব্দে গিলে ফেলল ঝলমলে জাহাজটাকে।

॥ ৩ ॥

আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের বে-আইল্যান্ড রিসর্টে ঋজুদার ঘরে আমরা সবাই ঋজুদার খাটের উপর শুধুই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ম্যাপটাকে ছড়িয়ে দিয়ে খাটের তিন পাশে মেঝের কার্পেটে বসে ম্যাপটাকে দেখছিলাম ঋজুদার নির্দেশে। ঋজুদা

বসেছিল সমুদ্রমুখী বারান্দা আর ঘরের মধ্যের কাচের স্লাইডিং-ডোরের পাশের ইজিচেয়ারে। কাচের দরজাটা বন্ধই ছিল। কারণ, ভিতরে এয়ার কন্ডিশনার চলছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যে কোনও সমুদ্রপারের জায়গারই মতো শীত তেমন একটা পড়ে না। মাসটা ডিসেম্বর হলে কী হয়, বেশ গরম এখনও।

ঋজুদা বলল, আজ আর কাল আরাম করে নাও। পরশু থেকে তো সমুদ্রের মধ্যে মোটর বোটে। থাকা ও খাওয়ার এমন ইলাহি বন্দোবস্ত তো আর থাকবে না বোটে।

ভটকাই বলল, 'ভজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে।'

তিতির হেসে বলল, শব্দটা ভজনং নয় মিস্টার ভটকাই, ভোজনং।

আমি বললাম, বোকার মতো কথা বলিস না ভটকাই। শুনছিস যে মোটর বোটে থাকতে হবে, তার আবার যত্রতত্র কী?

ঋজুদা বলল, এই আরম্ভ হল তোদের চিটপিটানি আর ভাঁড়ামো। ম্যাপটাকে ভাল করে দ্যাখ, বুঝে নে।

তিতির বলল, বুঝব কী ঋজুকাকা। এ যে সবই একইরকম লাগে। আদিগন্ত জলের মধ্যে এই গুড়িগুড়িগুলো কী?

ওগুলো সবই দ্বীপ। বড়, মেজো, সেজো, ছোট। সবসুদ্ধ শপাঁচেক দ্বীপ আছে। হয়তো আরও বেশি আছে। ম্যাপে কিন্তু অনেক দ্বীপই নেই। মানে আনচার্টেড দ্বীপও আছে অনেক। এই পাঁচশো চার্টেড দ্বীপের মধ্যে আবার মাত্র ঊনচল্লিশটি দ্বীপে মানুষের বাস আছে।

মাত্র?

অবাক হয়ে বললাম আমি।

ইয়েস। মাত্র।

ঋজুদা বলল।

'দ্য ডেভিলস আইল্যান্ড' এই গুড়িগুড়িগুলোর মধ্যে কোনটা?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

হাঃ।

ঋজুদা পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে হাসি এবং ঠাট্টা মেশানো একটা আওয়াজ করল।

বলল, কোনটা? তা জানলে আর ভাবনা ছিল কী? তা ছাড়া 'ডেভিলস আইল্যান্ড' নাম হয়েছে একসময়ে এক বা একাধিক সাংঘাতিক মানুষ সেখানে থাকত বলেই। এখন সম্ভবত সেখানে কেউই থাকে না। আবার থাকতেও বা পারে। তবে এক বা একাধিক, সংখ্যায় সংখ্যাতে তারা যতই হোক, পার্মানেন্টলি কেউ থাকত না কোনওদিনই সেখানে। ওটা ছিল নানা শয়তান জলদস্যুদের ডেরা। তা ছাড়া, একই মানুষ বা একই দল কখনওই নিয়মিত সেখানে থাকত বলেও মনে হয় না। কোনও জায়গার শয়তানেরাই কোথাও থিতু হয় না। মানুষখেকো বাঘ থেকে ডাকাত, সবই। পার্মানেন্টলি থাকলে এখানের হ্যাবিটেবল দ্বীপের সংখ্যা

ঊনচল্লিশ নয়, চল্লিশটি হত।

তা ঠিক।

তিতির বলল।

এইসব দ্বীপে কারা থাকে ঋজুদা? মানে, ঊনচল্লিশটি দ্বীপে?

মানুষের বাস যেসব দ্বীপে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সেই সব দ্বীপে ওঙ্গে, আন্দামানি, এবং জারোয়াদের দেখা যাবে। নিকোবরে নিকোবরি শোম্পেনদের দেখা যাবে। দেশ ভাগের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল বেশ কিছু বাঙালি উদ্বাস্তুরাও এসে কিছু কিছু দ্বীপে বসবাস শুরু করেছেন।

আবারও বলল, জানিস তো, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় লোকসভার একটি মাত্র আসন এবং সেটিতে অনেকেই দিন হল এক বাঙালি উদ্বাস্তু ভদ্রলোকই নির্বাচিত হয়ে আসছেন।

কী নাম তাঁর?

তাঁর নাম শ্রীমনোরঞ্জন ভক্ত।

তারপরই বলল, জানিস তো? এখানের মানুষেরা তো বটেই, অনেক পাখ-পাখালির মতোই গাছ-গাছালিরাও সব endemic। বলেছি?

বলেছ আগে কিন্তু endemic শব্দের মানে?

ইংরেজিতে পণ্ডিত ভটকাই বলল।

সত্যি কথা বলতে কি আমিও শব্দটির মানে জানতাম না। আমি রুদ্র রায় মনে মনে কবুল করলাম কিন্তু আমার অজ্ঞতা 'পেকাশ' করলাম না।

তিতির বলল, endemic মানে, native বুঝলি না?

ঋজুদা বলল, তা ছাড়া, যাদের অন্য কোথাওই আর দ্যাখা যায় না। দ্যাখা তো যায়ই না, জোর করে সেই মানুষদের অন্যত্র নিয়ে গিয়ে তাদের পুনর্বাসন করালে, কী গাছেদের, অন্যত্র নিয়ে গিয়ে লাগালে তারা হাসে না, হয়তো বাঁচেও না।

তাই? আশ্চর্য তো!

চিন্তিতমুখে বলল, ভটকাই।

ঋজুদা বলল, মনে আছে তোদের? আমরা যখন ভারত মহাসাগরে স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জে সেই ফরাসি জলদস্যুদের গুপ্তধনের রহস্যভেদ করতে গেছিলাম তখন আমাদের দেশের কৃষ্ণচূড়ার চেয়েও অনেক বেশি ঝলমলে একরকমের গাছ দেখেছিলাম, রঙিন ফুলে-ফুলে ছাওয়া...। মনে নেই? কী রে তিতির?

বললাম, ফ্ল্যামবয়ান্ট। তাই না ঋজুদা, তাদের নাম? মনে আছে নিশ্চয়।

ভটকাই বলল, তিতির জানবে কোত্থেকে? সে কি সঙ্গে গেছিল আমাদের। তুমি ওই হাইলি-ডেঞ্জারাস মিশানে খুকিকে তো আর নিয়ে যাওনি।

তিতির হেসে বলল, 'দু'দিনের সন্ন্যাসী, ভাতকে বলে অন্ন'। রুআহাতে যেতে পারলাম আর...তোমাকে দলে এনে রুদ্র সত্যিই খাল কেটে কুমির এনেছে।

ঋজুদা কথা কেটে বলল, ইয়েস! এই ফ্ল্যামবয়ান্ট গাছই এখানের একটি দ্বীপে

একজন এনে লাগিয়েছেন ভারত মহাসাগরের স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জ থেকে। শুধু লাগিয়েছেন যে তাই নয়, সে গাছ তরতর করে বড়ও হয়েছে। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। গতবারে আমি দেখে গেছি। অথচ আশ্চর্য! ফ্ল্যামবয়ান্ট গাছ স্যেশেলস-এর endemic। আন্দামানে বাঁচবার কথা নয়।

কোন দ্বীপে? ঋজুকাকা?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

সেই দ্বীপও ওই ঊনচল্লিশটি দ্বীপের মধ্যে পড়ে না। সেটিও আনচার্টেড। তার নাম 'দ্য হর্নেটস নেস্ট'।

নামটা তো দারুণ।

আমি বললাম।

'To stir a hornet's nest!'

ভটকাই বলল।

খাইছে!

তিতির বলল।

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম জোরে।

ভটকাই বলল, ইংরেজিটা শেখার চেষ্টা করছি, তাতেও ঠাট্টা! আমি তো আর তোমাদের মতো ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে পড়িনি।

বেশ করেছিস। ইংরেজি-মিডিয়াম স্কুলে পড়লেই কি লেজ গজায় নাকি?

বরং ফালতু গুমোর বাড়ে।

তিতির বলল।

সেই দ্বীপে যিনি থাকেন তিনি এক দারুণ মানুষ। বুঝলি? মাত্র দু'জন মানুষ থাকেন 'দ্য হর্নেটস নেস্ট'-এ। মাঝে মাঝে একজন আবার চলে আসেন রসস আইল্যান্ডে। কখনও অন্যজন আসেন পোর্ট ব্লেয়ারে।

ঋজুদা বলল।

ভটকাই বলল, আচ্ছা, ঋজুদা সেই ভদ্রলোকের নাম কি মিঃ আহুক বোস? আর তাঁর সঙ্গীর নাম কি গুড্ডাপ্পা ভীরাপ্পান?

ঋজুদা অবাক হয়ে বলল, তুই কী করে জানলি? আশ্চর্য তো!

আমি আন্দামানের পটভূমিতে লেখা একটি উপন্যাসে পড়েছিলাম 'দ্য হর্নেটস নেস্ট'-এর কথা। সেখানে পাখির-বাসার ব্যবসা করেন তো ভদ্রলোক? তাইওয়ানে রপ্তানি করার জন্যে, তাই না?

পাখির বাসা? তা দিয়ে কী হয়?

আমি অবাক হয়ে বললাম।

আরে, চিনেরা ভালবেসে খায়।

তিতির বলল, কলকাতার 'তাজ বেঙ্গলে' বা 'মেইনল্যান্ড চায়না'তে বার্ডস-নেস্ট স্যুপ কি পাওয়া যায়?

ঋজুদা বলল, খেয়াল করিনি। তবে বম্বের তাজমহল হোটেলে পাওয়া যায়, খেয়েছি।

কী পাখির বাসা ওগুলো ঋজুদা?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সুইফট-লেট পাখি।

ফটিকজল পাখি দেখেছিস?

হ্যাঁ।

তাদেরই ক্ষুদে সংস্করণ। পাখিরা তাদের মুখের লালা দিয়ে বানায় সেই বাসা।

যে-বইয়ের কথা তুই বললি ভটকাই, সে বই তো বড়দের বই। আমি জানি। মা আমাকে পড়তে দেননি।

তিতির বলল।

কী বই রে?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

'সমুদ্র মেখলা'।

ভটকাই, টক খেলে মুখ যেমন ভ্যাটকায় তেমন করে বলল।

একটা কথা তিতির। তোর মাকে বলিস যে আমি বলেছি, বই পড়ে কেউই কোনও দিন খারাপ হয়নি।

ঋজুদা বলল।

না, মা তো নিজেই খুব রেলিশ করে পড়লেন বইটি তারপর মাসিকেও পড়তে দিলেন। অবশ্য খারাপ হওয়ার কথা বলেননি, বলেছিলেন, মনের গভীরতা বাড়ার পরে ও-বই পড়তে।

বয়স বাড়লেই কি সব সময়েই মনের গভীরতা বাড়ে? বইটির প্রকাশক কে? দে'জ পাবলিশিং।

পড়ে দেখতে হবে তো! আহুক বোস আর হর্নেটস নেস্ট নিয়ে কে লিখলেন বই? আর কেমনই বা লিখলেন?

'দ্য ডেভিলস আইল্যান্ড' কোনটা?

ম্যাপটা দেখিয়ে, ভটকাই প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে প্রশ্ন করল ঋজুদাকে।

ঋজুদা ইজিচেয়ার ছেড়ে নিজেও মেঝের কার্পেটের উপরে নেমে এল। তারপরে হাঁটু মুড়ে বসে পাঞ্জাবির পকেট থেকে মঁ-ব্লাঁ কলমটা বের করে সমুদ্রের মধ্যে একটি জায়গার ছোট বড় কয়েকটি বিন্দুকে মাঝখানে রেখে একটি গোল্লা এঁকে দিল। বলল, এই যে ছোট-বড় মিলিয়ে পাঁচ-ছটি দ্বীপ দেখছিস, তারই মধ্যে একটি হল 'দ্য ডেভিলস আইল্যান্ড'। ঠিক কোনটি যে তা আমি নিজেও জানি না।

আমাদের করণীয়টা কী? এই আরামের হোটেল ছেড়ে, এখানে দেখার মতো কত কিছু আছে সে সব কিছু ভাল করে না দেখে, সমুদ্রের মধ্যে মোটর বোটে করে

মোচার খোলার মতো ভাসতে ভাসতে অজানা দ্বীপের দিকে কী করতে যাব আমরা?

যাব, দেশের কাজে। কিছু তথ্য জোগাড় করে ইন্ডিয়ান নেভিকে দেব আমরা। তাতে তাদের কাজের সুবিধে হবে। তা ছাড়া সকলেই যা করে তা না করাটাই তো ব্যতিক্রমী মানুষদের কাজ। কুণ্ডু স্পেশাল বা অন্য অনেক টুর কোম্পানিই তো পর্যটকদের নিয়ে আসেন আন্দামানে, সেই সব পর্যটক কি 'দ্য হর্নেটস নেস্ট' বা 'দ্য ডেভিলস আইল্যান্ড' দ্বীপের নাম শুনেছেন, না যাবেন কখনও সেখানে? ইচ্ছে থাকলেও কি যেতে পারবেন?

তা বুঝলাম, কিন্তু দেশের কাজের ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।

ভটকাই বলল।

সত্যি! তুমি মাঝে মাঝে কী যে হেঁয়ালি করো না ঋজুকাকা!

এই কাজটি কি খুব বিপজ্জনক? মানে, 'ডেভিলস আইল্যান্ড'-এ যাওয়াটা?

আমি বললাম এবারে।

ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে বলল, এমনিতে বিপদ হওয়ার তো কথা নেই কোনও। তবে চাং ওয়ান যদি বিপদ ঘটাতে চায়, তবে আমরাও তার বিপদ ঘটাব। গায়ে পড়ে আমরা কিছুই করব না। তা ছাড়া আমরা তো কিছু তথ্যই সংগ্রহ করতে যাচ্ছি মাত্র।

চাং ওয়ান মানুষটি কে?

তিতির বলল।

জানবি জানবি, সবই জানতে পারবি সময়ে।

গুপ্তচরবৃত্তি বিপজ্জনক নয় কি?

ভটকাই বলল।

গুপ্তচরবৃত্তি হবে কেন? এই সমুদ্র, এই সব দ্বীপপুঞ্জ আন্দামান উপসাগর, বঙ্গোপসাগর সবই তো আমাদের। মানে ভারতেরই। এখানে বার্মা, থুরি মায়ানমার আর থাইল্যান্ড-এর বেশ কিছু মাছ-চোর আর কাঠ-চোরেরা এসে হামলা তো করেই চলেছে। তা ছাড়া আরও সাংঘাতিক কিছু করতে চলেছে তারা। মানে, চাং ওয়ান অ্যান্ড কোম্পানি। তাদের মদত জোগাতে পারে মেইনল্যান্ড চায়না, বা মায়ানমারের জঙ্গি সরকার। এমনকী পাকিস্তানও। সেই জন্যেই আমাকে এবারে এখানে আসতে বলা।

কে বলল আসতে?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

ইন্ডিয়ান নেভির ইন্টেলিজেন্স উইং।

ভারতীয় নৌবহর নিজে করতে পারল না কাজটা?

করতে পারত সহজেই। কিন্তু তাঁরা কারওকে বুঝতে দিতে চান না যে তাঁরা নিজেরা এই ষড়যন্ত্রর কথা বুঝতে পেরেছেন। মানে, ওঁরা যে ন্যাকা সেজে

রয়েছেন একথা আমাদের শত্রুদের বুঝতে দিতে চান না।

বাংলাদেশিরা আসে না এখানে মাছ চুরি বা কাঠ চুরি করতে?

আসত অবশ্যই। যদি এইসব উপসাগর ও সাগর বাংলাদেশের কাছে হত। তাদের দৌরাত্ম্য সুন্দরবন অঞ্চলে, বঙ্গোপসাগরের মুখে। তারা অবশ্য ডাকাতিতে পুরোপুরিই সিদ্ধহস্ত। চুরি করে পশ্চিমবঙ্গীয় সুন্দরবনে মাছ মারা, গাছ কাটা, ডাকাতি করা, বাঘ ও হরিণ মারা ইত্যাদি তো তারা নিয়মিতই চালিয়ে যাচ্ছে।

তা আমরা কী করছি?

ভটকাই বলল।

কী আর করব!

আমরা ভারতীয়রা বড় ম্যাদামারা। যারা যে ভাষা বোঝে, তাদের সঙ্গে যে শুধু সে ভাষাতেই কথা বলতে হয়, অন্য ভাষাতে যে তাদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করা যায় না, এই সহজ কথাটা আজ অবধিও আমরা বুঝে উঠতে পারলাম না। জানি না, কবে আমাদের চোখ ফুটবে।

ভটকাই বলল, যা বলেছ। আমাদের wave-length হচ্ছে, 'মেরেছ কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না?' আর সেই জন্যেই সকলেই আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে।

তোমার ওই 'সাংঘাতিক কিছুটা' কী ঋজুদা?

একটু যেন ভয় পাওয়া গলাতেই বলল, তিতির।

ঋজুদা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, হঠাৎ গলা নামিয়ে, প্রায় ফিসফিস করে বলল, দেখে আয় তো ভটকাই, আর ঘরের দরজার বাইরে কেউ আছে কি না?

বলেই বলল, দরজাটা এক ঝটকাতে খুলবি।

ভটকাই উঠে গিয়ে ঋজুদার ঘরের দরজাটা এক ঝটকাতে খুলেই মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে পাঁচ-সাত সেকেন্ড পরেই আবার বন্ধ করে দিল।

ও ভিতরে এলে, ঋজুদা বলল, দেখলি কী?

কেউ একজন দরজার সামনেই ছিল। সম্ভবত আমাদের কথা শুনছিল। হঠাৎ করে দরজা খোলাতে চমকে উঠে তাড়াতাড়ি রিসেপশানের দিকে চলে গেল।

লোকটাকে দেখতে পেলি কি?

হ্যাঁ। পেছন থেকে। এক ঝলক।

কী পোশাকে ছিল?

ফেডেড জিনস আর হলুদ গেঞ্জি।

কোনও বিশেষত্ব নজর করলি?

এক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে ভটকাই বলল, হ্যাঁ।

কী?

লোকটা একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে।

কোন পায়ে খুঁত?

দাঁড়াও, ভাবি একটু।

তারপরই বলল, ডান পাটা বোধ হয় একটু ছোট, বাঁ পায়ের চেয়ে।

মাথার চুলের ছাঁট কীরকম?

বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের চিনে-জুতোর দোকানের চিনেদের মতো।

হুমম্।

বলল ঋজুদা।

তারপর বলল, গায়ের রং কেমন?

ভটকাই বলল, ইট-চাপা ঘাসের মতো।

তার উপমা শুনে টান টান উত্তেজনার মধ্যেও ঋজুদা সমেত আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম।

চিনে হতে পারে?

ঋজুদা ভটকাইকে শুধোল।

হ্যাঁ। হতে পারে।

ঋজুদা আরেকবার বলল, হুমম্।

একটু পরে ঋজুদা বলল, কাল সকালে আরও তিনটি ম্যাপ আমাদের জন্যে পাঠিয়ে দেবে পোর্ট-ব্লেয়ারের ন্যাভাল কম্যান্ড থেকে। তবে দেখে মনে হবে, তিনটি বইই বুঝি। সেগুলো তোরা নিজের নিজের কাছে রাখবি, নিজের নিজের সুবিধে মতো দাগ বা চিহ্নও দিয়ে রাখবি। একজনের ম্যাপ অন্যকে দিবি না।

আমি বললাম, ঋজুদা; তোমার সঙ্গে সঙ্গে এ পর্যন্ত দেশে বিদেশে এত জায়গাতে এতরকম বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চারে গেলাম, কত জায়গার মানুষখেকো বাঘ, গুণ্ডা হাতি শিকার করলাম, গোয়েন্দা শিরোমণি হয়ে কত রহস্য ভেদ করলাম কিন্তু ঠিক এইরকম বিপজ্জনক কোনও মিশান-এ আমরা আগে এসেছি বলে আমার তো মনে পড়ছে না। পুব আফ্রিকার রুআহাতে, কিলালা এবং আন্তর্জাতিক চোরা-শিকারিদের সঙ্গে আমাদের রীতিমতো যুদ্ধই লড়তে হয়েছিল কিন্তু এই আন্দামানের ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম বলে মনে হচ্ছে।

ঋজুদা গম্ভীর হয়েই ছিল। গম্ভীরতর মুখে আমাদের দিকে চেয়ে বলল, তা ঠিক। এখন ভাবছি, একাই যাব পরশু। তোরা এই হোটেলেই থাক, মজা কর, যা যা দ্যাখার জায়গা আছে সব দ্যাখ-ট্যাখ, আমি ফিরে আসব দিন সাতেক পরে।

বললেই হল? আমরা কি...

ভটকাই তিতিরের মুখ থেকে কথা কেড়ে বলল, পোলাপান?

তিতির বলল, নো-ওয়ে। তোমাকে আমরা ছাড়ছি না, তুমিও আমাদের ছাড়ছ না। তবে একটাই অনুযোগ আমাদের। তুমি এবারে আমাদের একেবারে অন্ধকারে রেখে দিয়েছ।

ঋজুদা হাসল অনেকক্ষণ পরে। বলল, তোরা সকলে মিলে প্রার্থনা কর 'Let there be light.'

তারপরে বলল, যাও, নিজের নিজের ঘরে বিশ্রাম করো গিয়ে। তোমাদের নিয়ে বিকেলে বেরোব সাড়ে চারটেতে। 'অ্যাকোয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সে' যাব। সেখানে গিয়ে যার যা খুশি কোরো, সমুদ্রের জলে স্কুটার চালিও, ওয়াটার-স্কি কোরো, স্পিড-বোট চালিও, কিন্তু দেখো, দয়া করে সমুদ্রে ডুবে মরো না। লাইফ-জ্যাকেট পরে নেবে সকলেই, সমুদ্রের মধ্যে চিত-পটাং হলে যাতে তোমাদের উদ্ধার করা যায়। ওরাই অবশ্য জোর করে পরিয়ে দেবে।

ভটকাই বলল, আমরা কি পাগল? সবে চাং ওয়ান-এর আভাস পেলাম আর এখুনি জলে ডুবে মরব?' 'দ্য ডেভিলস আইল্যান্ড' না দেখেই।

ঋজুদা ভটকাই-এর কথার কোনও জবাব না দিয়ে বলল, ঠিক সাড়ে চারটেতে লবিতে দেখা হবে। যে টাটা সুমোটা আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে এসেছিল হোটেলে পরশু দিন সকালে, সেইটাই আসবে। লাল-রঙা।

ঠিক আছে।

বলে, আমরা তিনজন ঋজুদার ঘর থেকে চলে এলাম।

করিডর-এ বেরিয়ে তিতির বলল, দুপুরবেলাতে আবার বিশ্রাম কি? আমরা কি বুড়ো নাকি? ঋজুদা নিজেই খোরি বিশ্রাম নেবে। চলো সবাই আমার ঘরে।

ভটকাই বলল, চলো।

॥ ৪ ॥

তিতিরের ঘরে ঢুকে একজন ইজিচেয়ারে আর দু'জন খাটে উঠে বসলাম। একটা বালিশ টেনে নিয়ে ভটকাই বলল, আমার নাম ভটকাই, তোমার বালিশ চটকাই।

তিতির ভটকাই-এর বোকা বোকা রসিকতাতে কান না দিয়ে বলল, যাই বলো রুদ্র, ভাবতেই অবাক লাগছে যে ঋজুদার সঙ্গে আমরা কোথাও জাস্ট বেড়াতেই এসেছি। সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র নেই, টেনশন নেই, ছদ্মবেশ ধারণ নেই, শুধু খাওয়া-দাওয়া বেড়িয়ে বেড়ানো আর গল্প করা।

ভটকাই বলল, ওরকম বোলো না। Keep your fingers crossed.

আমি বললাম, বাবাঃ হলটা কী? এ যে দেখি সাহেব হয়ে গেছে। যখন তখন ইংরেজি ফুটোচ্ছে।

তিতির বলল, কিন্তু ও কথা কেন ভটকাই? হোয়াই শুড উই কিপ আওয়ার ফিঙ্গার্স ক্রসড?

কখন যে কোন নতুন মূর্তিমান এসে হাজির হয়ে ঋজুদার সাহায্য চেয়ে বসবে আর আমাদের বেড়াতে আসার বারোটা বাজবে তা আগে থেকে কে বলতে পারে! আমার তো মনে হয় যে 'দ্য ডেভিলস আইল্যান্ড'ই যথেষ্ট কমপ্লিকেটেড ব্যাপার।

তা যা বলেছিস। হাজারিবাগের মুলিমালোয়াঁতে বেড়াতে গিয়ে যেমন সেবারে ঋজুদার আর আমার অ্যালবিনো বাঘ আর জোড়া খুনের রহস্যভেদ করতে হল।

আমি বললাম।

কেন? পুরানাকোটে গিয়েই বা কী হল?? সাতকোশিয়া গণ্ড অভয়ারণ্য দেখতে গিয়ে কী সাংঘাতিক মানুষখেকো বাঘের সঙ্গেই না টক্কর দিতে হল তোমার আর ঋজুকাকার।

এবার তিতির বলল।

ভটকাই বলল, যাই বলিস রুদ্র, তোর লাকটাই আলাদা।

কেন?

আফ্রিকার সেরেঙ্গেটিতেই হোক, কি ওড়িশার পুরানাকোটে, আহত ঋজুদাকে তুইই তো বারবার বাঁচিয়ে হিরো হলি। আর আমি জিরোই রয়ে গেলাম।

বাঁচাতে না পারিস তুই আমাকে আর ঋজুদাকে মারার বন্দোবস্ত প্রায় পাকা করে ফেলেছিলি নিনিকুমারীর বাঘ মারতে গিয়ে।

তারপর বললাম, তা নয়, মানে আমি হিরো নই। মধ্যপ্রদেশের ঝিঙ্গাঝিরিয়াতে কী হল? ঋজুদা না বাঁচালে ঝিঙ্গাঝিরিয়ার বাঘ তো কম্মোফতে করে দিয়েছিল আমার।

সে কথা ঠিক। তবে it was very mean of you রুদ্র।

কোনটা? কীসের কথা বলছ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম তিতিরকে।

ঝিঙ্গাঝিরিয়াতে ভটকাইকে তো বটেই আমাকেও না নিয়ে যাওয়াটা।

বাঃ রে। সব জেনেশুনেও যদি আমাকে দোষী করো তো আমার বলার কিছুই নেই। আমি তো তল্পিবাহক। সব কম্মোই তো কর্তারই ইচ্ছায়।

ভটকাই, for a change, অত্যন্ত উদার এবং ন্যায়পরায়ণ হয়ে গিয়ে বলল, এ কথা তো আমাদের ভুলে গেলে চলবে না তিতির যে, রুদ্র রায়ই ঋজুদার আদি ও অকৃত্রিম সাগরেদ, অরিজিনাল। আমরা তো এসেছি অনেকেই পরে।

তিতির বলল, তা ছাড়া, এও ভুললে চলবে না, রুদ্রই সব ঋজুদা-কাহিনীগুলি লিখে ফেলে ঋজুদাকে সমস্ত বাঙালি পাঠক পাঠিকার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। আজ যে বাঙালির প্রতিটি দ্বিতীয় পরিবারের ছেলেদের মধ্যে একজন করে ঋজু পাওয়া যাচ্ছে এর পিছনে রুদ্রর লেখা ঋজুদা-কাহিনীগুলির অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। উই মাস্ট গিভ দ্য ডেভিল ইটস ডিউ।

ওসব কথা তো সকলেরই জানা। এসব কথা থামিয়ে বলো তো এখন ভটকাইবাবু আমরা যখন ঋজুদার ঘরে বসে ম্যাপ দেখছিলাম তখন যে লোকটা বন্ধ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল সে লোকটা কে?

সেটাই রহস্য। ঋজুদাও তো ভাঙল না। চাং ওয়ান না কার নাম বলল, সে নয় তো?

কী করে বলব বল? তোরা কি আর ঋজুদাকে জানিস না? যখন তার ইচ্ছে হবে তখনই এই রহস্য ফাঁস করবে। তার আগে জানার কোনও উপায়ই নেই।

এই 'দ্য ডেভিলস আইল্যান্ড'-এ আমরা যাচ্ছি কেন?

ভটকাই বলল।

আমার মনে হয়, গাছ-গাছালি পাখ-পাখালি চেনবার জন্যে। মাছও চেনা হতে পারে। কোরালও থাকতে পারে সেখানে।

তিতির বলল।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এটা কি আমাদের ফ্যামিলিয়ারাইজেশান ট্যুর?

সেইরকমই আর কী! আন্দামানে তো প্রতিবছরই কত বাঙালি বেড়াতে আসছে, হানিমুনে আসছে, তাদের দেখা আর ঋজুদার সঙ্গে যারা আসছে তাদের দ্যাখা তো কখনওই এক হতে পারে না। দ্যাখার যে অনেক রকম থাকে।

তা তো ঠিকই।

আমাদের কথার মধ্যে ঢুকে পড়ে ভটকাই বলল, দ্যাখ দ্যাখ রুদ্র, ওই নৌকোটাকে দ্যাখ। এখানে এসে অবধি দেখছি চারদিক খোলা অথচ ছাদওয়ালা মোটর বোটটা বালি বোঝাই করে আসছে, পোর্ট ব্লেয়ারের দিক থেকে, সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। সামনের ডান দিকের দ্বীপটার আড়ালে চলে যাওয়াতে সমুদ্রের ঠিক কোথায় যে যাচ্ছে তা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বালিগুলো কোথাও ফেলে দিয়ে আবারও ফিরে যাচ্ছে পোর্ট ব্লেয়ারের দিকে। এমন করে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত যাওয়া-আসা করছে। কালও দেখেছি। কেন? বলতে পারিস?

তিতির বলল, আমিও লক্ষ করেছি।

তারপর বলল, আমার মনে হয়, পোর্ট ব্লেয়ারে ড্রেজিং হচ্ছে, পাছে বন্দরের নাব্যতা কমে যায় তাই ড্রেজার বালি খুঁড়ছে এবং নৌকোটা সেই বালি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দূরের গভীর সমুদ্রে ফেলবে বলে। নয়তো...

ড্রেজার বালি তুললে এইটুকু নৌকোতে তা মোটেই আঁটত না। তা ছাড়া ড্রেজার বালি তুলে তার নিজের পেটেই রাখে তখনকার মতো। আমার মনে হয় ওই বালি রসস আইল্যান্ড বা ভাইপার আইল্যান্ড বা অন্য কোনও দ্বীপে বাড়ি ঘর বানাবার বা অন্য কনস্ট্রাকশানের কাজে লাগবে বলে নিয়ে যাচ্ছে নৌকোটা।

তিতির বলল।

আমি বললাম, চুলোয় যাক গে বালি-বোঝাই নৌকো। তার চেয়ে তিতির আমাদের মেগাপড পাখির কথা বলো। তুমি তো শুনলাম আন্দামান সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশোনা করে এসেছ।

ছাড়ো তো। ঋজুকাকার কথা! সবতাতেই বাড়িয়ে বলে।

মোটেই নয়, ঋজুদা যখন বলেছে তখন ঠিকই বলেছে। আমাদের তিনজনের মধ্যে তুমিই পণ্ডিত, কত পড়াশুনো তোমার, কতগুলো ভাষা জানো তুমি। আমি

আর রুদ্র হচ্ছি ঋজুদা অ্যান্ড কোম্পানির মাসল্‌মেন, দমাদ্দম গুলি চালিয়ে শত্রু সাফ করতে পারি আর তুমি হচ্ছ গিয়ে আমাদের থিংক-ট্যাঙ্ক।

আমাদের মস্তিষ্ক।

ভটকাই ফুট কাটল।

এরকম করে আমার পেছনে লাগলে আমি চললাম।

কোথায়?

ওই সামনের ছোট্ট জেটিতে গিয়ে বসে সমুদ্র দেখি গিয়ে।

সত্যি! কী সুন্দর না? জেটিটা। আগে নিশ্চয়ই ওই জেটি ব্যবহৃত হত সমুদ্র থেকে এই হোটেলে যাওয়া-আসার জন্যেই।

এখনও হতে পারে। কোনও কারণে হয়তো এখন তালা মারা আছে।

তালা মারা আছে অন্য কারণে।

ভটকাই বলল।

কী কারণে?

ব্যর্থ প্রেমিক আত্মহত্যা করতে পারে। ওইখান থেকে এক ঝাঁপ মারলেই তো কালাপানিতে প্রাণ যাবে। জল ওখানে কত যে গভীর বুঝতেই পারছ—হর্ষবর্ধনকে যখন কোল দিচ্ছে ওই খাঁড়ি। তা ছাড়া স্রোতও তো সেরকম। ঐরাবত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া লক্ষ করেছ যে কোনও তটভূমি নেই। দু'পাশের পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বইছে সমুদ্র। সমুদ্র আছে অথচ বালুবেলা নেই, ভাবা যায় না।

ভটকাই বলল।

আত্মহত্যার কথাটা খুব ভুল বলেনি ভটকাই। এত বড় হোটেলে দু'-একজন ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকা তো থাকতেই পারে।

তা ছাড়া, হানিমুনিং কাপলসও আসে অনেক।

তাদের মধ্যেও নতুন বিয়ে-হওয়া সেন্টিমেন্টের বড়িও কেউ কেউ থাকতে পারে।

আনকোরা নতুন স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেও আত্মহত্যা করতে পারে।

এই বে-আইল্যান্ড হোটেলই কী সবচেয়ে বড়?

পোর্ট ব্লেয়ারে?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল আমাকে।

আমি হেসে বললাম, তুই কি আমাকে আন্দামানের উপরে অথরিটি ঠাউরিয়েছিস না কি?

তিতির বলল, বড় তো বটেই, বনেদিও। আই.টি.সি'র এই হোটেল হওয়ার পরে অবশ্য অনেক ভাল ভাল হোটেল হয়েছে, সরকার এবং বেসরকারি। পিয়ারলেস কোম্পানি বড় হোটেল করেছেন একটা, সিনক্লেয়ারসও করেছেন শুনেছি। সরকারি নতুন হোটেলটিও চমৎকার—সমুদ্রর সৌন্দর্য যেখান থেকে আরও ভাল দেখা যায়। বে-আইল্যান্ড তো পোর্ট ব্লেয়ারের এক দিক থেকে আসা

সব জলযানেরই 'পোর্ট সাইডে' পড়ে। এই খাঁড়ি দিয়ে কলকাতা, মায়ানমার, ফিলিপিন্স ইত্যাদি জায়গা থেকে যে সব জাহাজ আসে সেই সব জাহাজ যায়, তা এই হোটেলে বসেই দেখা যায়। উলটোদিকের পাহাড়ের শেষ প্রান্তের লাইটহাউসটাও এখানে যাঁরা থাকেন তাঁদের উপরি পাওনা।

ভটকাই বলল, 'পোর্ট সাইড' মানে?

ওঃ। তিতির বলল, কোনও জাহাজ এমনকী এয়ারক্র্যাফটেরও বাঁদিককে বলে 'পোর্ট সাইড' আর ডানদিককে বলে—'স্টারবোর্ড সাইড।' যেহেতু প্রতিটি জাহাজ বা নৌকোর বাঁদিকটাই ডাঙার দিকে থাকে এবং বন্দর তো ডাঙাতেই থাকে, তাই বাঁদিকটার নাম পোর্ট সাইড। আর উড়োজাহাজও যেহেতু আকাশের জাহাজ তাদের বেলাও সেই একই নাম।

যেদিকে এয়ারপোর্ট সেটি এরোপ্লেনের পোর্ট সাইড। ওয়াটার craft-ই হোক কি এয়ার craft সকলেরই বাঁদিক ডানদিককে পোর্ট সাইড আর স্টারবোর্ড সাইড বলে।

ভটকাই বলল, মিস্টার রুদ্র রায়, কিছুদিন হল তোমার লেখার সমালোচকেরা বলতে আরম্ভ করেছেন যে তোমার লেখা নাকি বড় বেশি ইনফরমেটিভ। তাঁরা হয়তো ভুল বলছেন না।

সেটা কি দোষের?

আমি বললাম।

তাঁরা তো দোষেরই বলেন। জানি না, হয়তো অন্য কোনও দোষ খুঁজে পান না বলেই বলেন।

তিতির বলল, শিক্ষিত মানুষদের লেখা তো ইনফরমেটিভই হওয়া উচিত। বিশেষ করে রুদ্র যখন মুখ্যত কিশোরদের জন্যেই লেখে।

বাঃ তা কেন? রুদ্রর ঋজুদা-কাহিনীগুলো তো আমার দাদু থেকে পুঁচকে পটকাই সকলেই সমান আগ্রহ নিয়ে পড়ে দেখি।

তোমার ছোট ভাই স্নিগ্ধর ডাক নাম কি পটকাই না কি?

তা কেন হবে? ওর নাম স্নিগ্ধই। ডাক নাম স্নি। কিন্তু আমি ডাকি পটকাই বলে। তোরা আমাকে যখন তখন দুহাতে চটকাবি, বলবি, 'ওরে ওরে ভটকাই, আয় তোরে চটকাই' আর আমি আমার একমাত্র ছোট ভাইকে একটু পটকাব না। বাড়িতে আমি একাই ওকে পটকাই বলে ডাকি, মা এবং অন্য সকলের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও।

তিতির বলল, কারা রুদ্রর লেখাকে ইনফরমেটিভ বলে দোষারোপ করেন জানি না কিন্তু বাংলার শিশু ও কিশোর পাঠ্য সাহিত্যে ইনফরমেশানের অত্যন্তই অভাব ছিল। কিছু লেখকদের আই-কিউ, সাধারণ জ্ঞানের লেভেল, এতই নিচু যে, তাঁদের কাছ থেকে ইনফরমেটিভ লেখা আশাই করা যায় না। তার ফলে শিশু ও কিশোররা শুধু মনগড়া, আজগুবি এবং কষ্টকল্পিতই নয়, পুরোপুরি point less

সাহিত্য পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আজকাল বাংলা বই পড়ার প্রবণতা যে তাদের মধ্যে ক্রমশই কমে যাচ্ছে সে জন্যে লেখকদের একটি বড় অংশও কম দায়ি নয়।

এটা অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছ। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীতে গোয়েন্দা 'পিস্তল' নিয়ে খুনির ডেরাতে গিয়ে পৌঁছে কোমরের 'রিভলবার' দিয়ে দমাদ্দম গুলি ছোড়েন। এ একটা উদাহরণ দিলাম মাত্র। পিস্তল আর রিভলবারের মধ্যে যে তফাত আছে এবং তফাতটা কী তা কিশোর কিশোরীদের আরও অন্য অনেক কিছুরই মতো জানা উচিত। সব লেখকই তো আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা খগেন মিত্র নন। 'চাঁদের পাহাড়', 'মরণের ডংকা বাজে' বা 'ভোম্বল সর্দার' বা তারও আগে গিয়ে বলতে পারি ছবি-লেখা অবনঠাকুরের 'রাজকাহিনী'র মতো বই নেহাত সাহিত্যগুণেই উতরে যেতে পারে কিন্তু আজকালকার লেখকদের সব জোলো অন্তঃসারশূন্য পয়েন্টলেস লেখা কোন উপকারটা করে? সে সব লেখা কি তারা মনে করেও রাখে? পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো ভুলে যায়। ভুলে যায় শুধু তাই নয়, মনে হয়, ভুলে যেতে পারলে বেঁচে যায়।

তিতির বলল।

তোমরা এ কথা বলছ বটে তিতির কিন্তু সাহিত্য তো উপকারের উপাদান নয়। উপকার হওয়ার জন্যে কেউ বই পড়ে না। উপকার করার জন্যেও কেউ বই লেখেন না।

আমি বললাম।

তিতির বলল, ভুল কথা। কিছু জোর করে শেখানোটা সাহিত্য আদৌ নয়, সেটা আমি মানি কিন্তু যে সাহিত্যে কোনও আদর্শ নেই, কিছুমাত্র শেখবার নেই, কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র গঠনেরও কোনও ব্যাপারই নেই, সেই সাহিত্য আমাদের মতো কিশোর-কিশোরীরা না পড়লেও কিছুমাত্র যায় আসে না। শিক্ষণীয় যা, তা লেখার মধ্যে এমনভাবে মিশিয়ে দেওয়া উচিত যাতে পড়ুয়ারা বুঝতেই না পারে যে, তারা কিছু শিখছে। তবেই না তারা সে বই পড়বে। নইলে তো পাঠ্যপুস্তকেরই মতো তা পড়তে গাঁই গুঁই করবে। তাই না রুদ্র?

সেটা অবশ্য ঠিক।

আমি বললাম।

তারপরে বললাম, কে কী বলল তাতে আমার বয়েই গেল। ঋজুদা-কাহিনীগুলি আমি লিখি আমারই আনন্দের জন্যে। এই সব লেখাতে আমাদের দলের এই কজনের, ডাইরির মতো, দলিলের মতো, গ্রুপ ফোটোর মতো আমাদের এক এক জায়গার অভিযান, শিকার, রহস্য উদ্‌ঘাটনের স্মৃতি অথবা এবারের মতোই নিছক বেড়ানোরই স্মৃতি নথিবদ্ধ হয়ে থেকে যায়। অনেকদিন পরে যখন আমার লেখা বইয়ের পাতা ওলটাই কত পুরনো কথা,

পুরনো স্মৃতি চোখের সামনে জলজ্যান্ত ভেসে ওঠে—ওইটাই তো আমার এবং আমাদের মস্ত লাভ। অন্যে পড়ল কি পড়ল না তাতে বয়েই গেল!

॥ ৫ ॥

দারুণ জায়গা এই চিড়িয়াটাপ্পু। সত্যিই দারুণ। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে এখানে আসার পথটি ধরে এগোতে এগোতেই তা বুঝতে পারলাম। পথই যদি এত সুন্দর হয় তবে গন্তব্য না জানি আরও কত সুন্দর হবে।

পুরো পোর্ট ব্লেয়ারটিই একটি মস্ত দ্বীপ। পাহাড়, নদী এবং সৈকতে ভরা। উঁচু নিচু পথ দিয়ে চমৎকার নিসর্গর মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমরা পৌঁছব এই গভীর আদিম বনের মধ্যের ছায়াচ্ছন্ন চিড়িয়াটাপ্পুতে।

ঋজুদা বলছিল, এখানেও একটি সৈকত আছে শুনেছি কিন্তু তেমন সুন্দর নয়। রুক্ষ। স্নান করারও অযোগ্য। বেলাভূমি বলতে পুরী বা দিঘা বা গোয়া বা কোভালম যা বোঝায় তা ওখানে নেই কিন্তু আন্দামান, আন্দামানই। এই সব পাহাড়, নিবিড় বন এবং সমুদ্রর মধ্যে এক আদিমতার গন্ধ আছে। প্রাক্-ইতিহাস এখানে নীরবে কথা বলে।

পোর্ট ব্লেয়ারের বে-আইল্যান্ড হোটেল থেকে সকালে ব্রেকফাস্ট করে সাড়ে ন'টা নাগাদ সঙ্গে প্যাক-লাঞ্চ নিয়ে আমরা চিড়িয়াটাপ্পুর দিকে বেরিয়েছিলাম। ঋজুদা বসেছিল টাটা সুমোর সামনের সিটে। তার পাইপের গোল্ড ব্লক তামাকের সুগন্ধ আর আমাদের তিনজনের নানা সওয়ালের লাগাতার জবাবে টাটা সুমোর ভিতরটা ভরে উঠছিল। আমরা যেভাবে প্রশ্ন করছি তিনজন ঋজুদাকে সকালে এবং ঋজুদাও বিনা প্রতিবাদে জবাব দিয়ে যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে ঋজুদা যেন কোনও ট্যুর-অপারেটরের গাইড। পথের দু'পাশের সব কিছু দেখাতে দেখাতে, চেনাতে চেনাতে চলেছে। কারণ ওটাই তার কর্তব্যকর্ম।

ছাব্বিশ কিমি পথ। কিন্তু কী সুন্দর। উপরে ঘন নীল আকাশ। পথের এক পাশে নীল সমুদ্রর দাপাদাপি ও উচ্ছ্বাস কখনও দেখা যায় কখনও আবার উঁচু নিচু জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ি পথের আড়ালে সে মুখ লুকোয়। গাছেদের মধ্যে দেখলাম একমাত্র নারকোল গাছই চিনি এখানের আর সব গাছই প্রায় অচেনা। গাছপালা কিছু চিনি বলে মনের মধ্যে অজানিতে যে গর্বের বেলুন ফুলেছিল তা এখানে আসার পরই নিঃশব্দে ফেটে গেছে।

ঋজুদা শান্তিনিকেতনী কায়দায় গলা তুলে বলল, লাগল কেমন?

আমরাও সমস্বরে শান্তিনিকেতনী কায়দায় জোর গলাতে বললাম ভা—লো।

ঋজুদা বলল, আমরা যেখানে গিয়ে থামব চিড়িয়াটাপ্পুর শেষ প্রান্তে সেই জায়গাটার নাম কারবাইনস কোভ। দক্ষিণ আন্দামানের শেষ প্রান্ত হচ্ছে চিড়িয়াটাপ্পুর এই কারবাইনস কোভ। সেখানে সুন্দরবনের মতো ম্যানগ্রোভ জঙ্গল

আছে। সমুদ্রের মধ্যের পনেরোটা দ্বীপ নিয়ে প্রায় তিনশো বর্গমাইল জুড়ে একটি ন্যাশানাল পার্কও নাকি গড়ে উঠেছে ওই দক্ষিণ সমুদ্রে।

তারপরে বলল, আমরা কারবাইনস কোভ-এর ছায়া সুনিবিড় বনের কোনও বড় গাছের ছায়াতে বসে কফি খাব। কী রে তিতির? খাব তো? ফ্লাস্কে করে এনেছিস তো কফি? নাকি ভুলে মেরে দিয়েছিস?

তুমি কিচ্ছু ভেবো না। প্লাস্টিকের গ্লাস, দু' ফ্লাস্ক ভর্তি কফি, বালির উপরে বিছিয়ে বসার জন্যে তোয়ালে, এমনকী রাক্ষস দু'জনের জন্যে বিস্ক-ফার্মের চকোলেট বিস্কিটস পর্যন্ত।

সে কী রে! এই তো জম্পেশ করে ব্রেকফাস্ট খেলি কর্নফ্লেকস, দুধ, বেকন ও হ্যাম, কষে সরষে দিয়ে। গোটা দুয়েক করে টোস্টও তো খেলি দেখলাম সঙ্গে। আর এরই মধ্যে...

শুধুই টোস্ট ঋজুকাকা! তুমি জ্যাম আর মাখনের পুলটিসগুলো লক্ষ করনি টোস্টগুলোর উপরে? এক একটা এক এক ইঞ্চি। সত্যিই এরা রাক্ষস!

তিতির বলল।

তুমি ফিগার করো। সুন্দর ফিগার না হলে তো মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না আজকাল, আমাদের ডায়েটিং করার কী দরকার।

আমাদের খাওয়া নিয়ে খোঁটা দেওয়াতে রেগে গিয়ে বলল ভটকাই তিতিরকে।

আজকালকার মেয়েদের বিয়ে 'হয় না' মিস্টার ভটকাই।

চুল ঝাঁকিয়ে বলল তিতির।

তবে কী হয়?

আজকালকার মেয়েরা বিয়ে 'করে'। বিয়ে 'হওয়া' আর বিয়ে 'করার' মধ্যে বিস্তর তফাত মিস্টার ভটকাই।

বিয়ে কোনও ভদ্রলোক করে? যাদের জীবনে কিছুই করার নেই তারাই করার মধ্যে একটা বিয়ে করে ফেলে। ভাবা যায় না!

ভটকাই বলল, আক্রমণের সুরে।

আমি বললাম, তোমরা বড় দূরে চলে যাচ্ছ প্রসঙ্গ থেকে। হচ্ছিল ফিগারের কথা। আমি বলব, খাও, তারপর একসারসাইজ করে বার্ন-আউট করো। সেটাই সবচেয়ে ভাল।

ঋজুদা বলল, রাইট।

তারপরই বলল, ওই দ্যাখ, ওই গাছটা প্যাডক। এখানের বিশেষ গাছ। খুব বড় হয় গাছগুলো। এর কাঠেরও খুবই কদর।

বাবাঃ কী বড় গাছ রে বাবা! প্রাগৈতিহাসিক গাছ নাকি?

ভটকাই বলল।

এই প্যাডক আন্দামানের endemic। আসলে এখানের সব গাছই যে endemic তা তো নয়, যদিও সে দিন তাই বলেছিলাম। ভুল বলেছিলাম, অন্যমনস্কতায়।

উদ্ভিদও আছে এখানে প্রায় দুহাজার রকম। তার মধ্যে শুনেছি প্রায় আড়াইশো রকম endemic।

আর পাখি?

তিতির বলল।

প্রায় আড়াইশো রকম পাখি আছে তার মধ্যে প্রায় আশিটা endemic। প্রায় আশি রকম সরীসৃপও আছে। এই জঙ্গলে মাংসাশী জানোয়ার তো নেই তবে বিষধর সাপ আছে নানারকম। জলে এবং জঙ্গলে। হরিণ ছিল অগণ্য! এক সময়ে কেউ হরিণ শিকার করে হরিণের দুটি কান বনবিভাগে নিয়ে গিয়ে দেখালে তাকে শটগানের একটি গুলি, এল জি বা এস জি, আর দুটি করে টাকা দেওয়া হত। হরিণের জন্য আন্দামানে চাষবাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

আর এখন?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

এখন সব জায়গারই মতো কমে এসেছে হরিণের সংখ্যা। কমবেই। মানুষ যেখানেই বসতি করবে সেখানেই প্রকৃতির উপরে চাপ আসবে—পশু, পাখি, প্রজাপতি সবই কমে আসবে ক্রমশ। এমন সর্বভুক, সর্বগ্রাসী জানোয়ার বিধাতা তো আর দুটো তৈরি করেননি।

মেগাপড পাখির কথা সেদিন বলতে গিয়ে থেমে গেলে। বলো না ঋজুকাকা। মেগাপড কি একটাও দেখা যাবে না?

আছে হয়তো, আমার ঠিক জানা নেই, তবে সংখ্যাতে নিশ্চয়ই কমে গেছে, যদি থেকেও থাকে।

এখানে মেগাপড নামের একটি দ্বীপ আছে শুনেছি মেজোমামার কাছে।

তিতির বলল।

আছেই তো! একটি রেস্তোরাঁও আছে। এই সব দেখেই মনে হয় যে মেগাপড বোধহয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাই এখন দ্বীপের নাম আর রেস্তোরাঁর সাইনবোর্ডেই বেঁচে আছে। মেগাপড পাখি যে ডিম পাড়ে তা থেকে বাচ্চা ফুটে যখন বেরোয়, তখন তারা পুরোপুরিই স্বাবলম্বী। অনেকটা হাঁসের বাচ্চাদেরই মতো।

ভারী ওস্তাদ তো তারা। উড়তে পারে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই? হাঁসের বাচ্চারা যেমন সাঁতার কাটতে পারে।

ভটকাই জিজ্ঞেস করল ঋজুদাকে।

দূর। মেগাপড যে উড়তেই পারে না! আর উড়তে পারে না বলেই তো ওদের বংশ অত সহজে নাশ করতে পারল মানুষে। এই পৃথিবীর উপর তার একারই যে একমাত্র দাবি নেই, অগণ্য পশু-পাখি প্রজাপতি সরীসৃপের এমনকী পোকা-মাকড়েরও আছে, এই সহজ ও স্বাভাবিক সত্যটা মানুষে কখনওই যে মেনে নিতে পারল না।

ঋজুদা বলল।

এখন মানছে।

তিতির বলল।

না মেনে উপায় নেই বলেই মানছে। একেই বলে ঠেলার নাম বাবাজি।

ভটকাই যথারীতি ফুট কাটল।

ছাব্বিশ মাইল পথ, আমরা যেন আকাশ আর সমুদ্র, আদিম রেইন ফরেস্টস আর মানুষের লাগানো নারকোল বীথির মধ্যে উঁচু নিচু পথের নাগরদোলায় চেপে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসে পৌঁছে গেলাম চিড়িয়াটাপ্পুতে। পথটা ক্রমশ বনবীথিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল। দু'পাশ থেকে জঙ্গল চেপে ধরছিল, যেন চেপেই মারবে। জায়গায় জায়গায় আকাশও দ্যাখা যাচ্ছিল না। আর তার বদলে বনের চন্দ্রাতপ বিছিয়ে দিয়েছিল কোনও অদৃশ্য নিপুণ হাত যেন।

ঋজুদা বলল, আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি।

কারবাইনস কোভ-এ গাড়ি থেকে নেমেই ভটকাই বলল, যাই বল আর তাই বল ঋজুদা, আন্দামানকে তেমন করে উপভোগ করতে হলে বর্ষাকালে একবার আসতে হবে। বর্ষাকালে ওই দ্বীপপুঞ্জের চেহারাটা ঠিক কেমন হয়, সামুদ্রিক ঝড় আর বৃষ্টি কেমন করে ওয়াশিং-মেশিনের মতো একে ধোয়া-পাকলা করে তা নিজের চোখে একবার দেখবই।

ধোয়াটা তো জানি, পাকলাটা কী ব্যাপার?

তিতির জিজ্ঞেস করল ভটকাইকে।

ভটকাই হেসে বলল, ফরিদপুরিয়া শব্দ, এখন বাংলাদ্যাশি। আমার বড় ঠাকুমা ফরিদপুরের মেয়ে। তাঁর মুখেই শুনেছি এই ধোয়া-পাকলা শব্দবন্ধ। কচলে কচলে ধোয়াকে বোধহয় পাকলানো বলে।

আমি বললাম, ভটকাইকে চটকালে যেমন হয় আর কী!

সকলেই হেসে উঠল আমার সেই কথায়, মায় ভটকাইও।

সমুদ্র থেকে মৃদুমন্দ হাওয়া আসছে। কিছু দূরেই একটা দ্বীপ। সেদিকে ম্যানগ্রোভ বেশি। এদিকের বনের মধ্যেটাও যেন নিশ্ছিদ্র। প্রায় এই ডিসেম্বরের উজ্জ্বল সকালেও ঘোরান্ধকার। ছোট ছোট ঢেউ এসে কারওর আদরের মৃদু চাপড়ের মতো সমুদ্রবেলাতে চাপড়াচ্ছে আর অস্ফুট এবং নিরবচ্ছিন্ন শব্দ উঠছে একটা। আর সেই শব্দটাকে, গুলি লাগা জল-পাখির মতো মুখে করে কোনও অদৃশ্য গোল্ডেন-রিট্রিভার কুকুরের মতো হাওয়াটা নিমেষে নিয়ে আসছে আমাদের দিকে তারপর বনের গভীরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলছে শব্দটাকে।

ছটফট করাটা ভটকাই-এর স্বভাব। তিতির যখন শুকনো বালিতে, একটি মস্ত নাম-না-জানা গাছের তলাতে তোয়ালে পেতে কফির ফ্লাস্ক ও বিস্কিটের হ্যাম্পার বের করে চিরকালীন মেয়েলি দক্ষতাতে সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছে ঠিক সেই সময়ই ভটকাইচন্দ্র বলল, চল রুদ্র, জঙ্গলের ভিতরটা একবার ইনসপেক্ট করে আসি। তুই তো দেখছি বুড়ো মেরে গেলি।

ভেবেছিলাম, আন্দামান সম্বন্ধে তিতিরের মুখ থেকে কিছু শুনব, তা না সব ভেস্তে দিল ভটকাই। আমার মনে এ কথা আসার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ঋজুদাই 'ভেটো' প্রয়োগ করল। ভটকাইকে বলল, কোথায় যাবি মিছিমিছি সাপ-কোপের কামড় খেয়ে মরতে। কাল সকালেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে, একেবারে ভোরেই, এক কাপ করে চা খেয়ে 'দ্য ডেভিলস আইল্যান্ড'-এর উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছে যত ইচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার করিস তখন। তোর জন্যে রহস্যর মৌচাক ঝুলবে সেখানে গাছে গাছে তার উপর বিপদও থাকবে হয়তো নানারকম। আর চাং ওয়ানের বা উ থান্টের দয়া হলে তো কথাই নেই।

যে ভটকাই উত্তেজনার গন্ধ পেয়েই ফক্স-টেরিয়ার কুকুরের মতো উত্তেজিত হয়ে উঠে বাধ্য ছেলের মতো বসে পড়ল বিছানো-তোয়ালের উপরে।

তিতির বলল, উ থান্টকে আবার কোথা থেকে আমদানি করলে?

আমি বললাম, ঋজুদার প্যান্ডোরাজ বক্স-এ যে কত কিছুই থাকে। উ থান্ট তো কিছুই নয়।

ঋজুদা বলল, সব ঔৎসুক্যর নিরসন এক সঙ্গে হয়ে যাওয়াটা মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। সময়েই সব জানবে। এখন তিতির তোমাদের আন্দামান সম্বন্ধে কিছু জানাবে। আমি তো ওকে বলিনি হোমওয়ার্ক করে আসতে অথচ ও নিজের থেকেই করে এসেছে মাত্র দশদিনের নোটিসে। শিক্ষিত মানুষের দেশভ্রমণ আর অশিক্ষিতর দেশভ্রমণে তফাত থাকেই। তোরা তিতিরকে দেখেও কিছু শিখলি না যে এত দিনেও এটা ভেবেই দুঃখ হয়।

তিতির বলল, লজ্জা দিয়ো না ঋজুকাকা। যাই শেখার তার সবই তো তোমার কাছ থেকেই শিখেছি। রুদ্রও শিখেছে। রুদ্রও কি পড়েশুনে আসেনি? নিশ্চয়ই এসেছে। কিন্তু ও হল ছুপা-রুস্তম। আগবাড়িয়ে কিছু বলতে যায় না।

এবার আমি লজ্জা পেলাম। বললাম, জানিই না কিছু, তার বলব কী।

ভটকাই বলল, ভাবছ এখানে আমিই একমাত্র মূর্খ। কিন্তু আসলে তা নই।

যে হোম-টাস্কটা তিতির আর রুদ্র এবং ঋজুদাও বটেই, আমার জন্যে আগে ভাগে সেরে রেখেছে এবং রাখে সব সময়ই তা আমি নিজে কোন দুঃখে করতে যাব? সময়টা কাজে লাগানোর জন্যে, নষ্ট করবার জন্যে নয়। ম্যানেজমেন্টের কথা এটা, পার্সোনাল টাইম ম্যানেজমেন্ট।

আমরা সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলাম।

তিতির বলল, কোথায় পড়তে যাবে ম্যানেজমেন্ট? ভটকাই?

আমি তো আর বড়লোকের পোলা নই যে ইংল্যান্ড আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়াতে চলে যাব পাত্তির জোরে। আমাকে এন্ট্রান্স পরীক্ষাতে বসে জোকা, কি আহমেদাবাদ বা অন্য কোথাওই পড়তে হবে।

সেখানেও তো টাকা লাগবে পড়তে। তারা তো স্কলারশিপ দেয় না, যদিও দেওয়া অবশ্যই উচিত।

আমি বললাম।

সে টাকা জোগাড় হয়ে যাবে। তোরা সকলে মিলে দিবি ধার। নইলে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার নেব। আজকাল তো ব্যাঙ্কও ধার দিচ্ছে মেধাবী ছাত্রদের। আর তাও যদি না পাই তবে তোর পিস্তলটা একদিনের জন্যে ধার নিয়ে কোনও বড়লোকের নির্গুণ কোনও ব্যাটা বা জামাইকে ভড়কানি দিয়ে টাকা জোগাড় করে নেব। হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে। পড়িসনি?

ঋজুদা বলল, ভটকাই, তিতির তোকে আগেও একদিন বলেছে ও কথা। ভুলে মেরে দিয়েছিস দেখছি।

কী কথা ঋজুদা?

ইংরেজিতে 'এ' বলে কোনও উচ্চারণ নেই। ওটা হবে 'আ'। তা ছাড়া The শব্দটার উচ্চারণ 'দি'ও হয়, 'দ্য'ও হয়। কোনও স্বরবর্ণর শব্দর আগে the থাকলে তার উচ্চারণ হয় 'দি' আর ব্যঞ্জনবর্ণের আগে থাকলে হয় 'দ্য'।

স্বরবর্ণ মানে?

মানে, ভাওয়েল।

আর ব্যঞ্জনবর্ণ?

কনসোনেন্ট!

আমি বললাম।

বাংলা-মিডিয়াম স্কুলে পড়েও তো ইংরেজি ফোটাচ্ছে কম নয় দেখি। বাংলা শব্দ জানো না, ইংরেজি প্রতিশব্দ জানো।

ভটকাই হেসে বলল, ওই আর কী! তারপর বলল, থ্যাঙ্ক ইউ। পরে আর কখনও ভুল করব না। দি আউল, দ্য কাউ, দি এনিমি, দ্য ডেভিল্‌স আইল্যান্ড। ঠিক আছে?

আজকাল ভটকাই এসব কচ্ছে। সময়ের দাম সম্বন্ধে সে এতটাই সচেতন হয়ে উঠেছে যে, সেকেন্ডকে 'সেক', ঠিককে 'ঠি', দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সকে 'ডি স্কুল' বলছে। 'প্রোমো' 'রি-ক্যাপ' এসব তো বলছেই।

অবশ্য সকলেই আজকাল তাই বলছে। হঠাৎ-ই সময়ের দাম এত বেড়ে গেল কেন তাই ভাবছিলাম আমি। যে সময়টা মানুষ এখন নানাভাবে বাঁচিয়ে ফেলছে, ই-মেইল, ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে, সেই উদ্বৃত্ত সময় নিয়ে মানুষ কী করছে, কোন কোন বিশেষ কাজে লাগাচ্ছে তা জানতে খুবই ইচ্ছে করে। ইনফরমেশান টেকনোলজির এই রমরমার দিনে, যোগাযোগের এতরকম সুবিধে পেয়ে আমরা মানুষ হিসেবে কতটুকু উন্নতি করেছি আগের থেকে সে বিষয়ে একটা সমীক্ষা অবশ্যই হওয়া উচিত। মনুষ্যত্বর উন্নতি হয়েছে না অবনতি, সেটাও জানা অবশ্যই প্রয়োজন।

ভাবলামই। সব কথা, সব জায়গায়, সব সময়ে সকলকে বলা যায় না।

আমার ভাবনার ঘোর কাটিয়ে দিয়ে ঋজুদা বলল, এবারে এক কাপ করে কফি

খেয়ে গায়ে জোর করে নিয়ে তিতির দিদিমনির দেওয়া আন্দামানের Intro শোনার জন্যে তৈরি হও।

বলেই, ভটকাই-এর দিকে চেয়ে বলল, কী রে! পার্সোনাল টাইম ম্যানেজার, শিখেছি কি একটু একটু?

ভটকাই লজ্জা পেয়ে বলল, ভাল হচ্ছে না কিন্তু ঋজুদা।

কফি আর বিস্ক-ফার্মের চকোলেট ক্রিম বিস্কিট এবং নোন্তা বিস্কিট খাওয়ার পরে ঋজুদা বলল, এবারে শুরু কর তিতির।

হুঁ। বলে, তিতির যেন শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে বসে ছোট ছেলেমেয়েদের বাংলা পড়াচ্ছে এমনি ভাবে শুরু করল। তিতিরের মধ্যেই একজন বর্ন-দিদিমনি আছেন। পড়াশুনো শেষ করে ও অধ্যাপনাই করবে এমনই ওর ইচ্ছা যে, সে কথা আমাকে বহুবার বলেওছে।

তিতির বলল, আমি কিন্তু নিকোবর সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারব না এখন। নিকোবর গ্রুপে আছে গ্রেট নিকোবর, কাচাল, নানকৌড়ি, চাওরা, টেরিজা এবং ক্যাম্পবেল বে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ নর্থ আন্দামান, সাউথ আন্দামান, মিডল আন্দামান ও লিটল আন্দামান নিয়ে। চিড়িয়াটাপ্পুর এই কারবাইনস কোভ, সাউথ আন্দামানের দক্ষিণের একেবারে শেষাংশ। আন্দামানের মধ্যে অনেকেই দেখার মতো দ্বীপ আছে যেমন জলিবয়, আমরা দেখেছি সাউথ সিনক, রেড স্কিন, মধুবন, রসস, ইত্যাদি ইত্যাদি। ওই সব সুন্দর ছবির মতো দ্বীপের কোনওটিতেই বিদেশিদের রাতে থাকার অনুমতি মেলে না। দেশিরাও যাঁরা যান দিনে দিনেই ফিরে আসেন। রাতে জনমানবহীন এইসব সুন্দর দ্বীপে ডাইনি জ্যোৎস্নার মধ্যে বোধ হয় পরী আর মৎস্যকন্যারা জলকেলি করে বেড়ায়। ভাবলেও গা ছমছম করে। না?

বিদেশিরা থাকতে পারে না বটে কিন্তু ঋজুদার বন্ধু চাং ওয়ান বা উ থান্টদের কথা আলাদা।

আলাদা বলেই তো আমরা কাল যাচ্ছি 'দ্য ডেভিলস আইল্যান্ডে'।

আমি বললাম।

ভটকাই বলল, জাস্ট আ সেক তিতির।

ঋজুদা বলল, বাবাঃ ভটকাইচন্দ্র যে ভারী সাহেব হয়ে উঠল রে রুদ্র। কী করা যায়?

তাই তো দেখছি।

আমি বললাম।

কী বলছ, বলো?

তিতির বলল।

আন্দামান নামের কোনও ইতিহাস আছে কি?

অবশ্যই আছে। অনেকের মতে লর্ড হনুমান বা হনুমান থেকেই এই দ্বীপপুঞ্জের নাম হয়েছে আন্দামান।

কেন হনুমান আবার এর মধ্যে এল কী করতে? তুমি কি বি জে পি-তে যোগ দিলে না কি?

না, যোগ দিইনি। কিন্তু দিলেও বা দোষের কী? বি জে পিও তো দেশের একটি স্বীকৃত দলই। পশ্চিমবঙ্গের মতলববাজ আঁতেলরা তাঁদের নিজ নিজ গূঢ় স্বার্থর কারণে কী ভাবেন বা কী বলেন তা নিয়ে আমার কোনওই মাথাব্যথা নেই। হনুমান এলেন এই জন্যে যে অনেকের ধারণা হনুমান লঙ্কাতে লাফ দিয়ে যাবার সময়ে তাঁর, মানে হনুর 'ধাপ' অর্থাৎ পা পড়ত এই দ্বীপশিরে। মানে, ইংরেজিতে থাকে বলে স্টেপিং-স্টোন আর কী!

একটু থেমে তিতির বলল, আন্দামান তো আর সল্টলেকের জলার দ্বীপ নয়। এ বহু পুরনো ব্যাপার। রামায়ণে তো এর উল্লেখ মেলেই। টলেমি ও জেরিনির লেখাতেও এর উল্লেখ মেলে।

ভটকাই বলল, রামেরই অস্তিত্ব নেই আর রামায়ণ।

তিতির বলল, তা বটে! মহম্মদ, যিশুখ্রিস্ট, গৌতম বুদ্ধ, সকলেই ছিলেন, সকলেই মান্য, শুধু রাম বলেই কেউ ছিলেন না। ভারতবর্ষ দেশটা সম্বন্ধে যাদের সামান্যতম ধারণাও আছে তারা এমন গণ্ডমূর্খের মতো কথা কখনও বলবেন না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটা ভারতবর্ষের বাইরে নয়, সেখানে কোনও অন্য গ্রহের জীবেদের বাসও নয়। ঋজুকাকার সঙ্গে বারবার ভারতদর্শন করার পরেও যে তুমি এমন মূর্খের মতো কথা বলতে পারলে তা দেখে আমি অবাক হচ্ছি।

ঠিক আছে। উইথড্র করছি কথাটা। আগে বাড়ো।

রোম্যান জিওলজিস্টরা তাঁদের তৈরি করা বিশ্বর মানচিত্রে এই দ্বীপের উল্লেখ করেছেন 'গুড ফরচুন' বলে। তারপরে বিখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পর্যটক হিউয়েন সাঙও তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ করেছেন নগ্ন মানুষের দেশ বলে। চোল রাজারা তাঁদের তাঞ্জোর শিলালিপিতেও একে 'Nakkavaram', মানে, নগ্ন মানুষের দেশ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে অনেকেরই ধারণা আন্দামান নামটি এসেছে মার্কো পোলোর উল্লিখিত Andamnian থেকেই।

পোর্ট ব্লেয়ার কি কারও নামানুসারে হয়েছে? ব্লেয়ার কি কোনও সাহেবের নাম ছিল?

আমি বললাম।

রাইট।

তিতির বলল। তারপর বলল, সতেরোশো ঊনব্বুইতে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস-এর জমানাতে তিনি হাইড্রোগ্রাফার, ক্যাপ্টেন আর্চিবল্ড ব্লেয়ারকে বাংলা থেকে পাঠান এই দ্বীপপুঞ্জে সমুদ্রের ম্যাপ করতে। ডাঙায় যেমন ভূতত্ত্ববিদ, সমুদ্রে তেমন সমুদ্রতত্ত্ববিদ। হাইড্রোগ্রাফির বাংলা কি ঠিক বললাম ঋজুকাকা?

আমি কি তোর চেয়েও পণ্ডিত?

পাইপ ধরাতে ধরাতে বলল ঋজুদা। একটু হেসে।

তারপর বলল, কলকাতাতে ফিরে শঙ্খদার সঙ্গে কথা বলিস। ফোন নাম্বার দিয়ে দেব।

কে শঙ্খদা? শঙ্খ চৌধুরী? স্কালপটার?

না রে! তিনি তো দিল্লিতে থাকেন। কবি শঙ্খ ঘোষ। ফরফরিয়ে বেড়ান অনেকেই চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে অল্পজলের পুঁটি মাছের মতো। কিন্তু বাংলা ভাষাটাকে গুলে খেয়েছেন শঙ্খদা। নীরেনদাকেও জিজ্ঞেস করতে পারিস। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তবে শঙ্খদার মতো অমন প্রচার বিমুখ, লাজুক, কবিসুলভ কবি জীবনানন্দর পরে সম্ভবত বাংলাতে আর কেউই হননি।

তারপর বলল, বল তিতির। ভাগ্যিস তুই ছিলি। কত কী জানছি বল তো?

তিতির কপট রাগের সঙ্গে ঋজুদাকে শাসন করে বলল, ভাল হচ্ছে না কিন্তু ঋজুকাকা।

বলেই, শুরু করল, আর্চিবল্ড ব্লেয়ার চ্যাথাম আইল্যান্ডে এসে আস্তানা গাড়েন। চ্যাথাম আইল্যান্ড, যেখানে করাত কল আছে, এই দ্বীপপুঞ্জেরই একটি দ্বীপ এবং তা আন্দামানের মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যেই পড়ে। দুই দ্বীপের মধ্যে একটা ছোট সেতুরই ব্যবধান মাত্র। সেই আর্চিবল্ড ব্লেয়ারের নামেই নাম হয় এই দ্বীপের, পোর্ট ব্লেয়ার।

তারপর একটু থেমে বলল, সেদিন আমাদের হোটেলের সামনে দিয়ে যে হর্ষবর্ধন জাহাজ গেল বন্দরে তা পোর্ট ব্লেয়ারের 'হ্যাডো হার্ফ' বন্দরে। অন্যদিকে ভিক্টোরিয়া। দুইই পোর্ট ব্লেয়ারেই। পোর্ট ব্লেয়ারের পত্তন হবার পরে মনে হয় স্কটসম্যানদের আধিপত্য ছিল এখানে নইলে দেখলে না শহরের মধ্যে এত স্কটিশ জায়গার নামের ছড়াছড়ি! অ্যাবারডিন বাজার।

ভটকাই হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, বাবারে! আর তিতির দিদিমনির জ্ঞান ভাল লাগছে না। চলো ঋজুদা সকলে বনের মধ্যে কিছুটা হেঁটে আসি। ফরেস্ট বাংলোতে গিয়ে যে লাঞ্চ খাব, খিদে করতে হবে না?

কথাটা মন্দ বলেনি ভটকাই। তোর সেকেন্ড ক্লাস হবে লাঞ্চের সময়ে চিড়িয়াটাপ্পুর বন-বাংলোতে। বুঝলি তিতির।

ঠিক আছে। ভালই হল। তুমিই তো ক্লাস নিতে বাধ্য করলে আমাকে। লাঞ্চের পরে রুদ্রর গান শুনব। যে যার মতো করে জেনে নেবে যা সে জানতে চায়, জোর করে জানানোর কোনও মানেও হয় না, ফতেপুর সিক্রি বা তাজমহলের বা আগ্রা ফোর্টের গাইডদের মতো।

ঠিকই বলেছিস।

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, ভটকাই-এর যদি আন্দামান সম্বন্ধে আরও জানার ইচ্ছে থাকে তো সে জেনে নিজেই নেবে। তুই উলুবনে মুক্তো ছড়াতে যাবি কোন দুঃখে।

॥ ৭ ॥

ঝকঝক করছে রোদ্দুর দিগন্তলীন নীলচে কালো সমুদ্রে আর সুনীল আকাশে। হু হু করে হাওয়া এসে আমাদের চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে। আমরা মোটর বোট-এর ছাদে বসে আছি সাদা ডেকচেয়ারে। এখন এগারোটা বাজে প্রায়। আমরা মানে, ঋজুদা আমি আর তিতির। তিতির উড়াল চুলের পাগলামি থামাতে মাথায় একটা সিল্কের লাল-রঙা স্কার্ফ বেঁধেছে। ভটকাই বোটের একেবারে সামনে ক্যাপ্টেন ভাদেরা যেখানে স্টিয়ারিং-এর সামনে বসে আছেন সেইখানে গিয়ে জমেছে। এরোপ্লেনের মতো না হলেও সেখানে আধুনিক গাড়ির ড্যাশবোর্ড-এর চেয়ে অনেক চওড়া ড্যাশবোর্ডে নানারঙা আলো জ্বলছে এবং নিভছেও। কমলা, লাল, নীল, সবুজ এবং লাল। কী করে মোটর বোট চলে এবং তাকে চালানো হয় সেই রহস্য জানবার জন্যই সেখানে গেছে ভটকাই। গেছে ভাল কথা কিন্তু আমার মতো ইঞ্জিনিয়ারিং না করলেই হয়। ভাবছিলাম আমি। বড় পিসেমশাই-এর একটি দারুণ ট্যাঁকঘড়ি ছিল। আমার ছেলেবেলাতে তিনি বম্বে থেকে একবার কলকাতাতে যখন এসেছিলেন পুজোর সময়ে তখন সেই দারুণ ঘড়ির মধ্যের যন্ত্রটা কী করে টিক টিক করে তা জানার উদগ্র উৎসাহে সেটাকে কয়লাভাঙা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙেছিলাম। তারপরে অবশ্য আমার পিঠও ভেঙেছিল। ভটকাই এর যন্ত্র সম্বন্ধে উৎসাহের পরিণতি আমার মতো করুণ না হলেই হল।

ঋজুদার মাথায় স্ট্র-হ্যাট। ঋজুদা সাহেবদের চেয়েও সুন্দর দেখতে আর তার স্মার্টনেসের কোনও তুলনা নেই। একটা ফেডেড জিনস আর হালকা মেরুন-রঙা কলারওয়ালা গেঞ্জি পরেছে। দারুণ দেখাচ্ছে। তিতির ফোটো তুলল একটা ওর ক্যামেরা দিয়ে।

আমার ফোটো তুলে ফিল্ম নষ্ট করিস না। ডেভিলস আইল্যান্ডে অনেক কাজে লাগবে। সেখানে ফিল্ম ফুরিয়ে গেলে তো আর পাবি না। জানিস, আমার ভাবতেই ভাল লাগছে যে অনেক দিন পরে সমুদ্রে মাছ ধরতে পারব।

কী করে ধরবে? এই বোটে বসে? এত লম্বা লাইন কি তোমার হুইলে আছে? আমি বললাম।

লাইন অনেকই লম্বা, মাছকে খেলাতে হবে না? তা ছাড়া এটা কি তোর পুনুদাদার সিঙ্গুরের পুকুর। এ যে সমুদ্দুর রে! এখানের মাছেদের ব্যাপারই আলাদা। তবে ধরব তো ওই জলি-বোটেই বসে। বলেই, হাতের পাইপটা দিয়ে বোটের পেছন দিকে দেখাল। দেখি, সত্যিই তো! এতক্ষণ খেয়াল করিনি একটা ছোট নৌকো, সাদা রঙা, বসে আছে সাদা রাজহাঁসের মতো সেখানে। বোট সমুদ্রে 'কাপুত' হলে এই ছোট নৌকোই লাইফ সেভিং বোটের কাজও করবে হয়তো। ভার্সেটাইল বোট।

অতটুকু নৌকোতে? ডুবে যাবে যে!

তিতির চিন্তিত হয়ে বলল।

ডুবব না রে, ডুবব না। তা ছাড়া বেশি গভীরে তো আর যাব না। দ্বীপের আশেপাশেই থাকব এবং বোটেরও কাছাকাছি। ডুবে গেলে তোরা উদ্ধার করবি।

কত বিপদে আর ফেলবে আমাদের তুমি আন্দামানে বেড়াতে এনে। চাং ওয়ান, উ থান্ট, ডেভিলস আইল্যান্ড তার উপরে আবার নৌকাডুবি?

তিতির বলল।

খুব জোরে হেসে উঠল ঋজুদা। এবং সেই হাসির শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই ভটকাই এসে হাজির হল রঙ্গমঞ্চে। নীচ থেকে। এসেই স্ট্রেট তিতিরকে বলল, নটিক্যাল মাইল কাকে বলে বলো তো? জলে বা আকাশে তো ডাঙার মাইল বা কিমি দিয়ে দূরত্ব মাপা হয় না, নটিক্যাল মাইলেই হয়। কিন্তু নটিক্যাল মাইল ব্যাপারটা কী?

তাই? সে তো আমরা জানিই।

তিতির বলল।

আমি বললাম, তুই কি ক্যুইজ-মাস্টার নাকি? তাও যদি অমিতাভ বচ্চনের মতো ক্রোড়পতি করতে পারতিস তো বুঝতাম।

ভটকাই আমাকে পাত্তা না দিয়ে তিতিরকেই বলল, তা তো জানি। এক মাইলে কত মিটার বলো তো?

তিতির বলল, মিটার বলতে পারব না তবে সতেরোশো ষাট গজে এক মাইল যে সেটা জানি। মিটারে কনভার্ট করে নাও।

আর নটিক্যাল মাইলে?

আমরা সকলেই কবুল করলাম যে, জানি না।

ভটকাইকে খুব খুশি দেখাল।

তিতির বলল, তুমি কি ক্যাপ্টেন ভাদেরাকে এইসব জিজ্ঞেস করেছিলে না কি? ভালই!

'দ্য ডেভিলস আইল্যান্ডে' আর পৌঁছনো হবে না আমাদের, তার আগেই বোটের ক্যাপ্টেন নিজের প্রাণ বাঁচাতে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবেন। প্রথম থেকেই অমন অত্যাচার শুরু করো না। সইয়ে সইয়ে করো। তোমাকে আমরা সইয়ে নিয়েছি 'নতুন' মানুষে পারবেন কী করে!

তিতির বলল।

হায়। হায়। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।

ভটকাই বলল।

তারপর বলল, আমি কি একার জন্যে জ্ঞানভাণ্ডার বাড়াচ্ছি নাকি আমার?

ঋজুদা হেসে ফেলল। বলল, ভালই বলেছিস। জ্ঞানভাণ্ডার! শুনেছিস রুদ্র?

শুনছি তো। আর ভাবছি, কী ছিল আর কী হল এ ছেলে?

ভটকাই একপাক নেচেই গেয়ে উঠল।

'অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু, গোদা রে—এ-এ-এ

কোথায় ছিল? কে আনিল? অস্তি গোদা-আ-আ-'

তিতির বলল, থামো। থামো। ক্যাপ্টেন আর ক্রুরা ভাববেন বোটে ডাকাতই পড়েছে বুঝি।

পরক্ষণেই ভার্সেটাইল ভটকাই প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল, দুপুরের খাওয়াটা জমে যাবে। কিচেন ইনসপেকশান করে এলাম। কুককেও ইন্টারভিউ করে এলাম। ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে ইদ্রিস আলি। স্ক্র্যাম্বলড এগস, টোস্ট, কমলালেবু, হর্ষবর্ধনে করে এসেছে কলকাতা থেকে, আর সাউথ ইন্ডিয়ান কফি। আধপেটাই খেতে হবে।

আর দুপুরে?

তিতির বলল।

বলব না। খাটাখাটনি সব আমি করব আর খাবে তোমরা। নিজেরা যাও, খোঁজখবর করো। খাটো, খাটো, উ্য মাস্ট আর্ন ইওর লাঞ্চ।

আমাকে ধমকেই বলল ভটকাই।

ঋজুদা আবার হেসে ফেলল, বলল, আমাদের আসল বিপত্তি দেখছি চাংওয়ানও নয়, উ থান্টও নয়, এই ভটকাইই।

তিতির হেসে বলল, ঠাকুর, রক্ষা করো।

আমি বললাম, সদ্য শেখা জ্ঞানটা এবারে আমাদের বিতরণ করে দে।

কী?

নটিক্যাল মাইলের রহস্য।

ও হ্যাঁ। Nautical মাইল অথবা কিমি দিয়েই আকাশ বা সমুদ্রর দূরত্ব মাপা হয়। ব্রিটিশরা নটিক্যাল মাইলকে 'অ্যাডমিরালিটি মাইল'ও বলেন। ব্রিটিশ মতে, এক নটিক্যাল মাইলে ছ হাজার আশি ফিট বা এক হাজার আটশো তেপান্ন, পয়েন্ট দুই মিটার। ইউ এস এ তে উনিশশো উনষাটের পয়লা জুলাই থেকে যে নটিক্যাল মাইল মানা হচ্ছে তা হল ছ হাজার ছিয়াত্তর পয়েন্ট এক এক পাঁচ ফিট বা আঠারোশো বাহান্ন মিটার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম সমুদ্র আর আকাশের জন্যে দূরত্বর অন্য মাপের প্রয়োজন হল কেন? ডাঙার মাপ কী দোষ করল?

ভটকাই চুপ করে রইল।

তিতির বলল, ঋজুকাকা তুমি কি জানো?

ঋজুদা বলল, ঠিক বলতে পারব না। তবে মনে হয় যে, পৃথিবী তো পুরোপুরি গোল নয়, মানে, যাকে perfect sphere বলা চলে আর কী। তাই বোধহয় সমুদ্র বা আকাশের দূরত্ব মাপতে অন্য পন্থা নিতে হয় এবং মাপের তারতম্যও ঘটে। আমি ঠিক জানি না। তবে আমি শুনেছিলাম যে এক নটিক্যাল মাইল বা 'নট' আমাদের ডাঙার মাইলের চেয়ে আটশো মিটার বেশি। ভটকাই ভাল বলতে

পারবে।

ঋজুদাও জানে না, এমনও যে অনেক কিছু আছে, তা জেনে অবাক হলাম আমরা সকলেই। আবার আশ্বস্তও হলাম, ঋজুদা সর্বজ্ঞ নয় বলেও। ঋজুদা নিজে অবশ্য সব সময়েই বলে, জ্ঞানের সীমা চিরদিনই ছিল, অজ্ঞতাই চিরদিন সীমাহীন।

ভটকাই বলল, তোমার নারী বালতিওয়ালা এক নম্বরের গুলবাজ।

নারীও নয় বালতিওয়ালাও নয়, নারি বাটলিয়ালা। কিন্তু গুলবাজ কেন?

কই? আমাদের তো ম্যাপ পাঠাল না।

পাঠায়নি বুঝি? তা পোর্ট ব্লেয়ারে থাকতে থাকতেই মনে করাবি তো! যাকগে, ভাল মনে করেছিস, নীচের কেবিন থেকে আমার ম্যাপটা নিয়ে আয় তো। টেবিলের উপরে রাখা আছে।

ভটকাই ম্যাপটা নিয়ে এলে ডেকচেয়ার থেকে নেমে ডেকের উপরে বাবু হয়ে বসে ম্যাপটা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, দ্যাখ এবারে। ভটকাই ম্যাপের কথাটা মনে করিয়ে ভালই করেছে।

তারপর ম্যাপে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, এই দ্যাখ, আমরা এখন সমুদ্রের এইখান দিয়ে যাচ্ছি।

এটা কি বঙ্গোপসাগর?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

না। 'বে-আইল্যান্ড' হোটেলের সামনে যে সমুদ্র দেখা যায় তা বঙ্গোপসাগর। আমরা কিছুক্ষণ আগে বঙ্গোপসাগর ছেড়ে আন্দামান উপসাগরে এসে পড়েছি। পড়ে, উত্তর পুবে যাচ্ছি। ডেভিলস আইল্যান্ডের দিকে। এবারে দ্যাখ, এই মায়নামার, মানে আগের বার্মা, আর এই হচ্ছে থাইল্যান্ড। আন্দামান উপসাগরের বেশ কাছেই থাইল্যান্ডের টেনাসেরিস অঞ্চল। আর ওই দ্বীপপুঞ্জ থেকে আসে থাই জাহাজ আর ট্রলারগুলো।

তারপর একটু চুপ করে থেকে পাইপে দু'টান মেরে বলল, তোরা মগ দস্যুদের নাম শুনেছিস? 'মগের মুল্লুক' বলে কথাই আছে। মগ বাবুর্চিরাও বিখ্যাত পৃথিবীময়।

বর্মীদের, থুরি মায়নামারের মানুষেরই তো আরেক নাম মগ। বাংলাদেশের চাটগাঁওর আর মায়নামারের আরাকানের বাবুর্চিদের হাতের খানা যে না খেয়েছে তার জীবনই বৃথা।

ভটকাই বলল, ইদ্রিস আলিকে জিজ্ঞেস করব তো তার বাড়ি চাটগাঁয়ে কী না!

ঋজুদা তারপরে বলল, ভাল করে ম্যাপে লক্ষ করে দ্যাখ, মায়নামারের প্রধান নদী ইরাবতীও আমাদের গঙ্গারই মতো অনেক ছোট বড় ব-দ্বীপ সৃষ্টি করে নানা নামে, নানা শাখা-উপশাখাতে বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে এসে পড়েছে।

মায়নামার থেকে মাছ ধরা ট্রলার ও জাহাজ যে শুধু আন্দামান উপসাগরে চলে আসে তাই নয়, তারা বঙ্গোপসাগরেও চলে যায়। এই দ্যাখ, উত্তর আন্দামানের

এই কোকো দ্বীপ থেকে মায়নামারের প্রেপারিস দ্বীপ খুবই কাছে। গাল্ফ অফ মার্তাবন হয়ে আসে চোরারা। শান্তির সময়ে শুধু মাছ চোরেরাই আসে আর যুদ্ধ লাগলে শত্রুপক্ষ এইসব দেশকে হাত করে তাদের যুদ্ধজাহাজ আর সাবমেরিনও ওই দিক দিয়েই পাঠাবে। এবারে দ্যাখ, আমার নিজের হাতে আঁকা এই ছোট্ট পুটকিটা, যা ছাপা ম্যাপে নেই। এই হচ্ছে 'ডেভিলস আইল্যান্ড'। ডেভিলস আইল্যান্ড থেকে মায়নামার এবং থাইল্যান্ড এই দু' দেশের থেকে আসা সব জলযানের উপরেই নজর রাখা যায়। শুধু তাই নয়, ডেভিলস আইল্যান্ডে একটা গুহা আছে মস্ত বড়, সেটার এক মুখ সমুদ্রের দিকে, অন্য মুখ ডাঙাতে। আদিম জঙ্গলের গভীরে।

তুমি এমন করে বলছ ঋজুকাকা, যেন তুমি সেখানে গেছো অনেকবার আগে, নিজের চোখেই সব দেখেছ।

তিতির বলল।

নিজের চোখেই দেখেছি, তবে সশরীরে যাইনি। নারি আমাকে ভি ডি ও ফিল্ম দেখিয়েছিল, গতমাসে, যখন কলকাতাতে এসেছিল।

তাই?

আমরা সমস্বরে বললাম অবাক হয়ে।

হ্যাঁ।

ডেভিলস আইল্যান্ড-এর ওই গুহাটার কথা বললে কেন ঋজুদা? ওর বিশেষ কোনও তাৎপর্য আছে কি?

আছে।

তারপর বলল, তোরা কেউ 'গানস অফ নাভারোন' ছবিটা দেখেছিলি? গ্রেগরি পেক, অ্যান্থনি কুইন এরা সব ছিলেন যে ছবিতে।

আমি আর তিতির বললাম, একবার নয়, বহুবারই দেখেছি। জার্মানরা গ্রিসের নাভারোনের পাহাড়ের গুহাতে দুটো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান বসিয়েছিল, যে কামান দুটো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মিত্রপক্ষের সব জাহাজ ডুবিয়ে দিত ক্রেট-এর সমুদ্রে। ওই জলপথটা যেহেতু প্রধান জলপথ ছিল, মিত্রপক্ষের জাহাজদের ওই পথ দিয়ে না গিয়েও উপায় ছিল না। ওই গুহার মধ্যে কামান দুটো থাকার জন্যে মিত্রপক্ষের উড়োজাহাজও কোনও ক্ষতি করতে পারত না কামান দুটোর।

কেন পারত না?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল ঋজুদাকে।

এরোপ্লেনের পক্ষে অসুবিধের কী ছিল।

যদি কোনও পাইলট প্লেন নিয়ে গুহা মুখে ঢুকে পড়তে পারত—জাপানের 'কামেকাজে' পাইলটদের, মানে আত্মঘাতী পাইলটদের মতো, তা হলে অবশ্য অন্য কথা ছিল কিন্তু মিত্রশক্তির পাইলটদের মধ্যে অমন দেশপ্রেম বড় একটা দেখা যেত না। তখনকার দিনে তো আর মিসাইলস ছিল না। আজকালকার দিনে গুহার

মধ্যে লুকিয়ে-রাখা কামানকে এরোপ্লেন থেকে মিসাইল ছুড়ে স্তব্ধ করে দেওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয়।

তারপরই বলল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে জাপানি সাবমেরিনে করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন আন্দামানে, জানিস তোরা? মণিপুরেরই মতো এখানেও, মানে পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেলেও আমাদের তেরঙ্গা পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই আন্দামানই সবচেয়ে প্রথমে ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাধীন হয়েছিল।

তারপর মণিপুর থেকে নেতাজিকে ফিরে যেতে হয়েছিল বার্মা হয়ে কিন্তু আন্দামানে জাপানি মদতে আই এন এর আধিপত্য বেশ কিছুদিন ছিল। ইন ফ্যাক্ট, ওই ডেভিলস আইল্যান্ডেই জাপানিরা নাভারোনের মতো কামান বসাবার মতলবও করেছিল।

নেতাজি কবে এসেছিলেন এখানে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

উনিশশো তেতাল্লিশের নভেম্বরের ছ তারিখে জাপান গভর্নমেন্ট প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট অফ আজাদ হিন্দকে আন্দামান হস্তান্তরিত করে দেন।

জাপানিরা নিজেরা কবে দখল করেছিলেন আন্দামান?

উনিশশো বেয়াল্লিশের তেইশে মার্চ। ওঁরা দখল নিয়ে রাস্তাঘাট এয়ারপোর্ট, জাহাজঘাটা, এই সব তৈরি করতে লেগে যান কিন্তু নানা কারণে পরে আজাদ হিন্দ ফৌজকেই আন্দামান হস্তান্তরিত করেন। ব্রিটিশরা অবশ্য আবার উনিশশো পঁয়তাল্লিশেই আন্দামান পুনর্দখল করে নেয়, আর সাতচল্লিশে পুরো ভারতই স্বাধীন হয়ে যায়।

ভটকাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। ঘটনার মতো ঘটনা। সবই ঘটে গেল আমাদের জন্মের কত আগে! সত্যি! আমরা না দেখলাম রাজা-মহারাজা আর জমিদারদের বৈভব, না দেখলাম ব্রিটিশের মহিমা আর অত্যাচার। না জানলাম পরাধীনতার জ্বালা। লাইফটাই বৃথা হল।

ঋজুদা বলল, শুনছিস তোরা? 'বৈভব', 'মহিমা', কী সব শব্দ ব্যবহার করছে ভটকাই আজকাল?

তিতির বলল, তাই তো দেখছি। গোপনে ও খুব জোর সাধনা করছে।

ভটকাই বলল, তাতে দোষের কী?

বলেই বলল, বলো ঋজুদা, থামলে কেন?

ভারতীয় নৌবাহিনীতেও ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওই গুহার মধ্যে খুব শক্তিশালী মিসাইল-লঞ্চার বসানো যায় কী না সেই কথা নিয়ে ভাবনাচিন্তা হচ্ছিল বেশ কিছুদিন হল।

তারপরে? আমরা সমস্বরে বললাম।

গত মাসেই আইডিয়াটা ড্রপড হয়েছে।

তবে? চাং ওয়ান আর উ থান্ট এর কী ইন্টারেস্ট রইল তা হলে আর ডেভিলস আইল্যান্ডে?

ইন্টারেস্ট তো নেই কোনও।

আমাদের স্তম্ভিত করে ঋজুদা বলল।

তার মানে?

তিতির বলল।

মানে, চাং ওয়ান আর উ থান্ট বলে কারওকেই আমি চিনি না।

কী বলছ, বুঝতে পারছি না।

ভটকাই একেবারে ভেঙে পড়ে হতাশ গলাতে বলল এবারে।

আমি বললাম, তা হলে চলো ফিরেই যাই। আমাদের জলিবয় দ্বীপ দেখা হল না।

ঋজুদা ধীর স্থির গলাতে বলল, যাবি রে যাবি। আগে ডেভিলস আইল্যান্ডে পৌঁছ, দ্যাখ, পছন্দ হয় কী না! পছন্দ হলে এখানেই হানিমুন করতে আসিস যখন বিয়ে-টিয়ে করবি।

ভটকাই কথা কেড়ে বলল, ওসবের মধ্যে আমি নেই। কিন্তু এলেও থাকব কোথায়? খাব কী?

কেন? তুই তো আগেই বলেছিস 'ভজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে'।

তারপর বলল, আমার তো বয়স হচ্ছে। কতদিন আর দেশের আর ভিন দেশের মানুষদের অর্ডার সাপ্লাই করব বল? কোথায় কার গুপ্তধন কে হাতিয়ে নিল, কোথায় কার বহুমূল্য হিরে কে চুরি করল, কোথায় কে কাকে খুন করল, কোথায় মানুষখেকো বাঘ বা গুণ্ডা হাতি মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলল তার সব জিম্মাদারি কেন শুধু ঋজু বোসকেই নিতে হবে বারবার? তোরাই বল? নাঃ এবার আমি রিটায়ার করব। আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি।

তোমার যেটা দুর্বলতা সেটাই আমাদের বল ঋজুকাকা।

তিতির বলল।

ভটকাই বলল, তোমার বুড়ো হওয়ার সঙ্গে ডেভিলস আইল্যান্ডের কী সম্পর্ক?

এই দ্বীপটা আমি কিনে নেব ভাবছি। মানে, লিজে নেব পঞ্চাশ বছরের। আরও পঞ্চাশ বছর তো বাঁচব না আমি। যত দিন বাঁচি, এই নির্জনেই থাকব। সাধু সন্ন্যাসীরা পাহাড়ে পর্বতে নদীতীরে, মরুভূমিতে গিয়ে একা থাকেন, ঈশ্বর চিন্তা করেন। আমরা ঈশ্বর তো প্রকৃতিই। তাঁর সান্নিধ্যেই বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেব। জানিস তো! নির্জনতা কখনও কাররওকে খালি হাতে ফেরায় না। নির্জনতা দু' হাত ভরে দেয়। সারাজীবন যত কথা বলেছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব এই সমুদ্রের মধ্যের জনমানবহীন দ্বীপে বাক্যহীন বাস করে। কথা আর বলব না, শুনবই শুধু। গাছেদের কথা, পাহাড়ের কথা, পাখিদের কথা, সমুদ্রের কথা, মাছেদের কথা, তারাদের কথা, চাঁদ-সূর্যের কথা। নৈঃশব্দ্যর মতো শব্দময়তা যে

আর কিছুই নেই সে কথা হৃদয়ের অন্তস্থলে অনুভব করব।

ভটকাই অত্যন্ত বিরক্ত গলাতে বলল, ওসব বললেই তো আর হল না। ওড়িশার কালাহান্ডি থেকে চারবার টেলিগ্রাম এসেছে। অরাটাকিরির মানুষখেকো বাঘটাকে মেরে দেবার জন্যে। তুমি অত মানুষকে ফেরাবে?

ফেরাব। আমার নিজেরও তো নিজের উপরে কিছু দাবি আছে। অনেক দৌড়াদৌড়ি ঘোরাঘুরি করেছি পনেরো বছর বয়স থেকে নানা পাহাড়ের জঙ্গলে নদীতে বাদাতে ঘাসবনে, দেশে বিদেশে। এবার আমার নিজস্ব পাহাড়ে জঙ্গলে এই সমুদ্র আর আকাশের মধ্যে থিতু হব।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা পড়িসনি কি তোরা?

কোন কবিতা?

আমরা সমস্বরে বললাম।

'বোঝাপড়া'। 'ক্ষণিকা'তে আছে।

না তো।

তোদের জীবন বৃথা রে পোলাপানগুলান।

বলো না কবিতাটা?

'নিজেরে আজ কহ যে,
ভালমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।'

বাঃ। কী সুন্দর।

তিতির বলল।

ঋজুদা আবার আবৃত্তি করল:

'সব কিছুরই একটা কোথাও করতে হয় রে শেষ
গান থামিলে তাই তো কানে থাকে গানের রেশ
জীবন অস্তে যায় চলি তার রংটি থাকে লেগে
প্রিয়জনের মনের কোণে শরৎসন্ধ্যা মেঘে।
নিজেরে আজ কহ যে,
ভাল মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে।'

॥ ৮ ॥

যখন আমরা ডেভিলস আইল্যান্ডে গিয়ে পৌঁছলাম তখন বিকেল পাঁচটা বাজে। এই পুরো সামুদ্রিক অঞ্চলেই সন্ধে হয় প্রায় সাতটাতে। তা ছাড়া, সমুদ্রের উপরে আলোও থাকে অনেকক্ষণ। জল মাত্রই তো স্থলের চেয়ে অনেক বেশি আলো প্রতিফলিত করে। বিকেলের আলোতে ছোট্ট, বহুবর্ণ দ্বীপটিকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। কত রকমের যে গাছ সেখানে। পাখি কিন্তু সেই তুলনায় মনে

হল কমই ছিল। আমাদের বোটটা দ্বীপটিকে আধাআধি পরিক্রমা করে ওদিকে গিয়ে পৌঁছতেই চোখে পড়ল এক ফালি তটভূমি। তার বালিতে কয়েকটা সামুদ্রিক টার্ন নেচে বেড়াচ্ছিল। তটভূমির কাছে নোঙর করা যায় না। কারণ সেখানে জল কম। আমরা তটভূমির পাশে যেখানে দ্বীপ সোজা উঠেছে জল থেকে, সেখানে নোঙর করলাম। তাও নোঙর জলে ফেলে নয়। কারণ, এখানে জল খুবই গভীর। পারের একটা মোটা প্যাডক গাছের সঙ্গে মোটা দড়ি বেঁধে দেওয়া হল। দু'জন খালাসি লাফিয়ে নামল বোট থেকে পাড়ে সেই দড়ি ভাল করে বাঁধবার জন্যে।

ঋজুদা বলল, ওইখানে যে তটভূমি দেখছিস তা এই পাহাড়ের পাথর, স্যান্ডস্টোন, বহুযুগ ধরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হয়েছে। নইলে আন্দামানের প্রায় সব দ্বীপই এক একটা পাহাড়, মানে, পাহাড়চুড়ো। জলের মধ্যে থেকে মাথা উঁচিয়ে আছে। যেটুকু আমাদের দৃষ্টিগোচর সেটুকুই দ্বীপ। সেই জন্যেই জল সব দ্বীপের চারদিকেই এত গভীর এবং জলে সাঁতরে এলে পাড়ে একটু হাত পা রাখারও জায়গা থাকে না এখানের অধিকাংশ দ্বীপেই।

আমি বললাম, তাই? এতদিনে বুঝলাম যে ডাঙার পরই জল কেন এত গভীর প্রায় সব দিকেই।

দড়িটা ভাল করে বাঁধা হলে আমরা সবাই একে একে নামলাম দ্বীপে দড়ি ধরেই। ক্যাপ্টেন ভাদেরা ততক্ষণে জলি-বোটটাকে খুলে ফেলে জলে নামানোর বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। জলি-বোটটা বড় বোটের গায়ে বাঁধা থাকলে আমাদের ওঠানামার যেমন সুবিধা হবে তেমন ঋজুদা ইচ্ছে করলে বোট খুলে নিয়ে সমুদ্রে মাছও ধরতে যেতে পারে। জলি-বোটের সঙ্গে একটি আউট-বোর্ড এঞ্জিন লাগানো আছে। সমুদ্রের স্রোতে হাতে দাঁড় বেয়ে নৌকো চালানো সহজ নয়। আগেকার মানুষেরা পারতেন।

ভটকাই চেঁচিয়ে বলল, চলে আয় রুদ্র। ডেভিলস আইল্যান্ডকে এক্সপ্লোর করি।

ঋজুদা বলল, আজ একদম নয়। কাল সকালে হবে। সকলেই যাব একসঙ্গে। সবতাতে ইয়ার্কি নয়।

ইতিমধ্যে তিতির চেঁচিয়ে বলল, দ্যাখো ঋজুকাকা কীরকম অন্ধকার করে আসছে। পুবের আকাশে কেমন মেঘ জমছে দেখেছ?

হুঁ।

আমি বললাম, সত্যি! কে বলবে ডিসেম্বর মাস।

এখানে সন্ধের দিকে ডিসেম্বরেও ঝড় বৃষ্টি হয়। ঝড় না হলেও বৃষ্টি হয়ই। প্রায় রোজই। ঋজুদা বলল।

বলেছিলাম না? এখানে বর্ষাকালে একবার আসতেই হবে। আহা। এখানে শ্রাবণের যা রূপ হবে না! কল্পনা করেই সুখে মরে যাচ্ছি।

ভটকাই বলল।

পোর্ট ব্লেয়ারে এসে হোটেলে থাকতে পারো। এইরকম বোটে করে বর্ষার সমুদ্রে যাওয়াআসা অসম্ভব বর্ষাতে।

তিতির বলল।

সেটা ঠিক।

ঋজুদা বলল।

তা ছাড়া, একা এলে তাকে বোট দিচ্ছেটাই বা কে?

সেটা অন্য কথা। আমার ক্যালি সম্বন্ধে তোদের ধারণাই নেই। কিন্তু নাঃ। তুমি সত্যিই একজন রিটায়ার্ড বোরিং বুড়ো হয়ে যাচ্ছ ঋজুদা। এবার থেকে সকাল বিকেলে তুমিও দেখছি কেডস পরে ছাতা বা লাঠি হাতে মর্নিং ওয়াক আর ইভনিং ওয়াক-এ যাবে আর পার্কের বা লেকের বেঞ্চে একদল বুড়োদের সঙ্গে বসে পরনিন্দা পরচর্চা করবে।

তা যাতে করতে না হয় সেই জন্যেই তো ডেভিলস আইল্যান্ডে এসে থিতু হব। তা ছাড়া, নিন্দা তো করে বুড়োরা ছেলে বউ-এর, আমার তো সেই বালাইই নেই।

আমরাই তো তোমার ছেলে মেয়ে। আমরা কি তোমার বালাই?

বলেই, ভটকাই আকাশে আঙুল তুলে কাঁপা কাঁপা ভয়ার্ত গলাতে বলল, ঋজুদা-আ-আ—ওই দ্যাখো, পুবাকাশে কুমুলো-নিম্বুলো মেঘ। কেলো হবে এবারে।

আমরা সকলেই সেদিকে চেয়ে আকাশের অবস্থা দেখে সত্যিই ঘাবড়ে গেলাম।

ঋজুদা বলল, বোটে উঠে আয় রুদ্র। যদি ঝড় আসে, তবে ঝড়ের দিক ও গতি বুঝে দ্বীপের অন্য দিকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হতে পারে আমাদের। ঝড়ের দাপট থেকে বাঁচতে। আমি অবাক হয়ে বললাম, এই সুন্দর রোদ ছিল হঠাৎ এরকম কালো হল কী করে।

আমার কথার কেউই উত্তর দিল না।

জলি-বোটটা কী তা হলে তুলে নেবে উপরে?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

না, তা কেন? জলি-বোট বাঘের পেছনে পেছনে যেমন ফেউ যায় তেমনই দড়ি বাঁধা অবস্থাতে পেছন পেছন যাবে। কান টানলেই মাথা আসবে।

আমরা বোটে উঠে আসতেই ইদ্রিস আলির অ্যাসিস্ট্যান্ট গোপালন ট্রেতে করে ধুঁয়ো ওঠা কফি আর খুব করে শুকনো লঙ্কা ঠাসা গরম গরম পেঁয়াজি নিয়ে এল।

এত শুকনো লঙ্কা দিতে কেউ কি বলেছিল?

তিতির জিজ্ঞেস করল, ঝালে মুখ বিকৃত করে।

গোপাল ভটকাইকে দেখিয়ে দিল তার ড্যাবা ড্যাবা চোখ দিয়ে।

ঈস,, অত ঝাল যে, মুখে দেওয়া যাচ্ছে না।

আমি বললাম। যদিও আমার খেতে আদৌ খারাপ লাগছিল না। তিতির আসলে ঝাল একেবারেই খেতে পারে না।

খাস না। ফেলে দে।

ভটকাই বলল।

ঋজুদা এক কামড় পেঁয়াজি খেয়ে বলল, কেন, ভালই তো হয়েছে খেতে, এমন কিছু ঝাল তো হয়নি। শুধু নিন্দার জন্যেই নিন্দা করিস না রুদ্র। তাতে নিজের অজানিতেই স্বভাব খারাপ হয়ে যায় মানুষের।

আমি চুপ করেই রইলাম। ঋজুদার জন্যেই বাঁদরটা এত বড় হনুমান হয়ে উঠল দিনে দিনে। কাকে আর বলব! খাল কেটে কুমির তো আমিই এনেছি।

ঋজুদা ভটকাইকে জিজ্ঞেস করল, পাইপে টোব্যাকো ভরতে ভরতে আকাশের দিকে তাকিয়ে, কী যেন বললি তুই একটা ভটকাই? কুমুলো-নিম্বুলো মেঘ, না কী যেন!

হ্যাঁ। ওইরকম কালো মেঘের নাম কুমুলো-নিম্বুলো নয়?

ঋজুদা হেসে বলল, কিউমুলো নিম্বাস। কাছাকাছি গেছিস। কিন্তু...তারপর বলল, ওগুলোকে বলে Cumulo-nimbus. Nimbus এক ধরনের জলবাহী মেঘ আর সেই মেঘই যখন পুঞ্জীভূত হয় তখন তাদের বলে Cumulo-nimbus। উপরটা সাদা থাকে আর নীচে ঘন কালো মেঘপুঞ্জ।

তুমি এসব জানলে কী করে ঋজুকাকা?

তিতির মুগ্ধ গলাতে বলল।

আমার বন্ধু আছে না? ক্যাপ্টেন চৌধুরী রে, তোরা দেখেছিস আমার বাড়িতে, এয়ার-বাস-এর ক্যাপ্টেন—ওর কাছ থেকে ধীরে ধীরে শিখেছি। যদি আমার কোনও ফ্লাইটে ও ক্যাপ্টেন থাকে তো ককপিটে ডেকে নেয় আমাকে টেক-অফ-এর পরেই। ওদের বাঁচা-মরা তো নির্ভর করে এই সব জ্ঞানের উপরেই আর ওদের সঙ্গে যাত্রীদের বাঁচা-মরাও—তাই ওদের বাধ্যতামূলক ভাবেই এসব শিখতে হয়, আমার তোর মতো শখের কারণে নয়।

বলো না আমাদের ঋজুদা, কত রকমের মেঘ হয়?

আমি বললাম।

তিতির বলল, কবি কালিদাসও সম্ভবত মেঘের এই নানারকমের কথা জানতেন নইলে তাঁর বার্তা কাকে দিয়ে পাঠাবেন তা ঠিক করতেন কী করে।

ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে বলল, হয়তো জানতেন।

তারপর ভটকাইকে বলল, নীচে গিয়ে ক্যাপ্টেন ভাদেরাকে এপারে আসতে বল তো একবার। ভাদেরা আমার ভুল হলে শুধরে দেবে।

উনিও জানেন এসব?

ভটকাই অবাক হয়ে বলল।

নেভিতে যাঁরা আছেন, এয়ারফোর্সে যাঁরা আছেন তাঁরা জানবেন না, না কি

আমি জানব! আকাশ আর মেঘ আর সমুদ্রের সঙ্গেই তো ওঁদের ঘর করা। ডাক, ওঁকে। ওঁর সঙ্গে অন্য কথাও আছে।

একটু পরেই ভাদেরা সাহেব এলেন। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। ঝকঝকে যুবক। এখন নেভি অফিসারের পোশাকে নেই, মুফতিতে আছেন, এই কাজ তো তাঁর অফিসিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট নয়, যদিও ডিউটির মধ্যেই পড়বে।

গুড ইভনিং স্যার। অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে ভাদেরা বললেন ঋজুদাকে।

ভেরি গুড ইভনিং স্যার।

ঋজুদা বলল।

মনে মনে বললাম, 'রাজা সবারে দেন মান। সে মান আপনি ফিরে পান।'

দুটো শটগান আছে তো সঙ্গে?

ইয়েস স্যার।

গুলি? কী গুলি?

এল. জি., এস. জি. আর এক নম্বর শটস।

কী শটগান?

ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স-এর। টুয়েলভ বোর, ডাবল-ব্যারেলড।

ফাইন। আশা করি প্রয়োজন হবে না ব্যবহারের। তবে এই ডেভিলস আইল্যান্ডে সাপ তো আছে অনেকই, না কি?

থাকা তো স্বাভাবিক স্যার।

তিতির ক্যাপ্টেন ভাদেরার হাতে কফির কাপ তুলে দিল। কিন্তু উনি নিলেন না, বললেন, এখুনি খেয়ে এলাম। থ্যাঙ্ক ইউ।

ঋজুদা বলল, ক্যাপ্টেন আমি ওদের মেঘ চেনাব। আমার ভুল হলে আপনি একটু শুধরে দেবেন। আপনি যখন সঙ্গে আছেনই, আপনার সাহায্য না নেওয়াটা মূর্খামি হবে। আমি আর কতটুকু জানি!

ক্যাপ্টেন ভাদেরা বললেন, মাই প্লেজার স্যার।

ঋজুদা অ্যাটেনশানে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাপ্টেনকে বসতে বলল । ভাদেরা আকাশের দিকে মুখ করে ডেক চেয়ারে বসলেন।

ইতিমধ্যে মেঘের রং ও অবস্থান বদলে গেছে অনেকই। হাওয়া দিয়েছে একটা। ডেভিলস আইল্যান্ডের হাজার হাজার সবুজ আর সাদা হাত হাতছানি দিচ্ছে আমাদের। হাওয়াতে পাতারা উলটে যাচ্ছে, পাতাদের সাদা বুক দেখা যাচ্ছে আবার পর মুহূর্তেই উলটে গিয়ে সবুজ বা লালচে বা খয়েরি হয়ে যাচ্ছে। নানা জলজ আর বনজ গন্ধে হাওয়াটা ভারী হয়ে গেছে। এই গন্ধবন্ধ আমাদের অচেনা। এতে জলের গন্ধ, মাছের গায়ের গন্ধ, মেঘের গায়ের গন্ধ, নানা অচেনা গাছের গায়ের গন্ধ মিশে আছে। সিঁদুরে লাল মাটির যতটুকু দেখা যাচ্ছে ডেভিলস আইল্যান্ডের সবুজের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টি-স্নাত, তা থেকেও সোঁদা গন্ধ উঠছে। যে গন্ধ একমাত্র মাটিরই।

সত্যি! প্রকৃতির কী লীলা খেলা! ভাবছিলাম, আমি।

ঋজুদা বলল, পাতলা পাতলা পেঁজাতুলোর মতো, ঊর্দ্ধমুখী সাদা মেঘকে বলে Cirrus। তারাই যখন আবার কেটে যাওয়া ছানার মতো ছাড়া ছাড়া হয়ে যায়, তখন তাদের বলে Cirro-cumulus. আবার Cirro যখন সমান্তরাল গড়নে দেখা যায় তখন তাদের নাম হয়ে যায় Cirro-stratus। Strata থেকে Stratus বুঝলি তো?

এই অবধি বলে, ক্যাপ্টেন ভাদেরার দিকে ফিরে ঋজুদা বলল। ঠিক বলছি তো? আপনি তো বাংলা বোঝেন না—

তবে মেঘের নামগুলো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?

বাংলাও বুঝি একটু একটু।

আমাদের অবাক করে দিয়ে ক্যাপ্টেন ভাদেরা বাংলাতেই বললেন। তারপর বললেন, আমার গার্ল ফ্রেন্ড, ন্যাভাল কমোডর সেনগুপ্তর মেয়ে। ওঁরা তো বাঙালিই। আমাদের এনগেজমেন্ট হবে সামনের মাসে। বিয়ে আগামী বছরের মার্চ মাসে।

ও তাই? কনগ্র্যাচুলেশানস। বাঃ বিয়ে করলে মার্চ মাস অবধিই করা ভাল ডিসেম্বর থেকে।

ভাদেরা অবাক হয়ে বললেন, কেন স্যার?

বাঙালি শ্বশুর তো, মার্চ অবধি লেপ-কম্বল দেবে।

ভাদেরা হেসে ফেললেন, আমরাও সকলেই হেসে উঠলাম বহুবার বিয়ে-করা ঋজুদার এই কথা শুনে। তারপর আমরাও বললাম, কনগ্র্যাচুলেশানস।

আপনি কি কমোডর সেনগুপ্তকে চেনেন?

ভাদেরা জিজ্ঞেস করল।

ঋজুদা বলল, তেমন চিনি না, তবে গতবারে যখন এসেছিলাম তখন নারির একটা পার্টিতে দেখা হয়েছিল। কমোডর সেনগুপ্তর কথা মনে আছে। নাইস জেন্টেলম্যান। মিসেসকেও মিট করেছিলাম। প্রেটি লেডি। আই হোপ, মিস সেনগুপ্ত ইজ লাইক মাদার লাইক ডটার।

ক্যাপ্টেন ভাদেরা লজ্জাতে মেয়েদের মতো ব্লাশ করে বললেন, আই ডোন্নো।

তা হলে আবার শুরু করি? ঋজুদা বলল।

সার্টেনলি স্যার। ইউ নো অ্যাজ মাচ অ্যাজ উই ডু। মে বি, মোর।

ভাদেরা বললেন।

দেয়ার শুড বি আ লিমিট টু মডেস্টি ক্যাপ্টেন।

ঋজুদা বলল, Stratus যখন পুঞ্জীভূত হয়ে যায় তখন তা হয়ে যায় Stratus-strato-cumulus। যখন ঘোর কালো দেখায় Stratus-দের তখন তাকে বলে Alto-stratus।

ভটকাই প্রশ্ন করল, এই সব মেঘই কি খুব উঁচুতে থাকে? মানে, যতখানি উঁচু দিয়ে প্লেন ওড়ে?

না, তা নয়। Stratus থাকে সবচেয়ে নীচে।

মানে? কত নীচে?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

এই ধর পনেরো-ষোলোশো ফিট উঁচু মাটি থেকে। তার উপরে প্রায় ছ হাজার ফিট অবধি দেখা যায় অন্যদের। হাজার থেকে কুড়ি হাজার ফিট অবধি দেখা যায় Alto-cumulos, Cumulo-nimbus, Alto-stratus এবং Cirro-stratus-দের। যদি আরও উপরে উঠিস, মানে, যে উচ্চতা দিয়ে প্যাসেঞ্জার জেট-প্লেন সাধারণত ওড়ে, চল্লিশ হাজার ফিট মতো, তখন দেখা যায় Cirrus আর Cirro-cumulus-দের। আর চল্লিশ হাজার ফিটেরও উপরে, তুই হয়তো দেখে থাকবি রুদ্র স্যেশেলস-এ যাওয়া আসার সময়ে বা ঝিঙ্গাঝিরিয়া থেকে থুরি, বেনারস থেকে ফেরার সময়ে, দিনের বেলা প্লেনের জানালা দিয়ে, এক ধরনের বহুরঙা, রামধনুর মতো স্বপ্নময় সমান্তরাল মেঘপুঞ্জ। তাদেরই নাম Iridescent clouds.

বাবা! ভটকাই বলল, নিজেদের মনে হচ্ছে আমরাই যেন জেট-প্লেনের পাইলট।

যদিও মেঘ সেজেছিল পরতের পর পরত কিন্তু বৃষ্টিটা তখনকার মতো এল না।

ঝড়ও নয়। তবে মনে হল রাতে বৃষ্টি আসবে। তা আসুক, খাওয়া-দাওয়ার পর সমুদ্রের আর ডেভিলস আইল্যান্ডের ওপরে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ব আমরা। এও তো এক নতুন অভিজ্ঞতা। সমুদ্রের বুকের এত কাছে কান পেতে বৃষ্টির শব্দ শোনার অভিজ্ঞতা তো আগে হয়নি কখনও। ঢেউগুলো ছলাৎ ছলাৎ করবে। ছোট মাছের ঝাঁক গা ঘষে দিয়ে যাবে হয়তো বোটের স্টারবোর্ড সাইডে কিংবা কোনও মস্ত টুনা মাছই, আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি-র' বড় এবং বুড়ো মাছটার মতো।

আমার ভাবনার জাল ছিঁড়ে দিয়ে ভটকাই বলল, বুঝলে ঋজুদা, রাতে আর বিশেষ ঝামেলা করতে মানা করলাম।

কীসের ঝামেলা?

ঋজুদাও যেন কী ভাবছিল, তার ভাবনার জাল ছেঁড়াতে সেও বিরক্ত হল।

মানে, ডিনারের মেনুর কথা বলছি।

ভটকাই বলল।

সত্যি! তুই একটা পেটুক দামু। অত খাওয়া-দাওয়া যদি করিস তা হলে তো বাড়িতে থাকলেই পারিস। তোকে আর নিয়ে আসব না কোথাওই।

আহা! রাগ করো কেন? একজনের তো ওদিকটা দেখতে হবে। খাবার বেলা তো রুদ্র আর তিতির চেটেপুটে খাবে আর বন্দোবস্তটা যে করছে সে খালি গালিই খাবে।

এবারে গুলি খাওয়াব তোকে।

আমি বললাম।

ভটকাই আমার কথাতে কান না দিয়ে, আমাকে পুরোপুরি ইগনোর করে ঝজুদাকেই বলল, মুগের ডালের খিচুড়ি। ভুনি খিচুড়িই করতে বলেছি। ডিরেকশান তো দিয়েছি, এখন কেমন করে দেখি! সঙ্গে বলেছি, মুচমুচ করকে আলু ভাজা আর সার্ডিন মাছ ভাজা। শুকনো লঙ্কা ভাজা আর আমের আচার। দেখলাম, অ্যাবারডিন বাজার থেকে কেনা বাঙালির দোকানের রসগোল্লাও আছে। এই বোটে ফ্রিজও আছে ঝজুদা, ব্যাটারিতে চলে। সোলার ব্যাটারি। হয়ে যাবে রাতের খাওয়াটা মোটামুটি আর কী! আরও কিছু কি করতে বলব? ঝজুদা তুমিই তো চিফ-গেস্ট।

থাম তো তুই এবারে।

ঝজুদা এবারে সত্যিই বিরক্ত হয়ে বলল।

॥ ৯ ॥

এখন বোট-এর সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। চারটি কেবিন। একটিতে ঝজুদা, একটিতে ক্যাপ্টেন ভাদেরা, একটিতে তিতির আর অন্যটিতে আমি আর ভটকাই। তিতির বাথরুমের আলোটা জ্বালিয়ে রেখে বাথরুমের দরজাটা ভেজিয়ে রেখেছে।

শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছে ভটকাই। রাতের খাবারটা কিন্তু দারুণই হয়েছিল। কৃতিত্ব ভটকাই-এরই, যদিও বেচারি গালাগালি খেয়েছে সকলেরই।

খেতে খেতে ঝজুদা এখানের সামুদ্রিক মাছেদের কথা বলছিল। ক্যাপ্টেন ভাদেরাও জানেন। কারণ পোর্ট ব্লেয়ারেই নাকি আছেন গত দু' বছর। বিয়ের পরে কোচিন-এ পোস্টিং হবে নাকি।

মাছ তো সমুদ্রে হাজারো রকমের হয় কিন্তু সব মাছ তো খায় না মানুষে। যে সব মাছ খায় এ অঞ্চলের মানুষে তার মধ্যে সুরমেই, কোরাই, ম্যাকারেল, সিলভার বেলিজ, রুপোলি পেটের মাছ, অ্যাকোরিজ, সার্ডিনস, সিয়ার ইত্যাদি মাছ আছে। সার্ডিনের আবার দু'রকমের কথা জানেন ক্যাপ্টেন ভাদেরা, হয়তো আরও রকম আছে। আছে হারমেণ্ডলা আর ডসুমেরিয়া অ্যাকুয়া। এ ছাড়াও আছে রেজ, বারাকুডা, মুলেট। জেলি ফিশ। নানারকম অক্টোপাস। শামুক, জার্মানরা যাকে বলে মুশেলস। কাঁকড়া। চিংড়ি নানা মাপের, বেশিই গলদা। বাগদাও পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা নানা দ্বীপে মিষ্টি জলের পুকুর করে, সেখানে রুই, কাতলা, মৃগেল, ল্যাটা, শিঙ্গি, মাগুর, কই ইত্যাদি মাছ ছেড়েছে। মাঝে মাঝে বাজারেও ওঠে সেসব মাছ। তবে এই সমুদ্র-মেখলা দ্বীপগুলিতে এখনও মানুষের প্রধান খাদ্য সামুদ্রিক মাছই। শুঁটকি মাছও খায় অনেকেই।

বড় মাছের মধ্যে টুনা আছে। ওদের একটা প্রজাতি পাঁচ মিটার অবধি লম্বা হয়। তাদের বলে ব্লু-ফিন টুনা। ঝজুদা নাকি ব্লু-ফিন টুনার জন্যেই পরশু সারাদিন

নৌকো ভাসিয়ে পড়ে থাকবে গভীর জলে। কী টোপ দেবে কে জানে! বড় বড় টুনা মাছগুলোর পিঠটা নীলচে-কালো হয়। আর পেটটা সাদা। অত বড় টুনা মাছ তো ইচ্ছে করলে ওই ছোট্ট জলি-বোটকে ডুবিয়েও দিতে পারে নীল তিমি মবিডিক যেমন ডুবিয়ে দিয়েছিল তিমি-মাছ ধরতে-যাওয়া জাহাজকে। অত বড় মাছ হলেও টুনা মাছ অন্যান্য মাংসাশী মাছের মতো কিন্তু অন্য ছোট মাছ খেয়ে বাঁচে না। এরা নিরামিশাষী। নানারকম প্ল্যাংকটন খেয়েই বাঁচে তারা। মাছেদের মধ্যে ওরা অন্যরকম।

বড় বড় টাইগার শার্ক হাঙর ঝড়ের গতিতে এসে স্যামন আর সার্ডিনের ঝাঁকে এসে পড়ে কাচের পাতের মতো জলকে টুকরো টুকরো করে আলোকিত সমুদ্রতলে মাছেদের ছত্রখান করে দেয়, দলছুট হয়ে তারা যে যেদিকে পারে আঁতরে যায় অপূর্ব সব তাৎক্ষণিক জলজ আলোছায়ার জ্যামিতিক নকশা এঁকে।

সমুদ্রে কত দেবদেবীও আছেন। মানুষের ভূমিকা যেখানে সামান্য, নগণ্য, যেখানে সে অসহায় প্রকৃতির কাছে সেখানে দেবদেবীদের মানতেই হয়। অশাণ্ডিমারু, জরুইন, আরও কত।

ঝজুদা বলছিল, ইগুয়ানাও খায় অনেকে, তারা উভচর জীব। স্যালামান্ডারদের থেকে বড়। ফল খাওয়া বাদুরের মাংসও নাকি খুব স্বাদু হয়। কম্যান্ডো-ট্রেনিং-এর সময়ে সর্বভুক হতে হয়েছিল ঝজুদাকে। খেয়ে ছিল সব কিছুই। ঝজুদার ভাষায়, 'কীরে-মাকড়ে' পর্যন্ত। সামুদ্রিক সি-কিউকুম্বার, সি-আর্চিনস এসবও খায় মানুষে।

কাল সকালেই আমরা নামব ডেভিলস আইল্যান্ডে। রাতে তাই উত্তেজনাতে ঘুম হচ্ছে না আমার। সত্যিই কী এখানেই পাকাপোক্তভাবে থাকবে ঝজুদা? নাকি আমাদের ভয় দেখাচ্ছে, কে জানে!

হাওয়া বয়ে আসছে সমুদ্রের উপরে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। হাওয়ার বাড়া-কমার সঙ্গে বৃষ্টিও বাড়ছে কমছে। কে জানে এই হাওয়া কলকাতা থেকেই আসছে কী না। কলকাতা কত দূর? মাঝে শুধু জল, অথৈ জল। ভাবতেই রোমাঞ্চ লাগছে।

আন্দামানে চারটি দ্বীপপুঞ্জের জটলা। নিকোবরের সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে নিকোবরের দ্বীপগুলি অনেক বেশি নির্জন, বিচ্ছিন্ন এবং রোমাঞ্চকর। এর পরে একবার আসব নিকোবরের দ্বীপগুলিতে, ঝজুদা যদি নিয়ে আসে। আন্দামানের চারটি ভাগ, উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ এবং লিটল আন্দামান। আর এদের দু'পাশে কত যে দ্বীপ, আগ্নেয়গিরিও আছে, আর কত যে দ্বীপের খোঁজ এখনও হয়নি তা কে বলতে পারে। কত নামের সব দ্বীপ, প্যাসেজ আর বে। মানে ক্ষুদে উপসাগর। একটা প্যাসেজের নাম, ইন্টারভ্যু প্যাসেজ। কত straits। সেন্টিনেল আইল্যান্ড, রসস আইল্যান্ড, স্পাইক আইল্যান্ড, রাটল্যান্ড আইল্যান্ড, ব্রাদার আইল্যান্ড, সিস্টার আইল্যান্ড, সব নাম বলতে গেলে নামের

জপমালা হয়ে যাবে। ব্যারেন আইল্যান্ডের আগ্নেয়গিরি থেকে সাম্প্রতিক অতীতেও অগ্ন্যুদ্গার হয়েছিল।

আন্দামান আর নিকোবরের মধ্যে অত্যন্তই গভীর সমুদ্র। মধ্যে দিয়ে দশ ডিগ্রি ল্যাটিট্যুডের চ্যানেল গেছে। খুব বড় বড় ঢেউ ওঠে ওই মধ্যবর্তী সমুদ্রে। সত্যি কথা বলতে কী ওই ক'দিন পোর্ট ব্লেয়ারের আলো-ঝলমল হোটেলে আধুনিকতম সুযোগ সুবিধের মধ্যে থেকে সমুদ্রর যে মানুষের মনের উপর কেমন অভিঘাত তা ঠিক বুঝতে পারিনি। রাতে ওই নিঃসীম সমুদ্রের মধ্যে কাগজের নৌকোর মতো অলকা-পলকা বোটে শুয়ে 'দ্য ডেভিলস আইল্যান্ডে'র নানা রাত-চরা পাখির ডাক শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল আজ রাতে ঘুমোব না, সারারাত জেগেই থাকি। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সমুদ্রের মধ্যের এই ভয়াবহ নামের দ্বীপটির সান্নিধ্য উপভোগ করি।

হঠাৎই বিদ্‌ঘুটে এবং প্রচণ্ড আওয়াজ করে কী একটা জন্তু ডেকে উঠল দ্বীপ থেকে। ওই ডাক কখনও শুনিনি। চমকে তো উঠলাম, ভয়ও পেলাম প্রকট। ভয় পেতে কেমন যে লাগে তা ভুলেই গেছি ঋজুদার কল্যাণে। তাড়াতাড়ি বালিশের তলা থেকে পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা বের করে নিয়ে যথাসম্ভব কম শব্দ করে বোটের ডেকে উঠতে যেতেই ঋজুদা গলা নামিয়ে বলল, শুয়ে পড়। ও পাহাড়ের উপরে আছে। দেখতে পাবি না।

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, কী ওটা ঋজুদা?

ঋজুদা মাঝরাতেও রসিকতা করল জুরুইন ভূত নয়, ও আন্দামানি পেঁচা। এত বড় পেঁচা ভারতের মূল ভূখণ্ডেও নেই। কালপেঁচার চেয়েও অনেক বড় হয়। বিরাট বিরাট লাল চোখ। আমিও প্রথমবার ওর ডাক শুনে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। যা, শো গিয়ে।

ভাবছিলাম, অজ্ঞান তো তেমন তেমন শহুরে মানুষে গভীর জঙ্গলের গভীরে চরে বেড়ানো গোরুর ডাক শুনেও হয় কিন্তু, এ যে একেবারে আক্কেল-গুড়ুম ডাক। দশ বছর বয়স থেকে ঋজুদার অ্যাসিসটেন্সগিরি করছি, কতরকম ভয়ের মধ্যে দিয়ে পার করে দিয়েছি দেশ-বিদেশের কত রাত-বিরেত কিন্তু এমন সাংঘাতিক ভয় আগে কখনওই পাইনি।

ফিরে এসে শুতে শুতে অনেকদিন আগে বলা ঋজুদার একটা কথা মনে পড়ে গেল। ঋজুদা বলেছিল, ভয়ের জনক হচ্ছে অজ্ঞতা। জিম করবেট-এর 'জাঙ্গল লোর'-এর সেই 'বনশি'-র কথা পড়িসনি? যেদিন হঠাৎ করে এক দারুণ ঝড়-ওঠা বিকেলে 'বনশি'-র উৎস কিশোর জিম আবিষ্কার করলেন জঙ্গলের গভীরে, সেদিনই সেই হাড় হিমকরা বনশি-ভীতি মরে গেল।

বুঝলাম, যে ওই ডাক আগে কখনও শুনিনি বলেই, আমার অজ্ঞতার কারণেই, ভয় পেয়েছিলাম।

॥ ১০ ॥

অন্ধকার মানেই সংশয়, অসহায়তা, ভয় এবং অনিশ্চিত আর আলো মানেই সব সংশয়ের অবসান, আত্মবিশ্বাস, সাহস এবং নিশ্চয়তা। প্রতিটি তমসানাশিনী সকালই যে আমাদের জন্যে কী বয়ে আনে তা এই 'দ্য ডেভিলস আইল্যান্ডে'র পাশে নোঙর করা ছোট্ট বোটে রাত না কাটালে নতুন করে বুঝতে পারতাম না। মানুষখেকো বাঘের অপেক্ষায় থাকা, অনেক ডাকাত ও খুনির সঙ্গে মোকাবিলা করার অপেক্ষাতে ঋজুদার সঙ্গে অথবা ঋজুদার নির্দেশে অনেকই বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি আজ পর্যন্ত। আজ এই আন্দামান উপসাগরেও সকাল হল অনেক জানার মধ্যে দিয়ে। পৃথিবীর তিন ভাগই যে জল, মাত্র একভাগ স্থল একথা শিশুকাল থেকেই জেনে এসেছি কিন্তু সেই জানাটার তাৎপর্য যে ঠিক কী তা গত রাতে যেমন করে জানলাম তেমন করে আগে কখনও জানিনি।

এতদিন জানতাম পাহাড় দারুণ ব্যক্তিত্বময়, প্রত্যেক পাহাড়েরই আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে কিন্তু এখন জানছি সমুদ্রের ব্যক্তিত্ব হয়তো পাহাড়ের চেয়েও বেশি। তার প্রধান কারণ হয়তো এই যে, পাহাড় পর্বত অনড় কিন্তু সমুদ্র গতিশীল, বিচিত্র তার রূপ, বিচিত্রতর তার মন।

ঋজুদা বলল, ব্রেকফাস্ট খাওয়া-টাওয়া হবে না আজ। ভটকাইকে বলে দে রুদ্র, একটু আগেই দেখলাম কিচেনে গিয়ে কী ফিসির ফিসির করছে বাবুর্চির সঙ্গে। এক কাপ করে কফি আর দুটি করে বিস্কিট খেয়েই পনেরো মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে যাব আমরা। বন্দুক দুটো চেয়ে নিস ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে। আর জলের বোতল, মানে প্লাস্টিকের, নিয়ে নিস দুটো।

ক্যাপ্টেন ভাদেরা তো যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে।

তাই? তা হলে তো ভালই। উৎসাহ আছে ছেলেটির। ওর ফার্স্ট নেম কী? জানিস নাকি?

যুবরাজ। ভটকাই দোস্তি করে ফেলেছে।

করল কী করে? ইংরেজি তো ভাল বলতে পারে না।

উনি তো বাংলা জানেন একটু একটু, তা ছাড়া বডি ল্যাঙ্গোয়েজ।

বাঃ। চেহারাটি অবশ্য যুবরাজেরই মতো। সেনগুপ্ত সাহেবের ভাগ্য ভাল অমন জামাই পেয়েছেন। কী বল তিতির?

বিয়েতে-অবিশ্বাসী তিতির কী বুঝল জানি না; একটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে, গলাতে অনাবশ্যক জোর এনে বলল, নিশ্চয়ই!

কফি খেয়ে আমরা উঠে পড়লাম 'দ্য ডেভিলস আইল্যান্ড'-এ। আগে আমি, ভটকাই আর ভটকাই-এর সদ্য-লব্ধ যুবরাজ দাদা। ভটকাই কোন মন্ত্রবলে ইতিমধ্যেই তার সঙ্গে দাদা পাতিয়ে ফেলেছে কী জানি! উপরে ওঠার পরেই আমাদের বোটটি যে কী সুন্দর তা বোঝা গেল। ফুটফুটে এক মেমসাহেবের মতো বসে আছে যেন

সাদা 'টপ' পরে আর নীচে সমুদ্র মেখলার নীল স্কার্ট পরে। সাদার উপর কালো রং দিয়ে তার নাম লেখা আছে: The Bad Guy। এতক্ষণ নামটি লক্ষ করিনি। দ্য ব্যাড গাই না হলে অবশ্য 'দ্য ডেভিলস আইল্যান্ডে' আসবেই বা সে কেন?

উপরে উঠতে যে একটু কষ্ট হল না তা নয়, পরে নিশ্চয়ই অন্য কোনও দিক দিয়ে উঠলে চড়াইটা কম পড়বে তা খুঁজে বের করতে পারা যাবে। এর চেয়ে কম খাড়াই নিশ্চয়ই থাকবে অন্য কোনও দিকে। কিন্তু এদিকে যে এক ফালি তটভূমি আছে সেখানে আমরা চান করতে পারব এবং রাতে পিকনিক করব ক্যাম্পফায়ার করে। সেই লোভেই এখানে নৌকো বাঁধা। কোথায় যে নৌকো বাঁধব সেই সিদ্ধান্ত জলে এবং জীবনেও সমান জরুরি, কারণ, নৌকো বাঁধার প্রভাব সুদূর-প্রসারী।

উপরে উঠেই সত্যিই চোখ জুড়িয়ে গেল। উপরটা একটা মালভূমির মতো। কত রকমের যে গাছ! আদিগন্ত চারদিকে নীল সবুজ সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। একদল টিয়া উড়ে গেল। ছোট ছোট একরকমের পাখি, দল বেঁধে ওড়াওড়ি করছিল ফিচ ফিচ করে ডাকতে। ফটিক জল-এর চেয়েও ছোট, এগুলোর নামই বোধহয় বলেছিল ঋজুদা সুইফট-লেট। এরাই থুথু দিয়ে বাসা বানায় আর সেই বাসা আদর করে খায় চিনারা। Bird's nest soup।

ঋজুদা বলল, দ্যাখ এটা গুর্জন গাছ। সুন্দর নয়? এর চেয়েও সুন্দর গাছ অবশ্য অনেক আছে এখানে। ডানদিকে দ্যাখ, ওই গাছটার নাম বাদাম। ওর বাঁদিকে ওটা কোকো। ওগুলো সবই হার্ড-উড। নীচে যখন নামব তখন দ্যাখাব সিলভার-গ্রে গাছ। তাদের কাণ্ডর অনেকখানিই রুপোলি-ধূসর রঙের। তোরা আগে আগে গেলি তো, তাই দ্যাখাতে পারলাম না ওঠার সময়ে। চাঁদনি রাতে ভারী সুন্দর দেখায় এই গাছগুলোকে। পালামৌর চিলবিল বা ওড়িশার গেণ্ডুলি গাছেদের মতো।

আজ চাঁদ উঠবে?

তিতির বলল।

চাঁদকেই জিজ্ঞেস কর। পক্ষটা তো শুক্লপক্ষই। গত রাতে তো বিকেল থেকেই মেঘে আকাশের মুখ ঢেকে ছিল।

আরে। আরে। এ যে বটানিকাল গার্ডেনেই এসে পৌঁছলাম আমরা। এই ডেভিলস ডেন দ্বীপে দেখছি আন্দামানে যত গাছ হয় তার প্রায় সবই আছে। স্বাভাবিকভাবে এমনটা হতেই পারে না। এক বা একাধিক কোনও রসিক ফরাসি বা ইংরেজ বা ডাচ জলদস্যুই হয়তো এনে লাগিয়েছিল।

তুমি, মধ্যপ্রদেশ থেকে কিছু সরু বাঁশ, হালকা বেগুনি ফুলের জ্যাকারান্ডা আর বাসন্তী রঙা ফুলের অমলতাস বা বাসন্তীই এনে লাগিও এখানে ঋজুকাকা।

তিতির বলল।

আমি আর ভটকাই বললাম, আমরা এখানে ঋজুদাকে আর আসতেই দেব না।

ভটকাই-এর যুবরাজ দাদা বলল, কোনও মারাঠি জলদস্যুও এনে লাগাতে

পারে অথবা কনৌজি আংরে। তিনি তো এই সব সাগর উপসাগরে কম লড়াই করেননি বহু বিদেশির সঙ্গে।

তিতির বলল, সত্যি! ভাবা যায়! কোথায় মহারাষ্ট্র আর কোথায় আন্দামান। এ তো আর প্লেনে করে উড়ে আসা নয়। পুরো ভারতবর্ষকে পাক দিয়ে সমুদ্রপথে পশ্চিম ভারত থেকে এখানে আসা কি সোজা কথা।

আমি বললাম, সে কালের মানুষেরা সব অতিমানব ছিলেন। শিবাজিই বলো আর জাহাঙ্গিরই বলো, কি ঔরঙ্গজেব। ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা ভারতের এপার থেকে ওপার করতেন অবহেলে।

ভটকাই বলল, নবাবদের সঙ্গে আবার থাকত ধোবা, নাপিত, বাবুর্চি, বেয়ারা, ডাক্তার, নার্স, শয়ে শয়ে বউ। তাঁরা যুদ্ধও করতেন আবার কবিতাও লিখতেন। মাণ্ডুর মতো, শোনগড়-এর মতো দুর্গ আকছার বানিয়েও ফেলতেন যখন তখন। অরণ্য-দুর্গ, পর্বত-দুর্গ, মরু-দুর্গ, জয়সালমিরের মতো, আবার সমুদ্র-দুর্গও, জিনজিরার মতো। সত্যিই ভাবা যায় না।

ঋজুদা বলল, সেই বইটা পড়েছিস কি তোরা? ক্যাপ্টেন আপনি পড়েছেন কি?

কোনটা ঋজুদা? তিতির বলল।

ভাদেরাও জিজ্ঞাসু চোখে ঋজুদার চোখে তাকাল।

'The Wonder that was India'।

কার লেখা?

A.L. Basham.

না, পড়িনি।

কলকাতা ফিরেই পড়ে ফেলবি। ভটকাই, তুইও পড়বি।

আমি কি সায়েবের ইংরেজি বুঝব ঋজুদা?

ভটকাই মিচকেমি করে বলল।

তিতির বলল, ন্যাকামি কোরো না। পাক্কা সাহেব হয়েছ আজকাল, আর...তারপর যুবরাজকে বলল, আন্দামানের ন্যাভাল লাইব্রেরিতে পেয়ে যাবেন বইটি ভাদেরা। এই বই না থেকেই পারে না। প্রত্যেক ভারতীয়রই এ বই পড়া উচিত।

ঋজুদা বলল, এবার গাছগুলোকে চিনে নে। এখানে চিরহরিৎ গাছ যেমন আছে, পর্ণমোচীও আছে।

পর্ণমোচী মানে?

তিতির বলল।

পর্ণমোচী মানে deciduous মেমসাহেব। যে গাছেদের পাতা ঝরে গিয়ে আবার গজায়। মানে, যে গাছ coniferous নয়।

তারপর বলল, তোদের বাদাম গাছ তো দেখালাম, না? হার্ড-উড!

এখানে একরকম গাছ আছে তার নাম ডিডু।

ডিডু? কী নাম রে বাবা!

ইয়েস। ডিডু।

ওই দ্যাখ, সাদা চুগলাস, টঙ্গপিন, লাল ধুপ, আর সমুদ্র-মওহা।

মওহা মানে? মহুয়ার কাজিন-টাজিন না কি?

হতে পারে। আর ডিডু কিন্তু আসলে শিমুল। এখানে শিমুলকেই ডিডু বলে।

হার্ড-উড আছে, তো সফট-উড নেই?

যুবরাজ, বাঙালির ভাবী-জামাই জিজ্ঞেস করল।

নিশ্চয়ই আছে। সাদা ধূপ, বাকোটা, পপিতা, লম্বাপাত্তি। এবং ডিডুও সফট-উডই।

হার্ড এবং সফট-উড ছাড়াও এখানে অনেক ornamental গাছও হয়।

গাছ আবার ornamental হয় না কি?

ভটকাই বলল।

হয়, হয়, ভটকাইচন্দ্র। এখানে সবই হয়। নতুন দেশে এসেছ না?

তিতির জলিবয় আইল্যান্ডে সেই গানটা গাইছিল না? এলেম নতুন দেশে, তলায় গেল ভগ্নতরী কূলে এলেম ভেসে।

অর্নামেন্টাল গাছ কোথায়?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ওই দ্যাখ, আগেই দেখিয়েছি সিলভার গ্রে। তা ছাড়া, আছে উড। সাটিনের মতো মসৃণ, বুঝলি। ওই দ্যাখ ওই উপরে ওই গাছটার নাম মার্বল-উড।

সত্যি!

তিতির বলল।

আর যে মস্ত গাছটার ঠিক নীচে তুই দাঁড়িয়ে আছিস সেটার নাম জানিস কি?

কী?

চুল।

সত্যিই চুল?

আমি বললাম।

হ্যাঁ রে। চুল-এর বটানিকাল নাম Sagerala Eliptics.

বলেই বলল, আর ওই দ্যাখ, ওই প্রাগৈতিহাসিক মহীরুহ, চিড়িয়াটাপ্পুর পথে দেখেছিলি দু'-একটা—এখানের সবচেয়ে সুপরিচিত গাছ প্যাডক।

তিতির বলল, এর পরও চ্যাথাম আইল্যান্ডে চেরাই-করা কাঠ দেখতে যাচ্ছি না। করাত-কল তো নয়, গাছেদের লাশ-কাটা ঘর।

বাঃ। ভাল বলেছিস।

ঋজুদা বলল।

ভটকাই বলল, তুমি এবারে তোমার বটানির ক্লাসটা বন্ধ করো। চলো, গুহাটাকে আবিষ্কার করি আমরা। বাবাঃ এত গাছ কি এক সঙ্গে হজম করা যায়।

সবই গুলিয়ে গেল। কাল রাতের সার্ডিন ভাজাই হজম হয়নি তার উপরে এত বড় বড় সব বিদঘুটে নামের গাছ।

ঋজুদা হেসে বলল, ভটকাইকে, হ্যাঁ। ঠিকই বলেছিস, গুহাটা কোনদিকে, তা তোরা স্কাউটিং করে বের কর। একেকজন একেক দিকে চলে যা। আর গুহাটা খুঁজে পেলে গুহার মধ্যে তোদের কার ঘর কোনদিকে হবে তা এখন থেকেই ঠিক করে নে। ফার্স্ট-কাম ফার্স্ট-সার্ভড। কলকাতা থেকে আর্কিটেক্ট দুলাল মুখার্জি আর মিহির মিত্রকে নিয়ে আসব। দ্য ডেভিলস ডেন-এ আমার ভিলার প্ল্যান করার জন্যে। আমার বাড়ি হবে, আর সেখানে তোদের আলাদা আলাদা ঘর থাকবে না, তা কি হতে পারে!

চাই না ঘর আমাদের। এখানে তোমাকে আর আসতেই দেব না।

যুবরাজ ভাদেরা আমাদের ঝগড়া দেখে হাসছিলেন।

ঋজুদা বলল, তোরা তিনজনেই গুহার খোঁজ কর আমি আর ভাদেরা যাই পুকুরটার খোঁজে। নারি বলেছিল এখানে একটা মিষ্টি জলের পুকুর আছে।

পাহাড়চুড়োয় পুকুর? আজব কাণ্ড তো!

জল তো আর নীচ থেকে ওঠেনি। পুকুর খুঁড়েছিল কেউ কোনও সময়ে। তারপর বৃষ্টির জল জমে জমে পুকুর হয়ে গেছে। এখানকরা স্যান্ডস্টোন যদিও কোয়ার্টজাইট বা ব্যাসাল্ট বা মার্বল বা গ্রানাইটের মতো ওয়াটারটাইট নয়, মানে ওইসব পাথরের তুলনাতে 'পোরাস', তবু পাথর তো। পুকুর যদি খুঁজে পাই তা হলে সেখানে আমিও রুই-কাতলা কই-মাগুর সব ছাড়ব। আর তেলাপিয়াও। বাঙালির পো, মিষ্টি জলের মাছ ছাড়া চলে? বল? আর গদাধরকেও নিয়ে আসব। কালোজিরে কাঁচালঙ্কা দিয়ে তেল-কই রাঁধবে সে জম্পেশ করে। পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা বা সরষে দিয়ে তেলাপিয়া।

আমি বললাম, তুমি মাসে এক লক্ষ টাকা মাইনে দিলেও গদাধরদা আসবে না মরতে এখানে। দোখনো বাদার মানুষ তার মদনটাকির ফির দেশ ছেড়ে সে থোড়াই এই মেগাপডের দেশে আসবে। তা ছাড়া, আমি তো গিয়েই জুরুইন ভূতের গল্প করব তার কাছে। আর দেখতে হবে না।

ঋজুদা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, তা তো করবিই! বুড়ো বয়সে যে এই ডেভিলস ডেন-এর টঙে বসে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখব আর আবৃত্তি করব 'I am the monarch of all I survey'—সেই সুখ কি আছে আমার কপালে! তোরা তো আমার মিত্র নোস, শত্রুই।

তারপর বলল, তোদের কাছে একটা বন্দুক রাখ, গুলি ভরেই রাখ, আর অন্যটা আমাকে দে। সেটাও গুলি ভরে দে। সাপ দেখলেই ট্রিগার-হ্যাপি মিস্টার ভটকাই গুলি চালাবে না। বুঝেছ। সাপ যদি তোমাদের দিকে তেড়ে আসে তবেই মারবে। মনে থাকে যেন। আমার জমিদারিতে অযথা খুন-খারাপি ঘটাতে দেব না আমি। একে এক অভয়ারণ্য করে গড়ে তুলব।

ঋজুদা আর ভটকাই-এর যুবরাজ দাদা দ্বীপের উত্তর দিকে চলে গেল, আমরা দক্ষিণ দিকে এগোলাম।

'দ্য ডেভিলস আইল্যান্ড'-এর এলাকা কত হবে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না। তবে এক থেকে দেড় বর্গ কিমি তো হবেই কম করে।

তিতির বলল।

ভটকাই বলল, একবার চিন্তা কর রুদ্র। আমার এক পিসতুতো জামাইবাবু সল্টলেক-এ পাঁচ কাঠা জমি কিনে গর্বে বেঁকে গেছে। আবার বলে, আমেরিকান কায়দায়, 'সল্টলেক সিটি'। দেড় দু' বর্গকিমিতে কত কাঠা জমি থাকে রে রুদ্র?

এমন সুন্দর জায়গাতে আমাকে দিয়ে অঙ্ক করাস না। ক্যালকুলেটরও নিয়ে আসিনি।

আমি বললাম।

থাকগে। ওই অঙ্ক আমি ওই জামাইবাবুকে দিয়েই কষাব। অঙ্ক কষতে কষতে মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যাবে।

কেন?

কেন আবার? জে ফর জেলাসি।

আমি আর তিতির হেসে উঠলাম। ভটকাই-এর হরকতে।

একটু এগোতেই আমরা একটা ঘাসবনে এসে পড়লাম। সুন্দর একরকম ফিকে গোলাপি ফুল ফুটেছে সেই ঘাসে। প্রভাতী হাওয়ায় সুন্দর একটা আলতো গন্ধও ভাসছে সামুদ্রিক হাওয়াতে। পলিউশন যে কাকে বলে, তা ভুলেই গেছি পোর্ট ব্লেয়ারে প্লেন থেকে নামার পরে। আর 'দ্য ডেভিলস আইল্যান্ড'-এ হাওয়াতে যে পরিমাণ অক্সিজেন তাতে বছর খানেকের জন্যে গড়িয়াহাটের মোড় বা ডালহৌসি স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে থাকলেও ফুসফুসের কিছু ক্ষতি হবে না।

ভটকাই দেখি, ডাঙায় তোলা কই মাছের মতো মুখ হাঁ করে প্রশ্বাস নিচ্ছে। মুখ খুলছে আর বন্ধ করছে।

কী রে?

আমি বললাম।

ভটকাই বলল, ফুসফুসটাকে সার্ভিস করে নিয়ে যাচ্ছি। সত্যি। ঋজুদা এখানে থাকলে মন্দ হয় না কিন্তু। বছরে একবার করে জাহাজের ডেকে শুয়ে সবচেয়ে কম পয়সার টিকিটে কলকাতা থেকে চলে আসতে পারলে বাকিটা তো কেয়ার-অফ ঋজু বোস হয়ে যাবে। ঋজুদার বোট আনতে যাবে আমাদের পোর্ট ব্লেয়ারে। তারপর গুহার মধ্যে নিজের ঘরের বারান্দাতে পায়ের উপর পা তুলে বসে শুধু প্রশ্বাস নিয়ে যাব।

এই ফুলগুলোর কী নাম, জানো রুদ্র?

তিতির বলল।

না, জানি না, জানতে চাইও না। তোমাকে দেখি আধুনিক মানুষের রোগে ধরল।

মানে?

মানে, এই পৃথিবীতে জানার অনেক কিছুই আছে কিন্তু তা বলে সব কিছুই জানতে চাইতে নেই তিতির। কিছু জানার বাকি থাক, রহস্য থাক কিছু অমীমাংসিত। সবজান্তা মানুষের বড়ই বিপদ।

কেন?

কারণ, সে বড় রিক্ত।

সে আবার কী কথা।

এটা ভাববার কথা। ভেবে দেখো। শুধুমাত্র এই কারণেই আধুনিক মানুষদের জন্যে আমার মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয়। চাঁদে কী আছে? বৃহস্পতিতে প্রাণ আছে কি না? সমুদ্রের গভীরে কী কী থাকে? তার সব মাছ, সব প্রাণী, অক্টোপাস, তিমি, হাঙর, সব ফাঙ্গি, প্ল্যাংকটন, অ্যালগিকে চিরে চিরে না জানলে মানুষের শান্তি নেই। প্রকৃতির মধ্যের সব রহস্যই যেদিন মানুষ জেনে যাবে, সেদিন তার রিক্ততার আর শেষ থাকবে না। রহস্যময়তাই সব সৌন্দর্যর, ভাললাগা, ভালবাসার গোড়ার কথা। তা, তোমার মতো সুন্দর কোনও মেয়ের রহস্যময়তাই হোক, কি সমুদ্র বা পাখি বা প্রজাপতি বা কোনও ফুলের।

তারপর বললাম, জানি না, বুঝিয়ে বলতে পারলাম কি না। কিন্তু এমনই মনে হয়।

ভটকাই বলল, খাইছে। পোলাডা দেহি একেরে ফিলসফার হয়্যা গেল গিয়া। হায়! হায়! কলকাতা ফিরেই মাসিমাকে বলতে হবে তোকে চোখে চোখে রাখতে।

সামনেই বড় বড় গাছের একটা দঙ্গল। তার মধ্যে প্যাডক আর ডিডু চিনলাম। অন্য গাছগুলোর পরিচয় ঋজুদা এক সঙ্গে আমাদের ক্যাপসুলে ভরে বলে দিল বলেই গুলিয়ে গেছে। মানুষ চেনারই মতো, গাছ চেনাও সহজ নয়। ওই জঙ্গলের আড়ালে কী আছে দেখা যাচ্ছে না। হয়তো আরও জঙ্গলই আছে। মাটিতে ও গাছে সাপের জন্যে চোখ রেখে ওই গাছের জঙ্গলের মাঝামাঝি আসতেই ভটকাই চেঁচিয়ে উঠল, ওই তো গুহাটা।

আমরা তিনজনেই সেদিকে তাকিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ঋজুদার সঙ্গে কম জঙ্গলে তো ঘুরিনি দেশে-বিদেশে, কম পাহাড়ে চড়িনি, কম গুহাও দেখিনি কিন্তু এক ঝলক দেখেই মনে হল, এই গুহাটার মধ্যে কেমন এক প্রাগৈতিহাসিকতা আছে যেন। তার মুখের সামনে আগাছার জঙ্গল। নানা লতা লতিয়ে উঠেছে ছাদে। মধ্যপ্রদেশের হাম্পি বা বিজয়নগরে একা একা গেলে যেমন গা ছমছম করে এই গুহাটা দেখেও তেমনই গা ছমছম করে উঠল।

গুহার মুখটা প্রকাণ্ড। চার পাঁচটা হাতি ঢুকে যেতে পারে সহজেই পাশাপাশি। সাবধানে আমরা গুহার মুখে গিয়ে পৌঁছলাম জঙ্গলটা পেরিয়ে। তার মধ্যে কোন জন্তু জানোয়ার বা সাপ-খোপ আছে তা কে জানে! মস্ত লম্বা তার মধ্যেটা। খুব উঁচুও। পেছনের মুখটাও খোলা। তবে সেটা ঢোকার মুখের মতো অতখানি চওড়া নয়। গুহার পেছনের খোলা মুখ দিয়ে আকাশের নীল আর সমুদ্রের সবুজ দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের

নিজের তো কোনও রং নেই, জলের গভীরতার জন্যে কোথাও সবুজ, কোথাও নীল বা কোথাও কালো মনে হয় আর আকাশ তার রং ধার দেয় সমুদ্রকে, ধার দেয় চাঁদ এবং সূর্যও। সমুদ্রের বুকে অনেকেই আঁটে। অন্ধকার রাতে সমুদ্রের আবার অন্য রূপ। কখনও কখনও ফসফরাস জ্বলে ঢেউ-এর মাথায় মাথায় জলপরী আর মৎস্যকন্যাদের কোনও উৎসবের দিনে।

গুহার ভিতরে পা বাড়াতেই ভিতরে যেন একটা ঝড় উঠল। আর তার সঙ্গে উৎকট দুর্গন্ধ। বাঘের গুহাতে যেমন দুর্গন্ধ থাকে, তেমন। প্রায় দু-তিনশো বাদুর তাদের ডানার ফটাফট শব্দে পাখিদের পাখসাটের চেয়েও অনেক জোরদার শব্দ করে একই সঙ্গে গুহার বাইরে আসতে লাগল। উড়ে। আমরা কী করব বুঝতে না পেরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম তিনজনেই। কিছু উড়ে গেল পেছনের মুখ দিয়েও সমুদ্রের উপরে। ভটকাই বলল, ফ্লাইং মারব? শটগান দিয়ে? কী রে রুদ্র? এক নম্বর দিয়ে মারলে গোটা চারেক কি বেশিও নির্ঘাত পড়ে যাবে। এরা সব ফল-খাওয়া বাদুড়। এদের মাংস যা রোস্ট হবে না! লাজোয়াব!

তিতির নাক কুঁচকে বলল, খবরদার নয়। মরে গেলেও ওই দুর্গন্ধ প্রাণীর মাংস আমি খাব না। মেরো না রুদ্র।

বাদুড়দের মেঘ মাথার উপর দিয়ে উড়ে বাইরে গিয়ে ছড়িয়ে গেল ডেভিলস আইল্যান্ডের আকাশে। নানা গাছে গিয়ে বসল বোধ হয়।

তারপর তিতির বলল, এখানে মারামারি নয়। ঋজুদা না বলেছে এখানে অভয়ারণ্য গড়বে!

ছাড়ো তো ঋজুদার কথা। সারাজীবন জন্তু-জানোয়ার মেরে ঢিবি করে দিয়ে এখন বড় ধার্মিক হতে চাইছে। ঋজুদার মতিভ্রম হয়েছে।

আমি রুদ্রকে বললাম, তোর বড় বাড় বেড়েছে ভটকাই।

ঠিক সেই সময়েই মালভূমির অন্যদিক থেকে ধ্বপ করে একটা গুলির আওয়াজ হল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে শটগানের গুলির আওয়াজ ওরকমই শোনায়।

আমাদের কথার মধ্যেই বাদুড়গুলো গুহা খালি করে দিল আমাদের জন্যে। প্রোমোটারেরা যেমন পুরনো বাড়ির গরিব ভাড়াটেদের নির্দয়ভাবে উৎখাত করে, আমরাও আমাদের নতুন আস্তানার জন্যে বাদুড়দের উদ্বাস্তু করে দিলাম। বেচারিরা কোথায় থাকবে এখন, কে জানে! তিতির তখনও বাঁ হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে নাক চেপে ছিল। সত্যিই ভীষণই দুর্গন্ধ। এখানে যে কত পেটি রুম-ডেওডোরান্ট লাগবে গন্ধ মারতে তা ঈশ্বরই জানেন। দুর্গন্ধটা কোনওরকমে সহ্য করে আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম এবং এগিয়ে যেতেই এক জায়গাতে চার-পাঁচটি নরকঙ্কাল দেখতে পেলাম। কঙ্কালদের গায়ের পোশাক ধুলো হয়ে গেছে কিন্তু মাথার রংচঙে টুপিগুলো প্রায় অক্ষতই আছে। ইংরেজি ছবিতে জলদস্যুরা যেমন টুপি পরত তেমনই টুপিগুলো।

ভটকাই বলে উঠল ইরিবাবা। ওদের খুন করা হয়েছিল না নির্বাসন দেওয়া

হয়েছিল কে জানে। কোন দেশি মানুষ এরা তাই বা কে জানে। এক পাশে দেখলাম একটা লম্বা দূরবিন পড়ে আছে যেমন তালের ভেঁপুর মতো দূরবিন আগে ব্যবহার হত সমুদ্রে।

এসব পাশ কাটিয়ে গিয়ে আমরা গুহার অন্য মুখে গিয়ে পৌঁছলাম। আর পৌঁছেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। গুহাটার বাইরে অনেকখানি অনাবৃত পাথুরে জায়গা, ইংরেজিতে যাকে বলে ledge তাই আছে। খোলা বারান্দার মতো। আর সেখানে দাঁড়ালে সমুদ্রর যা দৃশ্য তা কী বলব! একবারে খাড়া প্রায় ছ-সাতশো ফিট নীচে সমুদ্র। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে ডেভিলস আইল্যান্ডের পায়ের পাথরে। তটভূমি নেই। আসলে এই দ্বীপও তো একটি পাহাড়ই। প্রায় হাজারখানেক সাদা সিগাল আর টার্ন চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের কিছু কিছু মাঝে মাঝেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তার মানে, এই পাহাড়ের খাড়া গায়ে ওদের বাসা আছে। ওদের তীক্ষ্ণ কিন্তু বিলাপের মতো ডাকের মধ্যে এক গভীর বিষণ্ণতা আছে। যে বিষণ্ণতা সমুদ্রের জলে এবং ওই গুহাতেও ছড়িয়ে যাচ্ছে, আবিরের মতো উড়ে যাচ্ছে সামুদ্রিক হাওয়ার দমকে দমকে।

আমরা তিনজনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সেই প্রাকৃতিক বারান্দাতে। অনেকক্ষণ। কোনও কথা সরছিল না কারও মুখেই। অনেকক্ষণ পরে বাচাল ভটকাই বলল, সত্যিই যদি ঋজুদা এখানে আস্তানা গাড়ে তা হলে আমি কিন্তু ঋজুদার 'ফ্রাইডে' হয়ে সেঁটে যাব। আঃ কী জীবন। চিন্তা করা যায় না। বল রুদ্র?

তিতির স্বগতোক্তি করল, ঋজুকাকার কোনও বিপদ হল না তো! গুলি ছুড়তে হল কেন? আমাদের উচিত একবার ওদিকে গিয়ে খোঁজ করা।

ঠিক বলেছ। বলে, আমরাও সেই স্বর্গের বারান্দা ছেড়ে সেই গা-ছমছম করা প্রায়ান্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকে এলাম আবার।

ভটকাই বলল, এখান থেকে সানরাইজ আর সানসেট কেমন দেখাবে বলত রুদ্র।

তিতির সঙ্গে সঙ্গে সুইজারল্যান্ড থেকে তার বড় মামার এনে দেওয়া ঘড়ির ব্যান্ডে লাগানো কম্পাসে চেয়ে বলল, বাঃ। গুহাটা উত্তরমুখো। তার মানে, ওই বারান্দাতে দাঁড়িয়ে ডানদিকে চাইলে সানরাইজ আর বাঁদিকে চাইলে সানসেট দেখা যাবে। ফার্স্ট-ক্লাস।

গুহা থেকে বেরিয়ে আমরা বাইরে পড়ে কিছুটা যেতেই ঋজুদা আর যুবরাজের গলার স্বর শুনতে পেলাম। ওরা এদিকেই আসছেন। ভটকাই গলা তুলে বলল, ঋজুদা, আমিও একটা বই লিখব ঠিক করলাম।

কী বই?

দূর থেকেই বলল, ঋজুদা।

'দ্য ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া'-র সেকেন্ড পার্ট।

তারপরই বলল, গুলি চালালে কেন?

এবার ওঁদের দেখা গেল। ঋজুদা বলল, এমার্জেন্সি হয়েছিল। বাঙালির ভাবী জামাই-এর প্রাণ বাঁচাতে গুলি চালাতে হল। নইলে, এতক্ষণে শঙ্খচূড় সাপে তার

মাথাতে ছোবল মারায় সে 'ফিনিতো' হয়ে যেত। বাপরে বাপ। কত বড় সাপ। সাপটার সঙ্গে বোধহয় যুবরাজের ফিয়াসেরও প্রেম আছে নইলে যুবরাজকে দেখেই সে অমন তেড়ে আসবে কেন? আমিও তো পাশেই ছিলাম।

যুবরাজ ভাদেরা হাসছিল। বলল, রিয়্যালি আই উড হ্যাভ বিন ডেড অ্যাজ হ্যাম বাই নাউ। থ্যাঙ্কস টু মিস্টার বোস।

তিতির উত্তেজিত গলায় বলল, কী দুর্গন্ধ জানো না ঋজুকাকা। অসংখ্য বাদুড়। তা ছাড়া কঙ্কাল আছে গুহার মধ্যে, জানো ঋজুকাকা। বিদেশি নাবিকদের।

কী করে বুঝলি যে বিদেশি নাবিকদের?

টুপি আর দূরবিন দেখে।

ভালই হল। নিয়ে যেতে হবে মেমেন্টো হিসেবে। একটা টুপি যুবরাজকে দিয়ে দেব, ভাল করে ড্রাই-ক্লিনিং করে মেমেন্টো হিসেবে ওর ফিয়াসেকে প্রেজেন্ট করবে। শঙ্খচুড়ের চামড়াটাও 'স্কিন' করে দিস তো রুদ্র।

আমি কিছু বললাম না। গুহাটা দেখে এতই অভিভূত হয়ে গেছিলাম যে, অত কথা তখন ভাল লাগছিল না। আবার আমরা ঋজুদাকে আর যুবরাজদাদাকে নিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকলাম। বাদুড়ের কথা শুনে ঋজুদা উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, বাদুড়গুলোর যা রোস্ট হত না, মারলি না কেন গোটা চারেক? তা ছাড়া খারাপ কি গন্ধটা? আমার তো বেশ ভালই লাগে।

ভটকাই বলল, ওই যে! তোমার চেলা-চেলিদের জিজ্ঞেস করো।

ঋজুদা বলল, কঙ্কালগুলোও নিয়ে যেতে হবে। নৃতত্ত্ববিদদের কাছে পাঠাব। তাঁরা এইসব কঙ্কালের মালিক মানুষেরা ঠিক কত বছর আগের তা বলে দিতে পারবেন পরীক্ষা করে। এখানে কঙ্কাল তো থাকতেই পারে। খুনখারাপি তো হতই, আবার না-খেয়েও মরে থাকতে পারে এরা। ধরো আমরা যাবার সময়ে যদি ভটকাইকে এখানে নামিয়ে দিয়ে চলে যাই, তবে বাদুড় আর ফল খেয়ে আর কতদিন বাঁচবে। ছমাস পরে এলে আমরাও ভটকাই-এর কঙ্কালও পাব, এই নীল-রঙা জামাটা গায়ে দেওয়া অবস্থাতেই।

ভটকাই তাকে নিয়ে বদ রসিকতাতে চটে গিয়ে বলল, মরে গেলে দাহ না হলে সকলেই তো কঙ্কাল হবে। তা আমিও হব। তাতে আর কী?

বাইরের খোলা বারান্দাতে পৌঁছে ঋজুদা বলল, বাঃ যেমনটা ভেবেছিলাম, ঠিক তেমনই। এখানে না থাকলেই নয়। এই দ্বীপ থেকে কোনও বাণিজ্যিক জাহাজও দেখা যাবে না কারণ এর ধারেকাছে কোনও শিপিং চ্যানেলই নেই। তবে যুদ্ধজাহাজ দেখা যেতে পারে।

ভাদেরা বলল, সাবমেরিনও মাঝে মাঝে দেখা যেতে পারে। জলের নীচ থেকে দেশি বা বিদেশি সাবমেরিন পেরিস্কোপ তুলে দেখে যাবে আপনাকে। কখনও বা অক্সিজেন ভরার জন্যে 'সাব' ভেসে উঠলেও দেখতে পারেন প্রকাণ্ড, কালো, তিমি মাছের মতো তার শরীরের পিঠের উপরের 'কনিং-টাওয়ারে' ক্যাপ্টেন আর ক্রুরা

দাঁড়িয়ে আছে।

এই গুহাটা কিন্তু ইন্ডিয়ান নেভি সহজেই রকেট-লঞ্চার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। লং-রেঞ্জ রকেট লঞ্চার। আজকাল তো নিশানা নেওয়ারও দরকার নেই। Heat-Seeking Rocket নিজেই শত্রুপক্ষের প্লেন বা জাহাজ বা সাবমেরিনকে খুঁজে নেবে।

তা ঠিক। ভাদেরা বলল। তারপর বলল, ব্যবহৃত হবেও হয়তো কখনও। কে বলতে পারে। আমাকে একটা রিপোর্টও দিতে বলেছেন কমোডর বাটলিওয়ালা।

নানা জনে নানা কথা বলছিলেন সেখানে দাঁড়িয়ে। ওই সামুদ্রিক হাওয়ার মধ্যে, টার্ন আর সি-গালেদের সংক্ষিপ্ত কিন্তু চাবুকের মতো ডাকের মধ্যে, ডেভিলস আইল্যান্ডের সেই উঁচু, খোলা পাহাড়ি বারান্দাতে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম, আমি আরও বড় হয়ে, সচ্ছল হয়ে নিজস্ব মালিকানার এমন একটি দ্বীপের বাসিন্দা হব। সেখানে বসে লিখব, ছবি আঁকব, গান গাইব আর ভাবব। হেনরি ডেভিড থোরোর 'The Walden'-এর মতো, ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'The Leaves of Grass'-এর মতো, শ্রীঅরবিন্দ বা স্বামী বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথের মতো লেখা লিখব, যা পড়ে, আমার পরের পরের পরের প্রজন্মর মানুষেরা মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারবে। শুধু মানুষের চেহারা থাকলেই তো আর কেউ মানুষ হয়ে ওঠে না, ওই সব লেখা পড়েই তো আমার মতো সাধারণেরও 'মানুষের মতো মানুষ' হয়ে ওঠার ইচ্ছা জাগে মনে।

ঋজুদা হঠাৎ বলল তিতিরকে, তিতির, আয় আমরা সবাই এখানে বসি কিছুক্ষণ। মৃত বিদেশিদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি কিছুক্ষণ নীরব থেকে। বলে, নিজেই আগে পাথরের উপরে পা মুড়ে থেবড়ে বসে পড়ল। সর্বক্ষণ হাওয়া চলে, তাই পাথরের উপর কোনও ধুলোবালি ছিল না। এমনিতে মসৃণও।

আমরাও সকলে বসলে কিছুক্ষণ নীরবতা পালনের পরে ঋজুদা বলল, সেই গানটা শোনা তো তিতির। পুরোটা গাইবি কিন্তু। আস্তে আস্তে, তাড়াহুড়ো করবি না।

কোন গানটা তা তো বলবে?

তিতির বলল।

ও হ্যাঁ।

সেই যে, 'ঘাটে বসে আছি আনমনা'।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিতির বলল কথা যে মনে নেই।

এই তো তোদের দোষ।

'ঘাটে বসে আছি আনমনা যেতেছে বহিয়া সুসময়
সে বাতাসে তরী ভাসাব না যাহা তোমা পানে নাহি বয়।'

তারপরে কী তা আমিও ভুলে গেছি। শেষটা মনে গাছে। গানটা ধরই না। ধরলেই মনে পড়ে যাবে।

শেষটাই বলো তুমি। তিতির বলল।

'এতদিন তরী বাহিলাম যে সুদূর পথ বাহিয়া—

শতবার তরী ডুবুডুবু করি সে পথে ভরসা নাহি পাই ॥
তীর-সাথে হেরো শত ডোরে বাঁধা আছে মোর তরী খান—
রশি খুলে দেবে কবে মোরে, ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।
কবে অকূলে খোলা হাওয়া দিবে সব জ্বালা জুড়ায়ে
শুনা যাবে কবে ঘন ঘোররবে মহাসাগরের কলগান ॥'

ঋজুদা সুললিত গলায় আবৃত্তি করল। নিজে গাইলেই পারত। ভারী ভাল গায় অথচ গাইবে না। তবে আমার কখনও কখনও শোনার সৌভাগ্য হয়েছে।

ঋজুদা বলে, সব কিছুকেই কি বাজারে আনতে হয়? কিছু তো আমার নিজস্ব থাকবে!

কথাটা আমার খুবই ভাল লেগেছিল। আজকের এই আদেখলাপনার যুগে মঞ্চে উঠে নিজেকে নির্লজ্জর মতো প্রচার করার যুগে এমন মানসিকতা খুব কম মানুষেরই মধ্যে দেখতে পাই।

তিতির ধরল গানের মুখটা। রবীন্দ্রনাথের বা অতুলপ্রসাদের কিছু কিছু গান কোনও কোনও পরিবেশে কোনও সাধারণ গাইয়ের গলাতেও এমন গভীরতা ও দীপ্তি পায় যে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়।

গান শেষ হবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত আমরা সবাই-ই চুপ করে বসে রইলাম। ঋজুদার পাইপ অনেকক্ষণ নিভে গেছিল কিন্তু নতুন করে আর ধরাল না। সমুদ্রের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল আত্মস্থ হয়ে। ওই মানুষটির মধ্যে যে কতজন পরস্পর-বিরোধী মানুষ আছে তা শুধু আমরা তিনজনই জানি। অন্যেরা ঋজুদার তল পাবে না।

গান শেষ হলে ভাদেরা লাজুক মুখে নরম করে বলল, ও ও রবীন্দ্রসংগীত গায়।

ঘোর ভেঙে ঋজুদা বলল, ও কে?

মানে, আমার ফিঁয়াসে।

ও। আই সি।

ঋজুদা হেসে বলল।

তারপর বলল, তুমি বাংলা শিখছ, রবীন্দ্রনাথকে ভাল করে পড়ো। সত্যিই যদি পড়ো, যদি তাঁর গানকে হৃদয়ের শরিক করে তুলতে পারো, তবে কোনওদিন বা তোমারও উত্তরণ হবে। উ্য আর ভেরি লাকি দ্যাট উ্য আর গোয়িং টু ম্যারি আ বেঙ্গলি গার্ল হু সিংগস টেগোর সঙস।

ভটকাই-এর যুবরাজদাদা চুপ করেই রইল মাথা নামিয়ে। আমরাও চুপ করে রইলাম।

সব জায়গাতে, সব সময়ে কথা শুনতে তো ভাল লাগেই না, বলতেও নয়।

জুজুমারার বাঘ

ওড়িশার সম্বলপুর শহর থেকে মহানদীর অন্য পাশে একটি পথ গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে রেঢ়াখোল। রেঢ়াখোল হয়ে আরও এগিয়ে গেলে পৌঁছনো যায় বড়কেরাছক হয়ে অঙ্গুলে। এটি ওড়িশার একটি বিখ্যাত বনাঞ্চল।

এই অঙ্গুল ডিভিশনেরই অধীনে পুরানাকোট, বাঘঘমুণ্ডা, টুম্বকা, লবঙ্গী ইত্যাদি বিভিন্ন ফরেস্ট ব্লক। ঋজুদার দৌলতে এই সবের মধ্যে অনেক জায়গাতেই যাওয়ার সুযোগ আমার, তিতিরের এবং ভটকাইয়েরও হয়েছিল। তবে ওড়িশার এদিকটাতে আগে ঋজুদা যদিও এসেছিল, আমরা কেউই আসিনি।

সম্বলপুর শহরের নাম সমলেশ্বরীর মন্দিরেরই নামে। মস্ত বড় সাদারঙা মন্দির। সম্বলপুরের রাজারাই সমলেশ্বরীর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মা দুর্গারই আরেক নাম সমলেশ্বরী। কটক শহরে আবার এই দেবীরই নাম চণ্ডী। কটকচণ্ডীর মন্দির বিখ্যাত সেখানে। যে পথে কটকের মন্দির সেই পথের নামই মন্দিরের নামে—কটকচণ্ডী রোড।

কটক শহরের রাস্তাঘাটের নামগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত। তবে প্রত্যেকটি নামেরই মানে আছে। একটি পথের নাম বজ্রকপাটি রোড।

কটক শহর খুবই প্রাচীন শহর তো। প্রাচীন তার ঐতিহ্য। কলকাতা শহরের মতো স্বল্পদিনের এবং সর্বজ্ঞদের শহর নয় কটক।

সম্বলপুরের কাছেই কোল ইন্ডিয়ার সাবসিডিয়ারি কোম্পানি মহানদী কোলফিল্ডস-এর সদর দপ্তর। ঋজুদার কী কাজ ছিল মহানদী কোলফিল্ডস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শর্মা সাহেবের সঙ্গে। আমরা কলকাতা থেকে ট্রেনে গিয়ে ঝাড়সুগ্‌দাতে নেমে সেখান থেকে চমৎকার মসৃণ এবং চওড়া রাউরকেলা-সম্বলপুর এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে মহানদী কোলফিল্ডস-এর গেস্ট হাউসে গতকাল সকালেই এসে পৌঁছেছিলাম। চমৎকার গেস্ট হাউস। এয়ারকন্ডিশনড। খাওয়া-দাওয়া চমৎকার।

গতকাল সারাদিন ঋজুদা কাজ সেরেছে। তাই আজ সকালেই গাড়ি করে বেরিয়ে পড়েছিলাম ব্রেকফাস্টের পরে, অঙ্গুলে যাব বলে। কিন্তু দুপুরবেলা

জুজুমারা আর চারমল-এর মাঝামাঝি হাইওয়ের উপরের একটি ধাবাতে খাওয়া সেরে বেরোবার দশ মিনিট পরেই দেখা গেল গাড়ির ব্যাটারি চার্জ দিচ্ছে না। আসলে, চার্জ দিচ্ছিল না অনেকক্ষণ আগে থেকেই। না ড্রাইভার, না সামনের সিটে-বসা ঋজুদা তা নজর করেছিল। গাড়ি থামিয়ে বনেট খুলে দেখা গেল যে দোষ ব্যাটারির নয়, অ্যাম্বাসাডর গাড়ির আর্মেচারই পুড়ে গেছে।

ড্রাইভার কৃষ্ণ দাস গোমড়ামুখে বলল, আর্মেচার সারাবার মতো মিস্ত্রি ওখানে এক রেঢ়াখোল ছাড়া অন্য কোথাওই নেই। তাই তাকে বাস বা ট্রাকে করে যেতে হবে আর্মেচার নিয়ে রেঢ়াখোল-এ। এই বিয়াল্লিশ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরেই।

যদিও মে মাসের শেষ, কিন্তু বৃষ্টি নেমে গেছে। সারা পৃথিবীর আবহাওয়াই ওলট-পালট হয়ে গেছে আমাদের অসীম লোভে। এই অন্যায়ের গুণাগার আমাদের তো শুনতে হবেই। আমাদের ছেলেমেয়েদেরও হবে।

ঋজুদা সব সময়েই বলে একথা।

কৃষ্ণ অঙ্গুলগামী বাসে চড়ে চলে গেছে কিছুক্ষণ আগে, পাকা তাল-এর মতো দেখতে, তামার তার জড়ানো ভীষণ ভারী আর্মেচারটি দু' হাতে বয়ে নিয়ে কোঁত দিতে দিতে বাসে উঠে। এখন আমাদের কতক্ষণ 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!' করে প্রাণভোমরাহীন গাড়িতে বসে থাকতে হবে, তা কে জানে। কৃষ্ণ বলে গেছে, তার ফিরতে দু' ঘণ্টাও হতে পারে আবার রাতও হয়ে যেতে পারে। অতএব...

সামনে-পিছনে এবং দু' পাশেই অত্যন্ত গভীর জঙ্গল কত বর্গকিলোমিটার হবে তা জানি না। তবে শ পাঁচেক কিলোমিটার তো হবেই স্বচ্ছন্দে। তার মধ্যে-মধ্যে নানা পাহাড়শ্রেণী। স্থানীয় লোকেরা বলে 'পর্বত'। ধাবাতে খেতে খেতে শুনছিলাম। আর কত বিচিত্রই না তাদের নাম সব। সাগমুলিয়া-গড়াখুল, বনতুলে-খকর, রেঙ্গানি-কানি, যসুয়া—এই রকম। পর্বত বলে, কারণ আসল পর্বত, যেমন গাড়োয়াল বা কুমায়ুন বা সিকিমের হিমালয় তো দেখেনি এরা চর্মচোখে। তাই তিলকেই তাল মনে করে।

ঋজুদা বলল, আমরা জনবসতির খুব দূরে নেই। জুজুমারার থেকে একটুই এসেছি। চারমল পেরিয়ে পৌঁছতে হবে রেঢ়াখোলে।

—জুজুমারা!

—কী নামরে বাবা।

ভটকাই স্বগতোক্তি করল।

তিতির বলল, শেকসপিয়ার তো পড়নি তুমি ভটকাই। শেকসপিয়ার বলেছিলেন, 'হোয়াটস ইন আ নেম।'

—শেকসপিয়ার তো আমি পড়িনি, তুমি কি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারাশঙ্কর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পড়েছ? রবীন্দ্রনাথও কি পড়েছ ভাল করে?

ঋজুদা বলল, এই শুরু হল তোদের খুনসুটি। তার পরে বলল তিতিরকে, শেকসপিয়ারের কথা বললি তুই তিতির, তাই মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় বাংলা

বইয়েতে শেকসপিয়ারের উল্লেখ থাকত 'শেক্ষপিয়ার' বলে আর জার্মান দার্শনিক ম্যাক্সমুলারের উল্লেখ থাকত 'মোক্ষমুলার' বলে।

আমরা হেসে উঠলাম ঋজুদার কথাতে।

ভটকাই বলল, কেন?

—কেন? তা কী করে বলব। তখন মানুষের ইংরেজি-জ্ঞান কম ছিল। পরাধীন ভারতে ইংরেজির যা পরাক্রম ছিল, স্বাধীন ভারতে তার চেয়ে একশো গুণ বেশি। তবে যে যেটুকু জানতেন তা তিনি ভালভাবেই জানতেন। এতকিছু জানতে গিয়ে সব গুবলেট করে ফেলেনি মানুষ। তাঁরা বাংলা জানতেন ভাল করে। তাঁদের মধ্যে ইংরেজি জানতেন খুব কম মানুষই। সে কারণেই হয়তো এমন সীমাবদ্ধতা দেখা যেত। তবে একথাও বলব যে, তখন রুই-কাতলার রাজত্ব ছিল, আজকের মতো খলসে আর পুঁটি ফরফর করে বেড়াত না চারদিকে।

তাই?

অবাক হয়ে বলল তিতির।

আমি প্রসঙ্গ বদলে বললাম, ঋজুদা এ অঞ্চলে তুমি কখনও শিকার করোনি?

—বলতে গেলে, না-ই। এ অঞ্চলের গল্প শুনতাম কটকের চাঁদুবাবু আর অঙ্গুলের বিমলবাবুর কাছে। এইসব জঙ্গলের রোমহর্ষক সব গল্প বলতেন চাঁদুবাবু। গণ্ডার এবং বুনোমোষ ছিল না অবশ্য। কিন্তু হাতি, বাঘ, বাইসন মানে গাউর, চিতা, ভয়াবহ সব ভাল্লুক, ইয়া ইয়া দাঁতের বড়কা বড়কা শুয়োর, তোর কাঁধ সমান উঁচু কাঁটা-ঝনঝনানো শজারু, নানা জাতের হরিণ এবং অ্যান্টেলোপ, ময়ূর, মুরগি, সবুজ হরিয়াল, গাঢ় নীলরঙা রক-পিজিয়ন, বড়কি এবং ছুটকি ধনেশ, ওড়িশাতে যাদের বলে কুচিলা-খাঁই এবং ভালিয়া-খাঁই।

তিতির বলল, মানে, গ্রেটার এবং লেসার হর্নবিল বলছ ঋজুকাকা?

—হ্যাঁ।

—তবে এখানে ওদের এরকম অদ্ভুতুড়ে নাম কেন?

—হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধ নাকসভোমিকার ফল যে গাছে হয় তাদের ওড়িয়াতে বলে কুচিলা। আর ওই কুচিলা খুব ভালবেসে খায় এবং শীতকালে যখন সে গাছে ফল আসে তখন বড়কি ধনেশরা ওই গাছেতেই আড্ডা গাড়ে বলেই তাদের ওরা নাম দিয়েছে কুচিলা-খাঁই। ভালিয়াও এক রকমের গাছই। তবে কুচিলা গাছেদের চেয়ে অনেক ছোট হয় সে গাছ। পাহাড়ি এলাকাতে ঘন বনের মধ্যেই হয় এইসব গাছ। ছোটকি ধনেশ ভালিয়া ফল খেতে ভালবাসে বলেই ওদের নামও ভালিয়া-খাঁই। মানে, ভালিয়া খায় আর কী!

—তবে কি আমার নাম হওয়া উচিত ছিল পাত্তুয়া-খাঁই?

আমরা সবাই হেসে উঠলাম ভটকাইয়ের কথা শুনে।

তিতির বলল, স-ত্যি! তুমি যে কত্ত জানো ঋজুকাকা!

ঋজুদা হেসে বলল, ইয়ার্কি হচ্ছে? একটু-আধটু জানা ভাল কিন্তু কেউ যদি

সর্বজ্ঞ হয়ে যায় তবেই বড় বিপদ। প্রার্থনা করিস ঈশ্বরের কাছে, তা যেন কখনও না হই।

তারপরই বলল, বৃষ্টি তো থেমে গেছে। চল আমরা গিয়ে আম কুড়োই। পরে নুন-লঙ্কা জোগাড় করে রেলিশ করে খাওয়া যাবে।

পথের দু' পাশে মস্ত মস্ত প্রাচীন আমগাছ আর প্রত্যেকটাই আমে ভরে আছে। মে মাসের শেষ। এখানে পৌঁছবার আগে দেখে এসেছি যে, গ্রামের কাছাকাছি সব জায়গাতে পথ-পাশের আমতলিতে ছোট-বড় অনেকেই আম পাড়তে আর আম কুড়োতে ব্যস্ত। অনেকে গাছে উঠেও পাড়ছে আম। দেখেছিলাম। অনেকে আবার জমিতে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে অথবা আঁকশি দিয়েও পাড়ছে। এখানে কাছাকাছি জনবসতি নেই বলেই গাছতলিতে মানুষ নেই। বৃষ্টি থামার পরে নানা রকম পাখি ডাকছে দু' পাশের বন থেকে। যে-পাখিটা রাতের বেলা ভুতুড়ে গলাতে গুব-গুব গুব গুব করে ডাকে সে এই ভর দুপুরেই ডাকতে আরম্ভ করেছে। পাখিটার নাম জানতে হবে ঋজুদার কাছ থেকে।

তিতির বলল, ঋজুকাকা তোমার মধ্যে একজন চিরশিশু আছে বলেই তোমাকে আমাদের এত ভাল লাগে। তুমি বুড়ো হলে কখনও আম কুড়োবার কথা বলতেই পারতে না।

ঋজুদা বলল, এইটাই তো আমার রোগ। মহারোগ। বুড়ো আমি ইচ্ছে করলেও কোনওদিনও হতে পারব না। হয়তো পক্ক-কেশ, লোলচর্ম হয়ে যাব কোনওদিন, হয়তো কেন, অবশ্যই হব, কারণ সকলেই হয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ছেলেমানুষটিই থাকব। আঠারোই আমার চিরকালীন বয়স। সে বয়স আর বাড়বে না কোনওদিনও।

ভটকাই বলল, তাই থেকো, তাই থেকো, এভার গ্রিন।

আমি বললাম, আমরা রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনীর 'নবযৌবনের দল' হয়েই থাকব চিরটা কাল।

ঋজুদা বলল, তাই যেন থাকি।

অনেকগুলো আম কুড়োনো হয়ে গেলে একটা মস্ত আমগাছের নীচের বড় বড় কালো পাথরের উপরে আমরা গিয়ে ছড়িয়ে বসলাম উপরে-নীচে। পাথরগুলো ভিজে ছিল। ভটকাই বুদ্ধি করে গিয়ে গাড়ির গ্লাভস-বক্স খুলে হলুদ আর লাল কাপড় নিয়ে এসে পাথরগুলো ভাল করে মুছে দিল।

ঋজুদা একটা বড় পাথরে বসে পাইপটা ধরাল। এখন প্রায় আড়াইটে বাজে। দুপুর। বৃষ্টি থেমে গেলেও আকাশের মুখ ভার। মনে হচ্ছে যে-কোনও সময়েই আবার কেঁদে উঠতে পারে।

ভটকাই কাপড়গুলো গাড়িতে রেখে এসে ঋজুদাকে বলল, ঋজুদা, রুদ্র যে জিজ্ঞেস করল তোমাকে এই অঞ্চলে শিকারের কথা, তা তুমি তো কথাটা চেপেই গেলে।

—চেপে গেলাম মানে?

—চেপে গেলে না? বললে, 'বলতে গেলে, না-ই।' তার মানেটা কী হল? এরকম ঘোরপ্যাঁচের কথা তো বলে কমিউনিস্টরা। তুমিও কি কমিউনিস্ট?

—কম অথবা বেশি, আমি কোনও অনিষ্টর মধ্যেই নেই। যারাই দেশের দশের ভাল করবে আমি তাদেরই দলে। সে ভাল, যে দলই করুক না কেন?

—এই ভটকাই। তুই ওকালতি পড়। তোর হবে। এমন জেরা তো ফৌজদারি আদালতের উকিলও করে না রে!

ফাজিল ভটকাই বলল, হাঃ। হাঃ। এই লাইফটাই তো একটা ফৌজদারি আদালত।

আমরা সকলেই ওর কথাতে হেসে উঠলাম।

ঋজুদা বলল, রুদ্র ভট্‌কাইকে ধরে এবারে একটু চটকে দে তো।

মাঝে মাঝে, তবে বেশ অনেকক্ষণ বাদে বাদে এক একটি বাস বা ট্রাক বা প্রাইভেট গাড়ি আসছিল বা যাচ্ছিল জলভেজা মসৃণ পথের উপর ছিপ-ছিপ-ছিপ শব্দ তুলে। যানবাহন খুবই কম। এখনও শান্তি আছে কোথাও কোথাও। জেনে ভাল লাগে।

এই কদিন আগেই কাগজে পড়ছিলাম যে, এই পথেই অঙ্গুল থেকে সম্বলপুরে আসার সময়ে একটি যাত্রীবোঝাই বাসের গায়ে একটি একরা-বাইসন গুঁতো মেরে বাস-এর গায়ে ফুটো করে দিয়েছে। পুরো অঞ্চলটাই ঘন বনাবৃত নানা পাহাড়শ্রেণীর পাহারাতে, নানা নদী-নালার মালাতে এখনও বেশ আদিম আদিম আছে। বনের গাছগাছালির অধিকাংশও আদিম। বনবিভাগের লাগানো প্ল্যানটেশন নয়।

—কী হল ঋজুদা? বলো। 'বলতে গেলে না-ই'-এর ব্যাখ্যা কিন্তু তুমি এখনও দিলে না।

ভটকাই বলল।

—হ্যাঁ।

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, আমাদের পেছনে ফেলে-আসা জুজুমারার একটু আগে রেঙ্গানি-কানি নামের একটি পাহাড়শ্রেণী আছে। তারই পাদদেশের ঘন জঙ্গলের লাগোয়া গ্রামে একটি cattle-lifter মেরেছিলাম বহু বছর আগে। মেরেছিলাম মানে, মারতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাই বলেছিলাম শিকারের কথায়, 'বলতে গেলে না-ই'।

—বাধ্য হয়েছিলে মানে?

—মানে, নিজেই জিপ চালিয়ে যাচ্ছিলাম সম্বলপুর থেকে অঙ্গুল। জুজুমারার আগে হঠাৎই একটি আত্মহত্যাকামী ব্যর্থ-প্রেমিক বোকাপাঁঠা জিপকে বাইসনের মতো টুঁ মারতে গিয়ে পা পিছলে চাকার নীচে পড়ে গিয়ে মারাত্মক রকম আহত

হয়। সেই সময়টাতে আমি বামরাতে শাল জঙ্গলের ঠিকা নিয়ে জঙ্গলেই ক্যাম্প করে থাকি। সঙ্গী বলতে আমার সেবাদাস হাবা-গোবা কিন্তু নিজেকে সুপার ইনটেলিজেন্ট ভাবা, আতুপাতু ধন্ধ। আমার কুক-কাম-ড্রাইভার-কাম-মুহুরি-কাম-লোকাল গার্জিয়ান।

—কী নাম বললে?

—আতুপাতু।

—আতুপাতু আবার কারও নাম হয় নাকি?

—হবে না কেন? বাবা-মা ভালবেসে যে নাম রাখবেন সে নামই হয়।

আমি বললাম, ভটকাই-ই বা কারও নাম হয় নাকি?

ভটকাই তখন চুপ করে গেল।

তিতির বলল, ধন্ধটা কী ব্যাপার?

—আহা, surname, পদবি। ওড়িয়া পদবি। আমাদের কারও কারও পদবি যদি দাড়িপা বা পোদ হতে পারে ধন্ধ কী দোষ করল!

—তা ঠিকই।

তিতির বলল।

—তারপর বলো ঋজুদা।

ভটকাই বলল।

—মিনিট পাঁচেক আগেই তাকে স্টিয়ারিং ছেড়েছিলাম আমি, নইলে আমিই চালাচ্ছিলাম বামরা থেকেই। আর তারই মধ্যে সেই চালাক-পাঁঠা চাপা দিয়ে দিল এক বোকা-পাঁঠাকে। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন এসে ঘিরে ফেলল আমাদের। এই মারে কি সেই মারে। পাঁঠাটার দাম মিটিয়ে দিলেই মামলার নিষ্পত্তি হত, কিন্তু আতুপাতুর চ্যাটাং-চ্যাটাং কথাতে জনতা ক্ষেপে গেল। আর ভারতের সব জায়গার জনতাই হচ্ছে লাল পিঁপড়েদেরই মতো। একবার একজন কোথাও সেঁটে গেলে, অন্যরা সকলে কী ঘটেছে তা না জেনেই গায়ে পড়ে উড়ন-চাঁটি মেরে হাতের সুখ করে নিতে চায়। পাঁঠাটাও একেবারে মরে গেলে মামলার সহজ নিষ্পত্তি হত কিন্তু সে তো মরে তো নিই, মরবেও না। তার চিৎকার শুনে জনগণ বলতে লাগল, 'যড়া! সে খাসিটাকু খন্ডিয়া করিকি ছাড়ি দেলু।'

—মানে?

তিতির বলল।

—মানে হল, অর্থাৎ 'শালা! খাসিটাকে আহত করে ছেড়ে দিল।'

যখন অগণন উড়ন-চাঁটি আমার নিজের গায়ে-মাথায়ও বর্ষিত হয় হয় এমন সময়ে ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলল, ঋজুবাবু।

আহা! কানে যেন মধুবর্ষিত হল। ধড়ে প্রাণ এল।

আতুপাতুও বত্রিশপাটি বিকশিত করে বলল, বাবু! হাড়িবন্ধু।

জনতা, বিনি-পয়সার উত্তেজনায় ভাঁটা পড়াতে মন-মরা হয়ে গেল।

হাড়িবন্ধুর বাড়ি লবঙ্গীতে। সেখানে ফুটুদাদের সঙ্গে যখন যেতাম তখন সেই আমাদের সবরকম খিদমদগারি করত। সে জনতাকে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে কাঁকড়াবিছের শুঁড়ের মতো একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে শান্ত করল।

তার পরে জনতারই কথাতে জানা গেল যে, রেঙ্গানি-কানি পাহাড়ের পাহাড়তলিতে কুচুয়া বলে একটি গ্রামে গত রাতেই একটা মস্ত চিতা খুব বড় একটা দুধেল গোরু মেরেছে। গোরুটার কিছু খেয়েও গেছে। 'মড়ি'র উপরে বসলে আজ তাকে হয়তো মারাও যাবে। তবে আশা কম। এবং গোরুর 'মড়ি'তে বাঘের ফেরার আশা কম বলেই এই পাঁঠাটাকে কিনে কুচুয়া গ্রামের লোকেরা গ্রামে ফিরে যাচ্ছিল। হাড়িবন্ধু এখন কুচুয়াতেই থাকে। কয়েক গুঁট জমি কিনে সে এখানেই বিয়ে করে থিতু হয়েছে।

—গুঁটটা কী জিনিস?

তিতির প্রশ্ন করল।

—গুঁট হচ্ছে ওড়িশার জমির পরিমাণ। আমাদের যেমন বিঘা।

—ও। বলো, ঋজুকাকা।

—চাষ-বাস করে হাড়িবন্ধু। তরি-তরকারিও ফলায়। জুজুমারা আর চারমল-এর হাটে বিক্রি করে। চলে যায় দিন কোনওমতে।

ঋজুদার পাইপটা একেবারেই নিভে গিয়েছিল। পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে ঋজুদা আবার শুরু করল—

যে গোরুটাকে মেরেছে চিতা, সেটা হাড়িবন্ধুর বড় সম্বন্ধীর। হাড়িবন্ধু সকলকে বোঝাল যে, এই অধম ভারী শিকারি। ওড়িশার বহু বনেই তাঁর পা পড়েছে। আজ সাক্ষাৎ মা সমলেশ্বরীই তাঁকে চিতা-নিধনের জন্য এই পথে চালান করেছেন এবং পাঁঠাটাও বোধ হয় তা জানতে পেরে জিপের গায়ের সঙ্গে নিজের গা ঠেকিয়ে দিয়ে এই কেলো করেছে।

আমি হাড়িবন্ধুর কথার প্রতিবাদ করে বললাম, তা কী করে হবে। আমাকে অঙ্গুলে গিয়ে আজ পৌঁছতেই হবে। ঠিকাদার মহাদেব ঘোষ আর বিমল ঘোষের সঙ্গে কাজ আছে। ওখানে কাজ সেরে ঢেনকানলেও যেতে হবে একবার।

কিন্তু কে শোনে কার কথা!

বাঁচবার জন্য বললাম, আমি কি সঙ্গে বন্দুক-রাইফেল নিয়ে বেরিয়েছি নাকি? শুধু পিস্তলটা আছে বেল্টের সঙ্গে হোলস্টারে; প্রয়োজনে বেয়াদব মানুষ মারার জন্য। পিস্তল দিয়ে কি বাঘ মারা যায়?

হাড়িবন্ধু এবং তার সঙ্গীরা বলল, 'বহুতো বন্দুক অচ্ছি এটি। বন্দুকপাঁই কিচ্ছি চিন্তা নাই। কিন্তু আপনাংকু রহিবাকু হেব্ব।'

তারপর বলল, বন্দুক, রেঙ্গানি-কানি পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশের গ্রামে গ্রামে অনেক আছে কিন্তু এমন শিকারি কেউ নেই যে ও চিতাকে মারতে পারে।

—কেন? একথা বললে আমি মানব কেন? এইসব জঙ্গল-পাহাড়ের গ্রামের যে-কোনও শিকারিই শহুরে নামীদামি শিকারিদের কানে ধরে শিকার শিখিয়ে দিতে পারে।

—চিতাটা সাধারণ চিতা নয়।

—মানে?

—মানে ওর গায়ে গুলি লাগলেও ওর কিচ্ছু হয় না। গুলি খেয়ে, পড়ে গিয়েও সে উঠে চলে যায়।

—এমন গুলিখোর চিতার কথা তো শুনিনি জন্মে।

তাকে যারাই মারতে গেছে তাদেরই নানা বিপদ ঘটেছে। প্রায় ছ মাস হল চিতাটা এই অঞ্চলে অত্যাচার করে যাচ্ছে কিন্তু বহু শিকারি চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। মা সমলেশ্বরীর যে কৃপাধন্য তাকে কি সাধারণ মানুষে মারতে পারে? এ চিতা সমলেশ্বরীর চিতা।

—তাহলে আমিই বা পারব কী করে!

ঋজুদা বলল, আমি বললাম, হাড়িবন্ধু অ্যান্ড কোম্পানিকে।

তারা বলল, আপনি তো স্থানীয় মানুষ নন। ওই চিতাকে মারতে পারলে আপনিই পারবেন।

ততক্ষণে পাঁঠাটাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করতে লাগল কেউ কেউ আর আমাদেরও জিপ থেকে নামিয়ে সসম্মানে চায়ের দোকানের সামনে বসিয়ে চা আর বিড়ি-বড়া খাওয়াল জবরদস্তি করেই।

এদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনও উপায় নেই দেখে আমি বললাম, গোরুর আধ-খাওয়া 'মড়ি' যখন আছেই তখন আবার পাঁঠার জোগাড়ে গেলে কেন?

—চিতাটা তো আধ-খাওয়া মড়িতে বড় একটা আসে না। যদি বা আসেও, শিকারি কাছাকাছি থাকলে ঠিক বুঝতে পেরে ফিরে যায়।

—তাহলে তো পাঁঠা বেঁধে বসলেও ফিরেই যাবে।

—হয়তো যাবে। তবু চেষ্টা করতে হবে।

—কখনও কুকুর বেঁধে চেষ্টা করা হয়েছে কি?

—না তো। কেন? কুকুর কেন?

—বাঃ। চিতার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য কুকুর, বাঘের যেমন ঘোড়া। তাই জানো না এতদিনে হাড়িবন্ধু?

—না তো।

—তাহলে এখন বলো কী করতে হবে। এখানে থাকার জায়গা কী আছে? ডাকবাংলো-বনবাংলো কিছু আছে কি?

—আছে, তবে এখান থেকে দূরে। আমাদের গ্রামে থাকলে হয় না?

হাড়িবন্ধুর এক সঙ্গী বলল।

আরেকজন মাতব্বর বলল, ধ্যাৎ। বাবু কি আমাদের বাড়ি থাকতে পারবেন? বিজলি নেই, কমোড নেই, কী করে থাকবেন শহুরেবাবু? ওঁদের সবসময়ে গরম জল লাগে—গরম জলের মেসিনকে বলে গিসার—গরমে ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে লাগে ইয়ারকন্ডিশন। বাথরুমই নেই তার গিসার বা কমোড কোথায় বসবে?

ঋজুদা বলল, শব্দটা কানে লেগে গেল, বুঝলি। ইয়ারকন্ডিশন। ইয়ার-দোস্তদের কন্ডিশনার থাকলে মন্দ হত না। যাই হোক, আমি ওদের অবাক করে দিয়ে বললাম, আমি তোমাদের বাড়িতেই থাকব। তবে আমাকে একটা আলাদা ঘর দিতে হবে।

—সে কোনও সমস্যা নয়।

হাড়িবন্ধুর সঙ্গীরা বলল।

কিন্তু পরক্ষণেই সমস্যায় পড়ে বলল, গা-ধেইবি, ঝাড়া-দেইবি কুয়াড়ে?

—মানে?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল ঋজুদাকে।

—মানে, চান করবে, বাথরুম করবে কোথায়?

বললাম, নদীতেই এবং জঙ্গলে, তোমরা যেমন কর। 'মত্তে গুট্টে ঢাল্ব দেই দিবি, আউ কিছি লাগিবনি।'

ঢাল্বটা আবার কি জিনিস? ঢাল-তরোয়াল নিয়ে বাঘ মারতে যেতে চাইছিলে নাকি?

তিতির বলল।

ঋজুদা হেসে ফেলল। বলল, নারে পাগলি! ওড়িয়াতে ঘটিকে বলে ঢাল্ব।

২

জিপে করে গিয়ে কুচুয়া গ্রামে পৌঁছে আমার ছোট ব্যাগটা নামিয়ে নিয়ে আতুপাতুকে বললাম জিপ নিয়ে অঙ্গুলে চলে যেতে। বিমলবাবু আর মহাদেববাবুকে দুটি চিঠি লিখে দিলাম। তখন ইনটারনেটের কথা ছেড়েই দে, ফ্যাক্স বা এস টি ডি-ও ছিল না। ফোন করতে হলে চারমল-এর পোস্ট অফিসে গিয়ে ট্রাঙ্ক-কল বুক করে বসে হাঁসফাঁস করতে হত। জুজুমারাতেও ফোন ছিল না। তখন সিঙ্গল লাইনের ট্রেনও ছিল না সম্বলপুর-অঙ্গুলের মধ্যে, ট্রেন তো এই সেদিন হল, বছর দুই। সুতরাং জিপই পাঠাতে হল। বাসেও পাঠাতে পারতাম ওকে কিন্তু জিপ নিয়ে গেলে জিপেই রাতে শুয়ে থাকতে পারবে এবং কাল দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে ওদের উত্তরের চিঠি সঙ্গে নিয়ে। এই ভেবেই জিপ দিয়ে পাঠালাম।

কুচুয়া গ্রামটা ছোট। তবে বাসিন্দাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব জায়গা-জমি আছে। ভাগ-চাষি কেউ নেই তাই এই গ্রামের অবস্থা অন্য গ্রামের তুলনাতে বেশ ভালই।

প্রায় সকলের বাড়িতেই হাঁস, ছাগল, গোরু আছে। ঢেঁকিও আছে একটি। গ্রামের সকলের ব্যবহারের জন্য। কীর্তন ও রামায়ণ পাঠের জন্যে একচালা আছে একটা। কখনও কখনও নাকি দোলে-দুর্গোৎসবে বা রজোৎসবে অষ্টপ্রহর থেকে চব্বিশ ঘণ্টাও কীর্তন বা পালাগান বা রামায়ণ পাঠ হয়।

ওরা আমাকে গ্রামের সবচেয়ে অবস্থাপন্ন মানুষের বাড়ির বাইরের দিকের একটি ঘর ছেড়ে দিল। মাটিরই ঘর, মাটির মেঝে, মাটির দাওয়া, তবে সাপ-খোপের ভয়ের কারণে জমি থেকে বেশ উঁচু। প্রায়, কোমর সমান। একটা দরজা। তিনদিকে তিনটি জানলা। বাঁশের বাখারি দিয়ে বানানো খাট। তোশকের অভাবে খড়গাদা থেকে অনেকখানি খড় এনে পেতে দিল। তার উপরে একটি খয়েরি-কালো কাজকরা সম্বলপুরী চাদর বিছিয়ে দিয়ে চারদিক দিয়ে গুঁজে দিল এমনই করে যে, সেটাই তুলোর বদলে খড়ের তৈরি তোশক হয়ে গেল।

—খড় দিয়েও তোশক হয় বুঝি?

তিতির বলল।

—হবে না কেন? এখন তো পশ্চিমের সব দেশেই হিটিং সিস্টেম হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা তেমন বোঝাই যায় না। কিন্তু আগেকার দিনে অনেক দেশেই দেখেছি পাখির পালকের তোশক এবং লেপ, এমনকী বালিশ পর্যন্ত। কী নরম আর গরম কী বলব।

—তারপর? আগে বাড়ো।

ভটকাই অর্ডার করল ঋজুদাকে।

—ঘরের পাশেই একটা মস্ত শিমুল গাছ। তার ফুলফোটা তখনও শেষ হয়নি। তার অন্য পাশেই একটি ছোট পুকুর। পুকুরে হাঁসেরা প্যাঁক-প্যাঁক করে স্বগতোক্তি করতে করতে চরে বেড়াচ্ছে। তার ধারে ভেরাণ্ডা গাছের সারি। জারুল, পারুল, একটা মস্ত বড় কনকচাঁপার গাছ। মাদার। মে মাসের শেষে এখনও জারুলের ফিকে বেগুনিরঙা ফুল, পারুলের লাল ফুল আর মাদারের সিঁদুরে ফুলে বৃষ্টিস্নাত সবুজ বনের শাড়িতে যেন পাড় বসিয়েছে। একটা পাগলা কোকিল কোনও দলিল-দস্তাবেজহীন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই পৃথিবীতে বসন্তকে বারমাস্যা করে দেবার আর্জি নিয়ে তারস্বরে ডেকে চলেছে আর উঁচু রেঞ্জানি-কানি পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশের গহন জঙ্গল থেকে তার এক পাগলা দোসরও সাড়া দিয়ে চলেছে ক্রমাগত। ভাবখানা এমনই, যেন বলছে, 'লড়ে যাও। আমিও আছি সঙ্গে। করতে হবে। করতে হবে।'

দুপুরের খাওয়ার তখনও অনেকেই দেরি আছে। মনে হচ্ছে, আমার জন্য কুচুয়া গ্রামের মানুষেরা বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করছে। নানা রকম ফিসফিস গিসগিস শুনতে পাচ্ছি। আমি ওদের বাড়িতে আছি বলে ওরা এমন ভাব করছে যেন চিতা বাঘের যম তো নয়, ওদের আপদ চিতা বাঘটাকেই ওরা ঘরের মধ্যে এনে তুলেছে। এ তো ভারি অস্বস্তির ব্যাপার হল! ভাবছিলাম।

—তারপর?

আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, তারপর আমি চিতার-মারা গোরুর 'মড়ি'টা দেখিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম হাড়িবন্ধুকে। হাড়িবন্ধুর বড় সম্বন্ধী, যার গোরু মেরেছে চিতাটা সে নিজেই চলল আমার সঙ্গে।

শক্তসমর্থ মানুষটার মাথাভর্তি কাঁচা-পাকা চুল, মুখভর্তি গুণ্ডি-পান। বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে সে একটা কুড়ুল কাঁধে ফেলে নিল। জঙ্গলের মানুষদের এই স্বভাব। যাদের হাতি-বাইসন থেকে বাঘ-ভাল্লুক-সাপ-খোপ সকলের সঙ্গেই বারো মাস ঘর করতে হয় তারা কিছু কিছু অলিখিত নিয়ম মেনে চলেই। যেমন নিতান্ত নিরুপায় না হলে খালি হাতে এবং একা জঙ্গলে যায় না, আলো ছাড়া রাতে কখনওই বেরোয় না, সে গ্রামের মধ্যে হলেও। জন্তু-জানোয়ার ছাড়াও ভূত-প্রেতের ভয়ও তো কম নয়। এই ভারতবর্ষের কথা তো আলো-ঝলমল কলকাতা শহরের বুকেই যারা সারা জীবন থাকেন, তাঁরা জানেন না।

গোরুটাকে মেরেছে সন্ধের আগে আগে। গ্রামের বাইরের ঘাসবনে যেখানে পাহাড়ের পা এসে পৌঁছেছে, সেখানে। মেরে, সেখান থেকে টানতে টানতে নিয়ে পাহাড়ে চড়ে গেছে। রক্তের দাগ প্রায় ধুয়ে গেছে আজ সকালের বৃষ্টিতে। তবে এত বড় গোরুটাকে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন অবশ্যই ছিল।

কিছুটা যেতেই একটা মিটকুনিয়া গাছের নীচের আগাছাহীন জমিতেই পায়ের দাগ পরিষ্কার দেখা গেল। উবু হয়ে বসে ভাল করে দেখেই বুঝলাম এ চিতা নয়, মস্ত বাঘ। মনে মনে বললাম, চমৎকার। এ তো গোদের ওপর বিষফোঁড়া।

যে জন্তু তার সাধের দুধেল গোরুটিকে ধরেছে সে যে চিতা অথবা দেবী সমলেশ্বরীর চিতা নয়, পেল্লায় এক বাঘ সে খবর গোরুর মালিক জানে না। যেহেতু চিতাটাই এই অঞ্চলে অত্যাচার করছে, গোরুটি বিকেলে বাড়ি না ফেরাতে তারা তাকে খুঁজতেও যায়নি, ধরেই নিয়েছে যে এ কাজ ওই চিতারই।

গোরুটিকে নাকি রেঢ়াখোলের হাট থেকে গত গ্রীষ্মে হাড়িবন্ধুর বড় সম্বন্ধী কিনেছিল। তারপরই গোরুটা গাভিন হয়। এত দুধ, তার আর কোনও গোরুই দেয়নি নাকি আগে। বাড়িসুদ্ধু লোক এবং কুকুর-বেড়ালও সাধ মিটিয়ে দুধ খাবার পর জুজুমারার চায়ের দোকানে বিক্রিও করত নাকি রোজ দু' কেজি করে।

একটি বাচ্চা ছেলে এই জঙ্গলময় এলাকাতে রোজ দু' মাইল হেঁটে যায় জুজুমারাতে সেই দুধ নিয়ে এবং হেঁটেই ফিরে আসে জুজুমারা থেকে। বিকেলের দুধটাই নিয়ে যায়। ছেলেটির ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়।

আমি বা তোরা যে কাজকে 'দুঃসাহসিক' বলে মনে করি তাই এখানকার জঙ্গল-পাহাড় ঘেরা গ্রামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে পড়ে। এই বিপজ্জনক কাজের মধ্যে এরা বিন্দুমাত্র বাহাদুরিই দেখে না।

হাড়িবন্ধুর বড় সম্বন্ধীর নাম রাম। পায়ের দাগ যে বাঘের, তা না বলে, আমি

রামকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কেউ কি চিতাটাকে দেখেছ?

—আমি দেখিনি। প্রথম যখন গোরু মারতে আরম্ভ করে মাস ছয়েক আগে, তখন ফাটা-রহমান দেখেছিল।

—ফাটা রহমান কে?

—সে খুব ভাল শিকারি। সে থাকে হাতিগির্জা পাহাড়ের কাছে। এখানে এসেছিল এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সেই 'মড়ি' দেখে বলেছিল যে মস্ত চিতা।

—কোন হাতিগির্জা পাহাড়? বাঘঘমুণ্ডার কাছের?

—না বাবু! এ হাতিগির্জা রাজাবসার কাছে। ভারী পাহাড় বাবু। হাতিদের ডিপো।

—তা সে মারল না কেন?

—তাকে আমরা ধরে পড়েছিলাম। তবে তার হাতে সময় ছিল না তাই তাকে ফিরে যেতে হয়েছিল মড়িটা দেখেই।

তারপর আমি রামকে জিজ্ঞেস করলাম, এবারে একটা কথা বলো। যেসব শিকারিরা ওই বাঘ মারতে এসেছে তারাও কেউ কি দেখেছে যে জানোয়ার গোরু মারছে তাকে?

—তা বলতে পারব না। চার-পাঁচবার মাচায় বসেছিল দু'-তিনজন শিকারি। কিন্তু সেই জানোয়ার একবারও আসেনি। তবে গ্রামের একটা বাচ্চা ছেলে গোরু চরাতে গিয়েছিল। তার গোরুকে ধরে চিতাতে। সেই কেবল দৌড়ে পালিয়ে এসে গ্রামের সকলকে বলে যে, একটা বড় বাঘ তার গোরুকে নিয়ে গেল। ও ছেলেমানুষ, তার আগে বাঘ কি চিতা কিছুই দেখেনি। তাই তার কথায় কেউ আমল দেয়নি।

—ছেলেটার বয়স কত?

—তা সাত-আট হবে।

—যদি কেউ দেখেই না থাকে জানোয়ারটাকে, সেই বাচ্চা ছেলেটি ছাড়া, তাহলে গুলি লাগছে না, বাঘটা যে চিতাবাঘই, গুলি লাগলেও চিতার কিছুই হচ্ছে না, এসব কথা রটল কী করে!

—গুলি তো করেইছে অনেকে। গুলিতে কিছু হয় না ওর।

—যেসব শিকারি গুলি করেছে তারাই তো বলেছে সেকথা। অন্য সাক্ষী কেউ কি আছে?

ঋজুদা বলল, আমি আবারও বললাম রামকে, বাঘটা যে চিতাবাঘই তা কি কেউ নিজচোখে দেখেছে?

—তা আমি বলতে পারব না।

রাম বলল।

—এদিকে এত বড় চিতা আছে নাকি? আমার তো পায়ের থাবার দাগ দেখে মনে হল ওটা চিতা নয়, বড় বাঘ।

—না, না বাবু ওটা চিতাই। এদিকের রেঙ্গানি-কানি, দেওঝরন, যাদুলুসিন পর্বতে এত বড় বড় চিতাবাঘ আছে যে, তারা বাঘের চেয়েও বড়।

—তুমি কী বললে?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঋজুদাকে।

ঋজুদা বলল, আমি কী বলব। চুপ করেই রইলাম। ওরা জঙ্গলেরই মানুষ। ওদের অভিজ্ঞতা সারা জীবনের অভিজ্ঞতা। আমার মতো শহুরে শিকারি ওদের তুলনাতে কতটুকুইবা জানি। রাম যা বলছে তাই নিশ্চয়ই ঠিক।

—কিন্তু চিতা যত বড়ই হোক, চিতাবাঘের পায়ের থাবার দাগে আর বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগের মধ্যে তফাত থাকে।

তিতির বলল।

—তা তো থাকেই। শিকারি মাত্রই তা জানেন। হাড়িবন্ধুর বড় সম্বন্ধী রাম তা না জানতে পারে কিন্তু ওই অঞ্চলের শিকারি যারা এবং হাতিগির্জার সেই বিখ্যাত শিকারি ফাটা-রহমানও একথা বুঝতে পারল না থাবার দাগ দেখার পরও, তা হতে পারে না।

ঋজুদা বলল, ব্যাপারটা রহস্যময় ঠেকল কিন্তু রহস্যটা কীসের তা বুঝতে পারলাম না।

আর কিছুদূর যাবার পরই মড়িটা পাওয়া গেল। বড় বাঘ যেমন করে খায় তেমনই গোরুটার পেছন দিক থেকে খেয়েছে আগে। তারপর তলপেটে দুধের ওলান দুটো বাঁট-টাট সুদ্ধু খেয়েছে। ডান উরু আর পেছনের সংযোগস্থল থেকেও খেয়েছে কিছুটা। এখানেও দাগ যতটুকু আছে, তাতে আমার মনে হল এ গোরুখেকো চিতা নয়, বড় বাঘই।

চারদিকে নজর করে দেখলাম যে তেঁতরা, মিটকুনিয়া, রসসি, আম, বাঁশঝাড় এবং সেগুনের জঙ্গলই বেশি। জংলি তেঁতুল ও জামও আছে। আম এতই বেশি যে পাথর-টাথরের উপরে বাঘের প্রতীক্ষাতে রাতে বসাটা ভাল্লুকের কারণে অত্যন্তই বিপজ্জনক। কোনও নিষ্ঠাবতী বিধবা ভাল্লুকী আমের ফলার করতে যদি চলে আসে তবে আমি তাতে বাদ সাধলে সে পেছন থেকে অতর্কিতে ফালা-ফালা করে দিতে পারে আমাকে। আমাদের দেশের বনে ভাল্লুকের মতো বদমেজাজি এবং আনপ্রেডিকটেবল বন্যপ্রাণী আর দুটি নেই। সম্পূর্ণ বিনা প্রয়োজনে সে যে-কোনও মানুষের নাক, কান, চোখ, ঠোঁট খুবলে নিতে পারলে বেজায় খুশি হয়। মানুষের নাক, কান, চোখ, ঠোঁট তার খাদ্যও নয় যে জম্পেশ করে খাবে। তবু শুধু ছেঁড়ার আনন্দেই সে ছেঁড়ে। আর ভাল্লুকে যদি ছেঁড়ে, তবে কোনও প্লাস্টিক সার্জনের সাধ্য নেই যে সেই মানুষের বীভৎস মূর্তিকে তিনি মেরামত করেন।

—তারপরে বল। তুমি আজকাল বড় ডিরেইলড হয়ে যাও গল্প বলতে বলতে ঋজুদা। হচ্ছিল চিতার গল্প, তার মধ্যে এসে পড়ল বাঘ এবং এখন আবার ভাল্লুক। তার উপরে প্লাস্টিক-সার্জন।

ঋজুদা হেসে বলল, বনের গল্প এরকমই হয়। এখানে সব কিছুই বিশ্বাসযোগ্য এবং কিছুই বিন্যস্ত নয়। এখানে আগে থেকে কিছুই ঠিক করে রাখা যায় না এবং ভবিষ্যৎও দেখা যায় না। প্রতি মুহূর্তেই বর্তমান এখানে অতীত হয়ে যায় যেমন, তেমন বর্তমান আবার ভবিষ্যতেও গড়িয়ে যায়।

— তাই তো দেখছি।

বিজ্ঞ ভটকাই বলল।

ঋজুদা পাইপটার ছাই ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বলল, দাঁড়া। দাঁড়া। পাইপটা ভাল করে ভরে নিয়ে ভাল করে স্মৃতি হাতড়াই। যেসব কথা তোমাদের বলছি সে কী আজকের কথা।

ইতিমধ্যে রেঢ়াখোলের দিক থেকে একটা মান্ধাতার আমলের জরাজীর্ণ মোটর সাইকেলে দু'জন লোক আসছে দেখা গেল, বৃষ্টিভেজা পথ দিয়ে, দু' পাশের বৃষ্টিভেজা জঙ্গলে মোটর সাইকেলের ভটভটানি শব্দর জোর অনুরণন তুলে। মোটর সাইকেলটা ক্রমশ তার বেগ কমাতে কমাতে আসছিল। কাছে আসতেই, আমরা উৎসুক হয়ে তাকালাম। যে চালাচ্ছে, সে একজন হৃষ্টপুষ্ট মানুষ, আর তার পিছনে, চুলে কদমছাঁট লাগানো রোগাপটকা একজন মাঝবয়সি মানুষ বসে আছে। তার কাঁধে একটা থার্মোফ্লাস্ক ঝুলছে।

মোটর সাইকেলটা থামতেই ঋজুদা স্বগতোক্তি করল, 'হাড়িবন্ধু! তু কেমিতি জানিলু যে আম্মোমানে এটি আসিলু।'

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে হাড়িবন্ধু নামের ব্যক্তিটি বলল, 'মু আউ কেমিতি জানিবি? রেঢ়াখোল যাইথিলি। সেটি আপনাংকু ড্রাইভার ক্রষ্ণকু ভেটিলু। তাই বাস থেকে নেমে মোড়ের দোকান থেকে আপনাদের জন্য একটু পান্তুয়া, কুচো নিমকি আর চা নিয়ে এলাম। একটু আগেই বাসে করে আপনাদের সামনে দিয়ে গেছি। আপনাদের দেখে গেছি। ক্রষ্ণ বলল যে, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে ফিরে আসবে আর্মেচার নিয়ে।'

ভটকাই বলল, 'ফাসকেলাস কাম্ব করিলা ভাই হাড়িবন্ধু।'

তিতির বলল, 'হাউ থটফুল অ্যান্ড নাইস অফ হিম।'

আমি বললাম, কী কো-ইনসিডেন্স! হাড়িবন্ধু কী করে জানল যে এখানে একজন পান্তুয়া-খাঁই আছে!

তারপর আমাদের চা আর নিমকি খাইয়ে, ঋজুদার কুশল নাকি সে আগেই মহানদী কোলফিল্ডস-এর গাড়ির ড্রাইভার ক্রষ্ণ দাসের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল, তাই কুচুয়া গ্রামের সকলের কুশল জানিয়ে হাড়িবন্ধু আবার মোটর সাইকেলের পিছনে বসে ফিরে গেল। যাবার আগে জিজ্ঞেস করে গেল আমাদের আর কিছু সেবা করতে পারে কি না।

ঋজুদা বলল, আর কিছুই লাগবে না। চা আর নিমকি সত্যিই খুব ভাল খেলাম।

—বল, পান্তুয়াও।

ভটকাই বলল।

তারপর মোটর সাইকেল আরোহীকে দেখিয়ে ঋজুদা বলল, এই ভদ্রলোক কে? তোমার কেউ হয়?

—না বাবু! ওঁর বাড়ি চারমল-এ। রেঢ়াখোলের মোড়ের চায়ের দোকানে বাবু চা খাচ্ছিলেন। আপনার কথা বলতেই উনি আমাকে নিয়ে এলেন এবং জুজুমারাতে নামিয়েও দেবেন বললেন। আপনার কথা এই অঞ্চলের সব মানুষই মনে রেখেছে, যদিও বহুদিন হয়ে গেছে। তখন আমি সবে বিয়ে করেছি ছেলেমেয়েও হয়নি আর এখন আমার ছেলে এবং মেয়ের ঘরেও নাতি-নাতনি হয়ে গেছে।

তারপরই চালকের পিছনের সিট-এ বসে দু' হাত দু'দিকে তুলে দার্শনিকের মতো হাড়িবন্ধু বলল, সময় কী করে যায়। সত্যি! আমাদের এই জীবনটা বড়ই ছোট বাবু।

ঋজুদা মাথা নাড়ল।

তারপর মোটর সাইকেলটা আবার ভটভট করতে করতে চলে গেল।

হাড়িবন্ধুর উচ্চারিত কথাগুলি পথের দু' পাশের ঝাঁটি জঙ্গলে আর ভিতরের গভীর বনে হাওয়ার সঙ্গে হুটোপাটি করতে লাগল। কিছু কিছু কথা, কিছু কিছু মুহূর্ত ঘরের বাইরে, বনের মধ্যে, মনের মধ্যে-ভিতরে এমন করে আলোড়ন তোলে যে তা বলার নয়। আমরা সকলেই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাড়িবন্ধুর হঠাৎ ছুড়ে দেওয়া কথা ক-টির গভীরতাতে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। এমনকী ভটকাই-এর মতো বাচালও চুপ করে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিতির বলল, এবারে ক্যাটল লিফটারটার গল্পটা শেষ কর ঋজুদা। গৌরচন্দ্রিকাটা বড্ডই লম্বা আর কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে।

ভটকাই বলল, ঠিক তাই। এবারে কাম টু দ্য পয়েন্ট, প্লিজ।

ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর একটা আম গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে শুরু করল আবার।

—রাম-এর কথা শুনে এবং ওই চিতা নামক বাঘের সম্বন্ধে যা-কিছু আগে শোনা গেছিল তাতে ওই জনশ্রুতির মধ্যে যে এক রহস্য আছে তা আমার মনে হচ্ছিল। সে রহস্য পরে উদঘাটিত হয়েছিল কিন্তু তোরা তো রহস্যগল্প শুনতে চাসনি আমার কাছে, চেয়েছিস শিকারের গল্পই শুনতে।

—হ্যাঁ। তাই তো!

—তাহলে শোন বলি। গোরুর মড়ি দেখে এবং তার আগে বাঘের থাবার দাগ দেখে আমার কোনও সন্দেহই ছিল না যে সেটা বাঘই, চিতা নয়। এবং তাই যদি হয় তাহলে মারা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। মানুষখেকো তো নয়, গোরু-খেকো। তা ছাড়া বাঘ wide hearted gentelman তাকে wide hearted মানুষেরই মতো মারা ভারি সহজ। এবং সহজ বলেই পশু-পাখির রাজা বাঘ এখন অবলুপ্তির

পথে। চিতাগুলো ছিঁচকে। মিচকে শয়তান। মানুষের বসতির আশেপাশেই তাদের বাস বলে মানুষের অভ্যেসও তাদের জানা। তাই তাদের মারা অনেকই কঠিন। তা ছাড়া তারা মানুষই মারুক কি পশু, মারে রাতের বেলা। বাঘ বেপরোয়া। সে দিনের বেলাতেই বেশি মারে বলেই তাকে সহজে কাবু করতে পারে শিকারিরা।

৩

ভটকাই বলল, ও বাবা! আবারও দেখি অন্ধকার করে এল। আবার বৃষ্টি নামলেই চিত্তির। ও ঋজুদা, তোমার বাঘকে তাড়াতাড়ি মারো নইলে আমরা সবাই ভিজে বেড়াল হয়ে যাব যে!

ভটকাইয়ের কথাতে আমরা সকলে হেসে উঠলাম। ঋজুদাও।

তারপর ঋজুদা আবার শুরু করল।

—রামকে বললাম, ফিরে যেতে গ্রামে, গিয়ে বন্দুক-রাইফেল যা কিছু হোক কী জোগাড় হল না হল দেখতে। আমি গিয়ে বেছে নেব। গুলিও যেন টাটকা থাকে। পিতলের ক্যাপে যদি সাদা স্যাঁতলা পড়ে গিয়ে থাকে তবে সেগুলি আদৌ ফুটবে কি ফুটবে না তা ভগবানই বলতে পারেন।

একবার পালামৌর রাংকার জঙ্গলে একটা ভাল্লুকের হাতে মরতে মরতে বেঁচে গেছিলাম। তাই গুলি সম্বন্ধে আমার ভীষণই খুঁতখুঁতানি। সব শিকারিরই তা থাকা উচিত। যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই জানেন যে, নিজের আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি ছাড়া বড় জানোয়ার শিকার করতে যাওয়াটা অত্যন্তই বিপজ্জনক।

রাম বলল, আপনি খালি হাতে থাকবেন?

আমি হেসে বললাম, খালি হাতে তো নেই। হাতে তো পাইপ আছেই।

ও কিছু না বলে চলে গেল।

গোরুর 'মড়ি'টা থেকে এগিয়ে গিয়ে একটি টিলা মতো জায়গাতে গিয়ে উঠে চারদিকটা ভাল করে নিরীক্ষণ করলাম আমি। রেঙ্গানি-কানি পাহাড়শ্রেণী সুবিস্তৃত এবং বেশ উঁচু। তাতে হাতি সুদ্ধু সব জানোয়ারই থাকার কথা। যেখানে পাহাড় শুরু হয়েছে তার দূরত্বে এবং উচ্চতাতেই বেশ কয়েকটি গুহা আছে। সেগুন গাছের ছায়াতে সেই সব গুহা গরমের দিনে এবং বর্ষাতেও বেশ আরামপ্রদও। পাহাড়ের পাদদেশ ঘিরে তিরতির করে জল বয়ে যাচ্ছে একটি নালা দিয়ে। এর নামও হয়তো রেঙ্গানি বা কানি হবে। কুচুয়া গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বলে হয়তো নাম কুচুয়াও হতে পারে। অথবা নালাটার নামই কুচুয়া, তাই হয়তো নালার ধারে পত্তন-করা বসতির নামও কুচুয়া হয়েছে।

তারপর একটু থেমে ঋজুদা বলল, আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে একই নামের ছোট নদী, নালা ও গ্রাম যে কত আছে, তার ইয়ত্তা নেই। বড় নদীর সৌন্দর্য এবং ভয়াবহতার কথা ছেড়েই দিলাম, ছোট ছোট নদী-নালার যে কত বিচিত্র

সৌন্দর্য, তা যার চোখ আছে সেই জানে। হাজারিবাগ জেলার ইটখোরি পিতিজ-এর পাশ দিয়ে যে পিতিজ নদী বয়ে গেছে তার একরকম সৌন্দর্য, ওড়িশার লবঙ্গীর পায়ের কাছ দিয়ে মাঠিয়াকুদু নালা বয়ে গেছে বা মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আশ্চর্য সুন্দর পুতানি বয়ে গেছে তার সৌন্দর্য বা হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্ক-এর মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া হারহাত নদীর সৌন্দর্যের কথা যাঁরা বার বার সেই সব নালার কাছে গেছেন শুধু তাঁরাই জানেন। সত্যি সত্যিই, 'এমন দেশটি কোথাও গেলে পাবে নাকো তুমি।'

ভটকাই বলল, 'ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।'

আমি আর তিতির সমস্বরে বললাম, 'এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি।'

ঋজুদা বলল, সত্যিই রে! আমাদের দেশের মতো এমন বৈচিত্র্যে ভরা, এমন ভয়ংকর, এমন সুন্দর আর একটিও দেশ নেই পৃথিবীতে। অনেক দেশেই তো পা পড়ল আমার। তোদেরও কম দেশে পা পড়ল না আমার সঙ্গে, বল?

—তা সত্যি। তোমার দৌলতে আফ্রিকা, স্যেশেলস কত দেশই তো ঘুরে এলাম। এবং একাধিকবার।

তিতির বলল।

ভটকাই স্যেশেলস-এর কথা উঠতেই হঠাৎই উদাস হয়ে গিয়ে বলল, ভারত মহাসাগরের স্যেশেলস আইল্যান্ড-এর কেসটার মধুরেণ সমাপয়েৎ হল না, এই একটু দুঃখ রয়ে গেল। সেই মেমসাহেবকে, কোটি-কোটিপতি অপরূপ সুন্দরীকেও তুমি টাকা-কেন্নোর মতো দু' আঙুলে টোকা মেরে হঠিয়ে দিলে ঋজুদা! আমার আর রুদ্রর এ জীবনে কখনও নিতবর হওয়া আর হবে না। হ্যাঁ ভাবি হো তো অ্যায়সা।

তারপর আমাকে বলল, যতই বলিস রুদ্র, তোর বই 'ঋজুদার সঙ্গে স্যেশেলসে'-র শেষটা তোর অন্যরকম করা উচিত ছিল।

আমি আর তিতির ভটকাই-এর আস্পর্ধাতে স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। ভাবলাম, ঋজুদা বুঝি হঠাৎ চটে উঠবে। কিন্তু না। ঋজুদা বলল, জ্যাঠামি করবি? না বাঘ শিকারের গল্পটা শুনবি? মাঝে মধ্যে ফাজলামি খারাপ লাগে না। তবে তুই মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যাস।

ইনকরিজিবল ভটকাই মাটির দিকে চোখ নামিয়ে ওর কাবলি স্যান্ডেলের মধ্যে পায়ের নখগুলো আগু-পিছু করতে করতে বলল, আমি ফাজলামি করিনি। তোমার সঙ্গে তো আমার ফাজলামির সম্পর্ক নয়। আমি সিরিয়াসলি বলছি ঋজুদা, তুমি বড়ই দাগা দিলে আমাদের।

এমন করেই বদমাইস ভটকাই কথাটা বলল যে, আমরা তো বটেই ঋজুদাও হো হো করে হেসে উঠল। বলল, তুই সার্কাসের ক্লাউন হয়ে যা, মানাবে ভাল।

—ঠিক আছে। আর কিছু বলছি না আমি। এখন ব্যাক টু কুচুয়া গ্রাম অ্যান্ড

রেঙ্গানি-কানি পাহাড় অ্যান্ড চিতা আর বাঘের গল্পে।

ভটকাই বলল।

তিতির বলল, শুরু করো ঋজুকাকা। এইখানে জঙ্গলের মধ্যের পথপাশের এই আম গাছতলির পাথরে বসে তোমার মুখ থেকে গল্পটা শুনতে যেরকম ভাল লাগছে তেমন কি আর চলন্ত গাড়িতে যেতে যেতে শুনতে ভাল লাগবে। ড্রাইভার কৃষ্ণ দাস তো চলে আসবে সূর্য ডোবার আগেই।

—কোথায় যেন ছিলাম?

ঋজুদা বলল। এই ভটকাই বাঁদরটা দিল সব গোলমাল করে।

ভটকাই-ই বলল, রেঙ্গানি-কানি পাহাড়ের পাদদেশে একটা টিলার উপরে। পাহাড়ের গায়ে যে অনেকগুলি গুহা আছে, তাই দেখছিলে।

—হুঁ। ঠিকই বলেছিস।

প্রকাণ্ড ঘাসবনের মাঝে কয়েকটা তেঁতরা, রসসি ও মিটকুনিয়া গাছ। কখনও বোধহয় ক্লিয়ার-ফেলিং হয়েছিল। বনবিভাগ আর প্ল্যানটেশন করেনি। ঘাসবন হয়ে গেছে। মড়িটার চারদিকে ঘুরে দেখলাম। একটা পাকদণ্ডি জানোয়ার-চলা game track চলে গেছে ঘাস মাড়িয়ে, নদী পেরিয়ে সেই পাহাড়ের দিকে। সকালে বৃষ্টিটা না হলে ওই নালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেই সবকিছু জানা যেত, কে যায়? কে আসে? কোনদিকে যায়। কিন্তু সব দাগ ধুয়ে গেছে।

ঠিক করলাম, ভরসা করতে পারি এমন বন্দুক বা রাইফেল একটা জোগাড় হলে বিকেলে এসে গোরুর মড়ির কাছের ঝাঁকড়া তেঁতরা গাছটাতে উঠে বসে থাকব। গাছটাতে ওঠবার পরেই বোঝা যাবে, তাতে বসে মড়ি দেখা যাবে কি না এবং দেখা গেলেও বাঘ মড়িতে এলে তাকে মারা যাবে কি না। গাছে না উঠে তা বলা যাবে না।

এখন যদিও শুক্লপক্ষ। হয়তো সপ্তমী অষ্টমী হবে। বাতের রুগি, নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা এবং মুসলমানেরা ছাড়া চাঁদের খবর আর কে রাখে! আর রাখে মধুচন্দ্রিমা যাপন-করা নববিবাহিতারা। চাঁদের হিসাব আমার কাছে ছিল না। কিন্তু আকাশে মেঘ ছিল এবং এমন গুমোট করেছিল যে, মনে হচ্ছিল বিকালের দিকে আবারও বৃষ্টি নামতে পারে। বাঘের আস্তানা যদি ওই গুহার মধ্যেই হয় তবে বাঘ কোথা থেকে নেমে কোথা দিয়ে গোরুর মড়িতে আসতে পারে তার একটা আন্দাজ করে নিলাম। তারপর গ্রামের দিকে হেঁটে চললাম।

গ্রামের কাছে যখন পৌঁছে গেছি, সবুজ লুঙ্গি-পরা একজন মাঝবয়সি লোক, দেখলাম আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। তার ডান হাতে একটা পিতলের বদনা।

—বদনাটা কী জিনিস?

তিতির জিজ্ঞেস করল।

—মুসলমানদের ঘটি। সামনেটা সরু থাকে। দেখিসনি কখনও? দেখেছিস নিশ্চয়ই, লক্ষ করিসনি। দেখা আর লক্ষ করার মধ্যে তফাত আছে।

তারপর বলল ঋজুদা, লোকটা সম্ভবত প্রাকৃতিক প্রয়োজনে নালার দিকে চলেছে। সে আমার দিকে বিরক্তির সঙ্গে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আপনাকেই চিতাটা মারার জন্য হাড়িবন্ধু ধরে নিয়ে এসেছে বুঝি বাবু?

—হ্যাঁ। কিন্তু ওটা চিতা নয় বড় বাঘ।

—ওর রূপের কথা আল্লাই জানেন। কখন যে সে কোন ভেক ধরে। এখানের মানুষেরা বলে এটা সমলেশ্বরীর বাঘ।

—কেন বলে? জঙ্গলে তো ঠাকুরানিও আছেন। জঙ্গলের বাঘ যদি দেবীর কৃপাধন্য হয় তবে তাকে ঠাকুরানির বাঘ না বলে অতদূরের সম্বলপুর শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সমলেশ্বরীর নামে কেন ডাকে মানুষে?

—আমি তো মুসলমান বাবু। এসব কথা গ্রামের কোনও হিন্দুকে জিজ্ঞেস করলে সেই বলতে পারবে। তবে এটুকু বলতে পারি যে, এই বাঘ আপনি মারতে পারবেন না। উলটে আপনারই বিপদ ঘটতে পারে।

ঋজুদা বলল, লোকটাকে আমার পছন্দ হল না। তারপর আমার বিপদের জন্য তার এত মাথাব্যথা আমার আরও পছন্দ হল না। কিন্তু মনের ভাব মনে রেখে বললাম, কেন?

—এই বাঘের গায়ে গুলি লাগলেও এ মরে না। বহু শিকারি গুলি করেছে। তাতে রক্ত পর্যন্ত বেরোয়নি।

—তাই? এতজনই যদি বাঘটাকে চাঁদমারি করল তা আমিও না হয় একটা গুলি ঠুকে দেখি।

—সে আপনার ইচ্ছে। জানটা তো আপনার নিজেরই।

—তা তো অবশ্যই।

—ভালর জন্যই বললাম বাবু। কথাটা ভেবে দেখবেন।

সে কথার জবাব না দিয়ে আমি তাকে শুধোলাম, এই অঞ্চলে এই চিতা বা বাঘ বা ভূত এ পর্যন্ত কতগুলো গোরু-মোষ মেরেছে?

—এদিকের গ্রামের মানুষ মোষ পোষে না। পোষে গোরু এবং বলদ। তা বহুতই মেরেছে। কোনও গোনা-গুনতি নেই।

—বাবাঃ। অতগুলো! তবে তো খুবই ক্ষতি হয়ে গেছে এদিকের লোকের। আমি বললাম।

—তা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু কী আর করা যাবে।

এই বলেই লোকটা হাতের বদনাটা দোলাতে দোলাতে চলে গেল নালাটার দিকে।

—আপনার নাম কী?

—মহম্মদ জব্বার মহম্মদ।

—ও।

—এই নালাটার কী নাম?

—রেঙ্গানি-কানি।

—ও।

এমন সময়ে ভটকাই বলল, একটা গোরু বা বলদ মরলে কত ক্ষতি হয়? মানে, কত টাকার?

—টাকার হিসেবে ক্ষতি হয় অনেকই। এখানকার গ্রামের মানুষের কাছে একটি বলদের সঙ্গে হরিয়ানা বা পাঞ্জাবের গ্রামের একটি ট্র্যাক্টরের তুলনা করা চলে। তা ছাড়া, গোরু যদি বাঘে মারে, তবে আর্থিক ক্ষতিরও উপরে ইমোশনাল অর্থাৎ মানসিক ক্ষতিও তো কম হয় না। যেদিন গোরুটিকে প্রথম কিনে আনে গ্রামের কোনও মানুষ সেদিন তার পা ধুইয়ে তাকে চান করিয়ে সিঁদুর পরিয়ে ঘরে তোলা হয়। সে যদি বাড়ির গাইয়ের বাছুর হয়, তবে তার সঙ্গে বাড়ির শিশুদের খেলার সাথীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গোরু হল গ্রামীণ মানুষের লক্ষ্মী। তার এই রকম রক্তাক্ত বিয়োগান্ত পরিণতিতে কারওরই তো সুখী হবার কথা নয়। এই গ্রামীণ ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে, আর ভারতবর্ষের অধিকাংশই তো এখনও গ্রামই, গোরু নিছক একটি প্রাণীমাত্রই নয়, সে পরিবারের সদস্যও। তাদের নাম থাকে, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা। বাড়ির বড় এবং ছোটরা সেই নামে তাকে ডাকে। আদর করে। তার এই রকম মৃত্যু মোটেই সুখপ্রদ ব্যাপার নয়।

ঋজুদা বলল।

—আগে বাড়ো ঋজুদা। আবার ডিরেইলড হচ্ছ তুমি।

ভটকাই ঋজুদাকে ওয়ার্নিং দিল।

—তারপর?

তিতির বলল।

—তারপর হাড়িবন্ধুদের বাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখি তিনটি দোনলা বন্দুক জোগাড় হয়েছে। আরও একটি গাদা বন্দুক। একনলা। দোনলা বন্দুকের মধ্যে একটি ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স কোম্পানির, আঠাশ ইঞ্চি ব্যারেলের। বন্দুকটি এক জোতদারের। ডাকাতদের ভয় পাওয়াবার জন্য কেনা, তা দিয়ে একটি গুলিও সম্ভবত ছোড়া হয়নি। বন্দুকটির ব্রিচ ভেঙে আলোর দিকে ব্যারেল তুলে দেখলাম ব্যারেল একেবারে ঝকঝক করছে। খুবই যত্ন করে রাখা হয়েছে বন্দুকটিকে। এতই যত্ন করে যে মালিকের বোধহয় এটি ব্যবহার করে পুরনো করার কোনও অভিপ্রায়ই নেই। নিজের বাড়িতে ডাকাত পড়ুক তা কে আর চায়। শুনলাম, সেই জোতদারেরই সাত-সাতটি গোরু মেরেছে বাঘে।

গুলিগুলোও নতুন। দুটি প্লাস্টিক সেল-এর আমেরিকান কার্টিজও ছিল। লেথাল বল, ইংলিশ ইলি-কোম্পানির এবং ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স কোম্পানির এল. জি.।

অন্য দুটি বন্দুক মুঙ্গেরি, হ্যামার ট্রিগারওয়ালা। হ্যামার তুলে তারপর ট্রিগার টানতে হয়।

রামকে বললাম যে, জোতদারের বন্দুকটিই নেব। গুলির হয়তো প্রয়োজন হবে একটি কী দুটির কিন্তু নিলাম ছটি গুলি। তিনটি বল, তিনটি এল. জি.।

রাম বলল, 'বহুত বড্ড বড্ড ডাবল বারা অচ্ছি এটি। গুট্টে বড্ড বারা মারি দেলে আম্মোমানে শিকার খাইথান্তি।'

—মানে কি হল?

তিতির বলল।

—বলে দে রুদ্র মেমসাহেবকে। এদিকে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানিশে বিশারদ অথচ ওড়িয়া অহমিয়া কিছুই জানে না। লজ্জার কথা।

আমি বললাম, এখানে খুব বড় বড়, মানে পেল্লায় বড় সব শুয়োর আছে। একটা বড় শুয়োর মেরে দিলে আমরা মাংস খেতে পারতাম।

তিতির বলল, শুয়োর। ম্যাগো!

আমি বললাম, হ্যাম, বেকন, সসেজ যখন খাও তখন বুঝি শুয়োর খাওয়া হয় না? দিশি শুয়োরের নামেই উঃ ম্যাগো।

ভটকাই বলল, শুয়োর যে ময়লা খায়!

—মোটেই না। বুনো শুয়োর ফল-মূল খায়। রামচন্দ্রও বন্য বরাহ খেতেন। তাও জানো না।

ঋজুদা বলল, বুনো শুয়োরের ভিন্দালু যা হয় না! আহা!

আমি বললাম, আবার সব গুলিয়ে দিচ্ছ তুমি ঋজুদা। আজ বড়ই গুবলেট করছ তুমি।

—হ্যাঁ। ফিরে যাই।

তারপর বলল, আমি রামকে জিজ্ঞেস করলাম, মহম্মদ জব্বার মহম্মদ লোকটা কে?

—জব্বার? সে তো চামড়ার ব্যবসায়ী।

—এ গ্রামেই সে থাকে?

—না তো। এখানে আসে যায়। আবু আলিরা একঘর মুসলমান থাকে কুচুয়াতে। সে কসাই। জুজুমারা এবং চারমলেও হাটের দিন খাসে কাটে আর বিক্রি করে। আবু আলিরই কী রকম রিস্তেদার হয় মহম্মদ জব্বার মহম্মদ। বাঘে বা চিতাতে গোরু মারলে সেই গোরুর চামড়া আবু ছাড়িয়ে রাখে, মহম্মদ জব্বার মহম্মদ এসে নিয়ে যায়।

—জব্বার কি ইদানীং একটু ঘন ঘন আসছে তোমাদের গ্রামে?

—হ্যাঁ তা তো আসবেই। গোরু তো মারা পড়ছে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই। সেই চামড়ার সদ্গতি তো ওরাই করে। আমরা পোষা গোরুর চামড়া বিক্রি করি না—কোনও দামও নিই না—অনেক সময় ওরা মরা গোরুর মাংসও কেটে নিয়ে বিক্রি করে আশপাশের মুসলমান গ্রামে।

—সে কী! হালাল না-করা মাংস মুসলমানেরা খায় নাকি? তাদের ধর্মে তো

মানা আছে।

—যেখানে বিক্রি করে সেখানে গিয়ে থোড়াই বলে যে চিতাতে মারা গোরুর মাংস। বলে, হালাল-করা মাংসই।

ভটকাই বলল, বুঝবে মহম্মদ জব্বার মহম্মদ। এই পাপের জন্য গুনাহ লাগবে তার। দোজখ-এ যেতে হবে।

এই অবধি বলে ঋজুদা বলল, এবারে বসি একটু। পাইপ খাই একটু। কোথায় যে গেল মিস্টার কৃষ্ণ দাস।

—সে ঠিকই এসে যাবে। হাড়িবন্ধুর কাছে তো শুনলে। সে আসার আগে তুমি গল্পটা শেষ করো।

—হ্যাঁ। তবে মনে করিস তো রেঢ়াখোলে পৌঁছে বিমলবাবুকে একটা ফোন করে দিতে হবে। নইলে চিন্তা করবেন। বউদির হাতের রান্না তো খাসনি। খেলে বুঝবি।

একটা বড় কালো পাথরের উপরে বসে দু' দিকে দু' পা ছড়িয়ে দিয়ে ঋজুদা বলল, দুপুরে আমাকে খুব খাওয়াল রাম এবং হাড়িবন্ধুরা মিলে। খুব তৃপ্তি করে খেয়ে আমি বললাম এবারে ঘুম লাগাব একটা। চারটের সময়ে আমাকে তুলে দেবে।

—চা খাবেন তো?

—যদি খাওয়াও তো খাব।

৪

একটা টর্চ-এর কথা বলে রেখেছিলাম। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ চেয়েছিলাম কিন্তু তিন ব্যাটারির চেয়ে বড় জোগাড় করতে পারেনি ওরা। তবে টর্চটা ভাল। মানে, দেখতে ভাল। অন্ধকার হলেই বোঝা যাবে সত্যি সত্যিই কতখানি ভাল। দুটি গুলি, দু' ব্যারেলে ভরে এবং দুটি গুলি প্যান্টের পকেটে পুরে নিয়ে যখন বেরিয়ে পড়লাম তখন সোয়া চারটে বাজে। অকুস্থলে পৌঁছতে কম করে মিনিট কুড়ি লাগবে। সূর্য ডুবতে ডুবতে প্রায় ছটা বাজবে কিন্তু গোরুটাকে বাঘ যেখানে লুকিয়ে রেখেছে সেই জায়গাটা একটা দোলামতো। তা ছাড়া পশ্চিমেই জঙ্গলাবৃত রেঙ্গানি-কানি পাহাড়শ্রেণীর সমান লম্বা এবং বেশ উঁচু পিঠ থাকাতে সূর্য অস্তে যাবার অনেক আগেই এই রঙ্গমঞ্চ, মানে যেখানে নাটক মঞ্চস্থ হবে, পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে ডুবে যাবে তাই এই পাহাড়তলিতে অন্ধকার নেমে আসবে হয়তো পৌনে ছটা নাগাদ অথবা তারও আগে।

সূর্য অস্ত যাবার পরেও, আকাশে যদি মেঘ না থাকে তবে বনে-জঙ্গলে, প্রান্তরে অনেকক্ষণ অবধি আলোর আভাস থাকে। প্রথমে তার রং থাকে কমলা, তার পর বেগনে, তারও পর তার কোনও রং থাকে না কিন্তু তার আলোর আভাস বিলক্ষণই

থাকে। অনেকক্ষণ। সেই আভাসই শটগান দিয়ে নিশানা নেবার পক্ষে অনেকই আলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুপুর থেকে পরতের পর পরত কালো মেঘ সাজছে আকাশে। মনে হচ্ছে যেন বর্ষাকাল। সারা পৃথিবীর আবহাওয়ার বদল হওয়া শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন হল। এখন, আমাদেরই নানা পাপের কারণে, বন-বিনাশের কারণে, গ্রীষ্মে বর্ষা, বর্ষায় গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মে শীত এবং শীতে গ্রীষ্ম। ঈশ্বরই জানেন, ভবিষ্যতে আরও কী ঘটবে অঘটন।

জায়গাটাতে পৌঁছে সকালে দেখে যাওয়া তেঁতরা গাছটাতে না বসে একটা মিটকুনিয়া গাছে উঠে বসলাম। কারণ, সেই গাছটাতে কাণ্ডর ফিট পনেরো উপরে দুটো বেশ মোটা ডালের সঙ্গমস্থলে বসার সুবিধা হবে। কাণ্ডতে হেলান দিয়েও বসা যাবে। সারারাত বসে থাকতে হবে কি না তাও তো অজানা। তাই বসার জায়গাটা একটু সুবিধাজনক হওয়া দরকার।

বাঘ যেদিক দিয়েই আসুক, মড়ির কাছে এলে তাকে আসার পথে দেখা যাবেই, যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, মানে মেঘে ঢাকা না থাকে। বাঘের যাওয়া-আসার শব্দ বড় একটা শোনা যায় না। বনের খবর জেনেই তার যাতায়াতের আন্দাজ করতে হয়। তবে জায়গাটা ঘাসবনের মধ্যে বলেই সুবিধা। তবে একবার গাছের ঘন ছায়াতে দোলার মধ্যে ফেলে-রাখা মড়িতে বাঘ পৌঁছে গেলে বাঘকে আর দেখা যাবে না। খাওয়া শুরু করলে অবশ্য তার মড়মড় আর কটাং কটাং করে হাড় কামড়ানোর এবং চপ চপ করে মাংস চিবোনোর আওয়াজ নিস্তব্ধ রাতে ঠিকই শোনা যাবে। দেখা যদি নাও যায়, তাহলে আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের মহাপুরুষেরা যেরকম শব্দভেদী বাণ মারতেন, তেমনই শব্দভেদী গুলি করতে হবে। কী করতে হবে না হবে, তা এখন ভেবে লাভ নেই। অবস্থা বুঝেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

—তার পরে? থামলে কেন ঋজুকাকা?

তিতির বলল।

—দাঁড়া। গলা তো শুকিয়ে গেছে। যা তো ভটকাই গাড়ি থেকে জলের বোতলটা নিয়ে আয় তো। গলাটা ভিজিয়ে পাইপটা আরেকবার ফিল করে নিয়ে শুরু করি।

ভটকাই গাড়ির দিকে যেতে যেতে বলল, আর কতটুকু বাকি আছে গল্প শেষ হতে ঋজুদা? আর কি এক 'ফিল'-এর?

ঋজুদা এবং আমরাও হেসে উঠলাম ওর কথাতে। পারেও বটে ভটকাই। 'এক গরাসের খাদ্য', 'এক ঘণ্টার পথ', 'এক ছিলিমের তামাক', এসব জানা ছিল কিন্তু পাইপের 'এক ফিল-এর গল্প'র কথাটা ভটকাই-এরই সৃষ্টি।

—ভটকাই দেখছি ফিলোলজিস্ট হয়ে উঠেছে রে!

ঋজুদা বলল।

—ফিলোলজিস্ট হবে কি না জানি না তবে ঋজুদা দিনমানেই এখানে যা মশা,

ফাইলেরিয়া ভটকাই-এর হতেই পারে। এগুলো ফালসিফোরাম-বাহী মশা নয় তো! ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতে মাথাতে যা যন্ত্রণা হয় তার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল।

ঋজুদা বলল, এখানকার মশার কামড়ে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয় বলে শুনিনি। তবে সিমলিপাল, নেফার নামধাপা ইত্যাদি বনের মশারা ম্যালিগনান্ট ম্যালেরিয়ার জন্য কুখ্যাত। অঙ্গুল ডিভিশনের লবঙ্গীর জঙ্গল থেকে ফিরেও একবার ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতে পড়েছিলাম।

—কতবার হয়েছে যেন তোমার? ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া ঋজুদা?

ভটকাই বলল, ফিরে এসে।

—কেন? তোরা শুনিসনি?

—তিনবার। ভটকাই জানবে কী করে! ও তো 'দু'দিনের বৈরাগী, ভাতকে বলে অন্ন'। কতদিন হল ও চেনে তোমাকে!

তিতির ভটকাইকে এক গোল দিয়ে বলল।

ঋজুদার জল খাওয়া হলে ভটকাইও ঢক ঢক করে এক লিটার জলের বোতল থেকে জল খেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে দিল। জল খেয়ে, ইতিমধ্যেই নতুন টোব্যাকোতে ফিল-করা পাইপটাতে লাইটার দিয়ে আগুন জ্বেলে ঋজুদা অনেকখানি ধোঁয়া ছাড়ল।

ভটকাই বলল, চলো, ফিনসে শুরু করো ঋজুদা। এতক্ষণে বাঘ বোধহয় এসে গেল।

ঋজুদা শুরু করল।

—আমাদের দেশের পাহাড়-বন সন্ধে নামার আগের অনেকক্ষণ সময় পাখিদের কলকাকলিতে এমন করে ভরে ওঠে যে, ইচ্ছে করে সূর্যকে ডেকে বলি, আপনার অন্য কোথাও কাজ আছে কি? তাহলে সেরে আসুন বরং। তার পরে ফিরে আসুন। যাবার এত তাড়া কীসের?

পাখিদের তখন কত যে হাঁকাহাকি, ডাকাডাকি, কত মিটিং-কনফারেন্স তা ভাল করে মনোযোগ দিয়ে শুনলে বুক ভরে যায়। বিজ্ঞানীরা তো বটেই, আজকাল অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষই জোরের সঙ্গে বলেন যে, ভগবান-টগবান নেই। সব বোগাস। ঈশ্বরবাবু একসময়ে থেকে থাকলেও আমরা তাকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছি। এখন কম্পিউটার আর ঈশ্বরবাবু সমার্থক। কিন্তু বনে-জঙ্গলে শিশুকাল থেকে ঘুরে ঘুরে আমিও বোধহয় গ্রাম্য, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে গেছি। নইলে ঈশ্বর যে নেই, একথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি না কেন বল? কে এমন রং লাগাল বনে বনে, কে এতরকম পাখি, ফুল, প্রজাপতি, পোকামাকড়, পশুর সৃষ্টি করল; করে, তাদের প্রত্যেকের চেহারা-ছবি আলাদা করে, তাদের গলাতে এত বিভিন্ন রকম স্বর দিল? অতটুকু-টুকু পোকা-মাকড়কেও আমাদের যা কিছু আছে তার সবই দিল, শুধু ধর্মবোধটুকু ছাড়া? কী করে মানি বল যে, এত

কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র নিচয় যার মন্ত্রবলে আবর্তিত হচ্ছে, যার যার কক্ষপথে যুগ যুগান্ত ধরে ঘুরে চলেছে সে কেউই নয়? এই পৃথিবীর দাম এই ব্রহ্মাণ্ডর প্রেক্ষিতে কতটুকু? আর এই পৃথিবীর বাসিন্দা আমরা, এই সর্বজ্ঞজনেরা কি এই ব্রহ্মাণ্ডর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মাথাতে উড়ন-চাঁটি মেরে বেড়াবার মতো জ্ঞানী হয়ে গেছি বলে মনে করিস তোরাও, এই ইয়ং-বেঙ্গলের প্রতিনিধিরা?

আমরা সকলেই চুপ করে রইলাম। বুঝলাম যে, ঋজুদাকে এখন কথাতে পেয়েছে। সকলকেই পায় কখনও কখনও। এখন বাদী-বিবাদী কোনও পক্ষ সমর্থন করতে যাওয়াটাই মূর্খামি।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করে রইলাম।

তিতির বলল, সূর্য কি ডুবল অবশেষে ঋজুকাকা?

—বাঘ কি এল?

ভটকাই বলল।

—হ্যাঁ। সূর্য ডুবতে না ডুবতেই বৃষ্টি নামল। সঙ্গে দমক দমক হাওয়া। মে মাসের শেষেও রীতিমতো ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। বন্দুকের নলটাকে নীচের দিকে করে যাতে বৃষ্টির জল নলের মধ্যে ঢুকে না যায় তাই, আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম। তখনও গাছের ছত্রছায়ায় আছি বলে জল মাথার উপরের দিক থেকে আসছিল না চারপাশ থেকে আসছিল কিন্তু গাছটা পুরো ভিজে গেলেই আসতে শুরু করবে।

—তারপর?

ভটকাই বলল।

—মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ-এর আলোতে পাহাড়তলি আলোকিত হয়ে উঠছে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু তারই কী রূপ। বৃষ্টিস্নাত গাছগাছালি যেন রুপোঝুরি হয়ে যাচ্ছে। গুহাগুলোর বাইরের কালো পাথরের স্তূপ ওই সাদা আলোতে ভারি রহস্যময় দেখাচ্ছে।

বাঘ তো বিড়াল পরিবারের সদস্য। ওরা এমনিতে জল পছন্দ করে না। শীতকালের রাতে যখন গাছের পাতা থেকে শিশির ঝরে টুপটুপিয়ে তখন দেখা যায় বাঘ জঙ্গল এড়িয়ে বনের পথের উপর দিয়ে হাঁটছে অথবা পথে বসে আছে। যতক্ষণ বৃষ্টি চলবে, ততক্ষণ বাঘ গুহাতেই সেঁধিয়ে থাকবে হয়তো। আধঘণ্টাটাক চলল বৃষ্টি। তারপরই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। শুক্লপক্ষ, কিন্তু সপ্তমী বা অষ্টমী হবে। ছোট হলেও উঠল চাঁদ এবং বৃষ্টিশেষের মিশ্রগন্ধবাহী হাওয়াতে আন্দোলিত ডালে পাতায় বৃষ্টিভেজা বন প্রান্তরে পিছলে-যাওয়া চাঁদের আলো আর অন্ধকারের বাঘবন্দী খেলা শুরু হল।

এমন সময় একটা কোটরা হরিণ খুব ভয় পেয়ে ডাকতে ডাকতে পাহাড়তলিতে উত্তর থেকে দক্ষিণে দৌড়ে গেল পড়ি কি মরি করে। তার ব্বাক্ ব্বাক্ ব্বাক্ আওয়াজ বনে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল। বৃষ্টির পরে বনের শব্দগ্রহণ ও শব্দপ্রেরণ ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায় তাই সেই ডাক দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে গেল। তারপরই দুটো

প্যাঁচা কিচি-কিচি-কিচর-কিচর-কিচি আওয়াজ করে পাহাড়তলির আকাশে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে ঝগড়া করতে লাগল।

তিতির বলল, প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি খাসা তোর চেঁচানি।

—বাঃ। ম্যামসাহেবও দেহি বাংলা কইতাছে। ফান্টোকিলাস। তুমারে একদিন শিদল শুঁটকি রান্না কইর‍্যা খাওইবার লাগব।

ভটকাই ফুট কাটল।

ঋজুদা বলল, সত্যিই যদি খাওয়াস তাহলে আমাকেও ডাকতে ভুলিস না ভটকাই।

আমি বললাম, তোরা ইন্টারাপট করার সময় পেলি না? বলো ঋজুদা।

—হ্যাঁ। প্যাঁচাদের ঝগড়া শেষ হতেই পাহাড়ের গা থেকে দুরগুম দুরগুম দুরগুম দুরগুম করে ডেকে উঠল সব প্যাঁচাদের ঠাকুরদা কালপ্যাঁচা। ওই প্যাঁচা যখন ডাকে তখন বুকের মধ্যে হাতুড়ি পড়তে থাকে। সে দেখতেও যেমন, তার ডাকও তেমন। সে ডাকের অনুরণন মিলিয়ে যেতে না যেতেই একজোড়া রেড-ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ টিটির-টি-টিটির-টি অথবা ডিড-ড্যু-ড্যু-ইট ডিড-ড্যু-ড্যু-ইট করে ডাকতে ডাকতে চাল-ধোয়া জলের মতো হালকা সাদা চাঁদের আলোর পাতলা আস্তরণ ভেদ করে তাদের লম্বা লম্বা পাগুলি ঝোলাতে ঝোলাতে দোলাতে দোলাতে ওই গুহাগুলোর দিক থেকে এদিকে আসতে লাগল। বুঝলাম, বাঘ এবারে গাত্রোত্থান করেছে। এবং যেমন ভেবেছিলাম, ওই গুহাগুলোরই একটার মধ্যে তার আস্তানা।

—তারপর?

আমরা সমস্বরে এবং রুদ্ধশ্বাসে বললাম।

—তার একটু পরই পাহাড়তলিতে ঘাসবনে আন্দোলন উঠল। বুঝলাম, বাঘ সোজা এদিকেই আসছে। এমন বীরদর্পে এবং throwing all caution to the winds কোনও বাঘকে তার মারা জানোয়ারের মড়িতে আসতে দেখিনি। এই বাঘ, তার মারা মড়িতে কখনও ফিরে আসে না বলে যে জনশ্রুতি আমাকে শোনানো হয়েছিল তা সর্বৈব মিথ্যা যে, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ রইল না এবং এই জনশ্রুতি কে বা কাদের বানানো সে সম্বন্ধেও একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল আমার মনে।

তেঁতরা গাছটার নীচে এমনই অন্ধকার যে বাঘ সেখানে একবার ঢুকে পড়লে বাঘের উপরে চাঁদের আলো আর পড়বে না। বন্দুকে ক্ল্যাম্পও লাগানো নেই। থাকলে তিন ব্যাটারির টর্চটা ফিট করে নেওয়া যেত ব্যারেলের সঙ্গে। এই বোকা বাঘ যেভাবে আসছে সেই ভাবেই যদি এগিয়ে আসে একটুও সাবধানতা অবলম্বন না করে, তবে সে গাছতলির অন্ধকারে সেঁধোবার আগেই তাকে গুলি করব বলে ঠিক করলাম। বাঘ যখন প্রায় একশো গজ মতো দূরে তখনও তার শরীর দেখা যাচ্ছিল না। ঘাসের মধ্যে ঘাসের মাথাগুলির নড়াচড়া দেখেই তার উচ্চতা এবং

দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাচ্ছিল মাত্র। মস্ত বড় বাঘ এবং হয়তো বুড়োও। নইলে বন্যপ্রাণী শিকার না করে দুধেল গোরুদের তার নিয়মিত খাদ্য তালিকাতে ঢোকাবেই বা সে কেন? অথবা কোনও আনাড়ি ও দায়িত্বজ্ঞানহীন শিকারির ছোড়া গুলিতে সে প্রতিবন্ধী হয়ে গেছে।

—তারপর?

ভটকাই অধৈর্য হয়ে বলল।

—তারপর আমি টর্চটাকে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে খুবই আস্তে আস্তে বন্দুকটাকে কাঁধে তুললাম যাতে সেই নড়াচড়া বাঘের চোখে না পড়ে। আমার ডান বাহুর সংযোগস্থলে বন্দুকের কুঁদোটাকে টাইট করে ধরে বাঁ হাতের পাতা দিয়ে লক-এর নীচে ধরে ডান হাত দিয়ে স্মল-অফ-দ্য-ব্যাট চেপে ধরে তর্জনী ট্রিগার-গার্ডের উপরে ঠেকিয়ে রাখলাম। ডান হাতের বুড়ো আঙুল রইল সেফটি ক্যাচের উপরে।

একটু চুপ করে থেকে নিভে যাওয়া পাইপেই আরেক টান লাগিয়ে ঋজুদা বলল, বাঘের মাথাটা ঘাসবনকে চিরে আগে আগে আসছে। সব বাঘই তার সামনের দু' কাঁধের মধ্যে শরীরটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে যেমন ছন্দোবদ্ধ হয়ে হাঁটে তেমনি করেই হাঁটছে এও। তার শরীর বা মাথা দেখা যাবে না, ঘাসের আন্দোলন দেখেই আন্দাজ করে মারতে হবে এবং মারতে হবে সামান্য পরেই। বাঘের মনে, মড়ির কাছে যে তার বিপদ থাকতে পারে সে সম্বন্ধে আদৌ কোনও সন্দেহই জাগেনি দেখে অবাক হলাম আমি। সত্যিই কোনও বাঘকে এমন অদ্ভুত ডেয়ার-ডেভিল ব্যবহার করতে দেখিনি আগে। এ যেন আত্মহত্যা করবে বলে মনস্থির করেই এসেছে। কে জানে এর হয়তো খুবই খিদে পেয়েছে, অথবা প্রেমে ব্যর্থ হয়েছে যে, তাও হতে পারে। যাই হোক, বাঘ যখন পনেরো গজ দূরে তখন তার মাথাটা এবং ঘাড়টা কোথায় হতে পারে, প্রায় মাটি থেকে সাড়ে-তিন চার ফিট উচ্চতাতে সামান্য lead দিয়ে সেফটি ক্যাচ অন করেই ট্রিগার টানলাম।

—তারপর?

আমরা আবারও সমস্বরে প্রশ্ন করলাম।

—ডান দিকের ব্যারেলে লেথাল বল ছিল। ইংলিশ ইলি-কিনক কোম্পানির। বলটা গিয়ে বাঘের শরীরের কোথায় লাগল তা বোঝা গেল না, মানে কানে, না ঘাড়ে, কিন্তু কোনও শব্দ না করে বাঘ ঘাসের মধ্যে ডুবে গেল।

—গুলি যে লাগলই তা জানলে কী করে। বাঘ তোমাকে ভড়কি দেওয়ার জন্যে যে ঘাসের মধ্যে মাটিতে বসে পড়েনি তাই বা কী করে জানলে?

ভটকাই বলল।

আমি বললাম, তুইও অভিজ্ঞ হয়ে ওঠ, তখন গুলির শব্দ শুনেই বুঝতে পারবি গুলি গন্তব্যে পৌঁছল না ফাঁকাতে হাওয়া-কেটে বেরিয়ে গেল।

ঋজুদা আমাকে শুধরে দিয়ে বলল, গুলি গন্তব্যে না পৌঁছে আশপাশের

কোনও solid object-এ, যেমন গাছ বা পাহাড়ে বা বাঁধে লাগলেও যে শব্দ হতে পারে তাতে শিকারির ভুল হতে পারে। কিন্তু সেখানে কোনও solid object ছিলই না। ফাঁকা মাঠ আর ঘাসবন। তাই গুলি যে লেগেছে, তা গুলির শব্দেই বুঝে নিতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

—তারপর?

—তারপর প্রায় আধঘণ্টা বসে থাকলাম গাছে।

—কেন? বাঘ যখন মরেইছে জানো তখন নেমে তখুনি গ্রামে চলে গেলে না কেন?

ভটকাই বলল।

—বোকাইচন্দর এটা জেনে রাখ, যে, রাতের বেলা তো বটেই দিনের বেলাতেও বাঘকে মাচা থেকে গুলি করে কখনও মাচা থেকে নামতে নেই। এই সাবধানবাণী ব্যারিস্টার এবং বিখ্যাত শিকারি কুমুদ চৌধুরী মশায় বারংবার তাঁর নানা বইয়েতে লিখে গেছিলেন। তাই, ওটি আমাদের প্রজন্মর শিকারিদের দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়ে গেছিল।

—কুমুদ চৌধুরী কি বেঁচে আছেন?

—না না। বাঘের হাতে না মারা গেলেও এতদিনে তিনি এমনিতেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হতেন। উনি তো আজকের মানুষ নন। প্রমথ চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরীদের পরিবারের মানুষ, যে পরিবারের মানুষ ছিলেন জেনারেল জে এন চৌধুরী।

—উনিও বাঘের হাতে মারা গেলেন? বলছ কি ঋজুকাকা?

তিতির বলল।

—হ্যাঁ। ঋজুদা বলল, একেই বলে 'As luck would have it' এবং বাঘকে গুলি করে মাচা থেকে নেমে সেই আহত বাঘের হাতেই মারা গেলেন। ওড়িশার কালাহান্ডির জঙ্গলে শিকারে গেছিলেন।

আমি বললাম, কুমুদ চৌধুরীর গল্প বাদ দিয়ে এবারে তোমার গল্পটি শেষ করবে ঋজুদা?

—আধঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরেও যখন কোনও রকম নড়াচাড়ার লক্ষণ দেখা গেল না তখন পকেট থেকে টর্চটা বের করে আলো ফেলে বাঘের শায়ীন অবস্থান সম্বন্ধে আরও নিশ্চিত হয়ে বাঁ বারেলের এল. জি. টি-ও ফায়ার করলাম। তাতেও কোনও নড়াচড়া হল না।

—তারপর?

—বাঘ যে অবশ্যই মরেছে একথা নিশ্চিত জেনেও পকেটে রাখা অন্য দুটি গুলি বন্দুকে ভরে নিয়ে গাছ থেকে নেমে এলাম। তারপর বন্দুক রেডি পজিশানে ধরে বাঘের যেখানে শুয়ে থাকার কথা সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। তারপর ব্যারেল দিয়ে ঘাস সরিয়ে নিশ্চিত হলাম যে বাঘ মরে গেছে। টর্চ জ্বালিয়ে দেখলাম যে, লেথাল বলটা ঢুকে গেছে বাঘের ডান কানের মধ্যে দিয়ে একেবারে মস্তিষ্কে। তাই

শিকারি বুঝতেও পারেনি যে, সে মরে গেল।

দ্বিতীয় গুলির শব্দ হওয়ার পরই গ্রামের মধ্যে উসখুসানি ফিসফিসানি শুরু হয়েছিল যে, তা দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। আমি গ্রামে ফেরার পায়ে-চলা পথে মাঝামাঝি যেতেই দেখি জনা দশেক লোক দুটি হ্যাজাক জ্বালিয়ে হাতে লাঠি-সোটা টর্চ এবং দুটি বন্দুক নিয়ে এদিকে আসছে। তারা আমাকে দেখেই আনন্দে শোরগোল করে উঠল। তারপরে আমাকে হাড়িবন্ধুর জিম্মায় দিয়ে তার বড় সম্বন্ধী রাম এগিয়ে গেল অন্যদের সঙ্গে বাঘকে বয়ে আনতে। আজকে সারারাত উৎসব হবে গ্রামে।

—তারপর?

—তারপর আর কী? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাঘের চামড়া ছাড়াতে পারে এমন কেউ কি আছে? তাহলে আমাকে আর রক্তাক্ত হতে হয় না।

—সে তো সব শিকারিই পারে কিন্তু আজ ভাগ্যক্রমে এক কসাই আছে। মহম্মদ জব্বার মহম্মদ।

আমি বললাম, সেই কি বাঘে মারা গোরুগুলোর চামড়াও ছাড়ায়?

—হ্যাঁ। ওই তো ছাড়ায়। ওর শালা আফজল মিঞাও আসে রেঢ়াখোল থেকে। একসঙ্গে অনেক চামড়া নিয়ে যায় টেম্পো ভাড়া করে।

—তোমাদের এই অঞ্চলে গত এক বছরে কত গোরু মেরেছে বাঘটা?

—ওঃ মেলাই। তার কি হিসাব আছে কোনও?

—এই বাঘ যে সমলেশ্বরীর বাঘ, ও বাঘ তো নয়, তোমরা তো বলেছিলে চিতা, তা তোমরা জানলে কী করে? প্রথমবার বাঘ গোরু মারার পরে সেই বাঘ মারতে কে বসেছিল মড়ির উপরে?

—মহম্মদ জব্বার মহম্মদের শালা আফজল মিঞা। সে তখন এখানেই ছিল। সেও খুব ভাল শিকারি। নামডাক আছে রেঢ়াখোলে। তার রাইফেলও আছে।

—সেই বলেছিল যে, গোরুখাদকটা চিতা এবং তার শরীরে গুলি এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেলেও তার কিছু হয় না। নইলে সে আফজল মিঞার গুলি খেয়েও চলে যেতে পারে?

—একথা সেই প্রথমবার বলেছিল?

—হ্যাঁ। সেই বলেছিল। এবং তার পরের বার যখন গোরু মারা পড়ে তখন মড়ির উপরে বসেছিল মহম্মদ জব্বার মহম্মদ। সেও ভাল শিকারি। যদিও গাদা বন্দুকে মারে। সেও তাই বলেছিল।

—কী বলেছিল জব্বার?

—বলেছিল যে, ওই বাঘ নিশ্চয়ই সমলেশ্বরী দেবীর বাঘ। একে মারা কোনও মানুষের কর্ম নয়। তবে মহম্মদ জব্বার মহম্মদের মাচার নীচে বাঘ আসেনি।

—আসেইনি? না সে নিজেই হাততালি দিয়ে বাঘকে ভাগিয়ে দিয়েছিল?

—কী বলছেন ঋজুবাবু?

—আচ্ছা! তার পরের বার কে বসেছিল এই বাঘ মারতে?

—আবু আলি। সে তো এই গ্রামেরই বাসিন্দা।

—সে কী করে?

—সে মহম্মদ জব্বার মহম্মদের তামাকের ব্যবসার পার্টনার। চারমল-এ দোকান আছে তার। সেও চিতাকে গুলি করেছিল কিন্তু চিতার কিছুই হয়নি।

—তারপর?

আমরা বললাম।

ঋজুদা বলল, তারপর আর কী। ভারতবর্ষের সুন্দর অনেক দিক যেমন দেখেছিস নানা বনে বনে ঘুরে তেমনই আবার অন্য দিকটাও দ্যাখ। সরল মানুষগুলোকে কীভাবে ঠকিয়ে বাঘকে অক্ষত রেখে জব্বার আর তার শালা মিলে গোরুর চামড়াগুলো হাতিয়েছে। বাঘে মারা গোরুর চামড়ার জন্য কোনও দামও নেয়নি গ্রামবাসীরা। বুঝলি! যেখানে অজ্ঞতা, যেখানে অন্ধবিশ্বাস, তা সে সমলেশ্বরী দেবীর উপরেই হোক কি মহম্মদ জব্বার মহম্মদের উপরেই হোক, সেখানেই পীড়ন, সেখানেই অত্যাচার। বাঘে-খাওয়া গোরুগুলোর মাংসও ওরা হালাল-করা-মাংস বলে চালিয়ে দিয়েছে জুজুমারা, চারমল এবং রেঢ়াখোলে অন্য ধর্মভীরু মুসলমানদের কাছে।

ভটকাই বলল, বাঘ আর কতটুকু ডেঞ্জারাস! দেখছি, মানুষ তো তার চেয়েও সরেস।

ঋজুদা বলল, আমার সামনে বাঘের নিন্দা কখনও করবি না। এত বড় মহৎ প্রাণের প্রাণী, এত বড় নির্জনতা-প্রিয় সন্ন্যাসী তুই কেদারবদ্রীতেও পাবি না। এই পৃথিবী থেকে বাঘ যদি সত্যিই হারিয়ে যায়, অনেক দেশেই তো গেছে ইতিমধ্যেই, সেদিনকার মতো দুঃখবহ দিনের কথা ভাবতে পর্যন্ত পারি না আমি।

—হারিয়ে যেতে আমরা দিলে তো। অত্ব সোজা নয়।

ভটকাই বলল।

হুলুক পাহাড়ের ভালুক

ঋজুদার সঙ্গে আমরা বিহারের পালামৌ-র মারুমারের বাংলোতে এসে উঠেছি আজ সকালে। এখন বর্ষাকাল।

বর্ষার মারুমারের রূপের বর্ণনা দেব এমন ভাষা আমার নেই। কোয়েলের ব্রিজ পেরিয়ে গাড়ু হয়ে, মিরচাইয়া জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে এসে, মারুমারের বনবাংলোতে এসে পৌঁছেছি সকাল এগারোটা নাগাদ।

কালকে মোহন বিশ্বাসদের ছিপাদোহরের ডেরাতে ছিলাম। সেখানে ডালটনগঞ্জ থেকে রমেনবাবু, রমেন বোস, আর মোহনবাবুর ছোটভাই রতন বিশ্বাস আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেছিলেন। এই রমেনদা দারুণ ইন্টারেস্টিং মানুষ। কত গল্পই যে তাঁর ভাঁড়ারে আছে! কয়েকবছর আগে জিপ অ্যাকসিডেন্টের পরে তাঁর একটা পা ছোট হয়ে গেছে। ক্রাচ নিয়ে চলেন কিন্তু তাতে তাঁর জীবনশক্তির একটুও তারতম্য হয়নি। এই রমেন বোস-এর কথাই বিস্তারিত আছে 'কোয়েলের কাছে' এবং 'কোজাগর' উপন্যাসে।

ঋজুদা বলছিল যে, দুটি উপন্যাস রমেন বোস এবং মোহন বিশ্বাসের আরও চেলা-চামুণ্ডাদের বাঙালি পাঠকপাঠিকাদের কাছে বিখ্যাত করে দিয়েছে।

ঋজুদা দেখছি মোহনবাবুর কথা বলতে অজ্ঞান। বলে, আমার জীবনে দুজন মানুষকে দেখেছি, যারা বিনা স্বার্থে মানুষকে কী করে এবং কতখানি ভালবাসতে পারা যায় তা দেখিয়ে গেছেন। এর একজন হলেন ডালটনগঞ্জের মোহন বিশ্বাস আর অন্যজন হলেন কলকাতা ও যসিডির দ্বারিকানাথ মিত্র। ঋজুদার মোহন এবং দ্বারিকদা। দ্বারিকানাথ মিত্র চলে গেছেন গতবছর।

এঁদের দুজনের কথা বলতে গেলেই ঋজুদার মতো শক্ত মানুষের গলাও ভারী হয়ে আসে। অবশ্য ঋজুদার বাইরেটাই ভারী শক্ত, ভিতরটা তুলতুলে নরম। যারা জানে তারাই জানে।

মারুমার বনবাংলোতে দুটিই ঘর। কোনও খাবারঘর কোনও ড্রয়িংরুম নেই যা অধিকাংশ বনবাংলোতেই থাকে। পুরনো বাংলোর সামনেই নিচু জায়গাটাতে, যার পেছন দিয়ে একটি ঝরনা বয়ে গেছে হুলুক পাহাড় থেকে নেমে, একটা মস্ত কুসুম

গাছ আছে। বনবিভাগ সেই গাছে একটি ট্রি-কটেজ বানিয়েছে। সুন্দর। এটা বানিয়েছেন সাউথ কোয়েলের ডি.এফ.ও মহম্মদ কাজমি। কাজমি সাহেব লম্বা চওড়া দিলেরি মানুষ। লক্ষ্ণৌতে বাড়ি। ঋজুদা এসেছে শুনে ছিপাদোহরে ঋজুদার সঙ্গে দেখা করে গেছেন গতকাল।

ঋজুদা বলেছে আমি পুরনো বাংলোতেই থাকব। কত স্মৃতিই না আছে আমার এই বাংলোর। তোরা বরং ট্রি-কটেজে গিয়ে থাক রাতে, ভাল লাগবে। ট্রি-কটেজটির নাম 'কুসমি'।

ঋজুদা বলছিল, 'কুসমি' নামের এক রকম স্টিক-ল্যাক বা লাক্ষা হয় কুসুম গাছে—সেই crop-কেই লাক্ষার জগতে বলা হয় 'কুসমি'।

সত্যি! ঋজুদা কতই না জানে! কোনও অ্যাডভেঞ্চার বা মানুষখেকো বাঘের শিকার বা রহস্যভেদ না হলেও ঋজুদার কাছ থেকে মারুমার বনবাংলোর বারান্দাতে বসে নানা গল্প শুনেই দিন কেটে যাবে স্বচ্ছন্দে। মোহনবাবু নেই বটে কিন্তু মোহনবাবু বিখ্যাত আদিবাসী বাবুর্চি 'জুম্মানকে', যার কথা 'কোয়েলের কাছেতে বারবার এসেছে, রমেনবাবু আর রতনবাবু ধরে পাকড়ে নিয়ে এসে ঋজুদার ডিউটিতে লাগিয়ে দিয়েছেন। দেখলাম বহুদিনের জান-পহচান ঋজুদারও জুম্মানের সঙ্গে। জুম্মান বিরিয়ানির ইন্তেজাম করছে বাবুর্চিখানাতে আর আমরা এক কাপ করে কফি খেয়েছি। ঋজুদার পাইপটা ইংলিশ গোল্ড ব্লক টোব্যাকোতে ঠেসে নেওয়া হয়ে গেলে, তাতে রনসন-এর লাইটার দিয়ে আগুন ধরিয়ে মৌজ করে একটা টান দিয়ে ঋজুদা যেন অতীতের গভীরে ডুব দিল। আমরা বুঝলাম, এই মওকা। আমি আর ভটকাই ধরে পড়লাম, ঋজুদা, এই মারুমার আর হুলুক পাহাড়ে তোমার কত কী অভিজ্ঞতাই তো হয়েছে। আমাদের বলো না তার কিছু। রান্না হতে তো এখনও ঘণ্টা দুই লাগবেই। বিরিয়ানি রান্না কি কম হ্যাপা! তার উপরে চাঁব, চওরি, এবং লাব্বাও হবে।

বলো না প্লিজ ঋজুকাকা, তিতিরও ধরে পড়ল।

ঋজুদা নিমরাজি হয়ে বলল, দাঁড়া। দাঁড়া। পাইপটা সবে ধরালাম, পাইপের একটা ফিল অন্তত খেতে দে, সামনের হুলুক পাহাড়ের দিকে চেয়ে থেকে। তারপর যা মনে পড়বে, তা বলব এখন।

আমরা তিনজনেই খুব খুশি হলাম। ইতিমধ্যে কিশোর ও পাপড়ি চৌধুরী এসে হাজির। ওঁরাই বেতলার 'নইহার' হোটেল বানিয়েছেন। তা ছাড়া মারুমারেও ওঁদের বাড়ি আছে একটা। বাড়ি মানে, চালিয়াতির নয়, খুবই সাদামাঠা কিন্তু দারুণ। হাতিরা মাঝে মাঝেই এসে সে বাড়ি ভেঙে দিয়ে যেত প্রথম দিকে। 'নইহার' নামটির মানে হচ্ছে বাপের বাড়ি। হাতিদের বাপের বাড়ি, এই অর্থেই বেতলার হোটেলের নাম দিয়েছেন ওঁরা 'নইহার।' চৌধুরীরা যখন প্রথমবার গাড়িতে করে পালামৌ-এর এই সব অঞ্চলে আসেন তখন থেকেই ঋজুদার সঙ্গে তাঁদের আলাপ। ঋজুদা সেবারে কেঁড় বাংলোতে উঠেছিল।

ঋজুদা কিশোরবাবুকে বলল,—কিশোর, তুমি এদের একটু সুগা বাঁধটা দেখিয়ে দিও তো।

সুগা বাঁধটা কী ব্যাপার?

ওভার-ইনকুইজিটিভ ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

সুগা মানে যে টিয়া তা তো জানিসই।

হ্যাঁ তা তো জানিই।

সেই সুগারা তাদের ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে এই বাঁধ বানিয়েছিল এমনই রূপকথা আছে ওঁরাও আদিবাসীদের। কিশোর পাপড়ি বলবে তোদের।

তুমি যাবে না আমাদের সঙ্গে?

নাঃ।

কেন?

আমি কোনওদিনই যাইনি। দেখিইনি সুগা বাঁধ আজ অবধি। তাই আর বড় বয়সে দেখে কী লাভ? আমি সবকিছুই প্রথমে করাতে বিশ্বাসী। এই ব্যাপারটাতে যখন কিশোর ও পাপড়ি আমাকে সেকেন্ড করেই দিয়েছে তখন সেকেন্ডই থাকি বরং।

আমি ভাবছিলাম, ঋজুদার কী যেন হয়েছে ইদানীং। অনেক কিছুই 'জানেনা' বলছে, 'দেখেনি' বলছে। ঋজুদাও জানেনা বা দেখেনি এমন কোনও জিনিস যে থাকতে পারে তা আমাদের বিশ্বাসই হয় না, যদিও ঋজুদা নিজেকে কোনওদিনই সর্বজ্ঞ হিসেবে জাহির করেনি কারও কাছেই, আমাদের কাছে তো নয়ই! বরং যারা নিজেদের সর্বজ্ঞ ভাবে তাদের নিয়ে ঠাট্টাই করে ঋজুদা। তবু আমাদের যেন কীরকম অবাক লাগে। আমার সবচেয়ে বেশি লাগে, কারণ আমিই তো ঋজুদার সবচেয়ে পুরনো ও ওরিজিনাল চেলা।

ভটকাই প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল,—তোমার পাইপের টোব্যাকো তো জ্বলে গেছে ঋজুদা। এবারে শুরু করো আরেকবার পাইপ ফিল না করেই। গল্প শেষ হলে তারপর আবার ভরবে।

ঠিক আছে। বলল, ঋজুদা।

ওই যে হুলুক পাহাড়টা দেখছিস সামনে সোজা তার উপরে একটা মালভূমি মতো আছে। আজকাল তোদের মতো অনেক তরুণ তরুণীই ট্রেকিং করছে এই সব অঞ্চলে...

তার হোতা তো আপনিই।

কিশোরবাবু বললেন।

তা কেন? আসলে আজকালকার ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি অ্যাডভেঞ্চারাস, আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জানে শোনে, তাদের জানার ইচ্ছাটাও আমাদের চেয়ে অনেকই বেশি তাই তারা নিজেদের তাগিদেই বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, ট্রেকিং করে, পাহাড় চড়ে। এখন তো অজানাকে জানার ও জয় করারই যুগ। তারা

যা-কিছুই করে নিজেদের জন্যেই করে। আমার অবদান কিছুমাত্র নেই।

ঋজুদা বলল।

আমরা সকলে চুপ করে রইলাম। কিশোরবাবু 'আপনিই হোতা' বলেই ট্রেনটাকে ডি-রেইলড করে দিলেন। কিন্তু ভটকাই এমন ভবি যে, সে সহজে আদৌ ভোলে না। সে বলল, ব্যাক টু হুলুক পাহাড় এগেইন।

হ্যাঁ। ঋজুদা নিজেকে গুটিয়ে এনে বলল।

তারপর বলল, প্রতি শীতে মোহনের একটা ক্যাম্প পড়ত ওই পাহাড়ের উপরে। বহুবার যে গেছি এমন কথা বলব না তবে অনেকবারই গেছি। মোহনের মাসতুতো ভাই শান্টু, লম্বা, সুপুরুষ, কালো এবং তার সঙ্গে ছিপাদোহরের জাঙ্গল-ম্যানেজার মুসলিম দেখাশোনা করত ক্যাম্প। বাঁশ কাটাই ও লাদাই-এর ক্যাম্প। কেটে, সাইজ করে রেখে বাঁশ ট্রাকে করে নামিয়ে আনা হত ছিপাদোহরে। তারপর রেল-এর 'রেক'-এ করে চলে যেত বঙ্গভূমে অ্যান্ড্রু ইয়ুল কোম্পানির আই.পি.পি. অর্থাৎ ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প কোম্পানির কারখানায় কাগজ তৈরি হতে। তখন সারাদিনই বাঁশ বোঝাই ট্রাক চলত এই পথে। টাইগার প্রোজেক্ট হয়ে যাওয়ার পরে সমস্ত জাঙ্গল-অপারেশন এখন বন্ধ। তাই এত শান্ত সুনসান মনে হয় পুরো অঞ্চল।

ভটকাই বলল,—তুমি দেখি আমাদের বাঁশ-বিশারদ করে দেবে। অন্য গল্প বলো না।

তাই তো বলছি। এসবই তো সেই গল্পেরই প্রস্তাবনা। আমি অবশ্য ক্যাম্পে রাত কাটাইনি কখনও। মারুমার থেকে জিপে গেছি, হয়তো সারাদিন থেকেছি, তার পরে সন্ধের আগেই নেমে এসেছি কারণ হুলুক পাহাড়ে ওঠানামার পথটা আদৌ সুবিধের ছিল না।

আমরা যেতে পারব না? আমাদের জিপ নিয়ে?

সম্ভবত না। কারণ, জঙ্গলের কাজ তো বহুবছরই বন্ধ। মোহনই নিজের গরজে রাস্তা মেরামত করে নিত। তা ছাড়া বনের মধ্যের সব কাজই, যখন সেই সব কাজ করতে দেওয়া হত, বন্ধ হয়ে যেত ত্রিশে জুন। পথঘাট খুলত পয়লা অক্টোবর। সারা ভারতের অধিকাংশ বনবিভাগেই এ নিয়ম। রাজস্থান বা অন্য রুখু জায়গাতে কী নিয়ম খোঁজ করিনি।

বন্ধ থাকত কি বৃষ্টির জন্যে?

তাও বটে। আবার জন্তু জানোয়ারদের শান্তিতে থাকতে দেওয়ার জন্যেও হয়তো কিছুটা। ওই কটি মাস শিকারেরও closed-season ছিল সব জঙ্গলেই। এসব নিয়ম-কানুন সাহেবরাই বানিয়ে গেছিল তারপরে পঞ্চান্ন বছরেও সেই সব আইনের কোনও রদবদল হয়নি।

বলো, তারপর ঋজুকাকা। আবারও বাঁশ! আমাদের কি তুমি 'কোজাগর' উপন্যাসের 'বাঁশবাবু' করে দেবে না কি?

তা হলেই বা মন্দ কী? আহা! আমি যদি বছরের পর বছর ওইরকম এই সব অঞ্চলে থাকার সুযোগ পেতাম তবে কী মজাই না হত। স্থায়ী ভাবে কোথাওই বসবাস না করলে যা জানা যায়, তাতে আমার মতো মূর্খই হওয়া যায়, সত্যিকারের পণ্ডিত হওয়া যায় না।

আবারও তুমি গল্প থেকে নড়ে যাচ্ছ ঋজুদা। তুমি আগে তো এরকম ছিলে না? চরিত্রের অবনতি হয়েছে বলছিস?

ভীষণই।

তা একবার গরমের দিনে মারুমার থেকে জিপ নিয়ে গেছি হুলুক-এর উপরে শান্টুর সঙ্গে দেখা করতে। আর গরম কী গরম! সকাল আটটার পরে বাইরে বেরোনোই যায় না। কিন্তু বাঁশকাটা কুলিরা যখন এই গরমেও কাজ করে, তখন আমাদের না-বেরোনোর কোনও অজুহাত নেই। বনবিভাগের সব বাংলোতেই গরমের দিনে যব-এর ছাতু রাখা থাকে। ফরেস্ট গার্ডরাও বনে বেরোবার আগে বড় এক গ্লাস যবের ছাতু গুলে খেয়ে নিয়ে তারপর হেঁটেই হোক কী সাইকেলেই হোক ডিউটিতে বেরোয়। কুলি-কামিনদের জন্যেও মোহন যবের ছাতুর ঢালাও বন্দোবস্ত রাখত।

তারপর?

মে মাসের শেষ। সকালে ব্রেকফাস্ট করে মোহনের পার্সোনাল ড্রাইভার কিষুণকে নিয়ে বেরিয়েছি। লাল ধুলোতে লাল ভুত হয়ে যখন পৌঁছলাম তখন দেখি খুব শোরগোল সেখানে। শান্টু 'জাম্পিং-বিন'-এর মতো লাফাচ্ছে। তিন-তিনজন কুলি রক্তাক্ত অবস্থাতে ডেরার সামনে চৌপাইতে শুয়ে আছে। সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত। ক্ষতবিক্ষত না বলে ফালা ফালা বলাই ভাল। জামাকাপড়ও নেই বললেই চলে। কারও নাক নেই, ঠোঁট নেই, কারও কান নেই, কারও গলার কাছে বীভৎস ক্ষত। যাদের নাক নেই তাদের নাকের জায়গাতে দুটি রক্তাক্ত ফুটো আছে। কাজ বন্ধ। কুলিকামিনরা গোল হয়ে ঘিরে আছে শায়ীন আহতদের। আর শান্টু আর মুসলিম চিৎকার করে ওদের সরে যেতে বলছে। বলছে, হাওয়া আসতে দাও, ওদের নিশ্বাস নিতে দাও। তা ছাড়া, হাওয়াতে না রাখলে ওদের ক্ষত খুব তাড়াতাড়ি পচে যাবে।

তিনজনের মধ্যে একজনের জ্ঞানই ছিল না। অন্য দুজন মাঈরে! বাপ্পারে! করছিল।

শান্টু বলল, ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছে ঋজুদা। কারণ, প্রথম ট্রাক আসতে আসতে তো বারোটা-একটা বেজে যাবে। এখুনি জিপে করে এদের ছিপাদোহরে বা মহুয়াডাঁরে পাঠাতে না পারলে এরা মরেই যাবে।

তারপর?

ভটকাই বলল।

ক্ষত দেখেই বুঝেছিলাম যে এ ভাল্লুকের কাজ। কিন্তু একসঙ্গে তিন তিনজনের

এই অবস্থা করেছে দেখে অবাক হলাম।

শান্টু বলল, বন্দুক রাইফেল এনেছেন তো ঋজুদা?

তা তো এনেছি কিন্তু সে তো মারুমারের বাংলোতে আছে। তা ছাড়া আমার পারমিটে শুয়োর আর ভালুক ছাড়া আর কিছু মারার অনুমতি নেই। আর আছে একটা লেপার্ড।

ভাল্লুকই তো মারবেন! আর ভাল্লুক কী ভাল্লুক। 'ড্যাডি অফ অল ড্যাডিজ'। এত বছর এই পালামৌ-র জঙ্গলে বছরের ন মাস কাটাচ্ছি এত বড় ভাল্লুক আমি কখনও দেখিনি।

বললাম, এখন বাক্যব্যয় না করে এদের কোথায় পাঠাবে পাঠাও।

শান্টু বলল, মুসলিম, যাও এদের নিয়ে জিপে করেই। এখনও তো একটিও ট্রাক এসে পৌঁছয়নি ডালটনগঞ্জ থেকে। কিন্তু যাবে কোথায়?

ডালটনগঞ্জেই নিয়ে যাই একেবারে। ওখানে 'বাবু' আছেন সবরকম সুযোগ সুবিধা করে দেবেন।

তাই যাও।

বলেই, ছোট ছোট বাঁশ দিয়ে তৈরি তার ঘরের মধ্যে থেকে ডেটল-এর একটা নতুন শিশি নিয়ে এসে সেটাকে খুলে আহতদের তিনজনেরই ক্ষত স্থানে গবগব করে ঢেলে দিল। যে লোকটা অজ্ঞান হয়ে ছিল সে যুবক এবং তার স্বাস্থ্যও খুব ভাল কিন্তু সেই অজ্ঞান হয়ে হয়েছে। ক্ষতস্থানে ডেটল পড়তেও তার কোনও ভাবান্তর হল না। অন্য দুজন সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরে মাঈরে! বাপ্পারে! বলে চেঁচিয়ে উঠল।

শান্টু বলল, গেল ডেটলটা। কালই নতুন বড় শিশি আনিয়েছিলাম। ডালটনগঞ্জ থেকে। এখন দাড়ি কামাতে গিয়ে গাল কাটলেও এক ফোঁটা ডেটল পাব না।

গাল কাটলে তো আর প্রাণ যাবে না। ওদের যে প্রাণ বিপন্ন।

জানি তো। তাই তো দিলাম।

কিষুণ ওদের নিয়ে চলে গেল। সঙ্গে আরও দুজনকে নিয়ে গেল, আহতদের ধরে বসে থাকবে বলে।

শান্টু বলে দিল ডালটনগঞ্জসে তুম নেহি লওটনে শেকেগা তো ঋজুদা কি লিয়ে দুসরা জিপোয়া ভেজাও বাবুকো কহকে। হিঁয়া সাব রাত নেহি না বিতায়েগা।

উওতো জরুর। মগর জিপোয়া আতে আতে দেরতো লাগেগি। আপ হিঁয়াই সাবকি খানেপিনে কি ইন্তেজাম তো কিজিয়ে।

শান্টু বলল, উসকি ফিকির তুমহারি নেহি। তুম যাও জলদি আউর বাতিয়া না বানাও।

ঋজুদা বলল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হল কী করে?

আর বলবেন না ঋজুদা, এখানে একজন ডি.এফ.ও ছিলেন বহুদিন আগে, রামসেভক পাঁড়ে। তা পাঁড়েজি একটা সেকেন্ড হ্যান্ড অ্যাম্বাসাডার গাড়ি কিনে

রং-টং করিয়ে নিজে চালিয়ে বউ-আন্ডা-বাচ্চা সব নিয়ে কলকাতা দেখতে গেলেন। নিজের গাড়ি 'সেলফ-ড্রাইভ' করে কলকাতার যা কিছু দ্রষ্টব্য তো দেখলেন। যখন ফিরলেন, তখন গাড়িটাকে যদি দেখতেন! গাড়ির সারা শরীরে কোথাও ট্যাঁপারি, কোথাও আমড়া, কোথাও আঁশফল, কোথাও ডাব। কোথাও বা গভীর গাড্ডা, চাকা-চাকা দাগ।

আমরা গাড়ির হাল দেখে জিজ্ঞেস করলাম, হুয়া ক্যা থা পাণ্ডে সাব?

পাণ্ডে সাব অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন ওঁর মত পুছিয়ে। কলকাত্তাকি সব ট্রামওয়ালালোগ লাইন ছোড়কর আকর হামারা গাড়িমে টকরাতা থা। অজিব বাত হ্যায় ভাই।

তা আমি বললাম, কলকাত্তাকি সবহি ট্রাম-ড্রাইভারতো বিহারিই না হ্যায়। বিহারকি নাম্বার প্লেট দিখকর উনলোগোকি পেয়ার চড় গিয়া থা হোগা।

আরে মজাক নেহি শান্টুবাবু। গাড়িকি হালত দেখিয়ে। হায় বজরঙ্গবলি!

ঋজুদা বলল, তার সঙ্গে ভাল্লুকের কী সম্পর্ক?

এই ভাল্লুকও কলকাতার ট্রাম-ড্রাইভারদের মতো বেশ কিছুদিন হল লাইন ছেড়ে এসে যাকে তাকে আক্রমণ করেছে। কারও পেছন আঁচড়ে হাটিয়াতে নতুন কেনা লাল রঙের প্যান্টের এক গিরে কাপড় খুবলে নিচ্ছে প্যান্টের নীচের মাংস সমেত। কারও নাক, কারও কান, কারও চোখ। এ ভাল্লুকের মতো ত্রাস এ অঞ্চলে কখনও কোনও মানুষখেকো বাঘেও সৃষ্টি করেনি। বাঘে ধরলে ঝামেলা নেই। প্রাণ যে যাবে তা প্রায় গ্যারান্টিড। কিন্তু এ কী বিড়ম্বনা বলুন তো! আর যা শুনছি তাতে তো আতঙ্ক হচ্ছে। ভাল্লুকটা আপনার মতোই।

ঋজুদা বলল, আমি বললাম, তার মানে?

মানে আপনার চেয়েও লম্বা চওড়া। প্রায়, সাত ফিট লম্বা হবে। বুকের মধ্যে একটা সাদা ভি চিহ্ন। আমার ছোট মাসি আমাকে যেমন একটা কালো সোয়েটার বুনে দিয়েছিল তেমন ডিজাইনের।

সোয়েটারটা আছে এখনও?

না।

ভাগ্যিস নেই।

কেন?

থাকলে, কোনও শিকারি ভাল্লুক ভেবে তোমাকেই গুলি করে দিত হয়তো।

শান্টু হাসল।

ঋজুদা বলল, আমি বললাম এ আর নতুন কী? ভারতবর্ষের বনেজঙ্গলে ভাল্লুকের মতো পাজি জানোয়ার আর দুটি নেই। বিনা কারণে, কোনওরকমে প্ররোচনা ও উত্তেজনা ছাড়া, কেউ তাকে কোনওভাবে বিরক্ত না করলেও সে কোথা থেকে যে দৌড়ে এসে মানুষকে আক্রমণ করে বসবে তার ঠিক নেই। দিন রাতের কোনও ভেদ নেই। মানুষের উপরে তার জাতক্রোধ। ভারতের সব বনে

জঙ্গলে যত মানুষ দেখা যায় যায় চোখহীন, নাকহীন, কানহীন তার জন্যে দায়ি এই ভাল্লুকেরাই। বড় বড় নখ দিয়ে পেছনের দু পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে মানুষের মাথা থেকে পা অবধি আলিঙ্গন করে একেবারে চিরেফেড়ে দেয়। যারা বাঁচে, তাদের ওই অবস্থা হয় আর তাদের আক্রমণে মরেও যে কত মানুষ তার ঠিক নেই।

শান্টু বলল, তা আর জানি না! একবার, তখন আমি নতুন এসেছি মোহনদার কাছে—কলকাতা থেকে চাকরি করব বলে—বেকার বসে আছি বি কম পাশ করে তাই। মোহনদা ছিপাদোহরে পাঠাল মুসলিম-এর সাগরেদি করে কাজ শিখতে। আপনিই নিশ্চয়ই জানেন ছিপাদোহর থেকে কেঁড়-এ যাবার একটা কাঁচা রাস্তা আছে। পিচের বড় রাস্তা দিয়ে যেতে গেলে পথ বেশি পড়ত বলে আমরা সবাইই ওই পথটাই ব্যবহার করতাম। কেঁড় বাংলোতে মোহনদার অতিথিরা এসেছিল কলকাতা থেকে। ফিল্ম আর্টিস্টরা। ভাল খাওয়া-দাওয়া ছিল বলে মোহনদা ছিপাদোহর থেকে আমাকে যেতে বলেছিল খেতে। এই রকম গরমের দিন। চাঁদনি রাত। ফুরফুরে হাওয়া দিয়েছে। হাওয়াতে মহুয়া করৌঞ্জের গন্ধ ছুটছে। পোলাও মাংস খেয়ে সাইকেল চালিয়ে কেঁড় থেকে ফিরে আসছি আমি আর মুসলিম। মাইলখানেক আসার পরেই পথের বাঁদিক থেকে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক বেরিয়ে দৌড়তে দৌড়তে আমাদের দিকে আসতে লাগল। মনে হল আমাদের কোনও জরুরি খবর দিতে চায়। ছিপাদোহর স্টেশন থেকে যেন মাস্টারবাবুকে বলে টরে-টক্কা করে টেলিগ্রাফে সেই খবর পাঠিয়ে দিতে হবে।

আমি তো তাকে সাহায্য করার জন্যে সাইকেল থেকে প্রায় নেমেই পড়েছিলাম। জঙ্গলে সেই আমার প্রথম ভাল্লুক-দর্শন। মুসলিম চেঁচিয়ে বলল, সাইকেল তেজ চালাইয়ে শান্টুবাবু জান বাঁচানা চাহতা তো। আপকো ফাড় দেগা। ঔর কুস্তি লড়না হ্যায়তো উতারকে লড়িয়ে কুস্তি। ব্যাবাগো! ম্যাগো বলে যত জোরে পারি সাইকেল চালিয়ে সেই রাতে আমরা ছিপাদোহরের ডেরাতে ফিরেছিলাম। পোলাও-মাংস সব জোরে সাইকেল চালানোতে হজম হয়ে গেল। ক্ষিদে পেয়ে গেল। ডেরাতে পৌঁছে লাল্টু পাণ্ডেকে পুরি হালুয়া বানাতে বললম।

ঋজুদা বলল, তা তো হল, এখন আমার কী করণীয় বলো।

আবার করণীয়! ভাল্লুকটাকে মেরে দিন নইলে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। গত সাতদিনে এই নিয়ে আটজনকে জখম করেছে ব্যাটা। তার মধ্যে দুজন বোধহয় বাঁচবেই না। আজকেও একজন বাঁচে কি না সন্দেহ। আপনি যে এসেছেন তা তো আমি জানিই না। আজই যখন জগদীশ ড্রাইভার লাদাই ট্রাক নিয়ে ভোরে নীচে নামছে সে বলল, কাল ঋজুবাবুকো দেখা থা। মিরচাইয়াকি সামনে টহলতা থা। জরুর মারুমারমেই ঠাহরা হোগা উনোনে। হাতমে রাইফেল থা। কাহেনা উনকি খবর ভেজ দেঁতে হ্যায় আপ?

তখন ওকেই বললাম আপনাকে খবর দিতে মারুমারে।

ঋজুদা বলল, কই সে তো খবর দেয়নি? কেউই খবর দেয়নি। তুমি আছ তা

কিষুণ ড্রাইভারের কাছে জানতে পেরে আমি নিজেই তো এলাম।

তাই? দেখুন, ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাকে। আপনি আছেন কদিন?

তিনদিন।

যে করে হোক এই বদমাইশ ভাল্লুকটাকে মেরে দিন ঋজুদা। নইলে বাঁশের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। এদিকে ছিপাদোহরে 'রেক' এসে পড়ে আছে। গোমো থেকে বন্দোবস্ত করে ওয়াগনের রেক পাওয়া যা অসুবিধের তা কী বলব! তারপর দিনে আট ট্রাক বাঁশ নামে পাহাড় থেকে। ট্রাকগুলোও সব বসে থাকবে।

ভাল্লুকটা থাকে কোথায়? কুলিরা কেউ জানে?

কোথায় থাকে, তা কেউ বলেনি। তবে হুলুক পাহাড়ের মাথা থেকে ওদিকে সমান জমিতে মিরচাইয়া ফলস অবধি তার যাতায়াত। মিরচাইয়াতে একটি মেয়ে পরশু বিকেলে জল আনতে গেছিল তাকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। ডালটনগঞ্জের হাসপাতালে সে এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে।

ঋজুদা এবারে থেমে বলল, একটু পাইপ খেয়েনি এবারে। আর কিশোররা কখন এসেছে ওদের এখনও এক কাপ কফিও খাওয়ালি না। কী রে তিতির! ভারতীয় নারীরা উইমেনস লিব-এ সামিল হয়ে নারীত্বই বিসর্জন দিল কি? আসলে তোদের মিষ্টি কথা শুনতে, তোদের হাতে একটু চা-কফি খেতে, তোদের হাতের রান্না খেতে, তোরা সামনে বসে খাওয়ালে আমাদের কী ভালই যে লাগে তা তোরা বুঝবি কী করে।

তারপর বলল, শুধু চা বা কফিই নয় কিশোরদের খেয়ে যেতেও বল দুপুরে। গতবারে আমাকে দারুণ খাইয়েছিল ওরা মারুমারের বাড়িতে। শুধু আমাকেই নয় সঙ্গে আমার ব্যাটালিয়ন ছিল বামা, সুশান্ত, কৌশিক।

কোন সুশান্ত? চিড়িয়াখানার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর?

ভটকাই বলল।

হ্যাঁরে। আর চর্ম বিশেষজ্ঞ ডাঃ কৌশিক লাহিড়ী এবং কাস্টমস-এর বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিদেশ যেতে আসতে দমদম এয়ারপোর্টে যে আমার সব দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করে।

তিতির বলল, আমি একটু ঘুরে আসছি। কী খাবেন? চা না কফি? না কি ঠাণ্ডা কিছু খাবেন। ফ্রিজ তো নেই এখানে ঠাণ্ডা তো সেরকম হবে না।

কফি খাব।

আমি আগেই জিজ্ঞেস করতাম কিন্তু ঋজুদার গল্প শুনতে এতই মগ্ন ছিলাম যে ভদ্রতা জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছিল।

ঋজুদা বলল, তা হলে গল্প এখানেই শেষ। কফি যখন করতে বলছিসই তখন আমরা সকলেই খাব।

তিতির যেতে যেতে বলল, আমি না ফেরা অবধি শুরু কোরো না কিন্তু ঋজুকাকা।

না। তুই আয় কফির অর্ডার দিয়ে। আমি ততক্ষণে ছাই ঝেড়ে পাইপটা ভরি।

কফির পরে দুটান তো মারতে হবে।

তিতির চলে গেল। ঋজুদা পাইপের ছাই ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বলল, ওই দ্যাখ।

কী? কিউমুলো-নিম্বাস?

ভটকাই বলল।

ঋজুদা বলল, কাররেক্ট। আন্দামানের ট্রেনিং তবু কিছু কাজে লেগেছে দেখছি।

কিশোরবাবু বললেন, সকাল থেকেই সাজছে আকাশ। এবার নামবে।

ঋজুদা বলল, তিতির কোথায় গেল? ও, ওতো গেছে কফির অর্ডার করতে। ও এলে সেই গানটা গাইতে বলব ওকে।

পাপড়িদি বললেন, কোন গানটা?

আজ যেমন করে গাইছে আকাশ তেমন করে গাও গো।

বলেই বলল, পরের লাইনগুলো যেন কী, আজ যেমন করে চাইছে আকাশ তেমনি করে চাও গো।

আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায় মর্মরিয়া বনকে কাঁদায়।

তেমনি আমার বুকের মাঝে কাঁদিয়া কাঁদাও গো।

তারপরই বলল, এই তো তিতির। গা তো গানটা। আরে! এতক্ষণ তো খেয়ালই করিনি। কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে আজ শাড়ি পরে। জিনস-ফিনস, সালোয়ার-কামিজ যত কম পারিস পরবি। তোর শাড়ির রংটা কী বল তো?

এই ভিয়োলেট আর ম্যাজেন্টার মাঝামাঝি।

কেন? দিশি নাম নেই কি? তোর শাড়িটা দেখেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল।

কোন লাইন?

'ফলসাবরণ শাড়িটি চরণ ঘিরে।' আহা। কবিতা হবে তো এরকম। চারটি শব্দতে কেমন এক আবহ তৈরি হয়ে গেল বল তো? এমনিতে কি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ?

ঋজুদা বলল, আকাশের ঘনায়মান কালো মেঘের দিকে পাইপসুদ্ধ হাত তুলে দেখিয়ে, ওই দ্যাখ, 'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে'।

পাপড়িদি বললেন, মারুমারে বৃষ্টির শব্দ শোনা যায় দূরাগত এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো। ওই দ্যাখো হুলুক পাহাড়ের ভালুকের মতো আসছে বৃষ্টি—তার শিস শোনা যাচ্ছে—পাহাড় চুড়ো থেকে এখানে এসে পৌঁছতে মিনিট তিনেক তো লাগবেই।

ভটকাই রিলে করতে লাগল, আসছে, আসছে, এসে গেল। কিউমুলো-নিম্বাস ফেটে গেছে, মামাদাদুর কপালের ফোঁড়ার মতো।

ঝমঝমিয়ে নামল বৃষ্টি। ঝমঝমিয়ে বলাটা ঠিক নয়। ছোটনাগপুর উপত্যকার সব জায়গাতেই সে পালামৌই হোক কি রাঁচি কি হাজারিবাগ জেলা, বৃষ্টি হয় ফিসফিসিয়ে। আর প্রতিবার বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন মিশ্র গন্ধ ওড়ে, বনের গন্ধ, মাটির গন্ধ, জলের গন্ধ।

কিশোরবাবু বললেন।

সেটা ঠিক। এ কথা সব বনের বৃষ্টির বেলাতেই খাটে। ততক্ষণে কফি নিয়ে এল চৌকিদার এক হাতে ছাতা ধরে আর অন্য হাতে ট্রেতে কফির কাপগুলো বসিয়ে। সদ্য আসা বৃষ্টির গন্ধের সঙ্গে কফির গন্ধ মিশে গেল। কফিতে চুমুক দিয়েই ঋজুদা পাইপটা ধরাল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভটকাই বলল, নাউ ব্যাক টু হুলুক অ্যান্ড ভালুক।

ঋজুদা বলল হ্যাঁ।

জিপ তো কিষুণ নিয়ে চলে গেছে। ফিরতে ফিরতে বিকেল তিনটে চারটে হবে। সঙ্গে বন্দুক রাইফেলও আনিনি কিছু। কিন্তু এতখানি সময় মিছিমিছি বসে নষ্ট করারও মানে হয় না। এদিকে কাজও সব বন্ধ হয়ে গেছে। কুলিকামিনেরা ওই সাংঘাতিক তাপের মধ্যেই ছায়া খুঁজে নিয়ে জিরোচ্ছে। একটু পরে ওদের নিজের নিজের স্টেইনলেস স্টিলের বাটি খুলে যা-কিছুই এনেছে বাড়ি থেকে তাই খাবে। যা গরম! পাখিরাও ডাকছে না। ঝোপঝাড়ের ছায়াতে বসে বড় বড় হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে। ঠোঁটের ফাঁকে তাদের লাল টাগরা দেখা যাচ্ছে।

ঋজুদা বলল, আমি শান্টুকে জিজ্ঞেস করলাম, কোনও হাতিয়ার আছে?

আমার কাছে একটা স্পেশাল টাঙ্গি আছে। লম্বা বাঁশের, মস্ত ফলাওয়ালা, গাড়ুর লোহারকে দিয়ে অর্ডার মতো বানানো।

তাতেই হবে। আরও একটা বড় টাঙ্গি কুলিদের কাছ থেকে চেয়ে নাও।

কিন্তু এই রোদে কি বেরোনো ঠিক হবে ঋজুদা? লু লেগে যাবে যে!

বেরোতেই হবে। উপায় কী?

তবে দাঁড়ান। বলে, শান্টু ডেরার মধ্যে ঢুকে দুটো গামছা নিয়ে এল। বলল, ভাল করে কাচা। ভাল করে নাক-কান বেদুইনদের মতো ঢেকে নিন। ঠাণ্ডা বলুন, গরম বলুন সবই ঢোকে শরীরের ফুটো-ফাটা দিয়ে। সেখানে প্রোটেকশন থাকাটা অবশ্যই দরকার। তার আগে এক গ্লাস করে যবের ছাতুর শরবতও খেয়ে নিতে হবে। কিন্তু যাবেনটা কোথায়? ভাল্লুক কি তার ফোন নাম্বার পিন নাম্বার ঠিকানা রেখে গেছে?

রেখে যায়নি বলেই তো।

তারপরে বললাম, এমন একজন কুলিকেও সঙ্গে নাও যার কাছের কোনও লোককে ভাল্লুক ইনজিওরড করেছে আর যে শিকার-টিকার করেছে কখনও।

শান্টু ডাকল, রে ভোগতা।

ভোগতা নামের একটি দুবলা-পাতলা মানুষ এসে দাঁড়াল।

শান্টু বলল, যাবি আমাদের সঙ্গে? আমরা ভালুকটার রাহান-সাহানের খোঁজে যাচ্ছি।

ও সাগ্রহে বলল, যাব হুজৌর।

শান্টু বলল, খেয়ে নে। আমাদের ফেরার কোনও ঠিক নেই।

ও বলল, আপনারাও তো খাননি। ফিরেই খাব।

তা হলে ফিরে তুই আমাদের সঙ্গেই খাস তখন। বলেই, রামধানিয়া বলে হাঁক দিল। হাঁক দিতেই ডেরার অন্য প্রান্তের ঘর থেকে একটি অল্পবয়সি ছেলে এসে দাঁড়াল। শান্টু বলল, ভোগতাও আমাদের সঙ্গে খাবে। কী রান্না করছিস?

চাউল, অড়হড়কি ডাল, লাউকিকি সবজি আর আমকি চাটনি।

ঠিক আছে।

ঋজুদা বলল, আমি স্পষ্ট দেখলাম ভোগতার মুখ দিয়ে যেন লালা গড়াল। এই খাবার তো ওরা বিয়ে-চুড়োতে খায়।

ঠিক এই সময়ে পাপড়িদি বললেন, এবারে আমাদের উঠতে হবে। কলকাতা থেকে একজন আসবেন। কবি শঙ্খ ঘোষ এসে থাকবেন কদিন আমাদের এখানে তারই তত্ত্বতালাশ করতে আসবেন তিনি ডালটনগঞ্জ থেকে। আজকে আমাদের খাওয়াটা বাদ যাক।

তোমরা অতিথিকে নিয়েও আসতে পারো। তবে আমার মতো জংলির সামনে যদি শঙ্খ ঘোষের প্রতিভূকে না আনতে চাও তবে ঠিক আছে। তোমরা রাতে এসে খেয়ো। খাবার তোলা থাকবে। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আমারও ঠিক পটে না। আমি জংলি মানুষ, স্বভাবে এবং পরিবেশে, ওঁদের থেকে একটু দূরে থাকতেই ভালবাসি। তবে শঙ্খ ঘোষ আমার অন্যতম প্রিয় কবি। আজকালকার মতলববাজ অ-কবিদের নানা আড়ত-এর মধ্যে এমন কবিদের খুঁজে পাওয়া খুব কমই যায়। ঠিক আছে। তোমরা এসো।

ব্যাক টু হুলুক।

ভটকাই অসভ্যর মতো বলল, ওঁরা চলে যাবার আগেই।

হ্যাঁ। ভোগতাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাল্লুকটা আজ ওদের যেখানে আক্রমণ করেছিল সে জায়গাতে একটু নিয়ে চলো তো আমাদের।

চালিয়ে হুজৌর।

ভোগতা কোনও নাম না, ওর জাতের নাম। এই জাত-পাতের হাত থেকে বিহার যে কবে নিজেদের বাঁচাবে তা ঈশ্বরই জানেন।

বিহার কেন বলছ ঋজুকাকা এখন তা ঝাড়খণ্ড।

ঠিক। ভুল হয়েছিল। তবে বিহারও তো বিলক্ষণ আছে। তার অঙ্গচ্ছেদ করেই না ঝাড়খণ্ড হল!

পথ থেকে এদিক ওদিকে চলে যাওয়া গোরু ছাগলকে যেমন হ্যাট-হ্যাট করে তাড়িয়ে পথে নিয়ে আসে রাখাল ছেলে, ভটকাইও ঋজুদার পথ ভোলা গল্পকে তাড়িয়ে পথে আনল।

ভোগতা যেখানে নিয়ে গেল সেখানে গিয়ে দেখলাম নলি বাঁশের ঝোপে ওরা

বাঁশ কাটছিল। বাঁশেরই জঙ্গল সব বনে পাহাড়ে। তার সঙ্গে হরজাই জঙ্গল। গামহার, সিধা, শিশু, অর্জুন, কেঁদ, পিয়ার, মহুয়া, শাল, পিয়াশাল, কচিৎ সেগুন, জংলি আম (যে আমের টক রাঁধছে আজ রামধানিয়া), আমলকী, তেঁতুল, ঘোড়ানিম এসব গাছ। তবে ওই বাঁশগুলোর পেছনে একটা মস্ত চাঁর গাছ ছিল। এই চাঁর গাছ, মস্ত বড় বড়, সারান্ডার জঙ্গলে আছে।

আমাদের তো একবারও নিয়েই গেলে না সারান্ডাতে।

তিতির বলল, অনুযোগের স্বরে।

যাব, যাব, একবার নিয়ে যাব। 'ল্যান্ড অফ দ্য সেভেন হাড্রেড হিলস।' সাতশো পাহাড়ের দেশ। কারো, কয়না আর কোয়েল নদীর দেশ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুবই প্রিয় ছিল সারান্ডা।

ভটকাই ছপটি মারল, ব্যাক টু হুলুক। তারপর বিরক্তির সঙ্গে বলল, নাঃ। এমন ভাবে কি গল্প শোনা যায়? ইমপসিবল।

হ্যাঁ। চাঁর গাছটার নীচ থেকে ভাল্লুকটা হঠাৎ রে রে রে করে বেরিয়ে এসে পেছনের দু পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে ওরা কিছু বোঝার আগেই ওদের ফালা ফালা করে দিয়েছিল।

হাতে তো টাঙ্গি ছিল, মারল না?

ঝিন্টু মেরেছিল একেবারে ভাল্লুকের নাকের উপরে। কিন্তু টাঙ্গি ছিটকে উঠল যেন।

তারপর ভোগতা বলল, ভাল্লুকের নাক কি রাবার দিয়ে তৈরি হয় হুজৌর?

ঋজুদা কথাটা বলতে বলতেই হেসে ফেলল।

আমি বললাম, না রাবার দিয়ে তৈরি হয় না তবে সে এক অদ্ভুত জিনিস অবশ্যই।

তারপর বললাম, নাকে ভাল মতো লেগেছিল?

জি হুজৌর। ভালু উঁক করে আওয়াজ করেছিল একটা আর তারপরই তো ঝিন্টুকে মাটিতে ফেলে দিয়ে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। বেহোঁস হয়ে গেল সে।

কিন্তু তুমি কোথায় ছিলে তখন?

আমি ঝিন্টুর থেকে হাত দশেক ডানদিকে ছিলাম।

তুমি ঠিক দেখছিলে যে নাকে ভাল করে টাঙ্গির কোপ পড়েছিল।

জি হুজৌর।

মগর ইতনা আদমিকো ভালু কেইসে নোচ লিয়া?

শান্টু জিজ্ঞেস করল ভোগতাকে।

আয়া ঔর গ্যয়া।

ভটকাই বলল, বিধানসভা কি লোকসভার সদস্য ছিল না তো মিস্টার ভাল্লুক।

আমরা হেসে উঠলাম। আমি বললাম, এবার কে ডিসট্র্যাক্ট করছে?

সরি। বলে, দুহাত দিয়ে দুকানে হাত ছোঁয়াল ভটকাই।

তিতির বলল, তারপর?

তারপর জায়গাটাতে ভাল্লুকের হাত পায়ের দাগ খুঁজতে গিয়ে একটু পরেই দাগ পাওয়া গেল। ঝিন্টুকে যেখানে মাটিতে ফেলে আঁচড়েছিল সেখানকার মাটিতেও ধ্বস্তাধ্বস্তির দাগ দেখা গেল। গরমের দিনে মাটি শুকনো এবং আলগা, তার উপরে ধুলোর আস্তরণও পড়ে থাকে তাই দাগ পাওয়াটা অসুবিধের ছিল না। আমরা ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। ভোগতার চোখ আমার চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ। সে আগে যেতে লাগল টাঙ্গি কাঁধে তার পেছনে আমি শান্টুর স্পেশাল টাঙ্গি কাঁধে তারও পেছনে শান্টু খালি হাতে। দেখলাম, ভাল্লুকটা কিছুদূর গিয়েই বাঁদিকে নেমে গেছে পাহাড় থেকে। যে কোণে গেছে তাতে মনে হয় মিরচাইয়ার কাছে গিয়ে নামবে। তোরা এই ভরা বর্ষাতে মিরচাইয়ার এক রূপ দেখছিস আবার প্রখর গ্রীষ্মে এলে দেখবি অন্য রূপ। প্রকাণ্ড কালো পাথরের সব শিলাসন। জল পড়ছে ক্ষীণ ধারায়। একটা সময়ে এসে তাও বন্ধ হয়ে যায়। নীচের দহতে জমে থাকে সামান্য জল। সেখানে বাইসন শম্বর চিত্রল হরিণ এবং তাদের পেছনে পেছনে বাঘ বা চিতাও আসে জল খেতে গভীর রাতে। সকাল সন্ধেতে এখানে কম জানোয়ারই আসে কারণ মহুয়াডাঁর অবধি বাস যাতায়াত করে, প্রাইভেট গাড়ি ও ট্রাকও যায়।

তারপর?

তারপর ভাল্লুক তো নেমে গেছে, তবু পাহাড়ের ওপরটা ভাল করে একটু ঘুরে দেখব মনস্থ করলাম। কিন্তু হাঁটাচলা করাই দায়। লু বইতে শুরু করেছে অনেকক্ষণ। এয়ারকন্ডিশনারের পেছন দিয়ে যেমন গরম হাওয়া বেরোয় তার চেয়েও গরম হাওয়া শুকনো পাতা ধুলো খড় সব উড়িয়ে তীব্র বেগে বয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে পড়ে যাব। মাঝে মাঝে ধুলো বা পাতাপুতাকে অতিকায় সাপের মতো বায়ুস্তম্ভ উপরে তুলছে—অনেক উপরে—তারপর কোমরে গুলি-খাওয়া সাপ যেমন ধপ করে পড়ে যায়, তেমন করে ভেঙে পড়ছে জমিতে।

তারপরই ঋজুদা বলল, তোরা জলস্তম্ভ দেখেছিস কেউ নদীতে বা সমুদ্রে?

নাঃ।

আমরা সমস্বরে বললাম।

দ্যাখাব, যদি সুযোগ হয়।

তারপর?

তারপর ভোগতাকে শুধোলাম হিঁয়া কোঈ মাঁন্দ-উন্দ হ্যায়?

মাঁন্দ মানে? তিতির বলল।

মাঁন্দ মানে গুহা। মাঁন্দ-উন্দ মানে গুহা-টুহা।

ও।

ভোগতা বলল, হ্যায় না হুজৌর। বহত বড়া বড়া মাঁন্দ হ্যায়।

কওন তরফ।

উস তরফ। বলে, ও তার টাঙ্গির ডাণ্ডা দিয়ে দিক নির্দেশ করে দেখাল।

কিতনা দূর হোগা হিঁয়াসে?

দূরতো হোগা করিব আধা মিল।

শান্টু বলল, এখন ফিরুন ঋজুদা। আপনি বাঁচলে বাবার নাম। কালকে একেবারে ভোরে চলে আসবেন না হয়। তা ছাড়া খালি হাতে কি ভাল্লুককে কথাকলি বা ওড়িশি নেচে বশ করবেন? অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসুন, আজ আমি না হয় ভোগতাকে আমার কাছে রেখে দেব যাতে কাল ভোরে ও আপনার সঙ্গী হতে পারে। এই পাহাড়-জঙ্গলই তো ওদের ঘর বাড়ি—আপনি তো আর ওদের মতো ভাল চিনবেন না এসব।

তা তো বটেই। তবে তাই চলো।

বলে, শান্টু আপাতত প্রাণটা বাঁচাল বলে ওর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ফিরে চললাম আমরা।

ঋজুদা একটু পাইপ খেয়ে আবার শুরু করল।

ভোর চারটেতেই আলো ফোটে এখানে গরমের সময়ে। ঠিক আলো নয়, বের আঁকাশ আলোর আভাসে ভরে যায়। রোদ ওঠে সাড়ে চারটে নাগাদ। এক প চা আর দুটি বিস্কিট খেয়ে ফোরফিফটি-ফোরহান্ড্রেড জেফরি নাম্বার টু াইফেলটি আর পাঁচ রাউন্ড গুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে একটি থার্মোস নিলাম জুম্মানের কাছ থেকে চেয়ে। আর জলের বোতল। আর্মির জলের বোতল। তামার উপরে ফ্লানেল জড়ানো।

যখন পৌঁছলাম পাহাড়ের উপরে তখন দেখি শান্টু রামধানিয়াকে দিয়ে খাঁটি ঘিয়ের গরম পুরি আর আলুর চোখা ভাজিয়েছে গরম গরম আর তেজপাতা এলাচ দেওয়া গোরখপুরি চা।

এত সকালে ব্রেকফাস্ট?

শান্টু বলল, আপনার তো 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'। আমি জানি তা। তাই খেয়ে নিন পেট ভরে। ভোগতাকেও খাইয়ে দিয়েছি। আমি কি যাব?

তুমি গেলে এখানের দক্ষদজ্ঞ কে সামলাবে? তুমি থাকো।

কিষুণকে নিয়ে যান যতদূর জিপ যাবে। তারপর তো হাঁটতেই হবে। জলের বোতলে জল ভরাই ছিল। মারুমারের কুয়োর ফার্স্ট ক্লাস জল। বোতলের উপরের ফ্লানেলটা পুরো ভিজিয়ে নিলাম। যতক্ষণ ঠাণ্ডা থাকে জল। আর থার্মোসে ওই চা-ই নতুন করে করিয়ে ফ্লাস্ক ভর্তি করে দিল শান্টু। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে পড়ার মুহূর্তেই একটা ট্রাক এল নীচ থেকে কঁকিয়ে কেঁদে ফার্স্ট গিয়ারে। মোহনের সব ট্রাকে মা কালীর ছবি থাকে সামনে। দিনে তো দেখা যায়ই, রাতেও ফোটোর দুপাশে আলো জ্বলে বলে দেখা যায়। ড্রাইভার ট্রাকটাকেই থামিয়ে স্টিয়ারিং ছেড়ে নেমে আমার কাছে দৌড়ে এল। বলল, একটু

আগেই চৌকিদারের বউকে আক্রমণ করেছে প্রায় বাংলোর হাতার মধ্যে।

শান্টুও দৌড়ে এল ডেরা থাকে।

কী করা যায়। ভাল্লুক তো আর মাংস খায় না। মাংস খায় বলেই মানুষখেকো বাঘে আক্রান্ত মানুষকে বয়ে নিয়ে যায় আর সে জন্যেই বাঘকে অনুসরণ করা সোজা হয়। এই হতচ্ছাড়া ভাল্লুক গত জন্মের কোন রাগের কারণে একের পর এক মানুষকে আক্রমণ করে যাচ্ছে কে জানে। ড্রাইভার বলল, ও নাকি গাড়ুতে কাল শুনেছে যে কে বা কারা দুটি ভাল্লুকের বাচ্চাকে ধরে নিয়ে এসেছে তিনদিন আগে। এনে বিক্রি করে দিয়েছে এক ব্যাপারির কাছে! তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। প্রথমে ভেবেছিলাম নীচে নেমে যাই। পরে ঠিক করলাম যে না যা ঠিক করেছিলাম তাই করব। যদি এই সব গুহার কোনও একটিতে তার আস্তানা হয়ে থাকে তবে সে ফিরে এসে এই গরমে দিনের বেলাটা হয়তো গুহাতেই থাকবে। রাতে মূল খুঁড়ে, ফল খেয়ে, উইয়ের ঢিপিতে নাক ঢুকিয়ে উইপোকা শুষে খেয়ে সে হয়তো গুহাতেই ফিরবে। তাও আবার ঝিন্টু তার নাকে টাঙ্গি মেরে নাকটাকেও চোট করে দিয়েছে। সন্তানহারা পশুরা সন্তানহারা মানুষীর চেয়েও বিপজ্জনক হয়। তাদের অন্ধ ক্রোধে তারা তখন এমনই করে থাকে। বেচারি। যাই হোক, তার রাগ সঙ্গত জেনেও তাকে তো আরও মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করতে দেওয়া যায় না। কিছু একটা করতেই হয়। কুলি কাবাড়িরাও বলেছে যতক্ষণ না এই ভাল্লুককে মারা না হচ্ছে ততক্ষণ তারা না খেয়ে থাকবে সেওভি আচ্ছা কিন্তু কাজে আসবে না।

কিষুণ বেশিদূর যেতে পারল না। পথ নেই। না, জিপ যেতে পারে এমন পথও নেই। তাকে ডেরাতে ফিরে গিয়ে নাস্তা করতে বলে ভোগতার কাঁধে জলের বোতল আর চায়ের ফ্লাস্ক দিয়ে রাইফেল কাঁধে এগোলাম আমরা। সোয়া কিমি মতো গিয়ে আমরা বিরাট বিরাট কতগুলো গুহার সামনে এসে পৌঁছলাম। ওই দিকে যাবার একটি জানোয়ার চলা পথের হদিশও পেলাম। ওই পথটিই চলে গেছে গুহাগুলোর দিকে। পথে কিছু ঝাঁটিজঙ্গল গরমে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম সেই পথে শজারু, একটি বড় বাঘ, একটি ছোট চিতার পায়ের দাগও আছে। কিন্তু দাগগুলো বেশ পুরনো। প্রায় মুছে গেছে। শুধুমাত্র মস্ত একটি ভাল্লুকের পায়ের দাগই টাটকা। ওখানে আড়াল নিয়ে বসার মতো পাথর-টাথর বিশেষ নেই। গুহার কাছে গিয়ে আড়াল নিয়ে পাথরের উপরে বসা যায় কিন্তু বেলা বাড়লে সেখানে বসা আর উনুনের উপরে বসা একই ব্যাপার হবে। তার চেয়ে ঠিক করলাম একটা বড় মহুয়া গাছে বসব। গাছটা ওই জানোয়ার চলা পথ থেকে একটু দূরেই তবে রাইফেলের পাল্লার মধ্যে। ভোগতাকে জিজ্ঞেস করলাম ওর মতামত কী? দেখলাম, ও-ও আমার সঙ্গে একমত।

ভোগতা তো তরতরিয়ে গাছে উঠতে পারবে তাই ও আগে আমাকে ঠেলেঠুলে তুলে দিল। বেশি উপরে তো বসার দরকার নেই। বেশি উপরে বসলে চারধার দেখারও অসুবিধা। আমি ওঠার পরে ওর হাতের টাঙ্গিটা আমি ধরতেই ভোগতা

উঠে এল। ওকে বললাম, উপরে উঠে সুবিধেমতো ডাল দেখে বসতে। ও ইচ্ছে করলে আমার মাথাতে লাথি মারতে পারে। ওকে বললাম যে ভাল্লুক আসছে দেখলে যেন আমার মাথাতে পায়ের আঙুল দিয়ে খোঁচা মেরে কোন দিক দিয়ে আসছে তা সম্ভব হলে আঙুল দিয়ে দেখায়।

আমরা উঠে বসার পরেই আমাদের পেছন থেকে একটা কোটরা হরিণ হিস্টিরিয়ারোগীর মতো হিক্কা তুলে তুলে ডাকতে লাগল। মিনিট পনেরো পরেই দেখি একটি মাঝারি মাপের চিতাবাঘ দ্রুত পায়ে ওই গুহাগুলোর দিকে যাচ্ছে। তখন সূর্য সবে উঠেছে তবে উঁচু গুহাগুলোর জন্যে গুহার এপাশে তখনও আলো এসে পৌঁছয়নি।

আমার পারমিটে চিতা ছিল। মারলেই মারা যেত কিন্তু তখন ভাল্লুক মারাটা আশু কর্তব্য। এতগুলো মানুষকে সে জখম করেছে। চিতাটি চলে গেল চোখের আড়ালে। রাতে হয়তো মারুমার বা পাহাড়ের ওদিকের ঢালের কোনও গ্রামে গেছিল ছাগল, বাছুর বা কুকুর ধরার জন্যে। কুকুর চিতার বড় প্রিয় খাদ্য।

পাইপটা বের করে রনসনের লাইটার জ্বেলে ধরালাম। ব্রেকফাস্ট আর্লি হলেও যথেষ্ট হেভি হয়েছে। ঘুম পেয়ে যাবে পাইপ না খেলে। বেশিক্ষণ নয় মিনিট পনেরো বসার পরেই ভোগতাচন্দ্র আমার মাথাতে পদাঘাত করল। টুপিটা খুলে ওর দিকে তাকাতেই ও আঙুল দিয়ে যেদিকে দেখাল সেটা আমাদের পেছন দিক। ভাল্লুকটা ওই রাস্তা ধরে আগাগোড়া না এসে শর্টকাট করছিল। কিন্তু আমি তো তাকে দেখতেই পাচ্ছি না তাই রাইফেল পেছনে ঘুরিয়ে মারতেও পারব না। তাই সামনে তাকিয়েই অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভাল্লুকীকে যখন আমি দেখতে পেলাম সে তখন প্রায় গুহাগুলোর নীচে। একটু পরেই চোখের আড়ালে চলে যাবে। তাড়াতাড়িতে রাইফেল তুলেই গুলি করলাম কিন্তু ভাল্লুকের বুক বা কাঁধ কোনও কিছুতেই মারার উপায় ছিল না। তাই তার পিঠ লক্ষ করেই তাড়াতাড়ি গুলি করলাম। হেভি রাইফেলের শব্দে গমগম করে উঠল গুহাগুলো আর শব্দ দৌড়ে গেল মালভূমিতেও। গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে ভাল্লুকটা পড়ে গেল কিন্তু পরক্ষণেই উঠে দৌড় লাগাল গুহাগুলোর দিকে। প্রায় লাফিয়ে নামলাম গাছ থেকে। জলের বোতল আর চায়ের ফ্লাস্ক নিয়ে ভোগতার নামতে একটু সময় লাগবে জেনেই ওকে বললাম, তুমি গাছতলাতেই থাকো। আমি ফিরে আসছি তোমার কাছে। বলেই, রাইফেল কাঁধে নিয়ে দৌড়ে গেলাম ভাল্লুক যেদিকে গেছে সেই দিকে।

যেখানে গুলি খেয়ে ভাল্লুক পড়ে গেছিল তার একটু পর থেকেই ছোপ ছোপ রক্ত দেখা গেল, তাড়াতাড়িতে মারার জন্যেই ভাল্লুকের মেরুদণ্ডতে লাগেনি গুলি। লাগলে সে আর উঠে দাঁড়াতে পারত না। রক্তের স্রোতে ভাল্লুকের যাত্রাপথ চিনতে আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। কিন্তু উপরে উঠে দেখলাম ভাল্লুক গুহার মধ্যে ঢুকে গেছে।

আহত ভাল্লুক এবং এমন অতিকায় ভাল্লুক যাঁরাই অনুসরণ করে কখনও মেরেছেন তাঁরাই জানবেন সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা। ফোরফিফটি-ফোরহান্ড্রেডের সফটনোজড গুলির মার। ভাল্লুক বাঁচবে না। ওই গুহার মধ্যেই মরে পড়ে থাকবে কিন্তু কোনও ভাল শিকারিই আহত জানোয়ারের যন্ত্রণা প্রলম্বিত করতে চান না, চাওয়াটা অমানুষিক অপরাধও। যেখানে উপায় থাকে না অথবা জানোয়ারের হদিশ না পাওয়া যায় বা রাতের বেলা চোট করা হয় সেখানে অন্য কথা।

গুহাটার মুখে পৌঁছে মনে হল একটা টর্চ আনা খুবই জরুরি ছিল। শিকারে গিয়ে জলের বোতল আর টর্চ শিকারির সব সময়ের সঙ্গী হওয়া উচিত। একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ সঙ্গে থাকলে ভোগতা আলো হাতে আমার পাশে থাকলে ওই অন্ধকার গুহাতে তখনই ঢোকা যেত। কিন্তু তা যখন আনিনি তখন গুহামুখের এক পাশে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখলাম। পনেরো মিনিট রক্তক্ষরণ হবার পরে সে যখন একটু দুর্বল হয়ে যাবে তখনই ঢুকব ঠিক করলাম। মিনিট পাঁচেক হয়েছে এমন সময়ে পেছনে কোনও কিছুর পদশব্দ পেলাম। তাকিয়ে দেখি ভোগতা শান্টুর টাঙ্গিটা হাতে নিয়ে এসে হাজির। সে আমাকে ইশারাতে তার পেছনে আসতে বলে তরতরিয়ে গুহাটার মাথাতে চড়ে গেল। আমিও উঠলাম ওর পেছন পেছন। গুহাটা কত বড়, কত গভীর এবং তার অন্য কোনও মুখ আছে কি নেই কিছুই জানি না। আমি জানি না কিন্তু ভোগতা জানে। ছেলেবেলায় সে হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে এই গুহার মধ্যেই খেলা করেছে। বড়বেলাতে তির-ধনুক নিয়ে শিকারও করেছে।

গুহার মাথার উপর দিয়ে প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে বোঝা গেল যে গুহার পেছনে একটা মুখ আছে এবং সেটা বেশ বড়। যে মুখে আমি গিয়ে পৌঁছেছিলাম সেটা শুধু সরু বলেই নয়, গুহাটার ভিতরটা নিশ্চয়ই 'L' শেপ-এর, তাই ওদিক দিয়ে অন্ধকার দেখাচ্ছিল।

ভোগতা বাঁদরের মতো আবার তরতরিয়ে নীচে নামল। তার পেছনে পেছনে আমি। আমি নামামাত্রই গুহার ভিতর থেকে হুংকার দিয়ে ভাল্লুকটা বেরিয়ে এসে পেছনের দুপায়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং সামনের দু হাত ছুড়তে ছুড়তে মুখে থুথু ছিটোতে ছিটোতে এগিয়ে এসে ভোগতাকে প্রায় ধরে ফেলল। ভোগতা তার টাঙ্গি তুলল মাথার উপরে কিন্তু আমি তাকে এক ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ভাল্লুকের বুক লক্ষ করে গুলি করলাম। তিন-চারহাত দূর থেকে। সে ঘুরে পড়ে যেতে যেতে তার গলা লক্ষ করে আরেকটা গুলি করলাম। আর তারপরেই কাণ্ডটা ঘটল। মানুষ যেমন করে যন্ত্রণাতে কাঁদে, ভাল্লুকটা ঠিক তেমনি করে কাঁদতে লাগল শুয়ে শুয়ে। তবে বেশিক্ষণ তার কাঁদতে হল না। কান্না স্তিমিত হতে হতে থেমে গেল একেবারে।

অনেক শিকারির মুখে ভাল্লুকের এই মানুষের মতো কান্নার কথা শুনেছিলাম কিন্তু তার আগে বিভিন্ন রাজ্যে চারটে ভাল্লুক মারলেও কোনও ভাল্লুকই মরার আগে এমন করে কাঁদেনি।

মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। বেচারি সন্তানহারা মা। তার দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাদের যে সব মানুষে নিয়ে গেল তাদের কোনও শাস্তি হল না। কিন্তু মানুষের আইনে তাকেই জীবন দিতে হল।

ভোগতা বলল, চায়ে হিঁয়া পিজিয়েগা হুজৌর?

আমি মাথা নাড়লাম। তারপর মাথার টুপিটা খুলে মহুয়া গাছটার দিকে রওনা হলাম। আবার সেই গুহার মাথায় চড়ে এবং নেমে। ভোগতা গুহাটা সম্বন্ধে সব জানত বলে, নইলে অন্ধকারে আমি একা রাইফেল নিয়ে ঢুকলে ভাল্লুক অবশ্যই আমাকে আগে মেরে তবে মরত।

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে খেলাম এবং ভোগতাকেও ফ্লাস্কের ঢাকনি ভরে চা দিলাম। ভোগতা কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, আপকি ওহি মহকতা-হুয়ে তামাকু জারা দিজিয়েগা সাব?

কী করবে?

খইনির মতো হাতে মেরে খাব।

ওকে গোল্ড ব্লক টোব্যাকো দিলাম ওর হাতের তেলোতে। চাটা চার চুমুকে শেষ করে সে বলল, আপ তামাকু পিজিয়ে ম্যায় যাতা হ্যায় শান্টুবাবু ঔর সবকৌঈকো লানে কি লিয়ে।

যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আপ ক্যামিরা নেই লেতে আয়া হুজৌর? ফোটো নেহি খিচাইয়েগা?

আমি রাগের গলাতে বললাম, নেহি।

জুম্মান এসে বলল, খনা বন গ্যয়া হুজৌর। লাগা দুঁ ক্যা?

আমরা, মানে, আমি ভটকাই আর তিতির একই সঙ্গে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি দেড়টা বেজে গেছে।

ভটকাই বলল, থ্যাঙ্ক ইউ ঋজুদা।

আমি আর তিতিরও বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ ইনডিড।

ঋজুদার সঙ্গে,
রাজডেরোয়ায়

যাক। এতদিন বাদে আমার ইচ্ছা সফল হল।

ভটকাই বলল।

তিতির বলল, আমার কিন্তু ভারী মন খারাপ লাগছে। আজকাল সব জায়গাতেই তোমরা আমাকে না নিয়েই যাচ্ছ রুদ্র।

আমি বললাম, দুঃখটা তো আমার। তুমি আমার আফ্রিকার পার্টনার। তখন এই ভটকাই ছিল কোথায়? আফ্রিকার রুআহার অভিযানের শেষে আমি ঋজুদার কাছে ভটকাইয়ের হয়ে ওভাবে হাতে পায়ে ধরে উমেদারি না করলে ঋজুদা কি কোনওদিনও নিত সঙ্গে ভটকাইকে? তুমি তো সাক্ষী আছ তিতির। আর আজকাল তুমি নিজেই সঙ্গে যেতে না-পারায় ক্রমেই এই বেঁটে-বক্কেশ্বর মাথায় চড়ে বসছে। তোমার ধারণা নেই, কী বাড় বেড়েছে ওর। আমার মতো সম্ভবত আর কেউই বোঝে না যে বাঙালির ভাল করতে নেই। কখনওই।

ভটকাই মনোযোগ দিয়ে একটা বেগনে-রঙা ডটপেনের সামনেটা ওর বাঁ কানের ফুটোতে ঢুকিয়ে ডান চোখ বন্ধ করে কান চুলকোচ্ছিল।

এই বাজে অভ্যেস থেকে আমরা কেউই ওকে নড়াতে পারিনি, এমনকী ঋজুদার বকুনিও পারেনি।

ভটকাই ডটপেনটা কান থেকে বের করে বলল, আরে ক্যালি লাগে, ক্যালি! আমার ক্যালি না থাকলে কি আর মিস্টার ঋজু বোস এমনি এমনি আমাকে এত ইম্পর্ট্যান্স দিত। আমার ক্যালিটা অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো কলজে তো তোদের নেই! তাই...

এমন সময়ে ঋজুদা বসবার ঘরে এল। শোবার ঘরে গেছিল ই-মেইল দেখতে। বলল, কীসের ক্যালি? কার ক্যালি?

ভটকাই চকিতে কথা ঘুরিয়ে বলল, ক্যালি নয় কালী।

কালী?

হ্যাঁ, ট্রাঙ্গুলার পার্কের কাছে ডাকাতে কালীর কাছে পুজো দিয়ে আসার কথা বলছিল রুদ্র। কালই তো সকালে আমাদের যাওয়া। নাকি?

আমরা ওর উপস্থিত কুবুদ্ধিতে সকলেই একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

ঋজুদা বলল, হলটা কী?

ভটকাই বলল, 'গুরুজি চিতং
মেরা সারংমে বাজিছে
নয়া নয়া রং।'

আবারও হাসির হররা উঠল।

ঋজুদা বলল, দোষ তো আমারই। ওকে যে এতখানি বাড়তে দিয়েছি সে তো আমারই দোষ। ও এখন আমাকে নিয়েও ইয়ার্কি মারতে শুরু করেছে।

আমি বললাম, তুমি শুধু পারমিশানটা দাও একবার, তারপর দেখ হাউ ডু আই কাট হিম টু হিজ ওন সাইজ।

ঋজুদা বলল, হবে, হবে। যথাসময়ে সব হবে।

তারপর বলল, এ কী! তোরা চা খাসনি? নাঃ গদাধরদা সত্যিই বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।

তিতির বলল, না ঋজুকাকা। গদাধরদার দোষ নেই। ট্রেতে সাজিয়ে গুছিয়ে গদাধরদা তো চা নিয়েই এসেছিল। কিন্তু তোমার নতুন চেলার জিভে এই সাজ কোম্পানির বিস্কিট বিস...কুলোচ্ছে না।

সে কী! এত ভাল বিস্কিট তৈরি করেছেন বলে আমি তো মিঃ পালকে কনগ্র্যাচুলেট করে ফোন করেছি আজ সকালেই। ছেলেবেলাতে খাওয়া হান্টলিপামার বিস্কিটের মতো স্বাদ-গন্ধ একেবারে। ব্রিটানিয়াকে রীতিমতো ঘেবড়ে দিয়েছে। সেই বিস্কিটও তোর ভাল লাগল না। কী রে ভটকাই?

লাগবে কী করে। লেড়ো আর ভুসভুসি বিস্কিট খাওয়া যার অভ্যেস, তিতিরের কুকুর ম্যান্ডি যা খায় আর কী, তার ভাল বিস্কিট রুচবে কী করে!

ঋজুদা ঝগড়া আর বাড়াতে না দিয়ে বলল, ব্যাপারটা খোলসা করে বলই না?

অন্যায় কী করেছি? আমি বাঙালির ছেলে, বাঙালি খাওয়া-দাওয়াই আমার পছন্দ।

এই 'সাজ' বিস্কিট কোম্পানিও তো বাঙালিরই!

আমি বললাম।

ব্যাপার হল, তিতির বলল ব্যাখ্যা করে, ভটকাই গদাধরদার কাছে লাউভাজা খেতে চেয়েছে। শুধু লাউভাজাই নয়, ক্র্যাম দিয়ে তার মধ্যে পোস্ত আর কাঁচালঙ্কা কুচি ফেলে সরষের তেলে কড়া করে ডিপ-ফ্রায়েড লাউভাজার অর্ডার দিয়ে সে বসে আছে। লাউ ভাজা না হলে চা খাবে না। আমাদেরও খেতে দেবে না।

তা খাকই না বাবা। ও গদাধরদাকে নিজের শাশুড়িকে মতো আপন মনে করে যদি একটু-আধটু আবদার করেই, তোদের তাতে গায়ে লাগে কেন?

তিতির বলল, তা ঠিক রুদ্র। যার জীবনে সত্যিকারের শাশুড়ি কোনওদিন হবে

না, সে না হয় গদাধরদাকে দিয়েই শখ পূরণ করুক। একটু উদার হওয়াই না হয় যাক।

ঋজুদা বলল, এক নতুন ফ্যাচাং হল। বুঝলি।

কী?

আমরা সকলেই একসঙ্গে বললাম।

তোরা আসার একটু আগেই কাজমি সাহেব ফ্যাক্স করেছেন।

কাজমি সাহেব কে?

এস ই এইচ কাজমি।

হ্যাঁ। কিন্তু কে তিনি?

আরে বহু দিন বিহারের পালামৌ সাউথ ডিভিশনের ডি এফ ও ছিলেন। এখন উনিই তো হাজারিবাগের ডি এফ ও। কী করে জানতে পেরেছেন জানি না যে আমরা রাজডেরোয়ার জঙ্গলে হারহাদ বাংলো বুক করেছি, সম্ভবত ফরেস্ট অফিস থেকেই জেনেছেন, জেনেই এই ফ্যাক্স। সত্যি! কোথাও যে গিয়ে নিরিবিলি ছুটি কাটাব তা বোধ হয় আমার কুষ্টিতে লেখেনি। মনে আছে রুদ্র, এই হাজারিবাগ জেলারই মুলিমালোঁয়াতে বেড়াতে গিয়ে 'অ্যালবিনো' বাঘের ঝক্কিতে পড়ার কথা?

মনে আবার নেই?

কী হয়েছে ঋজুকাকা?

আরে রাজডেরোয়াতে নাকি চোরাশিকারি আর কাঠচোরেদের দৌরাত্ম্য ভীষণই বেড়েছে। আমি যখন সেখানেই যাচ্ছি, আমার সাহায্য চান উনি।

তোমাকে চেনেন উনি?

ঋজুদা হেসে বলল, হ্যাঁ চেনেন। সেই প্রথম পরিচয়ের গল্প বলব এখন তোদের পরে। পালামৌতেই হয়েছিল প্রথম পরিচয়।

তা এতে ফ্যাচাংটা কীসের?

না, ভেবেছিলাম খালি হাতে দু' হাত দু'দিকে ঝুলিয়ে আরামে যাব আর কুসুমডা থেকে আসোয়া বা নাগেশ্বরোয়ার কোনও পোতাকে জিপ পাঠিয়ে আনিয়ে ভাল করে সর্ষপ তৈল মর্দন করে শরীরটাকে একটু জুতসই করে নেব, তা না, কী ঝামেলা।

কী নেব সঙ্গে?

আমি বললাম।

ভটকাই বলল, খালি হাতে গেলে হয় না? তুমি বলবে শেয়াল পণ্ডিতের মতো, 'ঝপাংটা দাও এখুনি ওকে ভতাং করছি।'

ঋজুদা বলল, সত্যি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনি বই'য়ের কোনও বিকল্প পৃথিবীর সাহিত্যেই হয়তো নেই, অথচ উনি বাংলা ভাষায় লিখতেন শুধুমাত্র সেই কারণেই তাঁর প্রাপ্যর কিছুই পেলেন না। মাঝে মাঝে ভাবি, এত

পয়সাওয়ালা, খেতাবওয়ালা, ডিগ্রি আর প্রাইজওয়ালা বাঙালি হলেন আজ পর্যন্ত অথচ বাংলা বই অনুবাদ করে তা পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও কেউই করলেন না। ইচ্ছে হয় ঝপাংটা নিয়ে তাদেরই ভতাং করে দিয়ে আসি।

তোর ডাবল-ব্যারেল শট গানটা নিবি। পয়েন্ট টু টু পিস্তলটাও। জাইস-এর বাইনাকুলারটা। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। আমেরিকান। বন্ড-এর, আছে তো? না সেটিকেও খুইয়েছ?

এখন তো কাঁদলেও আর পাওয়া যাবে না ওসব জিনিস।

ভটকাই ফুট কাটল।

প্রচণ্ড রাগ হল আমার। হাবভাব তার এমনই যেন, সে এসব বিষয়ে সবজান্তা। দু'দিনের বৈরাগী, ভাতকে কয় অন্ন।

আমি বললাম, এখন ওসব অ্যান্টিক হয়ে গেছে। এখন আলট্রা-ভায়োলেট বাইনাকুলার। ঋজুদার আছে। অবশ্য স্পেশাল পারমিশান আছে বলেই আছে। নইলে তোর-আমার কাছে পেলে আমাদের সঞ্জয় খান করে দেবে।

মানে?

মানে, পুরে দেবে গারদে?

এ দূরবিন পেয়েছিল সঞ্জয় খানের বাড়িতে?

দূরবিন নয় ইডিয়ট তার বাড়িতে এ কে ফর্টিসেভেন রাইফেল পেয়েছিল। খবরের কাগজটাও কি পড়িস না?

এখন আর কোনও খবরের কাগজ আছে নাকি? সবই তো বিজ্ঞাপনের কাগজ, Admag। অনেকে বলেন, কী করব! আমাদের 'অব্যেস' হয়ে গেছে। সকালে উঠে না পড়লে বাদরুমই...। তা আমি তাঁদের বলি, ছাইভস্ম পড়ে মেজাজ খারাপ করার দরকার কী? তার চেয়ে ইসবগুল, মানে, ভুসি, খেলেই হয়। সস্তাও পড়বে অনেক।

ওই সবই লিস্টেড আর্টিকেল। প্রহিবিটেড। বেআইনিভাবে কেউ রাখলেই কালাপানি।

দূরবিন আবার দোষ করে কী করে?

করে। কারণ ওই দূরবিন দিয়ে অমাবস্যার রাতেও স্পষ্ট দেখা যায়।

ইস্। আমার যদি একটা থাকত রে!

ভটকাই প্রচণ্ড আপসোসের সঙ্গে বলল।

কী করতিস?

আরে! পাশের বাড়ির ভুতোদের রান্না করে যে লোকটা, সোঁদরবনের হরিদাস, সে বাড়ির কাজের মেয়ে, মেদিনীপুরের ডেবরার সৌদামিনীকে ছাদে দাঁড়িয়ে...

নাঃ। কোনওই মানে হয় না। এই জন্যেই তোর রেজাল্ট এরকম খারাপ হয়েছে এবারে। দাঁড়া। তোর মাকে ঘটনাটা বলতে হবে। হরিদাস অ্যান্ড সৌদামিনী দেখলে নাম্বার পাবে কী করে পরীক্ষায়! তুই তার চেয়ে গদাধরদার আর্টিকেলড

ক্লার্ক হয়ে যা। রান্না করাটাও আজকাল এ দেশে ফালতু প্রফেশন নয়।

আমি বললাম।

তোরা আজকাল বড্ড আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলছিস। বড় বেশি ট্রিভিয়াল। তোদের চরিত্রেরও দেখছি অনেক অবনতি হয়েছে।

তারপরই বলল, আমাকে একবার বেরোতে হবে। লাউভাজা হওয়া অবধি অপেক্ষা করলে চলবে না।

তিতির বলল, ভটকাইকে, দেখলে তো তোমার জন্যে ঋজুদার চা-টাও খাওয়া হল না।

ঋজুদা বলল, ছাড় তো। যেখানে যাচ্ছি সেখানেই চা খেয়ে নেব। শুনে রাখ যা বললাম। সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের ভাষাতে যার যার 'মাল জান' সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যাবি। ভেস্টিব্যুল কটায় দেবে? কত নাম্বার প্ল্যাটফর্মে দেবে? তা জেনে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করবি। আর আমি যদি আগেই পৌঁছে যাই তবে পার্কিং লট-এ গাড়ি খুঁজে নিবি। গাড়িতেই এসে তখন বসবি দয়া করে। ট্রেন লাগলে তারপর না হয় একসঙ্গেই ট্রেনে ওঠা যাবে।

কোডারমাতে কটায় পৌঁছব আমরা ঋজুদা? সেদিনই পৌঁছব তো!

অবশ্যই কালকেই। তবে ঠিক কটায় জানি না। বিকেল-বিকেলই হবে।

তারপর বলল, গাড়িতে দুপুরে খাওয়ার জন্যে গদাধরদা হট-কেসে খাবার দিয়ে দেবে। শুকনো শুকনো কিছু দিতে বলিস। তোদের যা খুশি। বেতের বাস্কেটে নন-ব্রেকেবল ডিশ, কাঁটা, চামচ, ন্যাপকিন সব গুছিয়ে দিতে বলিস গদাধরকে। যদিও সে জানেই। আর জলের গ্লাসও। পেপার ন্যাপকিন বেশি করে দিতে বলিস, জঙ্গলে কাজে লাগবে। কী খাবার নিবি, তা রুদ্র তুই আর ভটকাই মিলে ঠিক করে দিস আজই চলে যাওয়ার আগে।

তারপর বলল, চল তিতির, তোকে নামিয়ে দেব। তোদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছি।

তুমি কি একা একা আমাদের ফেলে ডাকাতে কালীর কাছে পুজো দিতে যাচ্ছ নাকি? ভটকাই উদ্বিগ্ন হয়ে বলল।

ঋজুদা বলল, তোর বিনাশের জন্যে প্রার্থনা করতে কি তোকেই সঙ্গে নিয়ে যাব?

ভটকাই অপ্রতিভ হয়ে মুখ নামিয়ে নিল। আমি আর তিতির জোরে হেসে উঠলাম।

ঋজুদা বলল, তুই সত্যিই রুদ্র আর তিতিরকে সব সময়েই সুপারসিড করতে চাস আজকাল।

নিজে যারে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে, বড় সেই হয়; পড়িসনি ছোটবেলায়?

আমি তো এখনও ছোটই আছি ঋজুদা।

বলে, ভটকাই রীতিমতো সারেন্ডার করল।

অনেক অনেকদিন পরে ভটকাইকে ঋজুদা একটু টাইট দেওয়ায় খুব আনন্দ হল আমাদের।

কোডারমা স্টেশনে যখন আমরা ট্রেন থেকে নামলাম তখন বিকেল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। তবে সন্ধে হতেও অনেক দেরি। ট্রেনটা চলে গেল। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ঋজুদা বলল, ওই যে অমলবাবু। উনি কিন্তু খুবই পীড়াপীড়ি করবেন রাতটা তিলাইয়ার দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের বাংলোতে কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে। ডি ভি সি-র ইঞ্জিনিয়ার সেন সাহেবেরও তাই ইচ্ছে। কিন্তু এপ্রিলের গোড়ার একটি দিন বা রাতও জঙ্গলের এত কাছে এসেও জঙ্গলে না কাটাবার মানে হয় না। আসাই তো মাত্র তিন দিনের কড়ারে।

ভটকাই বলল, তিলাইয়া ড্যামের ওপরে বাংলোগুলো শুনেছি দারুণ।

তোকে কে বলল?

আমার মেজোমামার সেজো শালি ফুটুস দিদি বিয়ের পর হানিমুন করতে এসেছিল এখানে।

তা তুইও যখন হানিমুন করতে আসবি থাকিস না হয় এখানে।

ভটকাইয়ের 'এতা কাব, ওতা কাব, থব খাব' অ্যাটিচুডটার কানে থাপ্পড় মারল ঋজুদা। খুব খুশি হলাম আমি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, অমলবাবু কে?

অমলবাবু এখানের পোস্টমাস্টার। আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যখন এলাহাবাদে নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে গেছিলাম তখন। খুব সাহিত্যপ্রীতি ভদ্রলোকের। নিজেও লেখালেখি করেন। হাজারিবাগেরই বাসিন্দা।

তা এখানে কেন উনি?

বা, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি। এখন এখানে বদলি হয়ে এসেছেন।

তারপর বলল, যেখানে এখন তিলাইয়া বাঁধ হয়েছে, মস্ত জলাধার তারই পাশে ছিল একটি গ্রাম। তার একাংশ অবশ্য আছে এখনও। নাম ঝুমরি তিলাইয়া।

কী নাম?

ভটকাই শুধল।

ঝুমরি তিলাইয়া।

বাঃ! কী সুন্দর নাম!

'ঝুমকা গিরা রে। ঝুমকা গিরা রে। ঝুমকা! ঝুমকা! ঝুমকা গিরা রে/
বেরিলিকা বাজারমে ঝুমকা গিরা রে।'

এ আবার কী গান! হিন্দি সিনেমার পোকা হয়েছিস দেখছি।

হায়। হায়। ঋজুদা। এ কী আজকের গান। এ গান যখন বাজারে আসে তখন আমি হামাগুড়ি দিচ্ছি।

তুমি তখনও হামাগুড়ি দিচ্ছ।

আমি হেসে উঠলাম। সঙ্গে ঋজুদাও।

নমস্কার। ধুতি ও সাদা ফুল শার্ট পরা অমলবাবু হাত জোড় করে নমস্কার করলেন ঋজুদাকে। ঋজুদাও প্রতিনমস্কার করল।

থাকবেন তো একটা রাত। আজ শুক্লপক্ষের সপ্তমী। চৈত্র মাস। চাঁদটা যখন উঠবে তখন যা সুন্দর দেখাবে না তিলাইয়ার বাঁধের জল। লক্ষ লক্ষ রুপোর সাপ কিলবিল করবে।

ঋজুদা বলল, আমি যদি একা আসতাম তা হলে এখানেই ডেরা গাড়তাম। তিলাইয়া বাঁধের মাছ, রাতের রূপ, নৌকা চড়ে বেড়ানো। কিন্তু আমি তো এবারে মাইনরিটি। এদের ইচ্ছা সোজা জঙ্গলে যাওয়া। তা ছাড়া কাজমি সাহেব সেলাম দিয়েছেন। রাজডেরোয়াতে নাকি চোরাশিকারিরা হুজ্জত করছে। জানি না, তারা কী মারতে এসেছে। রাজডেরোয়াতে চিতল হরিণ, চিতা, ক্বচিৎ শম্বর, কিছু শুয়োর আর বেশ কিছু নীলগাই ছাড়া আর কী প্রাণী আছে? বাঘ তো আমরা ছেলেবেলাতে যা দেখেছি ওই। তারপরে খুব কম মানুষই বাঘ দেখেছেন ওখানে।

তা ঠিক। তবে চোরাশিকারিরাই জানে কী মারতে আসে তারা। কাঠশিকার করতেও আসতে পারে।

তা ঠিক। গেলেই জানা যাবে।

আপনারা উঠবেন কি শালবনিতে?

না, না। আমরা হারহাদ নদীর ওপরে যে ছোট্ট বাংলোটা আছে সেই হারহাদ বাংলোতেই উঠব।

রাস্তা কি ভাল হয়েছে? আমরা একবার এক বাসন্তী পূর্ণিমাতে পিকনিক করতে গেছিলাম। ট্রাকে করে। ট্রাকের অ্যাক্সেলই ভেঙে গেল।

হেসে ফেলল ঋজুদা, অমলবাবুর কথা শুনে।

তারপর বলল, শুনেছি সাম্প্রতিক অতীতে হাজারিবাগ থেকে হারহাদে ঢোকার একটা রাস্তা হয়েছে। সেই নন্দী-ভৃঙ্গীর মতো পাথরগুলো পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় না আর এখন।

তাই? যদি তাও হয়ে থাকে, তা হলেও জঙ্গলের ভিতরের পথ দিয়ে না গেলে তো হারহাদে যাওয়ার মজাই নেই।

ঠিক তাই। তবে আমাদের তো ছখানি পা আছে। হেঁটেই ঘোরাফেরা করব। তা ছাড়া কাজমি সাহেব একটা জিপেরও বন্দোবস্ত করেছেন, সেটি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে নদীর পাশেই মজুত থাকবে আমাদের জন্যে। আজকে যাওয়ার সময় অবশ্য নতুন রাস্তা দিয়েই যাব।

আপনাদের জন্যে একটা বড় রুইমাছ বন্দোবস্ত করে রেখেছিলাম। যাবেনই যখন তখন সঙ্গেই নিয়ে যান। জঙ্গলে তো আর মাছ পাবেন না।

অমলবাবু বললেন।

না, তা পাব না। কিন্তু কী দরকার ছিল? সব জায়গাতে যে সব কিছু পেতেই হবে তার কী মানে আছে।

তা নেই। তবু, আমাদের আনন্দ বলেও তো একটা ব্যাপার আছে।

কত দাম পড়েছে?

ঋজুদা হিপ পকেট থেকে পার্স বের করে বলল।

ছিঃ ছিঃ ঋজুবাবু। অমন করে লজ্জা দেবেন না। আপনার চেনা এই রুদ্র রায়ের লেখা 'ঋজুদা-কাহিনী'গুলি তো এখানের এবং রেললাইনের ওপারের কোডারমা ও শিবসাগরের যত বাঙালি পরিবার আছে তাদের বড়-মেজো-ছোটরা সকলেই গোগ্রাসে গেলে। কথা ছিল, কাল সকালে আপনাকে একটা সংবর্ধনা দেবেন ওঁরা সকলে মিলে। ওঁরাই এই মাছ কিনেছেন।

দেখেছিস!

ঋজুদা লজ্জা, ভালা লাগা, কৃতজ্ঞতা, বিনয় সব কিছু মিলিয়ে একটা গুট্‌কা ক্করে তা গিলে বলল!

তারপর বলল, এই রুদ্র রায়ই আমার এই সব বিড়ম্বনার কারণ। ওকে এবারে এইসব লেখালেখি বন্ধ করতে বলতে হবে।

ছিঃ। ছিঃ। অমন বলবেন না! তাহলে আমরা সকলেই বড় বঞ্চিত হব। তা ছাড়া রুদ্র রায়ের 'ঋজুদা-কাহিনী' পড়ে বাড়ি বসে আমরা কত জায়গাতে যেতে পারি, কত অ্যাডভেঞ্চারের শরিক হই। তা ছাড়া রুদ্র রায়ের লেখা তো গল্পের গোরু গাছে চড়ার মতো নয়। প্রত্যেকটি জায়গার ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক পরিবেশের এবং প্রতিবেশের বর্ণনা এমন নিখুঁত এবং সত্যনির্ভর থাকে যে, আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু শেখাও যায়। বাংলাতে যাঁরা অ্যাডভেঞ্চার বা গোয়েন্দা কাহিনী বা শিকার কাহিনী এতদিন লিখে এসেছেন এবং আজও লেখেন তাঁদের মধ্যে নিরানব্বই ভাগই বন্দুকের সঙ্গে রাইফেল, পিস্তলের সঙ্গে রিভলভারের তফাতই জানেন না। তাঁদের গোয়েন্দারা 'রিভলভার' হাতে মঞ্চে ঢোকেন এবং পরক্ষণেই 'কোথা হইতে কী হইয়া যায়'। তাঁদের হাতের 'পিস্তল' গর্জাইয়া ওঠে। যে লেখক যে বিষয় নিয়ে লিখবেন সেই বিষয় সম্বন্ধে ফার্স্ট-হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স না থাকলে তা না লেখাই ভাল। কল্পনা দিয়ে কি সব ঘাটতির পূরণ হয়? তাই যদি হত, তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঐকতান' কবিতাতে লিখতেন না তাঁর আক্ষেপের কথা। তাঁর মতো যাঁর কল্পনাশক্তি ছিল তাঁর পক্ষে কি যা তিনি ফার্স্ট-হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সে জানতেন না তা নিয়ে লিখতে পারতেন না? খুবই পারতেন। কিন্তু তাঁর মতো প্রতিভারও সেই সংযম জ্ঞানটি ছিল।

ঋজুদা বলল, আপনি সাহিত্যবোদ্ধা, নিজে লেখক, কত কী জানেন আপনি! সত্যি! দেখ রুদ্র, কত কী শেখার আছে অমলবাবুর কাছ থেকে।

একটু চুপ করে থেকে অমলবাবু বললেন, অবশ্যই লিখে যাবেন রুদ্রবাবু। কারণ অভিজ্ঞতার কোনও বিকল্প নেই। আপনি লেখেন বলেই না আমরা

ভারতবর্ষের কত না রাজ্যর কত বন-জঙ্গল-নদী-পাহাড়ের কথা তো বটেই, ভারতের বাইরেরও, যেমন আফ্রিকার, স্যেশেলস-এর পটভূমিতেও নানা লেখা পড়তে পাই।

ঋজুদা বলল, ওকে মানা করি আমি ওসব লিখতে।

কেন ঋজুবাবু?

অমল সেনগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন।

আরে আমাদের নিজের দেশের মতো বড়, বিচিত্র ও সুন্দর দেশ কি আর পৃথিবীতে আছে অমলবাবু? নিজের দেশের কথাই বেশি করে লিখে দেশের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা জরুরি। আমরা নিজের দেশ, নিজের দেশের মানুষ, বন, পাহাড়, নদীনালাকে জানি না বলেই অশিক্ষিত, নতুন এবং পুরনো বড়লোক হামবাগদের মতো কথায় কথায় বিদেশে দৌড়ে যাই, ফিরে এসে গরিব আত্মীয়-বন্ধুদের নানা গল্প করে তাদের মন খারাপ করে দেব বলে। যে মানুষ বিদেশে গিয়ে নিজের দেশের সঙ্গে সে দেশের তুলনাই না করতে পারেন তাঁর বিদেশ যাওয়াই তো বৃথা। আমার তো তাই মনে হয় অন্তত।

ঠিকই।

তারপর অমলবাবু বললেন, চলুন, কোন গাড়িটা আপনাদের?

সে তো আমরাই জানি না। চলুন ওদিকে যাই, গেলেই জানা যাবে।

একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর পাঠিয়েছিল আমাদের জন্যে নাজিম সাহেবের ছোট ছেলে। এম এ পাস। সৈয়দ মহম্মদ জামালুদ্দিন তার নাম। হাজারিবাগে ওঁদের জুতো এবং গাদা বন্দুকের দোকান আছে। নাজিম সাহেব ঋজুদার খুবই কাছের মানুষ ছিলেন। নওয়াদাতে বাড়ি ছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, নওয়াদা জায়গাটা কোথায় ঋজুদা?

রেললাইনের ওপারে কোডারমা। কোডারমা অঞ্চল অভ্র খাদানের জন্যে বিখ্যাত। এখনও অনেক অভ্রর কোম্পানি আছে। রাজঘড়িয়া, সামন্ত এই সব পরিবার, এরা সব বিখ্যাত পরিবার এই ব্যবসায়ে। গিরিডিতেও তাই ছিল। কোডারমা থেকে বিখ্যাত রজৌলির ঘাট পেরিয়ে পাহাড়তলিতে পৌঁছলে পড়বে শিঙ্গার। শিঙ্গারের পরে বিহার শরিফ, নওয়াদা। আবার তারই কাছে জৈনদের বিখ্যাত মন্দির জলের ওপরে, পাওয়াপুরি। দেখবার মতো। সারা ভারতবর্ষে হিন্দু, মসুলমান, জৈন, খ্রিস্টান, শিখ, পারসি, হাজারো আদিবাসী সুখে একই সঙ্গে চিরদিন বাস করে এসেছিল। জিন্না সাহেব অ্যান্ড কোম্পানির মাথাতে যে কী পোকা কামড়াল—মুসলমানদের জন্যে আলাদা দেশ সৃষ্টি করার জেদ কেন যে ধরলেন তাঁরা, তা তাঁরাই জানেন। যেদিন থেকে ভারত ভাগ হল ধর্মের ভিত্তিতে সেদিন থেকেই তার কপাল পুড়ল। এখন যদি ভারতে বসবাসকারী মুসলমানেরা আবারও অন্যায়ভাবে সেই দাবি তোলেন, তবে সে দাবি বরদাস্ত করে নেওয়াটা

চরম কাপুরুষতারই নামান্তর হবে।

আমি চুপ করে রইলাম। এসব আমার মাথায় ঢোকে না। তবে কাপুরুষ, সে যে বিশ্বাসে ভর বা ভর-না-করেই কাপুরুষ হোক না কেন, তাকে আমি ঘৃণা করি। যে মানুষের বুকে সাহস নেই, যার মাথা সটান মেরুদণ্ডের ওপরে বসানো নেই তাকে আমি মানুষ বলে গণ্য করি না, মনুষ্যেতর প্রাণী বলে গণ্য করি। সেই মানুষ বড় সংস্থার চাকুরেই হোক বা সাহিত্যিক বা সাংবাদিক। ঘৃণ্য যে, সে সব সময়েই ঘৃণ্য।

ভটকাই বলল, তুমি অভ্র খাদান দেখেছ কখনও ঋজুদা?

ঋজুদা বলল, সে ব্যাপারে আমি বুক বাজিয়ে বলতে পারি যে সোনা-রুপোর খনি ছাড়া আমি সব খাদানই দেখেছি। কয়লা খাদান, সবরকমের, ইনক্লাইন মাইন, ওপেন-কাস্ট মাইন, পশ্চিমবঙ্গে, বিহারে, আসামে, মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গাতে তামার খনি, ঘাটশিলাতে, মালাঞ্জখণ্ডে, লোহার খনি, বিহারের সিংভূম জেলাতে, লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের খনি, ওড়িশার সুন্দরগড় জেলাতে, বক্সাইটের খনি বিহারের লোহারডাগা, মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টকে, আর অভ্র খনি এই অঞ্চলে। পৃথিবীর গভীরতম অভ্র খনি ছিল রজৌলির ঘাটে। ক্রিশ্চিয়ান মাইকা কোম্পানির। কোডারমা থেকে নওয়াদা যাবার পথে ওই ঘাটের প্রায় মাথায়, ব্যাসাল্ট আর কোয়ার্টজাইট পাথরের পাহাড়ে, ঘন শাল ও হরজাই জঙ্গলের মধ্যে। সেই খনিটির নাম ছিল খলকতুম্বি।

কী নাম বললে?

খলকতুম্বি।

তাতে নেমেও ছিলাম। কাঠের জলে-ভেজা সিঁড়ি বেয়ে, কী পিছল। ছেলেবেলাতে জেঠুমনির দৌলতে কিছু ঘুরে নিয়েছি। ক্রিশ্চিয়ান মাইকা কোম্পানি ছিল সাহেবদের। পরে রামকুমার আগরওয়ালা গ্রুপ তা কিনে নেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে। অনেক ক্যাপিটালিস্টদের খুব কাছ থেকে দেখে ছেলেবেলাতেই তাদের স্বার্থপরতা, অর্থান্ধতা, ক্ষমতান্ধতা সম্বন্ধে আমার মনে এক গভীর বিরাগ জন্মে গেছে। সে বড়লোক, খনি-মালিক হোক, কি মিডিয়া মালিক। তাদের হাল হকিকত, Modus-operendi আমার খুব ভালই জানা আছে। আর জেনেছি বলেই তাদের প্রতি আমার অনুকম্পা নেই। খাদানে খাদানে মাথা নিচু-করা, কয়লা মাখা, গরিব মজুরদের যেমন ছেলেবেলাতে দেখে চোখে জল এসে গেছে, তেমনই সুবেশ, অর্থবান, মেরুদণ্ডহীন সাংবাদিক-সাহিত্যিকদের দেখেও ঘৃণা জন্মেছে। তারাই ক্যাপিটালিস্টদের দাঁত-নখ।

তারপর ঋজুদা বলল, জানিস রুদ্র, মাঝে মাঝে মনে হয়, যাদের অভিজ্ঞতা কম, যাদের মেরুদণ্ড নেই, তারাই সহজে সুখী হতে পারে জীবনে। বেশি জানলে, টান টান মেরুদণ্ড হলে সেই মানুষের পক্ষে এই মনুষ্যেতর প্রাণীতে থিক-থিক করা পৃথিবীতে বাঁচাই মুশকিল।

আমি বললাম, মির সাহেবের একটা শায়েরি ছিল না?

কী?

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, কী? তা বলবি তো!

'হিঁয়া সুরত এ আদম বহত হ্যায়
আদম নেহি হ্যায়।'

বাবাঃ। এই নইলে ফেমাস লিটারেটর মিস্টার রুদ্র রায়!

বাঃ। এখানে মানুষের মতো চেহারার জীব অনেক আছে কিন্তু মানুষ নেই।

ইসি লিয়েই তো জামাল ভাইয়া সব লোগোঁকি লিয়ে রাতমে বিরিয়ানিকি ইন্তেজাম করকে রাখখা হুয়ে হ্যায়। মুঝকো বোলিন, কি, যো আপলোগোঁকি উত্থারকে গাড়ি লেকর হাজারিবাগ লওটনে কি লিয়ে। গরম গরম উমদা বিরিয়ানি গুলহার ঔর বটি কাবাব, পায়া ঔর সিনা ভাজা লেক্কার উও খুদ আওবেগা আপলোগোঁকি খানা খিলানে কি লিয়ে। উনোনে খুদ হান্ডিসে নিকালকে গরম খানা খিলায়েঙ্গা আপলোগোঁকি। হারহাদ নদীকি ঠাণ্ডা পনিসে নহা লেকর আপলোগ আরাম কিজিয়েগা। হামলোগোঁনে ন বজি করিব আ পৌঁছেগা।

ঋজুদা বলল,

বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া,
কুছ নেহিতো থোড়া থোড়া।

মহম্মদ নাজিমেরই তো ছেলে না!

বরহি হয়ে আমরা তিলাইয়া হ্রদের পাশ দিয়ে এসে বরহি-হাজারিবাগ রোডে পড়েছি। কয়েক মাইল গেলেই হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্কের নতুন বানানো শালপর্ণী। বাঁদিকে ঢুকে যেতে হয়। একটি সুন্দর ঝরনা আছে বাংলো আর গেটের মাঝে। আর ডানদিকে ন্যাশনাল পার্কের গেট। রাজডেরোয়ার গেট। আমরা ওই জায়গা ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে গেলাম। পদ্মার রাজার মস্ত বাড়ি। এখন কী সব সরকারি অফিস হয়েছে, পুলিশেরও হতে পারে। সেটা পেরিয়ে আমরা আরও এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে ঢুকে পড়লাম।

এই সেই নন্দী-ভৃঙ্গীর আকারের পাথর এড়ানো বাইপাস। বুঝলি রে রুদ্র। বাইপাস তো শুধু বুকেরই হয় না, পথেরও হয়।

একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। কিন্তু শুক্লপক্ষ বলে এখনই চাঁদ উঠেছে পুবাকাশে, সূর্য তখনও পশ্চিমে বহাল আছে। সূর্য অস্তমিত হলেই সবচেয়ে আগে উঠবে জ্বলজ্বলে নীলাভ সন্ধেতারাটি। নানা পাখি ডাকছে, মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে, সেই হাওয়াতে সুগন্ধর পিচকিরি ছুটছে। বসন্ত যে এসে পড়েছে, তাতে আর সন্দেহর জোটি নেই।

হারহাদ বাংলোর বারান্দাটা চওড়াতে খুবই কম। নীচ দিয়ে ছুটে চলেছে হারহাদ নালা। নদী না বলে তাকে নালা বলাই ভাল। ঝরঝর ঝরঝর শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন, তবে তেমন স্পষ্ট নয়। বাংলোর পেছনেই ঘর বাড়ি বস্তি ছেলেমেয়ে

কুকুর মোরগ। মানুষের বসতির সব ন্যক্কারজনক চিহ্ন পুরোমাত্রাতেই উপস্থিত।

ঋজুদা বলল, আগে জানলে হারহাদে আসতাম না। এই বাইপাস হয়ে যাওয়াতে হাজারিবাগ শহর থেকে সহজে পিকনিক পার্টিরা চলে আসে, বরহির দিক থেকেও আসে। গয়াও তো খুব দূরে নয়। বরহি হয়ে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক ধরে এগোলেই তো ডোভি। আর ডোভি থেকে ডানদিকে গেলেই বুদ্ধগয়া আর গয়া।

আর উলটো দিকে গেলে?

উলটো দিকে গেলে চাতরা? মূল পথ থেকে ডানদিকে চলে গেলে হান্টারগঞ্জ—প্রতাপপুর—জৌরি। আর সোজা গেলে বানারস।

এসব অঞ্চল তোমার হাতের তালুর মতো চেনা, না ঋজুদা?

ভটকাই বলল।

'হাতের তালু' বা 'মায়ের মুখের' মতো চেনা মানুষের কোনও কিছুই থাকে না। নিজের বিপদকালে এবং শিশুকালে মানুষ নিজের হাতের তালু আর মায়ের মুখের দিকে যেমন একাগ্রভাবে ভালবেসে তাকায় তেমন কি আর পরে তাকায় কেউ বাছারা! তখন প্রেমিকার বা স্ত্রীর মুখই বেশি চেনা হয়ে যায়। ও সব কথারই কথা। মায়ের প্রয়োজন যত দিন থাকে ততদিন ছেলেরা সব হাম্বা-হাম্বা করে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই টা-টা! বাই! বাই!

তারপরই বলল, সকলেই যা করে তোরা কিন্তু তা করিস না। যে ছেলেরা মায়ের কথা ভুলে যায়, মাকে মনে না রাখে, তারা অমানুষ।

তা তুমি বলছ বটে ঋজুদা, কিন্তু এখন প্রচুর মায়েরা আছেন চারপাশে যাঁরা ছেলেদের মুখই মনে রাখেন না। যে সব মা ছেলেদের ছেলে বলে না মানেন সেইসব মায়েদের ছেলেরাই বা মা বলে মানতে যাবে কেন।

আমি বললাম, আজ তো Mother's Day নয়, তবে কেন হারহাদের এই বাংলোতে এত দূর ঠেঙিয়ে এসে রাজডেরোয়ার জঙ্গলে আসলাম আমরা? এসে উঠলাম? কথা একটু কম বল ভটকাই। প্লিজ।

ইতিমধ্যে চৌকিদার সেলিমের সহায়তায় চা নিয়ে এল বারান্দাতে। চা, ছোট ছোট করে কাটা বাখরখানি রোটি আর শিক কাবাব—মুরগির।

আর কালাজামুন। ই ক্যা টাটিঝরিয়াসে মাঙ্গায়া কা কামাল?

নেহি সাহাব, ই হাজারিবাগ টাউন কি বেঙ্গলি সুইটস সে মাঙ্গায়া।

ভটকাই বলল, সবই ভাল। কিন্তু বাইরে এসে চা খেয়ে সুখ নেই। এত চিনি আর এত দুধ দেয় চায়ে।

ঋজুদা হেসে বলল, এ শুধু হাজারিবাগের জঙ্গলেই নয়। এ হচ্ছে ভারতীয় গ্রামীণ ঐতিহ্য। চিনি ও দুধের পরিমাণ যত বেশি হবে তোর প্রতি ভালবাসার প্রকাশও তত বেশি হবে। এই নিয়ম আসমুদ্র হিমাচলের।

তফাত শুধু কাশ্মীরে। সেখানে তো চায়ে চিনির বদলে নুন দেয়।

আমি বললাম।

তাই হয়তো ভালবাসাটা এমন চটকে গেল।

আমরা হেসে উঠলাম।

সেলিম সেলাম করে বলল, ম্যায় অব চলে হুজৌর। রাতমে কাজমি সাহাব কি ভি খানেমে সামিল হোনেকি বাত হ্যায়। অব দিখা যায়। আপকি বারেমে বহুত কুছ কহতেথে উনোনে।

ক্যা? ছিপানেওয়ালা বাতভি কুছ থা ক্যা?

ঋজুদা হেসে বলল। তারপর বলল, যিনকি বারেমে দুসরে বহুত কুছ কহতে হেঁ যব উনোনে খুদ উহা হাজির ন হো, তো শক হোতি হ্যায় কী জরুর কুছ উলটা-সিধা ভি বোল চুঁকে হেঁ।

নেহি নেহি সাব। বলেই, তওবা তওবা বলার মতো করে সেলিম দু' হাতের আঙুল ঠেকাল দু'কানে।

ঋজুদা বলল, ঠিক হ্যায়। আপ আইয়ে।

সেলিম চলে যাওয়ার পরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম পায়ে হেঁটে। ঋজুদা বলল, এই জন্যেই আমার চেনা পরিচিত জায়গাতে আসতে ইচ্ছে করে না আজকাল। এত বেশি খবরদারি, খিদমদগারি, প্যায়েরভি হয় যে নিজের খুশিমতো একা নির্জনতা উপভোগ করাই মুশকিল হয়ে ওঠে। কিছু অবশ্যই ভাল লাগে, কিছুর প্রয়োজনও ঘটে কিন্তু সব সময়ে এত মানুষজন, এত কথা ভাল লাগে না। ভাল তো লাগেই না, সত্যি কথা বলতে কী বিরক্তিই লাগে। এই জন্যেই এমন জায়গাতেই যাওয়া উচিত, যেখানে তোদের কেউই চিনবে না, চেনে না।

ভটকাই বলল, তা তো হবার নয় ঋজুদা। একেই বলে 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'। ঋজু বোস বোরখার আড়ালে মুখ লুকিয়ে না বেড়ালে তাকে তো মানুষে চিনে ফেলবেই, বিশেষ করে পূর্ব ভারতে। এই সব ঝামেলা হয় তোমারই কারণে। আমাদের আর চেনেটা কে!

তারপর বলল, আজকাল তো মিস্টার ঋজু বোসের চেলা দ্য গ্রেট রাইটার রুদ্র রায়ও রীতিমতো ফেমাস হয়ে উঠছে।

আমি বললাম, আমার তো আরও যা-তা লাগে। Reflected glory-তে গর্বিত হয় বাজে টাইপের মানুষেরা। ঋজুদা সেলিব্রিটি, তা আমাকে নিয়ে টানাটানি করা কেন?

কী করবি বল রুদ্র। আজকাল পৃথিবীটাই ভরে গেছে গুচ্ছের বিচ্ছিরি, বাজে টাইপের মানুষে।

হুঁ।

ঋজুদা বলল। তারপর বলল, চা তো খাওয়া হল, এবারে চল একটু হেঁটে আসি। হাত পা তো ধরে গেছে বসে বসে।

যা বলেছ ঋজুদা। আমি বললাম।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম জঙ্গলে। লাল মাটির পথ যেন উড়ান দিয়েছে উড়াল

হাওয়াতে। তিতির, বটের এবং ক্বচিৎ ময়ূরের ডাক ভেসে আসছে দিনকে বিদায় জানিয়ে। ছাতারেরা ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ করে দিনকে যা-তা বলছে চলে যাওয়ার জন্যে। কারণ, দিনের সঙ্গেই তাদের নাড়ি বাঁধা। দুটি প্যাঁচা কোটর ছেড়ে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে ওদের মাথার ওপর উড়ে উড়ে ঝগড়া করছে। ঋজুদা একদিন বলেছিল, ওদের দাম্পত্য-কলহের প্রক্রিয়াটা মানুষে রপ্ত করতে পারলে পাড়া-প্রতিবেশীরা রেহাই পেত। দূরের আকাশেই তাদের সব মামলা তারা নিষ্পত্তি করতে পারত। তবে মুশকিল হল এই যে, মানুষ তো উড়তে পারে না।

আঃ কী সুন্দর লাগছে রে রুদ্র। কত বছর পরে রাজডেরোয়াতে এলাম। আমার প্রথম যৌবনের কতগুলো বছর যে এই সব জঙ্গলে দস্যিপনা করে কেটেছে তা কী বলব। গোপাল, লালাদা, সুব্রত, নাজিমসাহেব, ভুতো পার্টি। সে সব দিনের অনাবিল আনন্দর কথা ভোলবার নয়।

ভুতো পার্টিটা কী ব্যাপার ঋজুদা?

সে ব্যান্ড পার্টির সমগোত্রীয়ই বলতে পারিস। তার কথা তো এত সংক্ষেপে বলা যাবে না। সময়-সুযোগ করে বলা যাবে'খন।

জানিস তো! এই যে নাজিম সাহেবের ছোট ছেলে, আমরা এসেছি শুনেই খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে, গাড়ি পাঠিয়েছে, সেই নাজিম সাহেবের প্রতি গোপাল, সুব্রত, লালাদাদের এতই ভালবাসা ও ভক্তি ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পরে কবরখানাতে শ্বেতপাথরের ফলক বসিয়েছেন লালাদা। এখনও যদি কখনও এদিকে আসেন, তবে মোমবাতি জ্বালিয়ে যান কবরের ওপরে। আগামীকাল সকালে আমিও যাব একবার। তোরা কি যাবি?

হাজারিবাগ শহর এখান থেকে কত দূর?

বেশি দূর নয়। বরহি থেকেই প্রায় চল্লিশ কিমি যখন, তখন এখান থেকে তো আরও অনেকই কম হবে। কাল সকালে তোদের পিচ রাস্তার ওপাশে শালপর্ণীতে নিয়ে যাব। রাজডেরোয়ার টাইগার-ট্র্যাপ দেখাব। এই হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে অনেকগুলো ওয়াচ টাওয়ার আছে। এখন সেখানে বসে বন্যপ্রাণী যে খুব দেখা যাবে এমন নয়, তবে বনের প্যানোরমিক ভিউ অবশ্যই দেখা যাবে। হু হু করে হাওয়া বইবে। একবার মে মাসের লু বওয়া দুপুরে পাঁচ নম্বর টাওয়ারের ওপরে বসে ছিলাম দুপুরবেলা।

পাগল নাকি তোমরা!

পাগলই বলতে পারিস। বাজি হয়েছিল গোপাল আর লালাদার মধ্যে। কে জল না খেয়ে, মাথায় টুপি না পরে, চোখে সানগ্লাস না পরে ওই ভরদুপুরে বেশিক্ষণ ওই টাওয়ারের ওপরে বসে থাকতে পারে।

মানে, আমৃত্যু বলছ? ভটকাই বলল।

বলতে গেলে তাই-ই এরকম।

বাজি কী ছিল?

এক ক্রেট কিংফিশার বিয়ার। গোপাল বিয়ার খেতে খুব ভালবাসত। ওই অত্যধিক বিয়ার খেয়ে খেয়েই ডায়াবেটিসে ধরেছিল শেষে। যাই বল আর তাই-ই বল, দে ওয়্যার গ্রেট গাইজ। যতটুকু শিখেছি, যা শিখেছি—সব ওদেরই কাছ থেকে।

তা ওঁরা না হয় বিয়ার বাজি রেখে মরতে বসেছিল, তুমি কী করতে ওই আত্মহত্যাকামী দুই পাগলের সঙ্গে রইলে মরতে?

বাঃ! আমিই তো টেনিস খেলার আম্পায়ারের মতন টঙে বসে আম্পায়ারিং করছিলাম। আমাকে ওঁরা দুজনেই ভালবেসে কখনও কখনও বিটকেল বলে ডাকতেন। অমন বিটকেলমি জীবনে করিনি। তারপর দু'দিন শুধু ফরেস্ট বাংলোয় রাখা যবের ছাতু জল দিয়ে গুলে গুলে খেয়ে চোখ উলটে পড়েছিলাম। হাজারিবাগের শীত আর হাজারিবাগের গরম—দুই-ই সমান বেশরম। যারা জানে, তারাই জানে।

কিছু কেলো করে নিয়েছ বটে জীবনে!

ভটকাই বলল।

তোমরাও কী কম করছ?

ঋজুদা বলল।

আর ওই কাজমি সাহেব? তার সঙ্গে তোমার আলাপের কথা বলবে বলেছিলে। সেই কথাটি এবারে বলো।

ও হ্যাঁ, আমি গেছি পালাম্যুর মারুমারে। সঙ্গে আমার তিন চেলা। বামাপ্রসাদ, সুশান্ত আর কৌশিক। বামাপ্রসাদ মুখার্জি, কাস্টমসের অফিসার, সুশান্ত ভট্টাচার্য, কলকাতার চিড়িয়াখানার অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর আর কৌশিক লাহিড়ী, ডাক্তার, চর্মবিশেষজ্ঞ। আগে ও আমার চেলা হলে ভাল হত, মানে যে সময়ে শিকার করতাম।

কেন?

আমরা সমস্বরে বললাম, অবাক হয়ে।

আরে, গুলি করার আগে জানোয়ারের চামড়ার কোয়ালিটি সম্বন্ধে ওকে বলতাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসতে। ট্যান করলে দারুণ হবে এমন গ্যারান্টি ও দিলে তবেই বন্দুক-রাইফেলের ঘোড়া দাবতাম।

ভটকাই বলল, তারপর ওঁর চামড়া কে ট্যান করত? জ্যান্ত বাঘের skin-inspection-এ গেলে?

সে কৌশিকই বুঝত।

কিন্তু এতদিন তো জানতাম যে, আমরাই তোমার চেলা। এত বছর পরে তুমি বলছ যে ওই তিনজন তোমার চেলা। এটা কি আমাদের পক্ষে সুখের কথা?

আরে বোকা। তোরা তো আমার চামুণ্ডা। ওরা চেলা হোক না গিয়ে। ওরা যে তোদের চেয়ে বয়সে অনেকেই বড়, তা ছাড়া ওরা চেলা হয়েছে ঋজু বোসের,

তোরই জন্যে, তোরই লেখা পড়ে। বহুদিন ধরে ওদের শখ ছিল আমার সঙ্গে জঙ্গলে যাবে একবার, তাই রাঁচি অবধি ট্রেনে এসে তারপর সোহনলালবাবুর কাছ থেকে একটা গাড়ি নিয়ে ম্যাকলাস্কিগঞ্জ, ডালটনগঞ্জ বেড়িয়ে, বেতলাতে কিশোর-পাপড়ি চৌধুরিদের 'নইহারে' দিন তিনেক থেকে মারুমারে এসে উঠেছিলাম।

বর্ষার দিন। এক দুপুরে ঘন কালো মেঘ করে এসেছে। আমি মারুমারের বাংলোর হাতা থেকে নেমে সামনের জায়গাটিতে, যেখানে বসে হুলুক পাহাড়ের পুরো শরীরটা ভাল দেখা যায়, সেখানে বসে লেবুপাতা, কাঁচালঙ্কা আর পাকা তেঁতুলের শরবত খাচ্ছি তারিয়ে তারিয়ে। বেলা দেড়টা-টেড়টা বাজে। চেলারা বাবুর্চিখানাতে চৌকিদারের সঙ্গে তরিবত করে কী সব রান্না-টান্না করছে, খেতে বসার সময় আমাকে একেবারে চমকে দেবে বলে। এমন সময়ে একটা জিপ বাংলোর হাতার মধ্যে ঢুকে এল তো বটেই, একেবারে আমার ঘাড়ে এসে পড়ল প্রায়।

একজন অত্যন্ত লম্বা-চওড়া হৃষ্টপুষ্ট মানুষ, গায়ে বনবিভাগের খাকি-রঙা উর্দি পরা, জিপের সামনের সিট থেকে নেমে আমারই পেছনে একটি প্রকাণ্ড কুসুম গাছের ওপরে ছুতোর মিস্ত্রিরা যে দুটি tree cottage বানাচ্ছিল, সেই দিকে যেতে যেতে নিজেই নিজেকে ইনট্রোডিউস করলেন, আই অ্যাম এ সি এইচ কাজমি, ডি এফ ও সাউথ, কোয়েল ডিভিশন, পালামৌ।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে আমার পরিচয় দিতেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন কাজমি সাহেব। বললেন, আরে, আপনার কথা এত মানুষের কাছে শুনেছি। ইয়ে হামারা খুশনসিবি যো আপসে আজ ভেট হো গ্যয়ে।

বলেই, সেই লক্ষ্মৌওয়ালা আমাকে বললেন, চলুন চলুন, ওপরের দুটো বেডরুমে কোন ফার্নিচার কোথায় থাকবে, লেখার টেবিল কোথায় থাকবে, সব দেখিয়ে দেবেন। সে সব দেখানো-টেখানোর পরে উনি বললেন, আপনি তো খুব ঘামছেন। আপনি কি এই গরমে রাম খাচ্ছেন নাকি?

আমি তেঁতুলের শরবতের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

বললাম, খাবেন নাকি একটু?

ম্যায় পিতা নেহি হুঁ।

বলেই বললেন, আরেকটা ছোট অনুরোধ।

কী বলুন?

আমি বললাম।

কাজমি সাহেব বললেন, এই যে কুসুম গাছে ট্রি কটেজটি হচ্ছে দু' কামরার, এর একটি নাম আপনি দিয়ে দিন। কটেজকি ইজ্জৎ বাড় যায়েগি।

আমার মুখে এসে গেল, কুসুম গাছে কটেজ! নাম দিন কুসমি।

বাঃ। বাঃ বহুত খুব। বললেন, কাজমি সাহেব। বেহেতরিন। মগর ইস কটেজ

ইনোগুরেট ভি করনে হোগা আপহিকো।

গেছিলে?

ভটকাই বলল।

কোথায় গেলাম। বিহারের গভর্নর গেছিলেন আমার জায়গায়। এক জায়গাতে গেলে, ইচ্ছে করে আবার কখনও গিয়ে সেখানে নিরিবিলিতে কটি দিন কাটিয়ে আসি। কিন্তু তা হয় কই? একই জায়গাতে দু' বার ফিরে যাওয়ার কপাল করে কি আর এসেছিলাম এ জন্মে। ইচ্ছে আর পূরণ হল কই? তার পরে পালাম্যুতেই আর যাওয়া হয়নি।

মারুমার জায়গাটার নামটা কেমন চেনা চেনা লাগছে।

লাগতেই পারে। পড়েছিস হয়তো কোথাও। কত বিখ্যাত সব বই আছে ওই সব অঞ্চলের ওপরে।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পালামৌ।

সে তো বহু যুগ আগের কথা। তার পরেও আর অনেকই ভাল বই লেখা হয়েছে পালামৌর ওই সব অঞ্চলের ওপরে।

যেমন...

থাক। ঋজুদা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল।

যে পড়েই না, তাকে ভাল বইয়ের ফিরিস্তি দিয়ে নিজের মুখ নষ্ট করতে যাবি কেন?

ঠিক বলেছ।

আহা কি সুন্দর দেখাচ্ছে চারিদিক বলত। আর এই চৈত্র রাতের হাওয়া। গা না রুদ্র, আমার সেই প্রিয় গানটা।

কোনটা ঋজুদা?

'চৈত্র পবনে মম চিত্ত বনে'।

তুমি গাও না ঋজুদা। কতদিন তোমার গলার গান শুনি না। তিতিরটা সঙ্গে থাকলে তাও জোরজার করে, নইলে তো তুমি গাওই না।

চল, ওই বড় পাথরটার ওপরে গিয়ে বসি।

পেছনে কাঁকড়া বিছে কি চিতি সাপ কামড়াবে না তো ঋজুদা?

কামড়াতেও পারে। জঙ্গলে গেলে these are all in the game.

কী আনফেয়ার খেলা রে বাবা! একেবারে hitting below the belt.

তুমি যে বললে, কী সব নন্দী-ভৃঙ্গী পাথরের কথা। আমরা তো প্রায় এক কিমি মতো চলে এলাম হারহাদ বাংলো থেকে, কই চোখে তো পড়ল না!

ভটকাই বলল।

এক কিমি মতো কী রে! দেড় কিমি এসেছি কম করে।

আমি বললাম।

তাই তো। ঠিকই তো বলেছিস।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, সম্ভবত পথ থেকে সরিয়ে ফেলেছে বনবিভাগের মজুরেরা।

কোনও মিনিস্টার বা ভি আই পি হয়তো এসেছিলেন কোনও সময়ে।

ভটকাই স্বগতোক্তি করল।

হয়তো তাই। কিন্তু করাটা আদৌ উচিত হয়নি। সঞ্জীববাবু পালামৌতেই লিখেছিলেন না 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে?' সেই কথাটাই একটু টেনে আমি বলব, যা কিছুই এলোমেলো, বুনো, আমাদের কাছে অসুবিধেজনক, সেই সব কিছুই বনের সৌন্দর্য বাড়ায়, বনকে বুনো রাখে। আমাদের বিভিন্ন রাজ্যের বনবিভাগের যে এই প্রতিনিয়ত 'খোদার ওপর খোদকারি' করার প্রবণতা দেখতে পাই তাতে বনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য একেবারে নষ্ট যায়।

তারপর আজকাল আবার হয়েছে সোশ্যাল ফরেস্ট্রি।

আমি বললাম।

যা বলেছিস ভটকাই। মধ্যপ্রদেশের অচানকমার অভয়ারণ্য হয়ে অমরকণ্টক যাবার পথে লামণি নামের একটি বনবাংলো আছে। তার মস্ত হাতায় একজোড়া মস্ত বড় বটলব্রাশের গাছ যেমন আছে তেমন দুটি বড় গামহারও আছে। কিন্তু মাটি করেছে পুরো ফাঁকা জায়গাটাতে লেবু গাছ লাগিয়ে। পেয়ারাও আছে কিছু।

ওই বাংলোর টালির ছাদের বসবার ঘরটি কী দারুণ। না?

আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, তা ভাল, তবে তোরা সিমলিপালের জোরান্ডা বাংলোর হাতার মধ্যে যে বসার জায়গাটা আছে তা দেখিসনি। অসাধারণ।

শুনেছি জোরান্ডা নাকি খুব সুন্দর জায়গা?

আমি বললাম।

সুন্দর মানে? আমার তো মনে হয় না ভারতবর্ষে তো বটেই, পৃথিবীতেই ওইরকম সুন্দর, ভয়াবহ, গা ছমছমে জায়গা আর বেশি আছে। সুন্দরবনের সঙ্গে তুলনা করা চলে এই eerie, uncanny অনুভূতির।

তারপর বলল, জোরান্ডা মানে জানিস?

না তো।

ভটকাই বলল, আমাদের নিয়ে যাবে না একবার?

যাব। একবার এইরকমই চৈত্র মাসে গেছি, দেখি সমতল থেকে আদিবাসীরা পুজো দিতে এসেছে ওপরে। দল বেঁধে। ওখানে বনদেবতা আছেন ওদের। তাদের নাম বাথুরি।

জোরান্ডা খুব উঁচু বুঝি?

উঁচু নয়! ওইরকম সুন্দর panoramic view পাহাড়ের মেঘের পরে পাহাড়ের মেঘ। বৈশাখ মাসে গেলে রাতের বেলা পাহাড়শ্রেণীর এ মেঘ ও মেঘের গলাতে যখন দাবানলের মালা জ্বলে তখন যেমন দেখতে লাগে তেমন দৃশ্য এই

পৃথিবীতেই খুব কম আছে। তবে জঙ্গলে গেলে চৈত্র-বৈশাখ মাসে যাওয়াই ভাল। মানে, ভারতের জঙ্গলে।

কেন?

কারণ, আমাদের অধিকাংশ বনের গাছপালাই পর্ণমোচী যদিও, কিন্তু সব গাছের পাতাই এক সঙ্গে মানে একই সময়ে ঝরে না। রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়লে কারও মনে হতে পারে শীতকালে বন বুঝি বিবস্ত্র হয়ে যায়। আসলে রবীন্দ্রনাথ তো আমাদের মতো এত এবং এতরকম বনে বছরভর ঘুরে বেড়াননি! যা দেখেছেন তাই...

কেন যে ঘুরলেন না! ঘুরলে তো লাভ আমাদেরই হত!

তা তো একশোবার! বড় লোক যাঁরা, কবি যাঁরা, তাঁদের ব্যক্তিজীবনের যা কিছু অভিজ্ঞতা তা তাঁরা সুদসুদ্ধ পাঠক-পাঠিকাকেই তো ফিরিয়ে দেন।

তারপর বলল, তোরা আমেরিকান লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের কোনও লেখা পড়েছিস?

আমি বললাম, একটা মাত্র পড়েছি।

কোনটা? The Old Man And The Sea?

হ্যাঁ।

অধিকাংশ মানুষই প্রত্যেক লেখকের সবচেয়ে বেশি প্রচারিত লেখাটিই পড়েন। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। কোন লেখকের কোন বইটি সর্বোত্তম তার বিচার করতে হয় তাঁর অনেকগুলি বই পড়ে। এবং এই বিচারের ফল আলাদা আলাদা পাঠকের মতে আলাদা আলাদা হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

তা ঠিক।

একদিন ভবিষ্যতে কখনও Old Man And The Sea নিয়ে তোদের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করব। দেখবি, মানে, বুঝবি ভাল লেখা, বড় লেখকের লেখা, কেমন অনুভূতি জাগায় মনে।

কী যেন বলছিলে না তুমি হেমিংওয়ে সম্বন্ধে?

হ্যাঁ। হেমিংওয়ে বলেছিলেন 'Nothing is wasted in a writer's life.' একজন লেখকের জীবনের সব অভিজ্ঞতাই, তা ভালই হোক কি মন্দ, আনন্দের বা দুঃখের, তাঁর লেখাতে চুঁইয়ে আসে। কোনও-না-কোনও সময়ে।

আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথ তো তাই-ই বলেছিলেন।

ঋজুদা বলল, কোথায়?

বাঃ। বলেননি? 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা, পুণ্যের পদপরশ তাদের পরে।'

ঠিকই তো! বাঃ রে রুদ্র। পড়লে, বিশেষ করে প্রকৃত বড় কবি, বড় লেখকদের লেখা এমনি করেই পড়তে হয়। পড়ার পড়াই নয়, জীবনে সে সব কথা গেঁথে নিতে হয়, তবেই না কাব্য-সাহিত্য পাঠকের জীবনকে সার্থক করে, সমৃদ্ধ করে।

কিন্তু গানটা?

নাছোড়বান্দা ভটকাই বলল।

আয় বসি।

ঋজুদা আমাদের নিয়ে বসল।

তারপর বলল, গাইছি গানটা। কিন্তু রুদ্র তুইও গলা দে।

না। আমি গিলোটিনে অথবা হাঁড়িকাঠে গলা দিয়ে মরতে চাই না। তোমার এত বয়স হল ঋজুদা, কিন্তু গলা শুনলে কে বলবে...

আমার কত বয়স হল রে? আমার বয়স আঠারো। এই আঠারোতেই আটকে থাকব আমি চিরটাকাল। শরীরের বয়স তো বাড়বেই শরীরের নিয়মে। কিন্তু মনের বয়স আমার কোনওদিনও বাড়বে না। বাড়লে, এই নবযৌবনের দল নিয়ে বিশ্বময় বেড়িয়ে বেড়াব কী করে বল?

ভগবান করুন, তোমার এই 'চিরটাকাল' সত্যি সত্যিই অনিঃশেষ হোক।

বিজ্ঞর মতো বলল ভটকাই।

গাইছি কিন্তু গান শেষ হলে পাক্কা আধটা ঘণ্টা এখানে নিশ্চুপে বসে থাকব। বনের কী বলার আছে আমাদের তা শুনব। একটা পাতা খসারও যে আলাদা শব্দ আছে, হাওয়াও যে নাচে, তার পায়েও যে অদৃশ্য নূপুর থাকে, তারাও যে কথা কয় তা নিজেরা চুপ না করলে জানবি কী করে। নৈঃশব্দ্যের মতো শব্দময়তা কি আর দ্বিতীয় আছে রে! আমাদের দেশের মুনি-ঋষিরা এই কথা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তো একা একা পর্বতে-কন্দরে বছরের পর বছর চুপ করে থাকেন তাঁরা। তাঁর কথাটি শুনতে পাবার জন্যে। যুবরাজ শাক্যসিংহ যেমন এখান থেকে কিছু দূরেরই একটি জায়গাতে নির্বাক হয়ে বসে জানতে চেয়েছিলেন, এবং যা জানতে চেয়েছিলেন তা জানতে পেরেছিলেন বলেই তো নিছক একজন রাজকুমার থেকে বুদ্ধদেব হয়ে উঠতে পেরেছিলেন উনি।

ঠিক।

আমরা বললাম।

ঋজুদা তারপরে গান ধরল।

'চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা, ওগো ললিতা/যদি বিজনে দিন বহে যায়, খর তপনে ঝরে পড়ে হায়, অনাদরে হবে ধূলিদলিতা, ওগো ললিতা/তোমার লাগিয়া আছি পথ চাহি—বুঝি বেলা আর নাহি নাহি, বনছায়াতে তারে দেখা দাও করুণ হাতে তুলে নিয়ে যাও—কণ্ঠহারে করো সঙ্কলিতা, ওগো ললিতা।'

গান শেষ হলেও আমরা কথা বললাম না কোনও। ঋজুদার গান আমার ভাল লাগে এই জন্যে যে, প্রত্যেক শব্দ তার গলাতে আলাদা একটা মাত্রা পায়। শব্দসমষ্টির সঙ্গে সুরমঞ্জরীর যুগলবন্দি হয়ে ঋজুদার গলার গান এক বিশেষ বার্তা পৌঁছে দেয় আমাদের কানে। ভটকাইয়ের কথা জানি না, কিন্তু আমি

রবীন্দ্রসংগীতের পোকা। এই লিপ্ততা পেয়েছি আমি আমার মায়ের কাছ থেকে। রবীন্দ্রসংগীতের আবহর মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছি, বাড়িতে বহু বড় বড় রবীন্দ্রসংগীত গাইয়ে গান গেয়ে গেছেন, তাই বলতে পারি যে, ঋজুদা যদি ভাল করে, মানে সময় দিয়ে গান গাইত, জনকর্ণে আসত, তবে অন্য অনেক তাবড় তাবড় পুরুষ-নারী গাইয়েদের বিপদ হতে পারত খুবই। কিন্তু ঋজুদা তো আমাদের ছাড়া, গান শোনায়ই না কখনওই, তাও এই জঙ্গল-টঙ্গলেই। ঋজুদার গান শোনার ভাগ্য শুধু আমাদেরই হয়েছে। ঋজুদা নিজে বলে দূর, দূর! আমি চানঘরের গায়ক। আমি কি গাইতে পারি গান?

এই একটা দুঃখ রয়ে গেল আমার। রবীন্দ্রসংগীত গায়ক ঋজুদাকে দশজনের সামনে উপস্থিত করাতে পারলাম না।

একদিন ঋজুদা, যখন আমরা 'নিনিকুমারীর বাঘের' জন্যে ওড়িশার জঙ্গলে গেছিলাম, এ ব্যাপারে আমি খুব চাপাচাপি করতে বলেছিল, দেখ রুদ্র, প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের কিছু কিছু জিনিস থাকা উচিত যা তার একান্ত নিজস্ব। নিজের সব কিছুই অন্যকে দিয়ে দেওয়া, দশজনের করে দেওয়াটা মুর্খামি। যারা নিজেদের প্রচার করে নিজেদের blow-up করে সুখ পান তাঁদের কথা আলাদা। নইলে আমার মতো গড়পড়তা মানুষের কখনওই উচিত নয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিজের পরিচয় নিয়ে গিয়ে দাঁড়ানো। এটা যাঁরা করেন, তাঁদের শালীনতার অভাব আছে।

কী আর বলব। ঋজুদা এই ঘোর প্রচার-সর্বস্বতার দিনে সত্যিই এক ব্যতিক্রম। আর সেই জন্যেই তো আমরা তার অন্ধ চেলা। চুপ করে বসে আছি আমরা। অন্ধকার নেমে এসেছে বেশ কিছুক্ষণ। তবে শুক্লপক্ষের অষ্টমীর চাঁদ অন্ধকারকে বাড়তে দেয়নি। তারাদের আলো আর সবে ওঠা অষ্টমীর চাঁদের আলো এই চৈত্র-সন্ধেতে এক ফিকে জল-ধোওয়া জলের মতো জ্যোৎস্নার বাতাবরণ তৈরি করেছে। হাওয়া বইছে একটা ঝিরঝির করে। সন্ধেতারাটার সবুজাভ আলোর দ্যুতি যেন আকাশকে একা হাতে শাসন করছে। ভারী সুগন্ধ উড়ছে চারধারে। 'বনময়, ওরা কার কথা কয় রে'। পিউ কাঁহা ডাকছে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে আর তার দোসর সাড়া দিচ্ছে। কীসের যে তাদের এত তাড়া কে জানে! প্রিয়া হারিয়ে গেছে বলেই কি অমন তীরবেগে ওড়া! অথচ প্রিয়া যদি সত্যিই হারাত তবেও না হয় বোঝা যেত। সে তো মাঝে মাঝেই সাড়া দিচ্ছে।

আমার ঠাকুমা ছোটকাকুর বিয়ের পরে রসিকতা করে তাঁকে বলতেন, 'আহা। যেন পলকে হারায়। নেবে না। নেবে না। তোর বউকে কেউ নিয়ে পালাবে না।' কাকিমা তখন অন্য দিকে মুখ করে হাসতেন।

সেইরকমই আমারও বলতে ইচ্ছে করল পিউ কাঁহাকে, হারাবে না। হারাবে না।

ঋজুদা পাইপের ছাই ঝেড়ে ফেলে ধরাল পাইপটা। পাইপের বোলের ভেতরে টোব্যাকো থাকে, তাই সিগারেটের আগুনের মতো তা পাশ থেকে বা চারধার

থেকে দেখা যায় না, কিন্তু গোল্ড-ব্লক টোব্যাকোর গন্ধ এই চৈত্রবনের গন্ধের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক দারুণ আবহর সৃষ্টি করেছে। খুব ইচ্ছে করছে ঋজুদার গলাতে আরও একটা গান শুনি। কিন্তু এখন taboo। আমরা তিনজন অন্ধকারে পাশাপাশি বসে আছি নীরবে। যার যার নিজের নিজের ভাবনা ভেবে চলেছি। আর সব থেমে থাকতে পারে, গাড়ি থামে, প্লেন থামে, পা থামে, কিন্তু মস্তিষ্ক ঠিকই তার কাজ করে যায় শুধু ঘুমের সময়টুকু ছাড়া। কিন্তু মজা এই যে, একজনের ভাবনা অন্যকে দেখানো যায় না। ভাগ্যিস যায় না। যদি এমন কোনও যন্ত্র আবিষ্কার হয় যে মানুষের মনের ভাবনা একটি কম্পিউটার স্ক্রিনে ফুটে উঠবে, তা হলে মানুষের সততা বলে আর কিছু থাকবে না। ধারেকাছে অন্য কেউ থাকলে তাকে নিজের ভাবনার অবদমন করতে হবে বা ভাবনাকে লুকিয়ে রাখতে হবে, অভিনয় করতে হবে। সে বড় দুর্দৈব হবে। মানুষ তার নিজস্বতাকে পুরোপুরি হারাবে।

হঠাৎ একটা কোটরা হরিণ ব্বাক ব্বাক ব্বাক করে ডেকে উঠল। সম্ভবত হারহাদ নালাতে জল খেতে গেছিল। চিতা-টিতা দেখে ভয় পেয়ে থাকবে। একটা শেয়াল ডাকল আর তার পরে পরেই একদল। এদিকে হায়না নেই। গভীর বন ছাড়া হায়না দেখা যায় না। তবে কখনও-সখনও জংলি কুকুর চলে আসে। তারা দেখতে বড় হয়, কিন্তু বড় সাঙ্ঘাতিক। একবার মধ্যপ্রদেশের সুফ্‌করে দেখেছিলাম। একটা শম্বরকে তাড়া করে এক দল কুকুর মাটিতে ফেলে পনেরো মিনিটের মধ্যে অত বড় জ্যান্ত শম্বরটার গায়ের মাংস চামড়া সব চাঁচিপুচি করে খেয়ে শুধু কঙ্কালটিকে ফেলে রেখে চলে গেল। শিং-সুদ্ধ কঙ্কালটা পড়ে রইল হায়নাদের জন্যে। গভীর রাতে তারা কটাং কটাং করে হাড় ভেঙে ভেঙে খাবে তাদের শক্ত চোয়ালে।

হায়নার কথা মনে হলেই আফ্রিকার সেরেঙ্গেটি প্লেইনসের কথা মনে পড়ে যায়। সেই 'গুগুনোগুম্বার'-এর দেশ থেকে ঋজুদাকে যে কীভাবে নাইরোবি সর্দারের সাহায্যে বাঁচিয়ে নিয়ে দেশে ফিরেছিলাম সে কথা ভাবলেও হাড় হিম হয়ে যায়। পুরানাকোটেও বাঘের হাতে যখন জখম হল ঋজুদা, তখন ভুবনেশ্বরে এসে প্লেন ধরে কলকাতাতে ফিরেছিলাম। তবে আমাকেও ঋজুদা আহত অবস্থাতে নিয়ে এসেছিল ঝিঙ্গাঝিরিয়ার জঙ্গল থেকে—যেবারে আমরা মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলাতে ঝিঙ্গাঝিরিয়ার মানুষখেকো মারতে যাই।

দূরে একটা গাড়ির আলো দেখলাম মনে হল। কিন্তু এঞ্জিনের শব্দ পেলাম না অত দূর থেকে। ন্যাশনাল পার্কে বন্যপ্রাণী দেখার জন্যে চেকনাকা পেরিয়ে কোনও গাড়ি ঢুকল কি? গাড়িটা বনে ঢুকল, না বন থেকে বেরুল, তা বোঝা গেল না। পথে যদি বাঁক থেকে থাকে ওখানে, তবে বন থেকে ফিরে গেল এমনও হতে পারে।

যার যেরকম মনে হয় সেইরকম ভাবছি। কার না জিপ না ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ভ্যান কিছুই সঠিক বোঝা গেল না। আলোর উচ্চতা দেখে অনুমান

করলাম যার যার মতন।

সেই হেডলাইটের আলো কিছুক্ষণের জন্য বনের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করে দিল। তারপরেই বন আবার নিজেকে ফিরে পেল। ঋজুদাই দিয়েছিল আমাকে রেডিয়াম-দেওয়া বড় ডায়ালের টাইমেক্স ঘড়িটা। জঙ্গলে ব্যবহার করার জন্যেই দিয়েছিল, তাই জঙ্গলেই ব্যবহার করি। খুবই কাজের ঘড়িটা। ঘড়িটার ডায়ালে তাকিয়ে দেখলাম আধঘণ্টা হতে এখনও অনেকেই দেরি। বনের মধ্যে সময় কখনও আদিবাসী যুবকের মতো দ্রুত পায়ে চলে, কখনও বা পায়ে আরথ্রাইটিস হওয়া বালিগঞ্জি বৃদ্ধের মতো। তার চাল যে কখন কীরকম হবে, তা সে নিজেই শুধু জানে।

নিঃশব্দে বসে রইলাম আমরা পাথরের ওপরে। বনভূমিতে এখন যেই পা ফেলুক না কেন, মানুষ কিংবা জানোয়ার, শুকনো পাতাতে তার শব্দ হবেই। যদিও বনের সব পাতা শুকোবে এপ্রিলের শেষে।

আমরা যেদিকে আলো দেখেছিলাম সেদিকে ঋজুদার ভাষায় যাকে বলে 'উৎসুক, উদ্‌গ্রীব, উৎকর্ণ এবং যাবতীয় উঃ' হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। এমন সময়ে যেখানে আলো দেখেছিলাম গাড়ির হেডলাইটের, সেখানে আবারও দেখলাম আলো। তারপরই হেডলাইটের আলো দুটো লাফাতে লাফাতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি কোমরে হাত দিয়ে পিস্তলের হলস্টারের বোতামটা খুলে দিলাম। আলোর উচ্চতা দেখে আমার মনে হল, ওটা গাড়িও নয়, জিপও নয়, ট্রাকও নয়, অন্য কিছুর আলো। তবে কীসের আলো? মঙ্গল গ্রহ থেকেই এল কি এই প্রায়-নিঃশব্দ আশ্চর্য যান? ওই দিকেও পথটা ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। তার মানে আমরা যেখানে বসে আছি আর ওই অলৌকিক যানটি যেদিক থেকে আসছে, এই দু'দিকেই উঁচু, আর এই দুই টিলার মধ্যে একটা উপত্যকা—তবে তা বিস্তারে সামান্যই। গাড়িটা পাথরের বুক কেটে বানানো অসমান পথের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে, অথচ এখনও তার এঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। ভারী আশ্চর্য তো! পরক্ষণেই বুঝলাম যে এঞ্জিন বন্ধ করে আসছে গাড়িটা, শব্দ যাতে না হয়, সেই জন্যেই। এমন সময়ে পথেরই একটা বাঁকে গাড়িটা আসতেই বোঝা গেল যে সেটা একটা তিন চাকার টেম্পো। অবাক হলাম, তিন চাকার টেম্পো নিয়ে কী করছে কারা এই জঙ্গলে?

টেম্পোটা থেমে গেল। আর তার হেডলাইট দুটোও নিভে গেল। ঝুপ-ঝাপ করে চার-পাঁচজন লোক টেম্পোর পেছন থেকে এবং ড্রাইভিং কেবিন থেকে নেমে পড়ল। একজন গলা তুলে বলল, বড়ি বেহেতরিন সিন হ্যায় হো হিঁয়া। বম্বেকি ফিল্মওয়ালা লোগ হিঁয়া আকর শুটিং কাহে না করতা? শালে লোক সব বুদ্ধু হ্যায়।

অন্যজন বলল, ক্যা উজালা রাত!

আরেকজন বেসুরো গলায় গাইল: উজালা, উজালা। চার বুঁদওয়ালা।

আরও একজন গলা তুলে বলল, আর এ আফজল। সুরত হারাম। তু করতে

ক্যা থা ইতনা টাইম?

যেখান থেকে টর্চের আলো জ্বলতে দেখেছিলাম আমরা সেদিক থেকে আফজল নামক লোকটা বলল, মাচান বাঁধনেমে টাইম তো লাগেগা।

আরে উল্লু। দো ঘণ্টা।

নেহি। ম্যায় বান্ধ তো লিয়া থা মগর টর্চ ফেককর জারা দিখ লেতা থা ঘোড়ফরাস যব আওবে করেগা তব উ মাচানসে ধড়কানেসে কোই দিককত আয়েগি ক্যা নেহি।

কওনসি দিককত? আজিব আদমি হ্যায় ইয়ার তু।

হ্যায় কিতনা দূর হিঁয়াসে মাচান?

হ্যায় থোড়া দূর। মগর ইস পাহাড় কি উস তরফ।

কে যেন জোরে বলল, তব তো বহতই দূর।

আরে দাদা চিল্লাও মাত। হর দোরখ্ কি কান হোতে হে। তুমলোগ ন্যাশনাল পার্ক কি অন্দর ঘোড়ফরাস মারনেকি ইন্তেজাম কর রহা হ্যায়, ইয়াদ রখনা। পাক্কড় যানে সে বিশ সাল অন্দর রহনা পড়েগা। হাঁ।

ছোড় ইয়ার। পাক্কাড় কেইসা যায়েগা? পাক্কাড় যানা অ্যায়সি আহসান হোতা থা তো আজ হাজারিবাগ কি জেলমে জাগ্গে নেহি হোতে থে। সমঝা। বুদ্ধু কঁহিকা।

তারপর বলল, আও, জারা চড়কে দিখো তো মাচান মজবুত বনা ক্যা।

আরে বৈঠেগা তো কাল্লু মিঞা এক্কেলেই। মাচানমে বৈঠকর হামলোগোনে ক্যা কাওয়ালি গাওবে গা? কাল্লু যাও, তুমহি দিখকর আও। অগর গোলি ভি চালায়া ঔর ঘোড়ফরাস ভি নেহি ধড়কায়া, তো তুমকো মারকর হামলোগ পায়া ঔর লাব্বা বানায়গা।

আরেকজন বলল, ঠিকসে নিগা তো কিয়া না? ইস রাস্তেমে ঘোড়ফরাসকি ঝুন্ড সাচমুচ যাতে ক্যা নাল্লামে ইস পাকদণ্ডিসে?

আরে হাঁ জি হাঁ। সাম হোতে হোতেহি পুরা ঝুন্ড উও বাঁয়াওলা বড়া পাহাড়সে উতারকে হারহাদমে পানি পিনেকি লিয়ে আতে হ্যায়।

তো আজ আয়া কাহে নেহি?

আওবেগা। কুছ গড়বড়-সড়বড় লাগা হোগা উসলোগোকা। ম্যায় বাত্তি ভি ফেকা থা না!

কিউ ফেকা থা?

আরে! বোলা না! গোলি চালানেমে কোই মুসিবত হোগা ক্যায়া নেহি দিখনে কি লিয়ে।

হিঁয়াকি গোল্লিকি আওয়াজ বাংলা, গাড় লোগোঁকি গুমটি আউর রাজডেরোয়াকি নাকা তক পৌঁছে গা তো নেহি।

আর্এ নেহি নেহি। উও সব জাগেমে রাত আট বাজিতক টারানজিস্টার আউর

টিভিমে বহুত তেজ গানা-বাজানা হোগা। উসব কি ইন্তেজাম হাম পুরা কর চুকা। ফিক্কর মত করো।

আরে ঘোড়ফরাস ক্যা তুমহারা জরুকা নোকর হ্যায় যো আট বাজিকা অন্দর হি আওবেগা।

আওবেগা। আওবেগা। আট বাজি কি অন্দর নেহি আনেসে ঝামেলা মচ যায়েগা। তব তো নাঙ্গা হাতমে লওটকে যানা হোগা কাল। নাসির মিঞাকি দুবারা ফিন শাদি করনা পড়েগা ঘোড়ফরাসকি কাবাব খানেকে লিয়ে।

হায়। হায়। জেসমিনকি তো তব তাল্লাকই দেনা হ্যায়।

অ্যাই। জবান সামহালকে। মজাক মত উড়াও।

সব শেষে যে লোকটি কথা বলল, সেই নিশ্চয়ই নাসির মিঞা। তারই বিয়ে কাল। তারই শ্বশুরবাড়িতে বরযাত্রীদের খাওয়াবার জন্যেই এই নীলগাই মারার পরিকল্পনা করা হচ্ছে তাহলে।

ইক সিগারেট ছোড়।

একজন বলল। গলা শুনে মনে হল ওই জলিল।

লো।

মাচিস?

দেশলাই জ্বালাবার শব্দ শোনা গেল না অত দূর থেকে কিন্তু আলো দেখা গেল। ওরা সকলে অনেকেই দূরে ছিল কিন্তু ওদের গলা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

এমন সময়ে হাওয়াটা কোনও ভয়-পাওয়া জানোয়ারের মতো আমাদের পেছন থেকে হঠাৎই দৌড়ে গেল ওদিকে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের মধ্যে একজন শেয়ালের মতো নাক উঁচু করে হাওয়াতে গন্ধ নিল। তারপরই গলা নামিয়ে বলল, খামোশ। কওনচি কি বু আ রহি হ্যায়? খুশবু? মিলা তুমলোগোঁকো?

লাগতা হ্যায়, আরেকজন বলল, কোই আনজান চিজ কি বু।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন বলল, ইয়ে খুশবু কোই ইত্তর-উত্তর কি নেহি। জিনকি হোগি। চল জলদি ভাগা যায় হিঁয়াসে।

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ধপাধপ করে টেম্পোতে উঠে পড়ে ওরা। টেম্পো ঘুরিয়ে জোরে চালিয়ে সত্যি সত্যিই চলে গেল।

ভাগ্যিস পথটি সোজা ছিল না, তাই ওদের হেডলাইট আমাদের ওপরে কখনওই পড়েনি। টেম্পো ঘোরাবার সময়ে আশঙ্কা ছিল, কিন্তু আমরা অনড় হয়ে গাছপাতার আড়ালে বসেছিলাম, তাই আলোর ঝলক পড়লেও আমাদের দেখতে পায়নি।

নীরবতা কাটিয়ে প্রথম কথা বললাম আমি। ভটকাইকে বললাম, আরও মেয়েদের পারফ্যুম মাখ, পুরুষ হয়ে। তোর জন্য প্রাণ যেতে পারত আমাদের। তোকে এই জন্যই জঙ্গলে নিয়ে আসতে বারণ করি আমি ঋজুদাকে।

সে কী?

ভটকাই আকাশ থেকে পড়ে বলল, ওরা নিশ্চয়ই ঋজুদার পাইপের টোব্যাকোর গন্ধ পেয়েছিল।

তোর গায়ের গন্ধ পায়নি?

বাঃ রে। বউদি আমার জন্যে নিয়ে এসেছিল সিঙ্গাপুর থেকে। মেয়েদের হতে যাবে কেন এ পারফ্যুম?

তা না হলে ওরা জিন বলে।

ঋজুদা হেসে উঠল আমার কথাতে। বলল, এমনিতেই ভীমরুলের কামড়ের ভয় থাকে বলে জঙ্গলে শুধু পারফ্যুমই নয়, কোনওরকম সুগন্ধীই ব্যবহার না করাই উচিত। অমরকণ্টকে আমার পরিচিত এক সাধু মারা গেছিলেন ভীমরুলের কামড়ে জঙ্গলে ধূপ জ্বালিয়ে। ওপরেই চাক ছিল।

জিন কী জিনিস? হামদু বড় যা খায় দুপুরবেলা লিমকা দিয়ে?

ভটকাই বলল।

হামদু বড়টা কী জন্তু আবার?

ঋজুদা বলল।

আরে আমার বড়মামা। মামাদের আমরা হামদু বলি। হামদু বড়, হামদু ছোট এরকম।

তা বলার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে তোর এই গণতন্ত্রে। হামদু কেন, তুই ইচ্ছে করলে মামদোও বলতে পারিস। তোর বড়মামা ব্রতীনের চেহারা ও চরিত্রর সঙ্গে তাহলে মানাবেও ভাল। তবে তোর হামদু বড় দুপুরবেলা যা খায়, সেই জিন আর এই জিন এক নয়। এই জিন হচ্ছে পেত্নি। মুসলমান পেত্নি। পুরুষদের জলে ফেলে ডুবিয়ে মেরে ফেলে। এইরকম ডাইনি-জ্যোৎস্নার রাতেই তারা বেরোয় আর জঙ্গলেই তোর মতো গন্ধগোকুলদের ধরে ধরে ঘাড় মটকায়।

ঋজুদা হাসি থামিয়ে বলল, যাই হোক রুদ্র, ভগবানের দয়াতে কাল রাতেই যদি কাজটা সমাধা হয়, তবে বাকি কদিন নিজেদের মতো ছুটি কাটানো যাবে, কী বল!

তারপরই বলল, ব্যাপারটা কী বুঝলি বল তো তোরা?

ভটকাই বলল, ব্যাপারটা কী তা বলার আগে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল ঋজুদা।

কী প্রশ্ন?

ওরা যে হাজারিবাগি হিন্দিতে কথা বলছিল আমি অনেক শব্দের মানেই বুঝতে পারিনি।

হাজারিবাগি হিন্দিতে কথা ওরা তেমন বলছিল না। হাজারিবাগি হিন্দির বিশেষত্ব হচ্ছে 'য়া' যোগ করা অনেকেই শব্দের শেষে।

যেমন?

যেমন জিপকে বলবে জিপোয়া, টাঁড়কে বলবে টাঁড়োয়া, বাঘকে বলবে বাঘোয়া—এইরকম আর কী।

তা কী শব্দ তুই বুঝতে পারলি না?

ধড়কান বা ধড়কানা, তারপর ঝুণ্ড আর তারপর ঘোড়ফরাস।

ঋজুদা বলল, ধড়কান আর ধড়কানার মানে আলাদা। ধড়কান হচ্ছে ধুপপুক করা। বুক ধড়কানো। সেই শায়ের আছে না?

কী শায়ের?

আমি বললাম।

'উলঝি সুলঝি রহনে দো
কিঁউ শরপর আফৎ লাতি হো
দিল্‌কা ধড়কান বাড়তি হ্যায়
যব বালোঁকো সুলঝাতি হো।'

ঋজুদা বলল।

মানে কী হল? এ তো দেখছি এক বিপদ থেকে উদ্ধার করে অন্য বিপদে এনে ফেললে।

ঋজুদা বলল, এও আমাদের নাজিম সাহেবেরই মুখ থেকে শোনা। মানে হল, উসকোখুসকো আছ, তাই থাক, অত সাজগোজের দরকার কী? কেন আমার মাথায় বিপদ ডেকে আনবে? তুমি চুল আঁচড়ে এলে আমার বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যায়।

বাঃ। কী সুন্দর।

আমি বললাম।

তারপরই বললাম, ঋজুদা, তুমি ভটকাইকে ওয়ার্নিং দিয়ে দাও। ওর তো কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। এটা আবার ওর ছোটবোন কিটির কোনও বন্ধুর ওপরে না ঝেড়ে দেয়।

ঋজুদা হেসে উঠে বলল, ও নিজ দায়িত্বে কিছু করে যদি চড়চাপড় খায় তো খাবে। তারপর বলল, ধড়কা দেগা জানে মেরে দেব। ফেলে দেব, গুলি করে। ধড়কান আর ধড়কায়েগার মধ্যে তফাত আছে।

নেক্সট কোয়েশ্চেন?

ঝুন্ড মানে কী?

ঝুন্ড মানে দল। থুড়ি পাল। হাতির ঝুন্ড, শুয়োরের ঝুন্ড, বিদের ঝুন্ড, গাইয়ের ঝুন্ড, নীল গাইয়ের ঝুন্ড, এইরকম আর কী। ইংরেজিতে যাকে বলে herd। কিন্তু সিংহ যদিও দল বেঁধে থাকে, সিংহের বেলা কিন্তু herd হবে না, হবে pride।

তাই?

ভটকাই বলল।

নেক্সট কোয়েশ্চেন?

'নিগা কিয়া থা'? মানে কী?

'নিগা বা নিগাহ' উর্দু শব্দ। মানে চোখ। 'নিগা কিয়া থা' মানে দেখেছিলে বা

নজর চালিয়েছিলে কি?

তারপর বলল, দোরখ মানে কী?

আরে! এ তো মহা মুশকিলেই ফেলল দেখছি। আমি কি ল্যাঙ্গুয়েজের ক্লাস করব এখানে? দোরখ মানে পেঁড়।

পেঁড় মানে? পেঁড়ার ভাই?

ধ্যাৎ।

বিরক্ত হয়ে ঋজুদা বলল, পেঁড় মানে গাছ রে হাঁদা। উঃ। তোকে নিয়ে আর পারা যায় না।

আর ঘোড়ফরাস?

ঘোড়ফরাস, নীলগাইয়ের স্থানীয় নাম। বিহারের হাজারিবাগ, পালামৌ, তিলাইয়া ইত্যাদি অঞ্চলে নীলগাইকে বলে ঘোড়ফরাস। ইংরেজি নাম Blue Bull। নাজিম সাহেবের ইংরেজিতে 'বুলু বুল'।

এর মাংস কীরকম খেতে ঋজুদা যে বিয়েতে এর কাবাব খেতে হবে?

আরে এ একরকমের গোরু তো। বাংলায় বলে বনগাই। হিন্দুরা খায় তো নাই-ই, মারেও না। তাই যেখানে এদের সংখ্যা বেশি এরা ভারী ক্ষতি করে ফসলের। তবে এখন আর কোন জানোয়ার বেশি আছে দেশে? সর্বভুক মানুষ সবই খেয়ে শেষ করে এনেছে। এদের মাংস বড় শম্বরের মতো, বারাশিঙার মতো। শম্বরের ও বারাশিঙার মাংস খেয়েছি অনেক সময়ে। একটুও ভাল নয়। অনেক সেদ্ধ করে নানা উপচারের সঙ্গে কাবাব করে খেতে মন্দ লাগে না। কষা মাংসও মন্দ লাগে না। তবে মুসলমানেরা তো গোস্ত খায়ই, ওদের—

যা বোঝা যাচ্ছে আমাদের কপাল খুবই ভাল। আজ কাজমি সাহেব যদি রাতে খাওয়ার জন্যে আমাদের হারহাদ বাংলোতে আসেনই তবে ওঁকে টিপস দিয়ে দিলে বাকি কাজটা উনি এবং পুলিশের লোকেরা মিলেই সমাধা করতে পারেন। আমাদের তাহলে আর ছুটি কাটাতে এসে গুলিগোলার হুজ্জোত করতে হয় না।

তোর কি আজকাল এইসব বিপজ্জনক ব্যাপার-স্যাপারকে, অ্যাডভেঞ্চারকে, হুজ্জোত বলে মনে হচ্ছে না কি রে রুদ্র?

না, আমার জন্যে নয়। আমাদের সঙ্গে মেয়েদের পারফ্যুম-মাখা অনভিজ্ঞ এক খোকাবাবু আছেন তো। তাঁর মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে হয় বইকী।

ঋজুদা আমাদের কথাকে পাত্তা না দিয়ে বলল, বিহারে তো এখন একেবারে নৈরাজ্যের অবস্থা, পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও খারাপ। রাবড়ি দেবী প্রশাসনকে একেবারে রাবড়ি করে দিয়েছেন। কাজমি সাহেব পুলিশের সাহায্য চাইবেন বলে মনে হয় না। এই কদিন আগেই চৌপারণে কাণ্ডটা কী ঘটল তা পড়িসনি কাগজে?

না। কাগজ আমি পড়ি না। বিজ্ঞাপনই যদি পড়তে হয় তবে Admag পড়ব। কাগজ পড়ে পয়সা ও সময় নষ্ট কেন করতে যাব?

ভটকাই বলল।

তারপরই বলল, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনেও কি জ্যোতিবাবুর জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে না?

ঋজুদা ভটকাইয়ের রাজনৈতিক মতামতকে উপেক্ষা করে বলল, কী গাছের নীচে বসে ছিলাম আমরা এতক্ষণ? লক্ষ করেছিলি?

ভটকাই ওর কাঁধে-ঝোলানো ঝোলা থেকে ছোট টর্চটা বের করে গাছটাতে ফেলতেই উজ্জ্বল লাল দুটি চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল; সেই আলো দুটির মধ্যের ফাঁক বড়জোর ইঞ্চি চারেক।

ঋজুদা হেসে বলল, রতনে রতন চেনে।

বলতেই কে এক গেছো-দাদা সড়সড় করে ডাল বেয়ে আরও ওপরের ডালে উঠে গেল।

কী ওটা? আমি বললাম।

উল্লু।

বলেই, হাসলি ঋজুদা। তারপর বলল, গাছটা আমলকী। আমরা এসে গাছের গুঁড়ি গার্ড করে বসাতে ও বেচারি গাছ থেকে নামার অবকাশ পায়নি আর। চল, আমরা যাই, ও-ও ফিরে যাক ওর ডেরাতে। তবে খুশিও হয়েছে খুবই ওর স্কুলের বন্ধুকে এতদিন পরে দেখে। কি বল ভটকাই।

এই তাহলে উল্লুক?

আমি বললাম।

উল্লু। আগে দেখেছিস, তবে চিড়িয়াখানাতে। জঙ্গলে দেখলি এই প্রথম। তোরা ভাগ্যবান আমি নিজেও এর আগে মাত্র একবারই দেখেছিলাম এই অঞ্চলেই। শিবসাগরের ক্রিশ্চিয়ান মাইকা কোম্পানির পাঁচ নম্বর বাংলো, যেটি ওদের গেস্টহাউস ছিল, তার সামনের জঙ্গলে। তখন আমি স্কুলে পড়ি। এমনই রাতের বেলাই দেখেছিলাম। জেঠুমনির সঙ্গে ফিরে আসছিলাম রজৌলির ঘাট থেকে পাঁচ নম্বর বাংলোতে। যুগলপ্রসাদ টর্চ ফেলে দেখিয়েছিল একটি বয়ের গাছে। জিপ গাড়ির ডিপার করা হেডলাইটে দূর থেকে সে লাল চোখের ঝিলিক দেখতে পেয়েছিল গাছের ওপরে, তাই জিপ গাছের নীচে দাঁড় করিয়ে দেখিয়েছিল আমাদের।

আমি ভটকাইকে বললাম, এই উল্লুর সঙ্গে ভাল্লুকের কোনও সম্পর্ক কিন্তু নেই। ও কালপেঁচা। গভীর জঙ্গলের বাসিন্দা। যখন ডাকে, তখন অনভিজ্ঞর নাড়ি ছেড়ে যায় ভয়ে।

তাই? জানোয়ার না, পাখি।

ইয়েস।

আমি বললাম। এরপর আমাদের কী কর্তব্য ঋজুদা?

বাংলোতে ফিরে গেলে হাঁটা হবে তিন কিমি মতো। ভাল করে চান করে আমরা হারহাদ বাংলোর বারান্দাতে বসব। নদীর আওয়াজ শোনা যাবে ঝরঝর

করে। রাত যত বাড়বে নদীর আওয়াজ তত বাড়বে। তারপর জামাল বিরিয়ানি আর কাজমি সাহেবকে নিয়ে এসে গেলে কবজি ডুবিয়ে বিরিয়ানি খাব। তারপর কাজমি সাহেবের জিপে করে রাজডেরোয়ার পার্কে মাইল পঁচিশ-তিরিশের একটা চক্কর লাগিয়ে ফিরে এসে আবার বারান্দাতে বসে নদীর গান শুনব। তারপর যার যেমন ইচ্ছা ঘুমোতে যাব এক এক করে।

আর কালকের প্রোগ্রাম?

কাল সকালে তোদের টাইগার-ট্র্যাপ দেখাব। পদ্মার রাজারা কী করে বাঘ ধরতেন, তাই। রাজার ডেরা ছিল বলেই তো এই জায়গার নাম রাজডেরোয়া। করদ রাজ্যের রাজা। এই সমস্ত অঞ্চল ছিল তাঁদের 'শুটিং প্রিজার্ভ'। অন্য কারও অধিকারই ছিল না এ বনে ঢোকার বা শিকার করার। আমাদের দেশের অধিকাংশ জঙ্গলই তো আগে তাই-ই ছিল। উত্তরবঙ্গের রায়কত রাজাদের বৈকুণ্ঠপুর, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের সিমলিপাল, পালাম্যুর গাড়োয়া, রাংকা ইত্যাদি, মধ্যপ্রদেশে মান্দালা, রেওয়া, রাজস্থানের বান্ধবগড়, আলোয়ারের রাজাদের সারিসকা। তোদের একবার সারিসকাতে নিয়ে যাব। আমরা পূর্বাঞ্চলের লোক, আমাদের চোখে একেবারে অন্যরকম লাগে। জঙ্গল থেকে, জানোয়ারের চেহারা।

তারপর একটু থেমে বলল, তখনকার দিনে রাজাদের প্রহরীদের যতটুকু ভয় পেত মানুষে এখন পুলিশ বা বনরক্ষীদের তা আদৌ পায় না। সবরকম আইন অমান্য করাটাই আমাদের স্বাধীনতার একমাত্র প্রকাশ হয়ে উঠেছে। ভাবলেও বড় দুঃখ হয়।

তারপর? মানে কাল সকালে?

রাজডেরোয়া ন্যাশনাল পার্ক দেখে বেরিয়ে যখন আমরা ডানদিকে হাজারিবাগের দিকে যাব, তখন ডানদিকেই দেখতে পাবি রাজপ্রাসাদ। ছেলেবেলাতে যখন আসতাম তখন চাঁদনি রাতে সাদারঙা ওই নির্জন খালি প্রাসাদ দেখে বুক ছমছম করত। এখন তো শুনেছি কী সব সরকারি অফিস-টফিস হয়েছে। নাস্তার পরে হাজারিবাগ শহরে তোদের নিয়ে যাব। হাজারিবাগ শহরের তিন দিকে তিন পাহাড়ের প্রহরা।

কী কী পাহাড়?

সীতাগড়া, সিলওয়াব আর কানহারি। কানহারিই সবচেয়ে কাছে শহরের। কানহারির ওপরে একটি সুন্দর বনবাংলা আছে। আজই কাজমি সাহেবকে বলে দিলে কাল সকালে ওখানে নাস্তাও করতে পারি। তারপর নিয়ে যাব হাজারিবাগ শহরের বড়ি মসজিদের কাছে Bengal Fancy Stores-এ নাজিম সাহেবের দোকানে। সেখানে এক কাপ করে লাল চা আর কালি-পিলি জরদা দিয়ে দু'খিলি পান খেয়ে যাব নাজিম সাহেবের কবরে মোমবাতি দিতে।

কবরখানাটা কোথায়?

হাজারিবাগ-টুটিলাওয়ার পথে। যে পথ সীমারিয়া হয়ে জাবড়া মোড় এবং

চাতরা চলে গেছে।

কাল রাতে কি আমরা বুলু-বুল অপারেশনের অ্যাকশন ফোর্সে থাকব?

আমি বললাম।

ধীরে বৎস, ধীরে। কালকের কথা কালই হবেখন।

তারপর বলল, ওই যে বললাম সীতাগড়ার কথা, ওই পাহাড়ের পাদদেশেই সুব্রত সীতাগড়ার মানুষখেকো বাঘটিকে মেরেছিল ষাটের দশকের গোড়াতে টুটিলাওয়ার ইজাহারুল হকের সঙ্গে।

তাই? আমি আর ভটকাই সমস্বরে বললাম।

দুটো পাগলা কোকিল সাতসকালে এমন ডাক ডাকতে লাগল যে শুয়ে থাকা আর সম্ভব হল না। উঠে দেখলাম, মিস্টার ভটকাই ইতিমধ্যে উঠে পড়ে হারহাদ নদীর ঝরঝরানি শুনছে কোমরে হাত দিয়ে বারান্দাতে দাঁড়িয়ে।

নদীর শব্দটা সারারাত ঘুমপাড়ানি গানের মতোই কানে বেজেছে আমাদের। রাত যত গভীর রয়েছে, শব্দটাও ততই গভীরতর হয়েছে।

হঠাৎই ভটকাই আমার দিকে ফিরে বলল, কী বুঝতাছস?

কী?

এরেই কয়, লানাবাই।

সেটা কী?

ইংরেজি তো মাঝে মধ্যেই ফুটাইস দেহি আর লানাবাইই জানস না?

দুর্গাবাই জানি, জিজাবাই জানি, শিবাজি মহারাজের মায়ের নাম, কিন্তু লানাবাই কোন বাই?

অ্যালিবাই তো জানস?

নাঃ।

জানস না? হাঃ। আরে। যারে কয় ছুতা।

ছুতা?

ইয়েস। ছুতানাতা। বাহানা। ই সবেরেই ইংরেজিতে কয় alibi। বোঝলা সর্বজ্ঞ।

এমন সময়ে ঋজুদা উঠে বারান্দাতে এল। বলল, কোথায় এমন সুন্দর জায়গাতে চুপ করে বসে সকালবেলার শব্দ-গন্ধ সব উপভোগ করবি, তা না! তারপরই বলল, এই কাজিয়া আরম্ভ করল কে?

কে আর? ভটকাই। লানাবাই কে, লানাবাই কী? এসব।

লালাবাই?

বলেই ঋজুদা হেসে ফেলল। বলল, লালাবাই? ঘুমপাড়ানি গানের ইংরেজি। কী রে রুদ্র, জানিস না তুই?

ভীষণ রাগ হয়ে গেল আমার। বললাম, সাতসকালে উঠে মানুষকে কনফিউজ করবার জন্যে যদি লালাবাইকে লানাবাই উচ্চারণ করে তাহলে বুঝব কী করে! বিশেষ করে এমন লোকে যদি তা করে, যার ইংরেজি জ্ঞান সম্বন্ধে আমার ধারণাটা

আদৌ উঁচু নয়।

বেশ। এবারে থাম। এবং চা খেয়ে তৈরি হয়ে নে। আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

জামালের বাড়ি গিয়ে পাঁঠার মগজ দিয়ে লাচ্চা-পরোটা খাব না আমরা ব্রেকফাস্টে? সে যে দাওয়াত দিয়ে গেল।

ভটকাই মনে করিয়ে দিল।

সেটা মন্দ নয়। যার মগজ বলে কিছু নেই সেই পাঁঠার মগজ দিয়েই শুরু করা উচিত। আমি বললাম।

কাজমি সাহেবের বাড়িতে কী খাবি তোরা দুপুরে?

এই বাঙালি পেটে দু'বেলা অমন মোগলাই খানা খাওয়া কি ঠিক হবে ঋজুদা? পায়া, লাব্বা, চৌরি, টেংরি-কাবাব, সিনা-ভাজা, কবুরার-চাট, চাঁব, গুলহার কাবাব, বটি কাবাব, শাম্মি কাবাব, শিক কাবাব তার পর উমদা বিরিয়ানি...।

তার ওপর ফিরনি...ভটকাই বলল, আমার কথা কেটে।

ঠিক বলেছিস। সকাল সকাল গিয়ে কাজমি সাহেবকে ওঁর দাওয়াতটা পোস্টপন করতে বলতে হবে। আমরা তো আছিই। পরে একদিন হবে। আমরা তো ওঁদের সকলকে নেমন্তন্ন করব একদিন। এখানে।

রাঁধবে কে?

কেন আমি, আমরা। আর জেঠুমনির বন্ধু বদি জেঠুর বাড়ি থেকে ওড়িশাবাসী রাঁধুনি পটা ঠাকুরকে ধরে নিয়ে আসব। সে যে বাঙালি রান্না রাঁধে একবার তা খেয়ে দেখতে পেলে মোগল নবাবেরা তাদের বাবুর্চিদের কোতল করে দিত।

বদি জেঠু কে?

বদি রায়। ধানবাদের কাতরাসের মুষ্টিমেয় বাঙালি কয়লা খাদানের মালিকদের মধ্যে একজন। হ্যাঁ, পয়সাওয়ালা মানুষ জেঠুমনির দয়াতে অনেকই দেখেছি কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে অমন 'রহিসি' বেশি মানুষের মধ্যে দেখিনি। কয়লা খাদান সব যখন সত্তরের গোড়াতে জাতীয়কৃত হল, তারপর বদি জেঠু তাঁর প্রিয় জায়গা হাজারিবাগে কাতরাস থেকে পোঁটলাপুঁটলি গুটিয়ে এসে থিতু হলেন। এই সেদিনও আশি বছর বয়সেও মাথায় হেডব্যান্ড বেঁধে ব্যাডমিন্টন খেলতেন নাতিপুতিদের সঙ্গে। এত দামি দামি বন্দুক, রাইফেল, এতরকম ক্যামেরা আর কোনও বাঙালির বাড়ি দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তারপর বলল, গোপালদের ভাইয়ের মতো ছিলেন তাঁর ভাইপো প্রণবদা, নর্থব্রুক কোলিয়ারির। মানভূমিয়া ভাষায় নাকি-নাকি সুরে কথা বলতেন ওঁদের সঙ্গে মজা করে। খুব ভাল ট্র্যাপ ও স্কিট-শুটার ছিলেন প্রণবদা। অলিম্পিকেও গেছিলেন।

এই তোমার দোষ ঋজুদা। একজনের কথা উঠলে তোমার স্মৃতির মালগাড়ি আজকাল ডিরেইলড হয়ে যায়। গ্র্যান্ড কর্ড থেকে মেইন লাইনে চলে যাও, মেইন

লাইন থেকে গ্র্যান্ড কর্ডে।

ভটকাই বলল।

ঋজুদা হেসে ফেলে বলল, সরি। কথাটা ঠিকই বলেছিস। আজকাল বড় নস্টালজিক হয়ে যাচ্ছি। বুড়ো হচ্ছি না কি রে?

তোমাকে বুড়ো হতে দিচ্ছে কে?

ঋজুদা বলল, যা, তৈরি হয়ে নে। চা খেয়েছিস তো?

না। এখনও দেয়নি তবে নিয়ে আসছে বোধ হয়।

তবে চা খেয়ে তোরা তৈরি হয়ে নে, আমিও চা খেয়ে পাইপটা ধরিয়ে বুদ্ধির গোড়াতে একটু ধোঁয়া দিয়ে নি। রাতে তো নাটক আছে। স্ট্র্যাটেজিটা এঁকে ফেলতে হবে।

কাজমি সাহেব যা বললেন, তাতে জানা গেল যে নাসির মিঞা, মানে, যার বিয়ে, তাকে তো উনি চেনেন। পাগমলে নাসিরের একটা জামা-কাপড়ের দোকান আছে। নাসিরকে চিনলে ওর বন্ধুবান্ধবদের খুঁজে বের করাও অসুবিধের নয়। তবে কাজমি সাহেবের বরাতির দাওয়াত নেই। বউভাতের দাওয়াত আছে। আর নীলগাই তো ওরা বিয়েতেই বানাবে বরাতিদের জন্যে।

ওই কাল্লু মিঞা লোকটাকেও উনি চেনেন। বললেন, যদি ওই কাল্লুই সেই কাল্লু হয়। কাল্লু মিঞা কসাই। বড় মসজিদের কাছে ওর বড়াগোস্তের দোকান আছে। সে যে চোরাশিকারও করে, সে খবরও তাঁর কানে এসেছে কিন্তু সাবুদ-প্রমাণ ছাড়া ধরবেন কী করে! গোস্তের সঙ্গে পুরনো এবং ঘনিষ্ঠ খদ্দেরদের মাঝে মাঝে শম্বর, কোটরা চিতল আর নীলগাইয়ের মাংসও সাপ্লাই দেয় চড়া দামে, এও শুনেছেন।

কাজমি সাহেব তো বলছিলেন বরাতিরা তো আস্ত একটা নীলগাই খেয়ে উঠতে পারবে না। অন্য নানা পদও তো থাকবে। বাকিটা কাল্লু মিঞা নিশ্চয়ই বিক্রি করে দেবে ভাল মুনাফাতে।

ভটকাই বলল।

ঋজুদা বলল, হবে হয়তো।

ইতিমধ্যে চৌকিদার ট্রে-তে করে চা নিয়ে এল।

ঋজুদা বলল, দাঁড়া। সাজ কোম্পানির বিস্কিট এনেছি সঙ্গে। খেয়ে দেখ। কেষ্টদার কোম্পানির বিস্কুট—বিস্কুট তো নয় যেন ছেলেবেলার হান্টলি-পামার।

আমরা খেয়ে দেখলাম চায়ের সঙ্গে। সত্যিই চমৎকার বিস্কিট। নানারকম প্যাকে দিয়েছেন উনি ঋজুদাকে। ব্রিটানিয়ার সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে সহজেই।

এই কেষ্টদা কে ঋজুদা?

কেষ্টধন পাল। খুব বড় একজন বাঙালি ব্যবসাদার-কাম-শিল্পপতি। 'আজকাল' কাগজে ওঁর একটি ইন্টারভিউ বেরিয়েছিল, পড়িসনি?

আমি বললাম, নাঃ। মিস করে গেছি। যদিও 'আজকাল' আমি রোজই রাখি।

কাজমি সাহেবের বাড়িতে, জামালের বাড়িতে নাস্তা করে যখন গিয়ে পৌঁছলাম

তার আগেই একরামের বাড়ি থেকে দাওয়াত পেছোনোর কথা ওঁকে একরামই জানিয়ে দিল আমাদের কথামতো। একরাম জামালের চাচেরা ভাই।

কাজমি সাহেব বললেন, আজ সন্ধের সময়ে হুজ্জোতি আছে তাই হড়বড়ি হবে দুপুরের খাওয়াতে। ভাল করে জমিয়ে খেতে পারবেন না। ভালই হল পোস্টপন করে। এই বইটি www.boiRboi.blogspot.com থেকে ডাউনলোডকৃত।

তারপর বললেন, শুনুন। সন্ধেতে আপনাদেরই ব্যাপারটাতে লিড নিতে হবে। আমি বা আমার অ্যাডিশনাল ডি এফ ও আজ জঙ্গলে গেলে ওদের সন্দেহ হবে। তবে আমি নিজে অপেক্ষা করব হারহাদের বাংলোতে।

ওরা বুঝতে পারবে না?

না। চেকনাকা দিয়ে ঢুকব না। নতুন শর্টকাট দিয়ে, যে শর্টকাট দিয়ে আপনারা কাল বিকেলে ঢুকেছিলেন তা দিয়ে ঢুকে আসব মন্টুবাবুর অ্যাম্বাসাডরে। জিপও আনব না। আসবও মুফতিতেই।

মুফতিটা কী ব্যাপার?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

ঋজুদা হেসে বলল, 'মুফতিতে' মানে, প্লেইন ড্রেসে। অর্থাৎ ইউনিফর্মে নয়। ইংরেজিতেও এই শব্দ চালু আছে।

ও। ভটকাই বলল।

আমিও জানলাম শব্দটি। আগে জানা ছিল না।

আপনারা যা সাহায্য চাইবেন পাবেন। কিন্তু ব্লু-বুলটাকে মেরে ফেলার আগেই ওদের ধরতে হবে। ব্যাপারটা কিন্তু খুবই রিস্কি হবে। ওরা তো আর্মডই থাকবে। তা ছাড়া ওরা যদিও বলছে যে কালু মিঞা একা বসবে মাচাতে কিন্তু ওরা জানে যে, গুলির শব্দের পরে ফরেস্ট গার্ডেরা যদি সে আওয়াজ শুনতে পায়, তাহলে তারাও আর্মড হয়ে আসবে এবং একটা কনফ্রনটেশন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই আমার দৃঢ় ধারণা, ওদের দলে আরও দু'-তিনজন, কম হলেও আর্মড থাকবে। ওরা এও জানে যে, চেকনাকাতে ওয়্যারলেস আছে এখন। ওয়্যারলেসে খবর পেলে শালপর্ণীর গার্ডরাও চকিতে চলে আসবে। হাজারিবাগ থেকে পুলিশ ফোর্সও আসবে প্রয়োজনে।

তারপর বললেন, আমার সঙ্গে পুলিশের এস. পি. পাসোয়ান সাহেবেরও কথা হয়েছে। আমারই সাজেশনে উনি ওঁর আর্মড পুলিশের একটি ক্র্যাক-প্ল্যাটুন রাখবেন ট্রাকে করে রাজডেরোয়ার চেকনাকার ওদিকে। মানে, বরহির দিকে। এই আধ কিমি মতো দূরে। তারা এসে ছোট্ট ট্রাকের বনেট খুলে পথের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকবে বরহি-হাজারিবাগ রোডে। ঠিক সন্ধের মুখে মুখে। যে সব গাড়ি বা বাস বা ট্রাক যাতায়াত করবে ওই পথে, তারা ভাববে, এঞ্জিন ট্রাবল হয়েছে। পুলিশের ট্রাকেও ওয়্যারলেস থাকবে। চেকনাকা থেকে খবর পেলে তারা দশ মিনিটে স্পটে পৌঁছে যাবে। নাজিম সাহেবের কবরখানা হয়ে আমরা এই নওজওয়ানদের

রাজডেরোয়ার টাইগার-ট্র্যাপ দেখিয়ে জায়গাটাতে একবার যাব। তবে আমি নিজে যাব না। আমি রাজডেরোয়া থেকে ব্যাক করব।

কেন?

বাঃ! আমাকে যে সকলেই চেনে। আমি চেকনাকা অবধি গেলেই জানাজানি হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমার ডিপার্টমেন্টের সকলেই যে ধোওয়া তুলসিপাতা এমন তো নয়। ওদের চর কেউ কেউ তো থাকবেই। তাই আমার বদলে আমি আপনাদের সঙ্গে দেব শত্রুঘ্ন পাণ্ডেকে।

সে কে?

সে আমার সীমারিয়ার ফরেস্ট গার্ড। ডেয়ার ডেভিল। বন্দুকের হাতও খুব ভাল। ফরেস্ট গার্ডদের তো শটগানই দেয়। রাইফেলও দেয় থ্রি-ফিফটিন বোরের। তবে ও বন্দুকেই সড়গড়। ও তিন-চারবার পোচারদের ধরেওছে। ওর ওপরে গুলিও চলেছে দু'বার। একবার তো বুকে গুলি লেগেছিল। তবে গান-শট এবং দূর থেকে মারা—এল. জি-র দানা লেগেছিল বাঁদিকের বুকে—একেবারে হার্টের ওপরে—তবে পেনিট্রেট করতে পারেনি বলে হাসপাতালে কয়েকদিন থেকে ছাড়া পেয়েছিল। ও দু'বার গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছিল।

ঋজুদা বলল, আমরা তো সিভিলিয়ান। আমরা যে তাদের এক্তিয়ারে ঢুকে এই সব কাণ্ডমাণ্ড করব, তাতে পুলিশের আপত্তি হবে না? তা ছাড়া যদি আমাদের গুলিতে পোচারদের কেউ মরে অথবা আহত হয় অথবা পোচারদের গুলিতে আমাদের কেউ—তাহলে নানারকম আইনি গোলমালও তো হবেই। তার কী করা যাবে?

সে সবও ভেবে নিয়েছি আমরা এবং পাসোয়ান সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করে নিয়েছি। আপনাদের গুলিতে পোচারদের কেউ মারা গেলে তার দায়িত্ব পুলিশের। এস পি সাহেব নিজে নেবেন। বলা হবে, পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। আর পোচারদের গুলিতে আপনাদের কেউ মরলে বা আহত হলেও তো পুলিশ কেস হবেই, তাই আপনাদের বন্ড সই করে নিতে হবে। তবে ঋজুবাবু একাই তো ইনভলভড হবেন, উনি বন্ড দিলেই হবে, খোকাবাবুদের নিতে হবে না। যেতেও হবে না।

আমার কান গরম হয়ে লাল হয়ে গেল। ভটকাই দেখলাম ওর জগিং শুর মধ্যে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটাকে ঘন ঘন আন্দোলিত করছে।

ঋজুদা চকিতে আমাদের মুখে একবার চেয়ে নিয়েই গলা খাঁকড়ে বলল, কাজমি সাহেব, আপনি বোধ হয় জানেন না যে এই রুদ্র আর ভটকাই ছেলেমানুষ হতে পারে, এরা আমার সঙ্গে দেশের বহু রাজ্য ছাড়া আফ্রিকার সেরেঙ্গেটি প্লেইনস, গুণ্ডনোগুম্বারের দেশে, রুআহা নদীর উপত্যকায় রুআহাতে, আফ্রিকা ও ভারতের মধ্যে ভারত মহাসাগরের স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জেও গেছে। গেছে, কখনও ম্যানইটার বাঘের মোকাবিলা করতে, কোথাও বিদেশি জলদস্যুদের অভ্যন্তরীণ

বিরোধের ইতি টানতে। গোয়েন্দাগিরি করতেও গেছে নানা জায়গাতে। ইন ফ্যাক্ট, একবার তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীরা যুগ্মভাবে কোল্লেগালে বীরাপ্পনকে ধরার জন্যেও বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমাকে। এবং তখনও এদের আমার সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল। পরে অবশ্য এই দুই সরকার তাদের নিজ নিজ রাজ্যের পুলিশ ও আমলারা অপদস্থ হবেন এই অজুহাতে সেই আমন্ত্রণ ফিরিয়ে নেন। আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম।

আমার এই দুই খুদে সাকরেদ সবরকম আগ্নেয়াস্ত্রই চালাতে এবং বন ও বন্যপ্রাণী এবং চোরাশিকারিদের মোকাবিলা করতে যথেষ্টই পারগ। আপনি যদি চান তবে আমার এই দুই অ্যাসিস্ট্যান্টের মস্তিষ্ককে আপনার ডিপার্টমেন্ট এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের জওয়ানদের ট্রেনিংয়ের কাজেও লাগাতে পারেন।

কাজমি সাহেব খুবই বিব্রত হলেন। ঋজুদার গলাতে হয়তো একটু উষ্মাও লেগে থাকবে। কিন্তু কাজমি সাহেব কিছুমাত্র বলবার আগেই ঋজুদা বলল, আপনার এই হারহাদের কাল্লু মিঞাদের শিক্ষা দেওয়াটা এদের কাছে এতই সামান্য ব্যাপার যে এদের দু'জনেরও একসঙ্গে যাবার দরকার হবে না। বন্ড শুধু একজনই সই করবে। ওয়ান ইজ এনাফ। বন্ডগুলো পাসোয়ান সাহেব আমাকে আজ ভোরেই পাঠিয়ে দিয়েছেন সিলড-কভারে।

তাহলে বোস সাহেব, আপনারা তিনজনেই সই করে দিন। যাতে আমি বেরোবার আগে কারওকে দিয়ে এস পি সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি।

ঋজুদা বলল, বললামই তো কাজমি সাহেব যে, ওদের মধ্যে একজনই সই করবে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কে?

'কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান'? আমার ও ভটকাইয়ের মুখ দেখে ওদের যেন তাই মনে হচ্ছিল। ঋজুদা অধুনা ভারতের আমলাতন্ত্রে চালু হয়ে যাওয়া টপকানো-টপকানো খেলায়, যাকে ভটকাইয়ের হামদু বড় বলেন 'supersession', তাতে শামিল না হয়ে বলল, রুদ্রই করুক সই। ভটকাইয়ের চেয়ে ওর অভিজ্ঞতা বেশি, মাথাও অনেক ঠাণ্ডা।

আমি মনে মনে বললাম, হাতি-ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল? কে কাল্লু মিঞা! ফুঃ!

আমি এরপরে ভটকাইয়ের দিকে তাকিয়ে ওর অপ্রতিভতাকে আর মিছিমিছি বাড়ালাম না। বাড়ালাম না এই জন্যে যে, ছেলেবেলা থেকেই যোগ্য প্রতিপক্ষর কাছে হার স্বীকার করে নেওয়াটাকে ধাতস্থ করে নিতে পারলে জীবনে, যথাসময়ে নিজেও যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া যায়। এই 'হার' মেনে নেওয়াটা 'সহবত'-এর মধ্যেই পড়ে। ঋজুদাই একদিন বলেছিল, বুঝলি রে, শিক্ষা শুধু বইয়েই থাকে না, প্রতিদিনের জীবনেও থাকে। চলতে চলতে যে সেই সব শিক্ষার টুকরোটাকরা লক্ষ করে চলার পথের দু'দিক থেকে নিজের ঝুলিতে তুলে নিতে পারে, সেই মানুষই কিন্তু পরে 'শিক্ষিত' বলে পরিচিত হয়।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর কাজমি সাহেব বন্ডের কাগজটি এগিয়ে দিলেন, বললেন স্ট্যাম্প, সইসাবুদ সব ডি সি সাহেব করিয়ে দেবেন। কাগজটা পুলিশ সাহেব পাসোয়ান সাহেবকে পাঠিয়ে দিলেই আমার কর্তব্য শেষ। নাও, সইটা করে দাও বাবা।

তারপর বললেন, ইন ফ্যাক্ট, ডি সি সাহেবের কাছে পাসোয়ান সাহেব একটু বকুনিই খেয়েছেন।

বকুনি কেন?

ঋজুদা শুধোল।

বকুনি এই জন্যে যে, আমার ডিপার্টমেন্টের কেউ যা পারল না, পারল না পুলিশ ডিপার্টমেন্টেরও কেউও, আর তাই কিনা করছেন কলকাতা থেকে বেড়াতে আসা টুরিস্টরা! এতে কি বিহারের পুলিশ ও বনবিভাগের মান বাড়ে?

ঋজুদা বলল, তা কেন? এটা ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। এতে তো কারওরই মান বাড়া কিংবা কমার প্রশ্ন নেই। এই চোরাশিকারের সমস্যাটা সারা ভারতবর্ষে এমনই এক পর্যায়ে চলে এসেছে যে, এখন মান নিয়ে ভাগাভাগি করার চেয়ে বড় হচ্ছে সমস্যাটার মোকাবিলা করা। আরও একটা কথা, রুদ্র আপনাদের কাল্লু মিঞাদের কবজা করতে পারুক অথবা নিজেই ওদের গুলি খেয়ে মরুক—মিডিয়াকে ওর নাম জানাবেন না। কোনওরকম প্রচারেরই প্রয়োজন নেই।

সেটা ঠিক।

কাজমি সাহেব বললেন। তারপর বললেন, আপনারা তাহলে এগোন কবরখানার দিকে নাজিম মিঞার কবরে ফুল দিতে। বিকেলে আমি হারহাদে গিয়ে পৌঁছচ্ছি ঠিক চারটের সময়ে।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, তাহলে তুমি বেটা জিম্মাদারি নিও। পুলিশ অথবা বনবিভাগের যাঁরা থাকবেন ওই অপারেশনে তাঁদের পাসওয়ার্ড হিসেবে তুমি বলবে 'কাউয়া'। মানে কাক। কাকের ডাক ডাকলেও দু'পক্ষেই জানবে যে মিত্রপক্ষ। ওদেরও এই পাসওয়ার্ডের কথা বলা থাকবে।

ঠিক আছে।

আমরা আমাদের গাড়িতে নাজিম সাহেবের দোকান বেঙ্গল ফ্যান্সি স্টোর্সে যেতেই জামাল অ্যান্ড কোম্পানি হইহই করে তেড়ে এল গাড়ি থেকে নামতে হবে বলে। ঋজুদা অনেক বুঝিয়ে জামালকে গাড়িতে তুলে নিল। বলল, আমরা তো আছি দিনকতক। পরে আসব, বসব, গল্প করব। তাড়া কীসের?

বাজারের মধ্যে দিয়ে কিছুদূর যেতেই পথে ভিড় কমতে লাগল। তারপর ফাঁকায় এসে পড়লাম। ঋজুদা বলল, আমাদের দেশের কোনও পথই আর নির্জন থাকবে না—সব পথেরই দু'পাশে বাড়ি হয়ে যাবে, সব শহরেই পপুলেশন এক্সপ্লোশান হবে। সুকুমার রায়ের খুড়োর কলের সামনে যে মাংসর টুকরো বাঁধা ছিল, সেই টুকরো আর খুড়োর মুখের মধ্যে দূরত্ব চিরদিন একই থেকে যাবে।

আমাদের দেশের দারিদ্র্য, প্রয়োজন—এসবের কোনওদিনও নিরসন হবে না যদি না জনসংখ্যা পিস্তলের নল দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নিয়ন্ত্রণ যা হচ্ছে তা সচ্ছল মহলে, শিক্ষিত মহলে, যেখানে না হলেও চলত। কিন্তু অসচ্ছল মহলে এবং কোনও কোনও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তাতে চিন্তিত হবার কারণ আছে বইকী। হাজারিবাগে তো আমি বহুবার এসেছি ছেলেবেলা থেকে, কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা কখনও এত ছিল না। বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িতরা এসেও জুটেছে আর এমনিতেই স্থানীয় মানুষদের মধ্যে জিওমেট্রিক প্রগ্রেশনে সংখ্যা বেড়েছে। বুঝলি রুদ্র, ভারতবর্ষ আর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পাকিস্তান হয়ে গেলে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই, খুব অবাক হবার কিছু থাকবে না। পঞ্চাশ বছর অবধি আমি বেঁচে থাকব না কিন্তু দূরভিসন্ধিসম্পন্ন ধান্দাবাজ মানুষেরা জেনেশুনেই সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে দেশটাকে। দিচ্ছে কি, দিয়েছে। (কথা সত্য। মুসলিমদের জনসংখ্যা [illegible] দেয় তো)

তারপর বলল, কী হে জামাল, তুমি কী বল? খারাপ বলেছি আমি?

না ঋজুবাবু, খারাপ বলেননি। তবে মুসলমান বাড়লে ক্ষতি নেই কিন্তু ভারতবর্ষে থাকব আর রেডিয়ো পাকিস্তান ছাড়া কিছু শুনব না, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের খেলা হলে পাকিস্তানকে সাপোর্ট করব, এটা চলতে পারে না।

তুমিই বল? ডুডুও খাব টামাকও খাব, সেটা কি ঠিক?

বলেই বুঝল যে, উপমাটা জামালের হজম হবে না। বুঝেই ভটকাইকে বলল, translate করে বল ভটকাই।

কোন ভাষায়? হিন্দিতে, উর্দুতে বা ইংরেজিতেই।

দাঁড়াও। ভাবি। তুমি যা বলছিলে বল।

জামাল বলল, এ কথা আমার আব্বা সব সময়েই বলতেন, মুসলমানদের ভারতে বাস করতে হলে ভারতীয়ত্বে সম্পৃক্ত হয়েই থাকতে হবে। নইলে হিন্দুরা আমাদের সহ্য করবে কেন? পাকিস্তান তো তারা চায়নি, আমরাই চেয়েছিলাম। মুসলমানদের জন্যে আলাদা রাজ্য চেয়ে স্লোগান তুলেছিলাম 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। পাকিস্তান পাওয়ার পরে এখানে অন্য পাকিস্তান গড়তে চাইলে হিন্দুরা তা মানবে কেন? তারা কি ডরপোক, কাপুরুষ? তারা কি নির্বোধ?

এই পথটা কোনদিকে গেছে?

আমার এই সব ধর্ম, তত্ত্বের কচকচানি ভাল লাগছিল না। আমি বললাম তাই।

এই পথ দিয়েই তো গোপাল, সুব্রত, লালাদারা নাজিম সাহেবের খামার কুসুমভাতে যেতেন। বনখেতিতে। আরও এগিয়ে গেলে বনাদাগ বলে একটা বস্তি পড়বে বাঁয়ে। সেখান থেকে মাইল তিন-চার হেঁটে যেতেন বন্দুক কাঁধে করে ওঁরা।

এই পথটা কোথায় গেছে?

ওঃ সরি। এটা গেছে টুটিলাওয়া, সীমারিয়া, হয়ে সোজা বাঘরা বা জাবড়া মোড়। সেখান থেকে বাঁয়ে গেলে চান্দোয়া-টোড়ি আর ডাইনে গেলে চাতরা।

একটু পরই গাড়ি থামল। আমরা নামলাম কবরখানায়। সীমারিয়ায় যেতে পথের ডানদিকে পড়ে। গাছগাছালির নীচে নীচে কবরগুলি শুয়ে আছে। মুসলমান আর খ্রিস্টানদের এই ব্যাপারটা বেশ লাগে আমার।

আমি বললাম, মানুষ মরে গেলেই প্রিয়জনদের মন থেকে মুছে যায় না একেবারে। জন্মদিনে, মৃত্যুদিনে ফুল দেওয়া যায় এসে, এই তুমি যেমন আজ মোমবাতি জ্বালাচ্ছ তেমন মোমবাতি দেওয়া যায়।

তা ঠিক। তবে পারসিরা যে উঁচু টাওয়ারে রেখে মৃতদেহকে শকুন-কাক-চিল-পেঁচা দিয়ে খাওয়ায়, সেটা কীরকম?

ভটকাই বলল।

ঋজুদা বলল, পারসিরা সূর্যের উপাসক। ওদের প্রাণ-ছেড়ে-যাওয়া শরীরও যাতে নষ্ট না হয়, পাখিদের আহার হয় যাতে, সে জন্যেই অমন করে। প্রত্যেক ধর্মেরই আলাদা আলাদা আদর্শ থাকে। সবই ভাল। আমরা বলি, আত্মার মৃত্যু নেই, শরীরের আছে। আত্মার মুক্তিই আমাদের প্রার্থনার।

বলেই বলল, ওই দেখ। পাথরের ফলকটা।

আমরা দেখলাম একটা বড় শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা আছে লালা, গোপাল, সুব্রত এবং ভুতোর নাম। নাজিম সাহেবের স্মৃতিতে। যে নাজিম সাহেবের সঙ্গে এই অঞ্চলের নানা বনে, পাহাড়ে তাঁদের বড় সুখের দিন কেটেছে তাঁরই স্মৃতিতে।

কবরে মোমবাতি জ্বালিয়ে, ফুল রেখে আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলাম। তারপর গাড়িতে বসে, জামালকে তার দোকানে নামিয়ে দিয়ে আবার রাজডেরোয়ার দিকে ফিরে চললাম।

গাড়িটা ছেড়ে দিতেই ঋজুদা হেসে বলল, কাণ্ডও করত বটে নাজিম সাহেব।

কী?

সুব্রতকে ডাকত সুরবোতবাবু বলে।

কেন?

কে জানে। দাঁত ভেঙে যেত বোধহয় উচ্চারণ করতে।

ঋজুদা বলল, অ্যাই দেখ হাজারিবাগ ক্লাব। জেঠুমনির সঙ্গে এসে একবার ছিলাম এখানে। আর ওই পুলিশ ট্রেনিং কলেজ। পুরনো। নতুন একটা হয়েছে বিরাট, বগোদরের পথে।

ভটকাই বলল, যত পুলিশ-ট্রেনিং কলেজ হচ্ছে ততই আইনকানুন লাটে উঠছে।

যা বলেছিস।

আমি বললাম।

ওই দেখ! বাঁদিকে রিফরমেটরির পথ গেছে। তারপর বিখ্যাত হাজারিবাগ জেল। আর ওই দেখ, ডানদিকে, গোপালদের বাড়ি 'পূর্বাচল'। কত গল্পই যে শুনেছি এই বাড়ির লালাদার কাছে।

এখানে সুব্রতদের বাড়ি ছিল না?

থাকবে না কেন? ওদের বাড়ি ছিল কানারি হিল রোডে। কাল যখন কানহারির বাংলো দেখাতে আনব, তোদের দেখাব। সুব্রতর বাবা তো হাজারিবাগের এস পি সাহেব ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে। রিটায়ার করেন অবশ্য স্বাধীনতার পরে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল চেকনাকাতে পৌঁছতে রাজডেরোয়ার। এই এখন আমরা প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকছি। ওই দেখ উলটো দিকে শালপর্ণী। ভিতরে আছে। এখান থেকে দেখা যাবে না। কাল শালপর্ণীও দেখাব এখন।

চেকনাকা দিয়ে ঢুকে কিছুটা গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে বাঁদিকে একটু গেলেই Tiger's Trap। একটি বিরাট বাঁধানো কুয়ো। বিরাট মানে, যেরকম কুয়ো আমরা সচরাচর দেখে অভ্যস্ত তেমন কুয়োর পনেরো-কুড়িটার সমান হবে এর পরিধি। সেই শুকনো কুয়োর নীচ থেকে একটা সুড়ঙ্গ উঠে এসেছে কিছুটা দূরের জমিতে। তার মুখে একটি শক্ত করে বানানো সিমেন্টের গেট। সেই গেটের মুখে মোটা মোটা লোহার গারদ দেওয়া খুব শক্ত লোহার ফ্রেমের খাঁচা। সেই কুয়োর ওপরে হালকা কাঠকুটোর এবং পাতা-টাতার আচ্ছাদন দিয়ে কুয়োর এক প্রান্তে একটা গোরু কিংবা পাঁঠা বেঁধে রাখা হত। এমনভাবে তা রাখা হত, যাতে বাঘকে তাকে ধরতে হলে ওই কুয়োর ওপরের আচ্ছাদনের ওপর দিয়েই আসতে হত এবং তাই আসতে গিয়ে বাঘ কুয়োতে পড়ে প্রচণ্ড হাঁকাহাঁকি করত। সেই হাঁকাহাঁকি দু'-পাঁচ মাইল দূর থেকেও শোনা যেত। বাঘ বেচারি লাফিয়ে লাফিয়ে কুয়ো থেকে উঠে আসতে চাইত এবং ধাঁই-ধাঁই করে আছাড় খেত। কয়েক দিন খাবার এবং জল ছাড়া ওইভাবে তাকে কুয়োবন্দি রাখার পর সে যখন খুবই ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে যেত তখন সেই সুড়ঙ্গের ওপরের মুখে লোহার খাঁচার মুখে একটি পাঁঠা দিয়ে দেওয়া হত। বাঘ সুড়ঙ্গ বেয়ে পাঁঠা ধরতে উঠে আসতেই খাঁচার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত। তারপর বিরাট পালকি করে তাকে নিয়ে যাওয়া হত।

কোথায়?

তা আমি ঠিক জানি না। এমনও হতে পারে যে, চিড়িয়াখানাতে বিক্রি করা হত বা অন্য কোনও রাজা-মহারাজকে বা ব্রিটিশ গভর্নর প্রমুখকে উপঢৌকন দেওয়া হত অথবা অন্য কোনওদিকে নিয়ে গিয়ে, যেখানে বাঘ নেই, বা কম, সেখানে ছেড়ে দেওয়া হত।

এই ব্যাপার! ভটকাই বলল! কী এমন বাহাদুরি!

বাহাদুরি না বলে রাজাউড়ি বল।

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, কটা বাজে রুদ্র?

আমি ঘড়ি দেখে বললাম, এ কী, সাড়ে দশটা!

ভটকাই বলল, ইর লাইগ্যাই কয় টাইম ফ্লাইজ।

ঋজুদা বলল, ঠিক করলাম আজকে তোদের ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে কটেজ,

প্রধান বাংলো, ওয়াচ টাওয়ার—এই সব না ঘুরিয়ে চল বিকেলের রঙ্গমঞ্চটাই ভাল করে পরীক্ষা করি। আমার মনটা ভাল লাগছে না। কাজমি সাহেব নিজেও থাকছে না, অবশ্য না-থাকার সঙ্গত কারণ আছে। তার ওপরে আমিও থাকছি না। রুদ্র একা। প্রতিপক্ষও ঘাঘু। তারা যে নিয়মিত চোরাশিকার করে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে এবং কাজমি সাহেবও তা জানেন।

সবাই সব জানে তবুও পুলিশ ওদের ছেড়ে রেখেছে কেন এতদিন কে জানে!

আরে জানলেই তো হল না। সাবুদ-প্রমাণের তো দরকার। তা ছাড়া শুনলি না কাল্লু মিঞা কী বলল কালকে! অপরাধ করলেই যদি জেলে যেতে হত, তবে তো হাজারিবাগ জেলে জায়গা হত না।

আমি বললাম।

গত রাতে ওরা যেখানে টেম্পোটা ঘুরিয়েছিল সেইখানে, জঙ্গলের মধ্যের বড় রাস্তা ছেড়ে হারহাদ বাংলোর পথে, সেই জায়গাটাকে আমরা আন্দাজ করে নেমে গেলাম। পাছে ড্রাইভার কিছু সন্দেহ করে, তাই ঋজুদা তাকে বলল, আমরা হেঁটেই যাব বাকি পথটুকু জঙ্গলে বেড়াতে বেড়াতে। তুমি বরং গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ঝুমরি তিলাইয়া চলে যাও। গিয়ে পোস্টমাস্টারবাবু অমল সেনগুপ্তকে বলে এস যে আগামীকাল রবিবার, উনি আমাদের সঙ্গে হারহাদেই খাবেন। তুমি গাড়ি নিয়ে গিয়ে ওঁকে নিয়ে আসবে এবং আবার বিকেল বিকেল পৌঁছে দিয়ে আসবে। উনি যেন মাছ-টাছ কিছু না আনেন, আমরা ভোরে বরহিতে গিয়ে নিজেরাই মাছ কিনে নিয়ে আসব।

ভটকাই বলল, এভাবে নেমন্তন্ন করাটা কি ভদ্রতা হবে? দু'লাইন লিখে দিলে হত না?

ঠিক বলেছিস। ঋজুদা বলল। তারপর বলল, দেখ তো রুদ্র, ভটকাই মাঝে মাঝে ঠিকও তো বলে। তুই-ও ওর পেছনে লাগিস। রুদ্র, তুই তো আমাদের মধ্যে একমাত্র লিটারেটর। লিখে দে দু'কলম। তোর সইও থাকবে। অমলবাবুর স্ত্রী আবার তোর ঋজুদা-কাহিনীর খুবই ভক্ত।

হিপ পকেট থেকে পার্স বের করে তার মধ্যে থেকে কাগজ বের করে দু'ছত্রে নিমন্ত্রণ লিখে দিলাম অমলবাবুকে। শেষে লিখলাম, আসা চাই-ই—ঋজুদা, আমার এবং ভটকাইয়ের পক্ষে।

লেখা হয়ে গেলে কাগজটা ড্রাইভারকে দিয়ে দিলাম।

ঠিক হ্যায় সাব। বলে, সে চলে গেল। ভটকাই বলল, উনসে দো লাইন লিখাকর লানা—।

ক্যা লিখাউঙ্গা?

আরে উনোনে দাওয়াত মে আ রহাঁ হ্যায় ক্যা?

ওহ্। সমঝা।

গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে ড্রাইভার চলে গেলে আমি বললাম, কাটালে তো!

না কাটিয়ে উপায় কী? তোর ভালর জন্যেই করতে হল। এবারে কথা না বলে চল নামি এই পাকদণ্ডিটাতে।

নেমে দেখলাম, জায়গাটা বেশ ছায়াচ্ছন্ন এবং হারহাদ থেকে একটা শাখা বয়ে গেছে ওই দোলামতো জায়গাটা দিয়ে। নীলগাইয়ের পায়ের দাগ তো আছেই, কোটরা, শুয়োর, শজারু এবং একটি চিতার পায়ের দাগও আছে নালার পাশের নরম বালিতে। যে লোকটা মাচান বানিয়েছে সে রাজডেরোয়ার মধ্যে জানোয়ারদের রাহান-সাহানের খোঁজ রাখে। মিনিট দশেক হেঁটে গিয়ে মাচানটাকে দেখা গেল। সামান্যই উঁচুতে বাঁধা একটা পন্নন গাছে। একজন বেশ আরামে বসতে পারে।

ঋজুদা বলল, রুদ্র, ওই বড় শিমুল গাছটা দেখছিস পুব দিকে?

হ্যাঁ।

তোর কিন্তু বিকেল চারটের মধ্যে এসে ওই শিমুলের কাণ্ডের একটা পার্টিশনের মধ্যে বসে থাকতে হবে। আমার ধারণা নীলগাইয়ের দল উলটো দিক থেকে এসে এই দোল্যা ধরে হারহাদ নালাতে যাবে। ওরা মাচানের রেঞ্জের মধ্যে আসার আগেই তুই তোর শটগান দিয়ে মাটিতে নীলগাইয়ের ঝুণ্ডের সামনে একটা গুলি করবি চার নম্বর শট দিয়ে।

চার নম্বর দিয়ে কেন?

আরে এমন অ্যাঙ্গেলে গুলিটা করবি যাতে ছররার দানাগুলো ফরফরিয়ে অনেকখানি জায়গাতে শুকনো পাতা ও কাঠকুটোতে গিয়ে পড়ে। তাতে নীলগাইয়ের দলের মধ্যে ত্রাসটা অনেক বেশি ছড়াবে।

তাতে কী হবে?

তারা মাঈরে মাঈ বলে অ্যাবাউট টার্ন করে যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই দৌড়ে পালাবে। তোর গুলির আওয়াজে কাল্লু মিঞা ভাববে, হয় অন্য চোরাশিকারি গুলি করেছে, নয় পুলিশ বা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক। শত্রুঘ্ন পাণ্ডেকে আমি ব্রিফ করে দেব, যাতে ও টেম্পো হোক কি ট্রাক যা নিয়েই পোচারের দল হারহাদের পথে ঢুকে আসবে, তাদের মোকাবিলা করবে।

সেই ট্রাকে বা টেম্পোতে যদি কারও কাছে আর্মস থাকে?

থাকতে তো পারেই। আর পারে বলেই তো কাজমি সাহেব শত্রুঘ্নকে আনিয়েছেন সীমারিয়া থেকে। আর্মস থাকলে দু'পক্ষই গুলি চালাবে। এবং ওদের ভেহিকলের শব্দ শোনামাত্রই তুই আর একটা গুলি শূন্যে ছুড়ে তাদের দিকে এগিয়ে যাবি শত্রুঘ্নকে সাহায্য করার জন্যে।

আর কাল্লু সিং?

কাল্লু সিংয়ের ভার নেব আমি আর ভটকাই এবং হয়তো কাজমি সাহেবও।

মানেটা বুঝলাম না।

সব না বুঝলেও চলবে। প্রথমত, তোর প্রথম গুলি এবং দ্বিতীয় গুলির

আওয়াজ শুনে এবং দ্বিতীয়ত ঘোড়ফরাসের ঝুণ্ড ভাগলবা হওয়ায় এবং তৃতীয়ত তোর বন্দুকের আওয়াজকে কাল্লু মিঞার বন্দুকের আওয়াজ ভেবে ওরা ট্রাক নিয়ে এগিয়ে আসছে তা দেখে...

দেখবে কী করে?

আরে গাধা! হেডলাইটের আলো দেখবে না?

ও হ্যাঁ। কিন্তু দেখ...?

শুধু দেখবেই নয়, গাড়িটা দাঁড়িয়ে যে গেল, তাও বুঝতে পারবে এবং গুলিগোলার আওয়াজও পেতে পারে।

তখন কাল্লু সিং বিপদের আশঙ্কা করে হয় ওদের দিকে দৌড়ে যাবে, যদি উদার হৃদয় এবং সত্যিই সাহসী হয়। যদি তা না হয়, তবে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' বলে উলটোপানে দৌড়বে, হারহাদের দিকে, যাতে নদীটা পেরিয়ে নতুন রাস্তা দিয়ে বরহি-হাজারিবাগ রোডের যে কোনও একটা জায়গাতে এসে উঠতে পারে। আর উঠতে পারলে তো ট্রাক, বাস, ট্রেকার—কিছুরই অভাব নেই।

তাহলে তো পালিয়েই যাবে। লাভ কী হবে?

ভটকাই বলল।

লাভ হবে রে ভটকাই। তোর লাভই হয়তো সবচেয়ে বেশি হবে।

কীরকম?

তোকেই তখন ধরতে হবে কাল্লু মিঞাকে। আর তুই যদি ঠিকমতো ওকে কবজা করতে পারিস তো কম্ম ফতে। ওকে জেরা করেই কোতোয়ালির বড় দারোগা রামখিলাওন পাঁড়ে অন্য সকলের নাম, ওদের Modus Operandi. সব বের করে নেবে। তুই থাকবি ওই দোলার শেষে। আর আমরা থাকব কাল আমরা পথের যেখানে ছিলাম তার একটু আগে সেই নন্দী-ভৃঙ্গী পাথরগুলোর আড়ালে বসে। কাল্লু সিং যদি হারহাদ বাংলোতে রাস্তা ধরেই পৌঁছতে যায়, তবে আমরাই তাকে ধরব।

আমরা মানে?

মানে, আমি আর কাজমি সাহেব।

তোমাদের প্ল্যান আমার মাথায় ঢুকল না।

যখন রঙ্গমঞ্চে খেলোয়াড়েরা সব উপস্থিত হবে, একের পরে এক 'অঙ্ক' বদলাবে, তখনই তুই দেখবি তোর অঙ্কের ফল সব ঠিকঠাক আসছে। আর যদি তুই একাই ধরতে পারিস কাল্লুকে আমাদের সাহায্য ছাড়া তবে কোল্লেগালে আমরা যখন বীরাপ্পনের সঙ্গে টক্কর দিতে যাব তখন তোর জায়গা আমার দলে পাক্কা।

ও সব তো মুখেই বল। কোল্লোগালে তো যাব বলে সেবারেও ন্যাড়া হয়ে টিকিওয়ালা তামিল ব্রাহ্মণও সেজেছিলাম কিন্তু তুমিই তো শেষকালে দিলে সব কেঁচিয়ে।

সব কেঁচাইনি। কেমন মণিপুরে গেলি বল হত্যা-রহস্যের কিনারা করতে। সে কি কম?

আমার আদিখ্যাতা নেই। যাই পাই তাই-ই ভাল।

আরেকবার ভাল করে ঘুরে দেখ শিমুলগাছের গুঁড়ির কোন কম্পার্টমেন্টে থাকবি তুই। শত্রুপক্ষর গুলি থেকে প্রোটেকশনও নিতে হবে, আবার কী ঘটছে না ঘটছে তা চোখে দেখে বা কানে শুনে বুঝতে হবে।

ঋজুদা বলল, আমাকে।

আমাকে সত্যি সত্যিই বর রওয়ানা করিয়ে দেওয়ার মতো করে ঋজুদা রওয়ানা করিয়ে দিল। শুধু বলল না যে বল, 'মা আমি তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি'! তখন চারটে বাজে। সন্ধে অর্থাৎ পুরো অন্ধকার হবে সাতটাতে। তবে কাল যেমন দেখলাম, পুরো অন্ধকার হবে না। বরং গত রাতের থেকেও আরও অনেক উজ্জ্বল হবে রাত। ভটকাইয়ের ভাষায় যাকে বলে 'উজালা উজালা চার বুঁদওয়ালা।'

আমার শটগানটা আমি নিয়েছি। কোমরে পিস্তলটাও আছে। ম্যাগাজিন পুরে লোড করে নিয়েছি, চেম্বারেও একটা গুলি আছে। তবে আমার পিস্তলটার একটাই দোষ, স্টপিং পাওয়ার কম। পয়েন্ট টু টু, স্প্যানিশ, লামা। বানানটা LLAMA, তবে ঋজুদা বলে, তোর ভুল ধারণা এটা। হাত ভাল হলে ওরকম ওয়েপন আর দুটি নেই। গোপালদা নাকি পয়েন্ট টু টু পিস্তল দিয়ে উড়ন্ত তিতির মারত। তা ছাড়া জন কেনেডির ছোট ভাই সেনেটর রবার্ট কেনেডিকেও ওই পিস্তল দিয়েই মেরেছিল আততায়ী। একটা বুলেট মাথায় লেগেছিল। এই উপমাতে আমার হাসি পেত। ভাবতাম, ঋজুদারও মতিভ্রম হয় তাহলে। নইলে তিতিরের সঙ্গে রবার্ট কেনেডির তুলনা করে।

এখন কথা হচ্ছে 'হাত ভাল হলে'। হাত ভাল হলে তো বাঘের কানের ফুটোতে এয়ার গান দিয়ে গুলি করলেও বাঘ মরে যেতে পারে। অকুস্থলে, অসময়ে, ভয় পেয়ে পিস্তলের ট্রিগার টানলে অনেক সময়েই গুলির বদলে মধু বেরোয়। সবাই তো আর ঋজু বোস বা ক্ষণজন্মা অগ্রজ গোপালদা, লালাদা, সুব্রতদা নয়।

হারহাদ বাংলো থেকে জায়গাটাতে পৌঁছতে আমার আধঘণ্টাটাক সময় লাগল। আরও কম লাগতে পারত যদি লাল কাঁকরের পথ ছেড়ে দিয়ে ওই দোলাটার পাশ দিয়ে মাচানে পৌঁছতাম। কিন্তু ঋজুদা মানা করেছিল। দোলার দু'পাশে মাটি ভেজা ও নরম। সকাল বেলাতেও বারবার আমাদের সাবধান করে দিয়েছিল। আমাদের পায়ের দাগ দোলার দু'পাশে সুন্দরবনের বড়-চামটা ছোট-চামটার গেঁয়ো গরান এবং কেওড়ার পাশে পাশে বাঘেদের থাবার শোভাযাত্রার দাগ যেমন দেখা যায়, তেমন করেই দেখা যেত। আমাদের সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘেদের কারওকেই কেয়ার না করলেও চলে, কিন্তু আমাদের তো অনেককেই কেয়ার করতে হয়। ভাবছিলাম, আমি তো বন্দুকটা নিয়ে এলাম, পিস্তলটাও কোমরের হোলস্টারে। কিন্তু বেচারা ভটকাইয়ের দুর্জয়

সাহস এবং অ্যাডভেঞ্চারের দুর্মর শখ, সে কি শুধু সেটুকু সম্বল করেই এই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবে? ওর নিজস্ব তো কোনও ওয়েপন নেই। ঋজুদার টু সেভেন ফাইভ সিঙ্গল ব্যারেল রাইফেলটি ঋজুদা ওকে দেবে না ও এখনও ছেলেমানুষ বলে। তা ছাড়া বারো বোরের শটগান পাশি বা বেপাশি হাজার হাজার আছে এই সব বনবাসী মানুষদের কাছে। কিন্তু রাইফেল অত নেই। রাইফেলের গুলির টুকরোটাকরা ফোরেনসিক এক্সপার্টরা পরীক্ষা করে সেই রাইফেলের কত বোর তা সহজে বলে দিতে পারেন। রাইফেল নিয়ে সুকর্ম বা অপকর্ম—যাই করা হোক না কেন রাইফেলের কোষ্ঠী-ঠিকুজি জানা সোজা। আর তা জানলে কার কার সেই বিশেষ রাইফেল আছে তার হদিশ করা অপেক্ষাকৃত সোজা। যাই হোক, ভটকাইয়ের ভাবনা ভটকাইই ভাবুক আর ভাবুক তার গুরু ঋজুদা। এখন আমার ভাবনা আমি ভাবি।

জায়গামতো পৌঁছে মাচানটাকে ভাল করে লক্ষ করলাম। গাছেরই ছাল দিয়ে চারটি হোসপাইপের মতো চওড়া ডালকে ভাল করে একে অন্যের সঙ্গে এবং নীচের প্রায় সমান্তরাল ডালটির সঙ্গে বেঁধেছে শক্ত করে। ওই মাচানে বসে ঘোড়ফরাসদের যাতায়াতের পথের দিকে দৃষ্টি রেখে বসলে চোরাশিকারির চোখ এবং বন্দুকের নল কোন দিকে থাকা স্বাভাবিক সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিলাম। তারও পর যদি শিকারির সঙ্গীরা এবং শত্রুরা (বনবিভাগের এবং পুলিশের) রাস্তা থেকে তার দিকে আসে তবে তারও বন্দুকের নল কোন কোণে থাকবে তারও একটা ধারণা করে নিলাম। শিমুলগাছের গুঁড়িতে পাঁচটি ভাগ হয়। যে গাছ যত বড়, তার কাণ্ড এবং কাণ্ডের কাণ্ডমাণ্ডও ততই বড়। তেমন বড় গাছ হলে অনায়াসে এক-একটি ভাগে জনা দশ পনেরো মানুষ গুঁড়ির অন্য ভাগের অজ্ঞাতে লুকিয়ে থাকতে পারে। এই শিমুলটি মাঝারি মাপের। কোন ভাগে লুকোলে আমার রথ দেখা কলা বেচা সম্পন্ন হয় তা ঠিক করে নিয়ে আমি সেই ডালের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম বন্দুকটি দু' উরুর ওপরে আড়াআড়ি করে রেখে। ডান হাতটি রইল বন্দুকের 'স্মল অফ দ্য বাট'-এ। ডান হাতের তর্জনী রইল ট্রিগার-গার্ডের ওপরে। ডান ব্যারেলে চার নম্বর পোরা আছে, আর বাঁ ব্যারেলে এল. জি.। বুশ শার্টের দু'দিকের বুক পকেটে আছে আরও একটি করে কার্তুজ। চারটি কার্তুজ ব্যবহার করার আগে হয় কাল্লু মিঞা কবজাতে আসবে, নয় আমি তার কবজাতে যাব। বেশি গুলি ভাল এবং আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন শিকারি কখনওই সঙ্গে নেয় না। যে সব শিকারি নিরীহ, হাতির দলই হোক কী নিরীহতর বগারি পাখির ঝাঁকই হোক, তাদের দিকে 'জেনারেল ডিরেকশন'-এ নিশানা করে গুলি ছোড়েন, গুলি লাগবার অদম্য উচ্চাশা এবং যশের দেউলে পৌঁছনোর দুর্মর কিন্তু তার নিজের পক্ষে প্রায় অগম্য পথে আগুয়ান শিকারির মতো শিকারি আমি কোনও দিন ছিলাম না ছেলেবেলা থেকেই এবং হওয়ার কোনও বাসনাও নেই।

রোদের তেজ যতই কমে আসছে বনের পশুপাখিরা ততই সোচ্চার হচ্ছে।

তারা একে অন্যকে বলছে 'জলকে চল, জলকে চল'। ময়ূর ডেকে উঠল বনের গভীর থেকে কেয়া-কেয়া-কেয়া করে তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে। টিয়ার ঝাঁক নীলাকাশে সবুজ চাবুকের সপাট তান ছুড়তে ছুড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। তিতিরের টিউ টিউ, ছাতারের ছ্যা ছ্যা, বুলবুলিদের চুলবুলি ডাক এবং পিউ কাঁহার হাহাকারে ভরে উঠল বেলাশেষের বন। এমনি করেই বেলা যাবে রাত নামার আগে, এমন সময় অদৃশ্য পাকদণ্ডির ওপরে খুরওয়ালা কোনও জানোয়ারের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজটি থেমে থেমে সাবধানে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি চোখ খুলে শিমুলের কাণ্ডর সেই বিভাজিত ঘরের কোনা অবধি নিঃশব্দে এসে ভাল করে নজর করে দেখি একটা প্রকাণ্ড নীলগাই, পুরুষ নীলগাই, সম্ভবত যূথভ্রষ্ট, একলা থেমে থেমে খুব সাবধানে এগিয়ে যাচ্ছে হারহাদ নদীর দিকে। প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' ছবিতে পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া সেই মন উদাস করা গানটির কথা মনে পড়ে গেল তার দ্বিধাগ্রস্ত একলা চলার দিকে চেয়ে, 'ওরে আয়, আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনশেষের শেষ খেয়ায়... ঘরেও নহে পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে' ইত্যাদি। ঠাকুমার প্রিয় গান ছিল।

অভিমানী সে বোধহয়, পাছে তার দলের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়, যে দল তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে শিংয়ের আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করে দিয়ে, আগে আগে চলেছে জল খেয়ে তারপর অন্য পথে ফিরে যাবে সারারাতের চাঁদের বনের সফরে।

বধ্য তো এল কিন্তু ব্যাধ কই? সেই না-দেখা কাল্লু মিঞা?

কিছুক্ষণ পরেই একটা মোটর সাইকেলের শব্দ শোনা গেল। তার ভটভটানি থেমে গেল এক সময়ে।

ম্যায় হাজারিবাগ লওটকে যা রহা হ্যায়, বহতই কাম হ্যায়।

উ লোগ তুমহারা গোল্লি কি আওয়াজ শুনকরই আওবেগা ট্রাক লেকর। ধড়কানেকো বাদ ঘোড়ফরাসকে হালাল জরুর করনা, জিন্দা রহতে রহতে।

ছোড় ইয়ার, দিখনেওয়ালা হিঁয়া হ্যায় কওন। কাল্লু মিঞা কি গোল্লি খা কর কোই জিতা নেহি এক ভি পল। গোলি অন্দর ঔর জান বাহার। ইতমিনানসে হালাল কর লেগা জমিন পর গির যানেকি বাদ।

দিখনেওয়ালা ইক তো জরুর হ্যায়।

আমি তো বাক্যটি শুনে ঘাবড়ে গেলাম। ওরা কি জেনে গেছে আমার এখানে লুকিয়ে থাকার কথা?

মোটর সাইকেলওয়ালা বলল, খুদাই হ্যায়। যিনকি আঁখোসে সবহি দিখা যাতা হ্যায়।

যাকগে বাবা।

তারপর বলল, তুমহারা বন্দুকোয়া কৌনসা পেড়মে ছিপাকে রাখা হুয়া হ্যায়

বাতাতো দিয়া না জালাল তুমকো ঠিকসে? বন্দুক তো টেম্পো মে লা কর জালাল রাখকে গায়া। গোলি তো তুম লয়া না সাথ মে?

জি হাঁ।

তারপরেই বলল, ঔর চিল্লাও শালে সুরতহারাম! যাও ভাগো হিঁয়াসে আভ্‌ভি। ম্যায় মাচানকি নিচামে আভ্‌ভি ইতমিনানসে মগরেবকি নমাজ আদা করেগা তব ঘোড়ফরাস ধড়কায়েগা।

একলা পুরুষ নীলগাইটি মোটর সাইকেলের শব্দ শুনে থমকে দাঁড়িয়েছিল, তারপর নাক উঁচু করে পেট্রোলের গন্ধ নিল বাতাসে। যে গন্ধ মানুষের নাকে পৌঁছয় না, পৌঁছবেও না তারা নিজেরা বায়ুদূষণে মরার আগে। সেই গন্ধে তার নাক জ্বালা করে উঠল। নাক দিয়ে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে সে দুলকি চালে, যাকে ইংরেজিতে বলে trot, দৌড়ে হারহাদের দিকে চলে গেল।

কাল্লু মিঞা শিকারি ভাল। তার বন্দুকটা গোপন জায়গা থেকে উদ্ধার করে এনে তার মাচার কাছে এসে পৌঁছেই স্বগতোক্তি করল, ইয়া আল্লা। ইতনা বড়া নরপাঠ্ঠা, ম্যায় পহুছনেকি পহিলেই সরুল দিখাকে চল গ্যয়া। অজিব বাত।

তারপর বলল, ছোড়, আভ্‌ভি ঝুণ্ড তো আইবেই করেগা।

শিকারি ভাল কাল্লু মিঞা, কিন্তু তার এই মস্ত দোষ শিকারে এসে কথা বলে। তার চেহারাটাও দেখা গেল মাচাতে চড়ার সময়ে। মাঝারি চেহারা। খাকি প্যান্ট আর খাকি ফুলশার্ট পরা। পায়ে বি এস সি কোম্পানির খয়েরি রঙা রাবারের কেডস জুতো। সে তরতরিয়ে উঠে গেল বন্দুকটা স্লিংসুদ্ধ কাঁধে ঝুলিয়ে।

দেখতে দেখতে আলো মরে গেল। সন্ধ্যাতারা উঠেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু শিমুলের ঝাঁকড়া ডালের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে না। তা ছাড়া সে তো উঠবে পশ্চিমে। চাঁদও উঠল। আজ শুক্লপক্ষের নবমী। গাছপালার চন্দ্রাতপের ফাঁকফোকর দিয়ে নীলাকাশকে রুপোর রাংতা মাখিয়ে দিল চাঁদ। মিনিটে মিনিটে আলোর দীপ্তি বাড়ছে। গাছগাছালির নীচে চুঁইয়ে আসছে সে আলো। রাত আরেকটু বাড়লেই জঙ্গলের নীচটাতে এক অদৃশ্য হাত পেতে দেবে আলোছায়ার বুটিকাটা সাদা-কালো গালচে। ঠিক এমন সময়ে বেশ দূরে ভারী পায়ের অনেকগুলো খুরের আওয়াজ শোনা গেল। শুকনো পাতা খুরের চাপে মচমচ করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। পাথরের সঙ্গে খুরের ঠোকাঠুকিতে খট খট করে আওয়াজ হচ্ছে। আমাকে পেরিয়ে গেলে নীলগাইয়ের দলের মধ্যে একজন তো অবশ্যই নিসারের বিয়ের রাতের মেনু বনে যাবে। আর দেরি নয়। বন্দুকটা তুলে নিয়ে তার নলটা জমির সমান্তরালে ধরে তাদের আসার পথের সামনে নিশানা নিয়ে আমি ট্রিগার টেনে দিলাম। ঝরঝর করে চার নম্বর শটসগুলো গাছেদের পায়ের কাছে, শুকনো পাতায় এবং পাথরে ফরফরিয়ে ছড়িয়ে গেল। হঠাৎই যেন ঝড় উঠল চৈত্রবনে। ফুল-পাতা-নুড়ি পাথর পদদলিত করে নীলগাইয়ের দল যে পথে এসেছিল সে পথেই দুড়দাড় শব্দ করে পাথরের ওপরে খুরে খুরে খটাখট শব্দ তুলে সজোরে

দৌড়ে গেল। কাল্লু খাঁ বলল চেঁচিয়ে, কওন হ্যায় রে সুরতহারাম। জরুর দুদু মিঞা। আজ হাম তুমকো কিমা বানায়গা। মজাকি করনেকি জাগে না মিলা।

বলেই কাল্লু মিঞা তরতরিয়ে গাছ থেকে নামতে লাগল। সে বন্দুকের আওয়াজ শুনে আমার অবস্থান সহজে আন্দাজ করেছিল, কিন্তু বুঝতে পারেনি যে আমি জমিতেই আছি, গাছে নয়। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে উপায় থাকলে হরিণ শম্বর নীলগাই-মারা শিকারি নীচে থাকে না, গাছেই থাকে।

এদিকে আমার গুলির শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুতবেগে একটা ছোট ট্রাক হেডলাইট জ্বেলে এদিকে ছুটে আসতে লাগল। এবং একটু পরেই ট্রাকটা এসে পড়ল এবং ঘুরিয়ে নিল মুখ। দাঁড় করাল একেবারে জঙ্গলের বাঁদিকে ঘেঁষে একটু নিচু জায়গা দেখে যাতে নীলগাইটাকে যদি মারত মিঞা তো বয়ে এনে সরাসরি জঙ্গল থেকেই ট্রাকের মধ্যে চালান করা যেত।

কাল্লু, আরে এ কাল্লু। বলে কে যেন ড্রাইভিং কেবিন থেকে দরজা খুলে নামল। তার সঙ্গে আরও জনা ছয়েক লোক। আমি এবার তাদের ট্রাকের পেছনে একটু দূরে নিশানা নিয়ে বাঁদিকের ব্যারেলের এল. জি-টি ফায়ার করলাম এবং করামাত্র ওরা শোরগোল তুলল, বলল, ই কেয়্যা মজাক হো রহা হ্যায়। তারপরেই উলটো দিকের জঙ্গল থেকে বন্দুক হাতে দু'জন লোক দৌড়ে এসে ওদের ট্রাকের দু'পাশে দাঁড়িয়ে বলল, কোই হিলেগা মত। হিলনেসে গোল্লিমে ভুঁঞ্জ দিয়া যায়েগা।

ওরা কারা? কাজমি সাহেবের শত্রুঘ্ন পাণ্ডে অ্যান্ড পার্টি কি?

ততক্ষণে ট্রাকে করে যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে অন্তত একজনের হাতে বন্দুক ছিল, সে গুলি চালিয়ে দিল। শত্রুঘ্নর দলের একজনের মাটিতে পড়ে যাওয়ার শব্দ হল। তাড়াতাড়িতে বন্দুকের দু' নলেই দুটো এল. জি. পুরে নিয়ে আমি পথের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা মস্ত বড় মহুয়া গাছের গুঁড়ির পেছনে আড়াল নিয়ে ঘটনা কী তা দেখার এবং শত্রুঘ্নর দলকে মদত দেওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে রইলাম। শত্রুঘ্নর দলের একজন পড়ে যেতেই ওদের দলের তিনটি বন্দুক পর পর গুলি চালাল। তখন হাজারিবাগী পোচারের দল ট্রাকটার এদিকে আড়াল নিতেই আমি ওদের পা লক্ষ করে ডানদিকের ব্যারেলের এল. জি. ফায়ার করে দিলাম। তাতে এল. জি-র দানা লেগে দু'জন 'ইয়া আল্লা' বলে জমি নিল। আমার আর একটামাত্র গুলি আছে। ওরা সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাল, কিন্তু সে সব গুলি মহুয়ার কাণ্ডে এসে বিঁধল। ইতিমধ্যে খুব জোরে একটা ট্রাক হেডলাইট ও স্পটলাইট জ্বেলে নাকার দিক থেকে এদিকে আসতে লাগল। ততক্ষণে শত্রুঘ্নর দলের তিনজন এসে গেছে ওপাশ থেকে। ওদের মধ্যে একজন ড্রাইভিং কেবিনে উঠে স্টিয়ারিং সিটে বসে ট্রাকটাকে এগিয়ে দিল যাতে ওরা আড়াল না পায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে চিতাবাঘের মতো ছিপছিপে একটি লোক হাতের দু'ঝটকাতে ওদের দু'জনকেই একসঙ্গে পটকে দিল মাটিতে আর অন্যরা তাদের বন্দুকটাকে কবজা করে ফেলল।

ততক্ষণে এস পি পাসোয়ান সাহেবের ক্র্যাক-প্ল্যাটুন নিয়ে পুলিশের ট্রাকটিও এসে পড়েছে। কারণ, আমার গুলির শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভবত কাজমি সাহেব রাজডেরোয়ার গেটের নাকাকে বলে দিয়েছিলেন ওয়্যারলেসে ওঁদের খবর দিতে। তাই সব ঘটনা ঘটবার আগেই তারা নাকা পেরিয়ে এদিকে রওনা হয়েছিল ফুল স্পিডে।

এদিকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের শত্রুঘ্ন অ্যান্ড পার্টি আছে, আছে পুলিশের ক্র্যাক-প্ল্যাটুন, ওদিকে মিস্টার কাল্লু খাঁ কী করছেন এবং মিস্টার ভটকাইও কী করছেন তা একটু দেখা দরকার।

ওই দোলা ধরে হারহাদের দিকে খুব সাবধানে যতখানি কম শব্দ করে হয় এগোচ্ছিলাম। বিশ-পঁচিশ গজ গেছি এমন সময়ে সামনে একটা ধস্তাধস্তির শব্দ শুনলাম। আতঙ্কিত হয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখি, ভটকাই কাল্লু মিঞার বন্দুকটা তারই দিকে বাগিয়ে ধরে প্রচণ্ড উত্তেজনাতে লাফাতে লাফাতে বলছে, আমি বাগবাজারের ভটকাই মিঞা। মাল চেনোনি বিশ্বেশ্বর। কোথায় খাপ খুলতে এসেছিলে তা বোঝ এবারে।

কী করে নিরস্ত্র ভটকাই এই অসাধ্য সাধন করল আমি তা ভেবে যত না অবাক হলাম তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক হয়েছিল কাল্লু মিঞা। আমি ভেবে পেলাম না কাল্লু মিঞার বন্দুকটা কী উপায়ে নিজে গুলি না-খেয়ে ভটকাই হস্তগত করল?

আমি গিয়ে পৌঁছতে সে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। আমাকে দেখে ভটকাই বলল, যা তো রুদ্র, আমি তোকে কভার করে আছি। তোর বন্দুকটা ওই গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে রেখে মক্কেলের হাত দুটো ভাল করে দড়ি দিয়ে বাঁধ তারপর দড়ি ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চল বড় রাস্তাতে। সেখানে নন্দী-ভৃঙ্গী পাথরের ওপরে Reception Committee নিশ্চয় মজুদ আছে।

আমি কাল্লু মিঞার কাছে গিয়ে দেখি একটা হলুদ-রঙা মোটা নাইলনের দড়ি দিয়ে একটি বড় ফাঁস বানানো হয়েছে। দড়িটি তার মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে তুলে নিতেই কাল্লু মিঞা পালাবার মতলবে ছিল কিন্তু ভটকাই বলল, তোমার খুপরি উড়ে যাবে বাছা। নড়েচ কী মরেচ। আমাদের দু'জনের বয়স এবং ভটকাইয়ের ভাষাতে বেজায় আহত কাল্লু মিঞা আর বেয়াদবি করবে বলে মনে হল না। ধরেই নিল এই দু'জন কোনও কৃতবিদ্য মানুষ, এদের সঙ্গে ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই না করাই ভাল।

আমি বললাম, আপতো জানসে বাঁচ গয়্যা মিঞা, মগর হুঁয়াতো আপকি চার দোস্তোঁ মুর্দা বন গ্যয়ে। আপহি লোঁগোকি ট্রাকমে উনলোগোঁকি লা রহা হ্যায়, ঘোড়ফরাস শোচকর।

কওন?

পাসোয়ান সাহেবকি পুলিশলোঁগ।

আপলোগ কওন হ্যায়?

ভটকাই বলল, হামলোগ কাঁড়িয়া পিরেত বা। হাঁ।

কাল্লু মিঞার চোখমুখের অবস্থা এমনই হল যেন অক্কা পাবে।

একটু পর আমাকে বলল, আপহি ও গোলি চালায়া থা? পহিলেওয়ালা গোলি? জি হাঁ।

কিঁউ? উতনা নজদিকোঁ সে এক ভি ঘোড়ফরাস ধড়কানে নেহি সেকা তো নিসার কি বরাতমে জানেকি হক্কে নেহি হ্যায় আপকো।

হামলোগোঁকো বরাত মে যানেকা দাওয়াত থোড়ি মিলা! মিলনেসে সায়েদ ধড়কা দেতা থা।

কথা বলতে বলতে আমরা যখন বড় রাস্তাতে উঠে এলাম তখন দেখি ঋজুদা একা উঁচু পাথরে বসে পাইপ খাচ্ছে। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কনগ্র্যাচুলেশনস। তারপর কাল্লু মিঞার দিকে চেয়ে বলল, বোলো ভাই কাল্লু মিঞা, হাজারিবাগমে আচ্ছা খাসি কা ক্যা কম্মি পড়া থা যো ঝুটমুট বড়ি মুশকিলসে বাঁচাহুয়া ই ঘোড়ফরাসকি ঝুণ্ডকি পিছে আপলোক পড় গ্যয়া?

গলতি হো গ্যয়া হুজৌর।

উও সব বাত ডি এফ ও সাহাব ঔর এস পি সাহাবসে কিজিয়ে গা। উও সব বাতে শুননেকি এক্তিয়ার হামে নেহি না হ্যায়।

বলতে বলতে কাজমি সাহেবের জিপ ওদিক থেকে এসে গেল। ফরেস্ট গার্ডরা কাল্লু মিঞাকে ধরে পেছনে ওঠাল।

ভটকাই বলল, আপ কি বন্দুকোয়া কাল্লু মিঞা?

বলেই, বন্দুকটা কাজমি সাহেবের হাতে তুলে দিল।

কাজমি সাহেব বললেন, বহুত বহুত শুকরিয়া খোকাবাবুলোগ।

বলেই জিভ কেটে বললেন, গলতি হো গ্যয়া।

ঋজুদা বলল, কাল দোপহরমে খানা হারহাদমে। ইয়াদ রাখনা।

ঔর পরশু রাত কি খানা হামারি হুঁয়া। পাসোয়ান সাব ভি আইয়ে গা খোকাবাবুলোগকি, ধ্যাৎতারিকা!—ইয়ে বাহাদুর-লোগোঁকো মিলনেকি লিয়ে।

বহত আচ্ছা। ঋজুদা বলল।

তারপর জিপটা চলে গেলে বলল, তাহলে এখন কিংকর্তব্যম্?

চা খাওয়া আর পাইপ খাওয়া।

আর গান গাওয়া হবে না একটু?

কী গান? কার গান!

'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো'। আজ ভটকাই গাইবে।

আমি বললাম, 'ফুলের বনে যার পাশে যাই তারেই লাগে ভাল।' বলেই বললাম, ছিঃ ছিঃ ভটকাই মিঞা শেষে কাল্লু মিঞাকে পাশে পেয়ে এই গান।

ভটকাই ম্যাচিওরিটি দেখিয়ে আমাকে ইগনোর করে ঋজুদাকে বলল, লাস্ট কোয়েশ্চেন; প্ল্যাটুন শব্দটির মানে কী?

প্ল্যাটুন সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত শব্দ। দশজন সৈন্যর একটি দলকে বলে Platoon—আর্মির সবচেয়ে ছোট unit। জানি না, এখন সংখ্যা আরও বেড়ে থাকতে পারে। আমরা যখন এন.সি.সি-তে ছিলাম তখন এরকমই ছিল। যেমন একশো জনের দলকে বলে Company। আর পাঁচশো জনের দলকে বলে Battalion।

কেমন ভটকাই বাহাদুর? স্যাটিসফায়েড?

ইয়েস।

আচ্ছা। তুই বন্দুকধারী কাল্লু মিঞাকে কবজা করলি কী করে রে ভটকাই, খালি হাতে? ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

ভটকাই তার ডান কপালের পাশে দুটো টোকা মেরে বলল, এখানে কিছু থাকতে হয়। ক্যালি।

তারপর বলল, চৌকিদারের বউয়ের কাছ থেকে দড়িগাছা চেয়ে নিলাম। এক প্রান্তে ফসকা-গেরো মেরে দোলাটি আর হারহাদের মাঝের জানোয়ার-চলা পথে একটা পঁইসার গাছে হাত পাঁচেক ওপরে এমন একটি ডালে বসে থাকলাম যে নীচ দিয়ে কেউ গেলে ওপর থেকে তার গলায় ফাঁসটি গলিয়ে দিয়ে টান মারলেই সে কবজাতে আসবে। তবে ওই পথে যদি না আসত কাল্লু মিঞা এবং দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য না হয়ে, তাহলে ওই মালা নিজের গলাতেই পরাতে হত। কিন্তু...

ঋজুদা বলল, As luck would have it!

আমরা সমস্বরে বললাম, ঠিক।

পথপাশের ঝোপ থেকে একটি বিচথুপড়াও বলে উঠল, ঠিক ঠিক। ঠিক।

মোটকা গোগোই

কাজিরাঙার ফিল্ড ডিরেক্টর বরজাতিয়া সাহেব ফরেস্ট সেক্রেটারি মহান্ত সাহেবের নির্দেশে ঋজুদার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ঋজুদা ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল অনেকবার। অনেকেই দিন ধরে। কিন্তু সঞ্জয় দেবরায় সাহেব তাকে ব্যক্তিগত চিঠি লেখাতে আর 'না' করতে পারেনি। তারপরে ফোনও করেছিলেন।

সঞ্জয় দেবরায় সাহেব অনেকদিন আগে মানাস টাইগার প্রজেক্টের ফিল্ড ডিরেক্টর ছিলেন। 'মানাস' লোকে বলত তাঁরই মানসপুত্র। তারপর আসামের চিফ কনজার্ভেটর হয়ে, (তখনও প্রিন্সিপাল কনজার্ভেটরের পদ সৃষ্টি হয়নি) চাকরির শেষ পর্যায়ে দিল্লিতে ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফরেস্ট হয়ে অবসর নিয়েছিলেন। আসামেই বসবাস ওঁদের, যদিও বাঙালি। বাংলা সাহিত্যের খুব ভক্ত ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। ঋজুদার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল দেবরায় সাহেবের অনেক বছর আগে। তখন উনি বরপেটা রোডে ছিলেন মানাসের ফিল্ড ডিরেক্টর হিসেবে। জঙ্গলপাগল মানুষ, অনেক করেছেনও মানাসের জন্যে।

আসামের বনবিভাগ এবং পুলিশ বিভাগের অনেকেই দক্ষ অফিসার আছেন কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই এখন বোড়ো এবং অন্যান্য উপজাতিদের সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় ব্যস্ত, বিশেষ করে নামনি আসামে। তা ছাড়া, ঋজুদার অভিজ্ঞতা বিশ্বব্যাপী। পুব আফ্রিকার আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্রেরও মোকাবিলা করে এসেছি বলতে গেলে দোকা হাতে আমি আর ঋজুদা। পরে অবশ্য তিতিরও গেছিল। তাই ওঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধে শেষ পর্যন্ত ঋজুদাকে আসতেই হয়েছে।

গুয়াহাটিতে প্লেনে নেমে আমরা কাজিরাঙার বনদপ্তরের অতিথিশালাতে না থেকে নওগাঁর সার্কিট হাউসে গিয়ে উঠেছিলাম। এই নওগাঁতে এসে ওঠার নানা কারণ ছিল।

সকালে গুয়াহাটিতে প্লেন থেকে নেমে একটি অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে করে বেরোলাম আমরা নওগাঁর দিকে। ঋজুদা বলল, আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে সুপুরি গাছে ভরা গুয়াহাটিকে যারা দেখেছে, তারা আজকে এ শহরকে চিনতেই পারবে না। ঘুমন্ত শহর ছিল। অবশ্য ঘুম এখন সব শহরের চোখ থেকেই বিদায়

নিয়েছে।

পথে জাগগি রোডে (নাথোলা) হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনের মস্ত কারখানা। কাগজ কলে দু'দিক থেকে সারি সারি ট্রাক আসছে বাঁশ ও কাঠ নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে। প্রকাণ্ড শহর গড়ে উঠেছে ওই কারখানাকে কেন্দ্র করে। ইউনিট টু-র ছোট ছোট বাড়ি আর ইউনিট ফোর-এর ফ্ল্যাটবাড়িগুলো পথের পাশে। এখান থেকে নওগাঁর পথেই পড়ে আইততবি গ্রাম। ঋজুদা দেখাল আমাদের। বিখ্যাত অহমিয়া লেখক লক্ষ্মীনারায়ণ বেজবরুয়ার জন্মস্থান। মূল পথ থেকে ভিতরে যেতে হয় কিছুটা। ঋজুদা বলল, বেঁচে ফিরলে, ফেরার পথে তোদের নিয়ে যাব। পথের ওপরে বোর্ডও আছে।

আমাদের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সামতাবেড়ে গ্রামে যাওয়ার পথ নির্দেশ করে তো কোনও বোর্ড নেই বম্বে রোডে।

শরৎবাবুকে তো আধুনিক বাঙালি লেখকরা লেখক **বলেই স্বীকার** করেন না, সরকারও করে কিনা জানি না।

ঋজুদা বলল।

তা তাঁরাই বা কী লিখলেন!

ভটকাই ফুট কাটল।

ঋজুদা বলল, যাক। আমরা এখন গণ্ডারের বিচরণভূমি কাজিরাঙায় বেড়াতে যাচ্ছি, সাহিত্যর কমলবনের কথা না হয় থাকই এখন।

একটু পরই পথের বাঁ পাশে ব্রহ্মপুত্র দেখা গেল। মার্চের শেষেও তার বিস্তৃতি দিগন্ত অবধি। দেখতে দেখতে কুওয়ারিটোলাতে এসে পৌঁছোলাম। এখান থেকেই বাঁদিকে পথ চলে গেছে সিলঘাটে। ৯ কিমি মতো পথ। ব্রহ্মপুত্রর ওপারে যেতে হলে সিলঘাট হয়ে যেতে হয়। তাদের এখান থেকেই নদী পেরোতে হবে ফেরিতে। গাড়ি ট্রাক বাস—সবই ফেরিতে করে গিয়ে ওপারের ভোমরাঘাটে ওঠে। ভোমরাঘাটে একবার পৌঁছে গেলে ওখান থেকে তেজপুর সামান্যই পথ।

ঋজুদা বলল, কথা হচ্ছে ব্রিজ হবে, তখন আর ফেরি পেরোবার ঝঞ্ঝাট থাকবে না। আমরা অবশ্য সোজাই এগোলাম নওগাঁর দিকে। অনেকই পেছনে জোড়বাটকে ফেলে এসেছি। মেঘালয়ের সীমানা জোড়বাট হয়েই ডানদিকে শিলংয়ে যাওয়ার পথ চলে গেছে।

নওগাঁতেই ঋজুদার লিস্ট অনুযায়ী সব কিছু জিনিসপত্র এই জলপাই-সবুজ বোলেরো জিপটিতে ভরে নেওয়া হল। জিপটি নওগাঁ সার্কিট হাউসেই আমাদের হাতে তুলে দেন বনবিভাগের অফিসারেরা। বন্দুক রাইফেলও আমরা নিয়ে আসি ট্রাঙ্কে করে। পশ্চিমবঙ্গের হোম সেক্রেটারি সৌরীন রায় এবং নেতাজি সুভাষ এয়ারপোর্টের বড়সাহেবকে আগে থাকতে বলা ছিল বলেই লাগেজের এক্সরে-তে সেগুলো ধরা পড়লেও, ওঁরা আটকাননি। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের পূর্বাঞ্চলের ডিরেক্টর কল্যাণ মজুমদার সাহেবও আগে থাকতে সিকিউরিটি স্টাফকে বলে

রেখেছিলেন। রাইফেল বন্দুক পাইলটের কাছে জমা রাখা যেত, কিন্তু তাহলে গুয়াহাটি এয়ারপোর্টেই জানাজানি হয়ে যেত আমাদের আসার কথাটা এবং আমরা যে এতগুলো আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে খেলা করতে যাচ্ছি না, সে কথাও। সেই জন্যেই এই গোপনীয়তা।

নওগাঁ থেকে সন্ধেবেলা বেরিয়ে রাতের বেলা, টাটার চা-বাগান পেরিয়ে অন্য একটি বাগান হাতিখুলিকে ডান পাশে রেখে বাঁদিকে আমরা ঘাসবনে ঢুকেছিলাম।

রাতের বেলা কাজিরাঙাতে কোনও গাড়ি ঢুকতে পারে না, কোনও পর্যটকও যেতে পারেন না, কিন্তু বনবিভাগের সহায়তায় আমরা ঢুকেছিলাম। হেডলাইট নিভিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে আমরা যে অবজার্ভেশন পোস্টটা আছে কাঠের, দোতলা সমান উঁচু, সেখানে বসে বনবিভাগের কাছ থেকে সব বুঝে নিয়েছিলাম। ম্যাপও তাঁরাই দিয়েছিলেন দাগ-টাগ দিয়ে।

খুব গর্বভরে প্রথমবার কাজিরাঙাতে আসার গল্প করে ঋজুদা আমাদের। ঋজুদা তখন, বলতে গেলে শিশু। জেঠুমনির সঙ্গে এসেছিল। কাজিরাঙাতে তার পরেও বহুবার এসেছে এবং বনবিভাগের অতিথি হয়ে বনের ভিতরে ভিতরে ঘুরেছে। সাধারণ পর্যটকের মতো সে যাওয়া নয়। তাই ম্যাপটা দেখে কোন কোন জায়গাতে চোরাশিকারিরা গণ্ডার মেরেছে এ পর্যন্ত, তা ঋজুদা ভাল করে দেখে নিয়েছে। একটা ছোট দল নাকি এসে কাজিরাঙার মধ্যেই ডেরা করেছে। নাগা ও গারো তারা। এর আগেও তারা এসেছিল বছর কয়েক আগে, তখন তাদের একজনকে ফরেস্টগার্ডরা গুলি করে মেরেও ছিল। তাতেও তারা দমেনি। আবার এসেছে।

পশ্চিমি দেশ হলে হেলিকপ্টারে করে কাজিরাঙার ওপরে ভাল করে **টহল** দিলেই এই ঘাসবনের চোরাশিকারিদের ধরা যেত। কিন্তু আমাদের দেশের সব রাজ্যেরই বনবিভাগের টাকা কোথায়? জিপ কিনতেই যাদের রেস্ত ফুরোয়, তারা হেলিকপ্টার কিনবে কোত্থেকে? তাও টাইগার প্রজেক্টের জন্যে ওয়ার্ল্ড লাইফ ফান্ড টাকা দেওয়াতে টাইগার প্রজেক্টগুলোর অবস্থা একটু ভাল হয়েছে। কিন্তু রাইনো বা এলিফ্যান্ট প্রজেক্টের জন্যে বিদেশ থেকে কোনও টাকা তো আসে না।

আমরা রাতটা ওই অবজার্ভেশন পোস্টেই শুয়ে থেকে শেষরাতে নেমে জিপে **বসে** জিপের হেডলাইট না-জ্বেলে কাজিরাঙার মধ্যে যেখানে ডাঙা জমি ও গভীর জঙ্গল আছে, স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে 'কাঠোনি', হাতি, গণ্ডার, হগ-ডিয়ার যেখানে থাকতে ভালবাসে, সেই দিকে এসে একটি বড় অশ্বত্থগাছের নীচে জিপটা **পার্ক** করেছিলাম। সকালের চা-বিস্কিট খেয়ে ওই ম্যাপটাকেই ভাল করে দেখছিলাম আমরা। বলতে ভুলে গেছি, আমাদের রান্না করা আর খিদমদগারি করার জন্যে অল্পবয়সি ফরেস্ট গার্ডকে দিয়েছেন ওঁরা, সে আমাদের গাইডও বটে। সে মেচ উপজাতির মানুষ। তামার মতো গায়ের রং। বেঁটেখাটো। তবে তাগা সঙ্গে বন্দুক রাখেনি, দূরপাল্লাতেও যাতে লক্ষ্যভেদ করতে পারে তাই

ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স কোম্পানির থ্রি-ফিফটিন রাইফেল নিয়েছে একটা। বনবিভাগের আর্মারি থেকে। ভালই করেছে। বন্দুকে তার হাত নাকি খুব ভাল। সে নাকি ভাল রাঁধুনিও। তারই নাম তাগা মেচ। সে নাকি খুবই উৎসাহী ও অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়। সেই জন্যেই চিফ কনজার্ভেটর দাস সাহেব ওকে আমাদের সঙ্গে দিয়েছেন। ভারি হাসিখুশিও সে। ঋজুদার সাকরেদি করতে পেরে যেন ধন্য হয়ে গেছে।

ঋজুদার কাছে যখন শুনেছে তাগা যে, ঋজুদা তাদের গ্রামেও গেছে, তখন সে রীতিমতো হাঁ হয়ে গেছিল।

তাগা মেচ-এর গ্রাম নামনি আসামের গোয়ালপাড়ার রাঙামাটি পাহাড়ে। গৌরীপুর থেকে যে পথটি চলে গেছে বরবাধা ফরেস্ট রেঞ্জে, সেই পথে। কুমারগঞ্জ আর তামাহাটের মধ্যে ডানদিকে একটি পাহাড় পড়ে। সেই পাহাড়ে যেতে হয় নাকি একটি টুঙবাগান পেরিয়ে। পাহাড়ের নাম আলোকঝারি। আলোকঝারিতে সাতই বোশেখে মস্ত বড় মেলা বসে প্রতি বছর। দেখার মতো মেলা সে। কত আদিবাসী আসে, পুজো দেয়, মুরগি ও কবুতর বলি দেয়। সেই আলোকঝারি পাহাড়ও পেরিয়ে গিয়ে নাকি রাঙামাটি। এক সময়ে মস্ত জঙ্গল ছিল সেখানে। বড় বাঘের ডেরা।

ঋজুদার কাছে সে সব গল্প একটু শুনেই তাগা মেচ ঋজুদাকে ঘরের মানুষ বলে মেনে নিয়েছে। এখন তারা নাকি রাঙামাটি ছেড়ে গারো পাহাড়ের পায়ের কাছে জিজিরাম নদীর পারের একটি গ্রামে এসে আস্তানা গেড়েছে। গ্রামের নাম মেচতালা। পাশেই রাভাতালা।

ম্যাপ তো আমাদের কাছে ছিলই, কিন্তু তাগাই আমাদের এনসাইক্লোপিডিয়া।

দুই

চিক-চুঁ ই ই ই ই...

শব্দটা দিগন্তব্যাপী ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে অনেকেই দূর থেকে যেন হাজার হাজার ঘাস চিরে কাজিরাঙার মে মাসের শান্ত সকালকে ঝুঁটি-নাড়া করে দিয়ে গেল।

দূরের পেলিক্যান-কাঠোনির উপরে কিছু পাখি চক্রাকারে উড়তে লাগল গুলির শব্দ শুনে। ঘুরতে লাগল নীল আকাশে তারস্বরে ডাকতে ডাকতে। পেলিক্যানদের আড্ডা ছিল এক সময়, তাই নাম পেলিক্যান-কাঠোনি। পেলিক্যানরা এখন সরে গেছে অনেক ভিতরে। পুরো কাজিরাঙার এই এলাকার ঘাসবনের বাদা-জলাতে যে সব পাখি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল তারাও মাটি ছেড়ে উড়ে আকাশে ঘুরপাক খেতে লাগল।

আমরা, মানে আমি, ঋজুদা আর ভটকাই কাজিরাঙার মধ্যে দিয়ে যে কাঁচা রাস্তাটা পাক দিয়ে দিয়ে গেছে, যে রাস্তাতে শুধু বনবিভাগের জিপারোহী

আমলাদের আর সাইকেল-আরোহী বনরক্ষীদের যাতায়াত, সেই পথের ওপরেই একটা মস্ত গাছের নীচে জিপ দাঁড় করিয়ে বসে ছিলাম। স্টিয়ারিংয়ে ছিলাম আমি। আমার পাশে ঋজুদা, পাইপ মুখে, কাজিরাঙার একটা ম্যাপ দু'হাঁটুর ওপরে মেলে রেখে। মনোযোগ সহকারে দেখছিল। আর পেছনের সিটে ভটকাইচন্দ্র। তার পিপাসা লাগাতে, বরফে-রাখা প্লাস্টিকের বাক্সর মধ্যে থেকে একটা স্প্রাইটের বোতল বের করে সবে বিড়বিড় করে বলেছে, 'দিখাওমে মত যাও, আপনা অকল লাগাও' আর সঙ্গে সঙ্গেই ওই গুলির শব্দ।

ভটকাইয়ের পাশে বসেছিল তাগা মেচ, আমাদের সঙ্গী-কাম-গাইড। তাগা মেচ শেয়ালের মতো কান খাড়া করে শব্দটা শুনে বলল, ওই! মোটকা গোগোই-এর দল আইস্যা পৌঁছাইয়া গেছে। একটা গেন্দারে মাইর‍্যাই দিল বোধহয়।

আমাদের সকলের মনেই সেই আশঙ্কাই হয়েছিল। ঋজুদা নিচু গলাতে বলল, ভটকাই, অকল লাগাও।

ভটকাই একটু চুপ করে থেকে বলল, হেভি বোরের রাইফেলের শব্দ। এখান থেকে বেশ দূরে হয়েছে গুলিটা। প্রায় ব্রহ্মপুত্রর কাছাকাছি।

আসামে গণ্ডারকে বলে গেন্দা।

ঋজুদা বলছিল যে প্রথম যেবারে এসেছিল কাজিরাঙায় তখন কাজিরাঙা এত বিরাট কিছু ছিল না। এত সব বাংলোর বাহারও ছিল না। একটি ছোট্ট খড়ের ঘর ছিল কাজিরাঙা ফরেস্ট অফিস। কাঠের বেড়া দেওয়া ছিল চতুর্দিকে, বাঘ, গণ্ডার ও হাতির হাত থেকে বাঁচার জন্য। সেই বাংলোর কাঠের গেটের দু'দিকের পাল্লার মাথাতে কাঠের দুটো গণ্ডার-মূর্তি ছিল। সে সব অনেকদিনের কথা। স্কুলে পড়ত তখন ঋজুদা। একটা খুব বুড়ো আর মস্ত গণ্ডার ছিল এই ঘাসবনে। তার নাম ছিল বুড়া গেন্দা। তার সঙ্গে বনবাসীদের বন্ধুর মতো সম্পর্ক ছিল। তাকে সকলেই ভালবাসত। সে মারা গেছিল অবশ্য স্বাভাবিক কারণে, চোরাশিকারিদের হাতে নয়। মরে যাওয়ার পর তার খড়্গটি সযত্নে রাখা ছিল সেই খড়ের বনবাংলোতে। এখন কাজিরাঙায় যে মিউজিয়াম মতো হয়েছে সেখানেও রাখা আছে সেটি।

বনের মধ্যে যে কোনও শব্দ শুনেই তার দিক ঠিক করা এবং দূরত্ব মাপা শিখতে জীবন কেটে যায়। পাহাড়ের ওপরে একরকমভাবে তা মাপতে হয়, গভীর জঙ্গলের মধ্যে আবার অন্যরকমভাবে। পুব আফ্রিকার সেরেঙ্গেটির অথবা কাজিরাঙার মতো এইরকম দিগন্তবিস্তৃত ঘাসবনে আরও অন্যরকমভাবে। পাহাড় ও জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে আমরা সেখানের শব্দ শুনে দূরত্বর আন্দাজ একটু একটু করতে পারি আজকাল, তবুও গণ্ডগোলও হয়ে যায় প্রায়ই। শব্দটা ডানদিক থেকে হল ভাবলাম, হয়তো পরে দেখা গেল বাঁদিক থেকে হয়েছে। প্রথমে মনে হল, দেড়শো-দুশো মিটার দূরে হয়েছে, কিন্তু পরে বোঝা গেল আরও দূরে হয়েছে। পাহাড় জঙ্গলেই এখনও আমরা গুবলেট করে ফেলি, আর এ তো ঘাসবন! দিগন্তলীন।

তবে ভটকাইচন্দ্রর ব্যাপারই আলাদা। হিন্দিতে বলে না, 'গুরু গুড় আর চেলা চিনি'—সেইরকমই ব্যাপার আর কী! সে এখন ঋজুদারও ওপর দিয়ে যায়।

আমি ফিসফিস করে ঋজুদাকে বললাম, কী করব আমরা?

ভটকাই বলল, গুলির আওয়াজটা বাঁদিক থেকে এল, না?

ঋজুদা বলল, না। সোজা।

ভটকাই বলল, দুশো মিটার দূর থেকে হবে?

আমি বললাম, বেশি, চারশো মিটার হবে।

মনে হয় তিনশো মিটার। বন্দুকের গুলি নয়, রাইফেলের গুলির আওয়াজ। ঋজুদা বলল।

জিপ নিয়ে এগোব কি?

জিজ্ঞেস করলাম ঋজুদাকে।

এগো, তবে ফার্স্ট-গিয়ার সেকেন্ড-গিয়ারে। দূর থেকে যেন একটুও শব্দ শোনা না যায়।

ঠিক আছে।

আমি বললাম, মাথার অলিভ-গ্রিন রঙা টুপিটাকে ঠিক করে বসিয়ে। তারপর ফার্স্ট-গিয়ারে দিয়ে, বাড়ালাম জিপটাকে। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে এগিয়ে চলল জিপটা। এই জিপটা সাধারণ জিপ নয়। মাহিন্দ্রর বোলেরো। ডিজেলে চলে। এয়ারকন্ডিশানড। প্রায় শব্দহীন। মধ্যে অনেকেই জায়গা। অবশ্য আমাদের মালপত্রও কম নয়। একটা তাঁবু, শুকনো খাবার-দাবার, টিনের স্যুপ, ক্যানড সার্ডিনস এবং ম্যাকারেল। চা-বিস্কিট, মুড়ি-চিঁড়ে-গুড়, চাল-ডাল-আটা-আলু, সর্ষের তেল, গাওয়া ঘি—বাসস। এমনই ঠিক হয়েছে যে, প্রয়োজনে আমরা জিপ কোথাও জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রেখে তাঁবু খাটিয়ে থাকব। বড় গাছে মাচা করেও থাকতে পারি। দুটি বাইনাকুলার আছে সঙ্গে, জাইস-এর। তাতে গাছের ওপরের মাচায় বসে চারদিক দেখতে সুবিধা হবে। মাচা বাঁধার জন্যে সফট উড-এর চারটি তক্তা এবং নাইলনের দড়িও এনেছি সঙ্গে। ডিজেলের ট্যাঙ্ক ভর্তি আছে। তবুও সঙ্গে এক জেরিক্যান ডিজেলও নেওয়া আছে। রান্নার জন্যে ছোট গ্যাস সিলিন্ডার খড়ের ঝুড়িতে বসানো, যাতে ঝাঁকুনি লেগে শব্দ না হয়। ডিম, ছোট স্টেইনলেস স্টিলের হাঁড়ি, প্লাস্টিকের কাপ ডিশ কাঁটা চামচও খড়ের ঝুড়িতে বসানো, যাতে শব্দ না হয়। আমার আর ঋজুদার কোমরে যার যার পিস্তল। ভটকাইয়ের কাছে ডাবল-ব্যারেলড শটগান, ঋজুদারই সেটা। চার্চিল, টুয়েলভ বোর-এর। গুলির বেল্টটা ব্যাঙ্কের দারোয়ানেরা যেমন করে ক্রশ-বেল্ট করে বুকে পরে, তেমন করেই পরে নিয়েছে। শটগানের রোটাক্স আর লেথাল আর স্কেরিক্যাল বুলেট, আছে এল. জি. এবং চার নম্বর শটস আছে কিছু। আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি যা আছে তা দিয়ে যুদ্ধ লড়া যায় তবে আমরা লড়াইটা বুদ্ধির লড়াইই লড়তে চাই মোটকা গোগোই-এর সঙ্গে। গুলি-বন্দুকের নয়। আমার কাছে আছে থার্টি-ও-সিক্স

রাইফেল। ম্যানলিকার শুনারের। জার্মানির। আর ঋজুদার কাছে তার প্রিয় ডাবল-ব্যারেল রাইফেল ইংলিশ হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ডের থ্রি সেভেন্টিফাইভ ম্যাগনাম। শ্লোটিং বন্দুক-রাইফেল বলতে এখনও ইংলিশ, জার্মান, আমেরিকান, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, বেলজিয়ান। মানে, যে সব জাতের মধ্যে জলদস্যু বেশি ছিল তারাই আগ্নেয়াস্ত্রর ব্যাপারে এগিয়ে আছে বলে মনে হয়। অবশ্য আমেরিকার কথা আলাদা—তারা তো সেদিনের দেশ। এই সব দেশের মানুষরা বা অন্য নানা দেশের মানুষরাই তো গিয়ে বসবাস করা শুরু করেছে সেখানে। তবুও আমেরিকান শ্লোটিং রাইফেল-বন্দুকও কম যায় না। উইনচেস্টার, রেমিংটন ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিছুদূর যাওয়ার পরেই একটা কাঠোনির মধ্যে পৌঁছোতেই ঋজুদা বলল, দাঁড় করা জিপ।

জিপ থামালে ঋজুদা বলল, ভটকাই, গাছে চড়তে পারবি, তাড়াতাড়ি।

হ্যাঁ।

শেষ কবে গাছে চড়েছিলি?

তোমার সঙ্গে নিনিকুমারীর বাঘ মারতে গিয়ে। ওড়িশায়।

ঋজুদা কিছু বলার আগেই তাগা বলল, আমি চড়ছি স্যার। আমি তো প্রায় রোজই চড়ি।

ঋজুদা বলল, তাই ভাল। তুমিই তাড়াতাড়ি গাছে চড়ে পড়ো তো দেখি। রুদ্র, বাইনাকুলারটা তাগার গলাতে ঝুলিয়ে দে।

তারপর বলল, শোনো তাগা। ওপরের ডালে উঠে যেদিকে ফাঁকফোকর আছে সেদিকে এগিয়ে যাবে। গুলির আওয়াজ যেদিক দিয়ে এল সেদিকে এই দূরবিনটা চোখে লাগিয়ে খুব ভাল করে নজর করবে কিছু দেখতে পাও কিনা। তাড়াহুড়ো করবে না। অনেকক্ষণ ধরে ভাল করে দেখবে। কোনও কিছু দেখতে পেলে নেমে এসে বলবে আমাদের।

বুঝছি স্যার।

রুদ্র বাইনাকুলারটা কী করে অ্যাডজাস্ট করে দেখিয়ে দে তাগাকে।

তাগা বললে, আমি জানি স্যার। আমাগো ডিপার্টে আছে না চারখান।

তাহলে তো ভালই।

তাগা গাছে উঠে গেলে ঋজুদা ভটকাইকে বলল, একটা কাজে তোকে লাগাব ভেবেছিলাম। তোর লেজ তো বেশিদিন খসেনি। সেই কাজটাই যখন তাগাই করে দিল, তখন তোকে ফেরতই পাঠিয়ে দেব ভাবছি। কাজিরাঙার আই. টি. ডি. সি-র লজে গিয়ে থাক। ফার্স্ট ক্লাস খাওয়া-দাওয়া। জমিয়ে ঘুম লাগা। তুই থাকলে, এখানে জায়গারও অকুলান হবে। তা ছাড়া, তুই তো যেখানেই যাস, খেতে আর ঘুমোতেই চাস।

এবারে প্রথম থেকেই ঋজুদা ভটকাইকে একটু টাইট করে রাখছে দেখে খুশি

হলাম আমি। যা বাড় বেড়েছিল ওর।

ভটকাই একটু আহত হয়ে বলল, খেতে আর ঘুমোতে তো কলকাতাতেই পারতাম। তার জন্যেই কি এত কাণ্ড করে এখানে আসলাম! তা ছাড়া, বন্দোবস্ত সব করি আমিই—আর রেলিশ করে খাও তোমরা সকলেই। আর তোমাদের গালাগালিটা শুধু আমি খাই।

তোর খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে যে এখানে। তাই তো বলছিলাম।

ভটকাই উত্তর না দিয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে রইল। মনে হল তার গোসা হয়েছে।

একটুক্ষণ পর তাগা নেমে এল গাছ থেকে। বলল, বড্ড ঘাস, জঙ্গলও আছে, দেখা গেল না কিছুই।

জানতাম।

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, এখন শুক্লপক্ষ। চৈত্র মাস। আজকে নবমী-দশমী হবে। যথেষ্ট আলো থাকবে রাতে। রাতের বেলা আমাদের ছড়িয়ে যেতে হবে। আমার ধারণা, ওরা মাচা বেঁধে আছে ওখানে। আবার নাও থাকতে পারে। দল বেঁধে গেলে হবে না। ওরাও যে মাচার ওপরে বসে দূরবিন দিয়ে আমাদের দেখছে না, তা কে বলতে পারে! ব্যাপারটা যদিও খুবই বিপজ্জনক হবে কিন্তু আমাদের একা একাই যেতে হবে। আগে পরে, ডাইনে বাঁয়ে, নিঃশব্দে এবং আস্তে আস্তে, গাছ-গাছালি এবং ঘাসের আড়াল নিয়ে নিয়ে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে, আরও একটা আইডিয়া এসেছে আমার মাথাতে।

কী আইডিয়া?

আমি বললাম।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কুনকি হাতির পিঠে শুয়ে যদি অলিভ গ্রিন শর্টস আর খালি গায়ে রাতের বেলা এগোনো যায়, তবে ওরা জংলি হাতি ভেবে হয়তো সন্দেহ করবে না কোনও আর আমরাও ওদের চমকে দিয়ে কাজ হাসিল করতে পারি। তবে তিন-চারটে হাতি লাগবে।

হাতির মাহুত লাগবে তো?

না। মাহুত-টাহুত নিয়ে ঝালর-দেওয়া হাওদা চাপিয়ে কি বিয়ে করতে যাবি রাজাদের মতো? হাতি তো চালিয়েছিস রুদ্র তুই উত্তর বাংলার তিস্তা পারের চ্যাংমারির চরে আর লালজির যমদুয়ারের হাতি-ধরা ক্যাম্পে। পারবি চালাতে তুই। তবে ভটকাই চালায়নি কখনও। তাগা তো পারবেই। ভটকাই না হয় না-ই যাবে।

ভটকাই চুপ করে থাকল। কী-ই বা বলবে!

ঋজুদা বলল, সন্ধে তো নামল। আজকে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। যেখানে

দরকার হবে, লেপার্ড-ক্রলিং করে যেতে হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে, যদি ওদের দেখামাত্র গুলি করে মারা সম্ভব হত, তবে তো অসুবিধের কিছুই ছিল না। কিন্তু মানুষ তো, অমনভাবে মারা যাবে না। মারাটা কখনও উচিতও নয়। মারলে নিজেদের ফাঁসি হয়ে যাবে। আর ওরা কিন্তু আমাদের দেখতে পেলেই কড়াক-পিং করে দেবে।

ভটকাই বলল, কেন মারা যাবে না? শাস্ত্রে বলেছে, 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'। শঠের সঙ্গে তো শঠের মতোই ব্যবহার করা উচিত।

তা উচিত। তবে তুই যদি গুয়াহাটি জেলে সারা জীবন কয়েদ থাকতে চাস অথবা ফাঁসিতে লটকে যেতে চাস, তবে তাই করিস। তোর বড় পিসিমা যেন আমার নাক বঁটি দিয়ে কাটতে না আসেন তাঁর আদরের ভেটকুর অমন দশা করলাম বলে। এদিকে অ্যাডভেঞ্চার করার শখও আছে, আর ওদিকে পিসিমার রিমোট-কন্ট্রোলের দাস, তা তো হয় না।

আমি বললাম, তুই রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গীর 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি কি পড়েছিল? পিসিমা বললেন, রেবু চলে আয়। আর অমনি অত্যাধুনিক দুঃসাহসী রেবতী সুড়সুড় করে পিসিমার পেছন পেছন চলে গেল।

না পড়িনি।

কলকাতাতে ফিরেই পড়ে ফেলিস। যেসব আধুনিক গল্পকার বলেন রবিঠাকুর গান ছাড়া কিস্‌সুই লেখেননি, যা লেখার তা সব তেনারাই লিখেছেন তাঁদেরই তো গুরু মেনেছিস তুই। তোর ইহকাল-পরকাল সব ফর্সা। শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকলে, বিশেষ করে পূর্বসূরিদের প্রতি, তার কিছুই হয় না। ঔদ্ধত্য, অসভ্যতা আর দুর্বিনয়ের সঙ্গে সপ্রতিভতার কোনও সম্পর্ক নেই, অথচ তোরা মনে করিস তাই।

'সপ্রতিভ' কথাটার মানে কী?

ঋজুদা লজ্জিত গলায় বলল।

আমি বললাম, স্মার্টনেস।

বাবাঃ, তুই তো বাংলায় পণ্ডিত দেখছি।

তিতিরের ইনফ্লুয়েন্স।

তিতির তো শুধু বাংলাতেই পণ্ডিত নয়, অনেক ভাষাতেই পণ্ডিত।

আমি তো আর কখনও হতে পারব না। আমার মা বলেন, ওর বুদ্ধিই আলাদা। আমার ঠাকুমা নাকি বলতেন, যে ছাও ওড়ে তার ডানা ফরফর করে। তিতিরকে প্রথম দিন দেখেই মায়েরও সেরকমই নাকি মনে হয়েছিল।

মানে?

কীসের মানে?

ওই ডানা ফরফর করার।

ভটকাই বলল।

মানে, যে বড় হবে তার মধ্যে শিশুকাল থেকেই বড়র লক্ষণ পরিস্ফুট হয়।

পরিস্ফুট মানে কী?

ঋজুদা বলল।

আমি বললাম, এবারে তুমিও আমার সঙ্গে...

ঋজুদা হেসে বলল, ওক্কে।

তারপর বলল, আয় এবারে তোদের কাজিরাঙার সিনটা আর পটভূমিটা ভাল করে বুঝিয়ে দি। এর পরে হয়তো সুযোগ পাব না। তা ছাড়া মোটকা গোগোই অ্যান্ড কোম্পানি সম্বন্ধেও তোদের অবহিত করা দরকার।

ভটকাই বলল, আমরা আজ সকাল থেকেই একটু বেশি হাসাহাসি করছি না? 'যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রাম শন্না'।

ঋজুদা বলল, ঠিকই বলেছিস। এবারে যা বলি সব মন দিয়ে শোন।

বলেই বলল, তাগা আমার চেয়েও ভাল জানে। তাগাই বলো। আমরা সকলেই শুনি।

তাগা বলল, তিন-চার বছর আগে মোটকা গোগোই নামের একজন চোরাশিকারি একটি গেন্দাকে গুলি করেছিল বুড়হা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যে পথটা কাঞ্চনজুরি গেটের দিকে চলে গেছে সেই পথের পাশে। তবে গেন্দাটা মরেনি, মোটকা গোগোই ধরাও পড়েছিল। তার বিরুদ্ধে কেসও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গেন্দা নিজে তো আর কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দিতে পারেনি তাই আমাদের দেশে যা হয় গোগোই বেকসুর খালাস হয়ে গেছিল সাক্ষীপ্রমাণের অভাবে। তবে তাকে আমরা ভালমতো ঠেঙিয়ে ছিলাম। ঠেঙানি দেওয়ার সময়েই সে শাসিয়েছিল যে আমাদের দেখে নেবে এবং গেন্দাদের গুষ্টিনাশ করবে একবার ছাড়া পেলে।

ঋজুদা বলল, বেচারি। সে তো উপলক্ষমাত্র। গণ্ডারই বল, বাঘই বল আর দাঁতাল হাতিই বল, ওদের যারা মারে তারা তো Tip of the Iceberg। তা ছাড়া তারা সকলেই গরিব মানুষ। খুবই গরিব, কিন্তু দুঃসাহসী এবং আমাদের দেশের জঙ্গল-পাহাড় তারা যেমন জানে আমাদের জানা সে তুলনাতে কিছুই নয়। আমরা তো শহরেই থাকি, মাঝে মাঝে বনে আসি আর ওরা তো শিশুকাল থেকে বনেই বড় হয়ে ওঠে। আমাদের জ্ঞান অনেকখানিই কেতাবি। ওদের ক্রীড়নক করে বড় বড় রাঘব বোয়ালেরা। তাদের বাস হয়তো গুয়াহাটি কলকাতা পটনা মুম্বই চেন্নাই বা বাঙ্গালোরে। কোটি কোটিপতি তারা। পুব আফ্রিকাতে দেখিসনি কত বড় চক্র ছিল ভুষুণ্ডাদের পেছনে, কত তাদের অর্থবল জনবল। তাই যদি না হত তবে নীলগিরি পাহাড়ের চন্দন গাছ আর হাতির দাঁতের যম বীরাপ্পনকে কি তামিলনাড়ু আর কর্ণাটক সরকারে মিলেও এত বছরে ধরতে পারত না?

ভটকাই বলল, বীরাপ্পনের কথা বোলো না ঋজুদা। শুনলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। মিছিমিছি মাথাটা ন্যাড়া করলাম আর তুমি কোল্লেগালের জঙ্গলে আমাদের না নিয়ে গিয়ে মণিপুরের ইম্ফল, মায়ানমারের মোরে আর নাগাল্যান্ডের কাঞ্চপোকপিতে নিয়ে গেলে হিরে চুরির রহস্য ভেদ করতে।

তারপর বলল, আমি জানি কেন বীরাপ্পনকে ধরতে পারছে না ওরা।

কেন?

কেউই যে মরতে চায় না। কেউ যদি মনস্থির করে আমারই মতো যে নিজে মরেও কোনও অপরাধীকে ধরব কী মারব তবে সেই অপরাধীকে সাক্ষাৎ ভগবানও রক্ষা করতে পারবেন না।

ঋজুদা বলল, গতস্য শোচনা নাস্তি। ও কথা এখন আর আলোচনা করে কী হবে। তবে নিজে না মরে মোটকা গোগোইকে ধর কি মার দেখি এবারে, যদি অবশ্য তাগাদের অনুমান সত্যিই হয়, মোটকা গোগোইই এসেছে এখানে তার অপমান অসম্মানের বদলা নিতে।

ভটকাই দেখল বড় বেশি সাহস দেখিয়ে ফেলেছে, এবার সত্যি সত্যিই প্রাণ না যায়। তাই একটু চুপ করে থেকে বলল, দেখা যাক কী করতে পারি। ফলেন পরিচীয়তে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম তাগাকে, আমরা যখন শেষরাতে ওয়াচ টাওয়ার থেকে নেমে এখানে এলাম, পথের ডানদিকে একটা বিলের পাশে তিন-চারটে প্রকাণ্ড হাতি, দুটো গণ্ডারের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল, ওই বিলটার কী নাম? আর ম্যাপে তো আছেই অনেক কিছু, তুমি ভাই আমাদের কাজিরাঙা সম্বন্ধে যা জানো একটু ভাল করে বলে দাও। কী কী নদী, কী কী বিল, কী কী গাছ আছে ওখানে।

তাগা বলল, ব্যাস। কইতাছি।

ভটকাই টীকা কাটল, বলল, কেন জিজ্ঞেস করছে রুদ্র বুঝছ তো তাগাদাদা? ঋজুদা না হয় এসব অঞ্চল ভালই চেনে, আমরা তো আর চিনি না। কিন্তু ঋজুদার না হয় বেড়ালের মতো নটা জীবন আর আমাদের তো মোটে একটা করে। বুঝছ তো ব্যাপারটা?

তাগা হেসে বলল, বুঝুম না ক্যান? বুঝছি।

তারপর বলল, ওই বিলটার নাম মিহিমুখ বিল। আর ওই যে বিরাট দাঁতালগুলান দেইখ্যা আইলেন ওগুলানরে আমরা কই বুরুণ্টিকা।

ঋজুদা বলল, কী বললে?

বুরুণ্টিকা স্যার।

তাই?

হ স্যার।

ঋজুদা বলল, বেশ। এবার তাহলে তুমি ওদের বলো যা বলার। ঠিকই তো, ওদের কাছে এ জায়গা একেবারেই নতুন। তা ছাড়া এ তো আর ডাঙা জমি নয়, মানে যাকে আমরা হাই-ফরেস্টস বলি, এ তো বাদা বিল আর এলিফ্যান্ট গ্রাস-এর জঙ্গল। কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। মোটকা গোগোইয়ের যে বর্ণনা তুমি দিলে তাতে তো মনে হচ্ছে শুধু গেন্দা শিকার করেই ক্ষান্ত হবে না সে, যাকে বলে per-

sonal vendetta তাই বোঝাপড়ার জন্যেই এবার সে এসেছে সদলবলে। আমাদের সকলেরই প্রাণ চলে যেতে পারে। ভাল করে সব জানা তো দরকারই।

তাগা বলল, কইতাছি সবই, শোনেন স্যার। এই কাজিরাঙার ন্যাশনাল পার্কের এলাকা প্রায় সাড়ে চারশো বর্গকিমির মতো।

সা-ড়ে-চা-র-শো বর্গকিমি! বলো কী তুমি তাগাদাদা?

তাইলে আর কইতাছি কী? কার্বি অ্যাংলং পাহাড়েরও আরও কিছু এলাকা এর মধ্যে ঢোকার কথা আছে।

কার্বি অ্যাংলং ব্যাপারটা কী?

কার্বি একটা ভাষার নাম। যে পাহাড়িরা ওই ভাষায় কথা বলে তারা হইতাছে মিকির। আদিবাসী। নির্বিরোধী। তারা নিজেদের নিয়েই থাকতে ভালবাসে আর ওই যে বুড়হা পাহাড়েরও ওপরে মেঘ মেঘ সব পাহাড় দেখা যায় ওগুলোই হচ্ছে মিকির হিলস। পুরনো জীবনযাত্রা নিয়ে নিজেদের সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে নিজেদেরই মতো সুখে থাকে ওরা। সমতলের মানুষদের ওরা এড়িয়েও চলে। সন্ধে হলেই শুনতে পাবেন ওই মেঘ মেঘ পাহাড় থেকে দ্রিদিম দ্রিদিম করে ঢোলের মতো বাজনা ভেসে আসছে। ওই কার্বি অ্যাংলং-এর অঞ্চল না ঢুকলেও গোটাঙ্গা, সিলডুবি, পানবাড়ি, কাঞ্চনজুরি, হলদিবাড়ি এবং ব্রহ্মপুত্রের প্রায় চারশো বর্গকিমি এলাকাও এখনকার সাড়ে চারশো বর্গকিমি এলাকার মধ্যে পড়ে। এইসব অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে ওই অভয়ারণ্যের আওতার মধ্যে এসেছে।

এখানে কি নদী বলতে ব্রহ্মপুত্রই?

আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, নদী নয়, নদ। তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র দুই-ই নদ, যেমন মধ্যপ্রদেশের নর্মদা।

নদ আর নদীতে তফাত কী?

নদ পুরুষ আর নদী মেয়ে।

ভটকাই বলল, তা তো বুঝলাম কিন্তু বুঝতে হয় কী করে। মানুষের মেয়েদের যেমন গোঁফ থাকে না, তারা দাড়ি কামায় না, তা থেকে বোঝা যায় যে তারা মেয়ে কিন্তু নদীর বেলা...

ঋজুদা বলল, কঠিন প্রশ্ন করেছিস। তিতির থাকলে হয়তো বলতে পারত কিন্তু আমাকে একজন নদী বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন যে, যে জলধারা হিমবাহ থেকে জন্মায় তারা নদী আর যাদের উৎস কোনও হ্রদ তারা নদ। ব্রহ্মপুত্রর উৎস মানস সরোবর, নর্মদার উৎসও এক অদৃশ্য জলরাশি। শোনেরও তাই। মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টকে যদি কখনও যাস তো দেখবি নর্মদা উদগম এবং শোনমুড়া—অন্তঃসলিলা কোনও হ্রদ থেকে তারা জন্মেছে। যেখানে তারা বাইরে বেরিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে সেই জায়গাই নর্মদা উদগম এবং শোনমুড়া।

ভটকাই বলল, তুই বড় বাগড়া দিস। তাগাদাকে কাজিরাঙার কথা বলতে দে

না।

আমি বললাম, হ্যাঁ! বলো তাগাদা।

ব্রহ্মপুত্র তো আছেই। ব্রহ্মপুত্র বর্ষাতে পুরো কাজিরাঙার অধিকাংশ জায়গাই ভাসিয়ে দেয়। শুধু মধ্যে মধ্যে জেগে থাকে বড় বড় উঁচু কাঠোনিগুলো। হরিণ, সম্বর, হগ-ডিয়ার, শুয়োর, বাইসন, গণ্ডার ভেসে যায়—জল এড়াতে বুড়হা পাহাড়ে গিয়ে ওঠে ন্যাশনাল হাইওয়ে পেরিয়ে। ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে অনেক জানোয়ার তখন। সে এক দৃশ্য।

আর কী নদী আছে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

নদী বলতে ডিফফুলু, মরা ডিফফুলু, ভেংড়া বরজুরি, ডিরিং, কোহরা, ডেহিং, ভালুকজুরি আর দেওপা বয়ে গেছে কাজিরাঙার মধ্যে দিয়ে। এদের মধ্যে কেউ কেউ পুব থেকে পশ্চিমে, কেউ বা কার্বি অ্যাংলং পাহাড় থেকে নেমে এসে ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে পড়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। এইসব নদীর মধ্যে ছোট ছোট চরের দ্বীপ গজিয়ে যায় শরতের শেষে তাদের বলে চাপারি। দেখতে পাবেন এই সময়ে। বর্ষা এলে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে সব একাকার হয়ে যায়। সে এক দৃশ্য বটে। ভয়ও লাগে। তখন নদ ব্রহ্মপুত্র তো নয়, মনে হয় সাক্ষাৎ ব্রহ্মদৈত্য।

ভটকাই বলল, কাজিরাঙার মধ্যে গেন্দা আর হাতি ছাড়া আর কোন কোন জানোয়ার আছে?

কী নেই? বুনো মোষ, বিরাট বিরাট শিং তাদের, গাউর বা ভারতীয় বাইসন, সম্বর, হগ-ডিয়ার, উল্লুক বা হোয়াইট-ব্র্যাওড গিব্বন, হনুমান বা লাঙ্গুর, সাদা মাথার, বড় বাঘ, নানারকম মাছখেকো সিভেট ক্যাট, বেজি, উদবেড়াল, ভালুক, সোয়াম্প-ডিয়ার। আর আছে ডলফিন, যাদের বলে গ্যানজেটিক ডলফিন।

সাপ-টাপ নেই?

নেই আবার? কমন-কোবরা, কিং-কোবরা, এ ছাড়াও নানা জাতের বিষধর ও নির্বিষ সাপ।

আর কী আছে?

পাখি আছে নানারকম। ফ্লোরিকান, যাদের বলে বেঙ্গল ফ্লোরিকান স্কাইলার্ক, ধূসর পেলিক্যান, নানারকম বক, যারা কাদামাখা বিরাট বিরাট বুরুন্টিকার পিঠে চড়ে তাদের মাহুতেরই মতো চরিয়ে বেড়ায়, গণ্ডারের গায়ের পোকা-খাওয়া ছোট ছোট রাইনো বার্ড।

এইসব নদীতে মাছ নেই?

আছে বইকি! ইয়া বড় বড় চকচকে রুপোলি চিতল। হুলালপথ নদীর পাশে ফরেস্ট গার্ডদের একটা আউটপোস্ট আছে চোরাশিকারিদের নজর করবার জন্যে। সেই সরু নদীর পাশে দাঁড়ালে দেখবেন ঘাই মারছে সেইসব চিতল। এই হুলালপথ গিয়ে পড়েছে ব্রহ্মপুত্রে। সেই মোহানার নাম ডিফফুলুমুখ। কী চমৎকার

যে তেল এইসব চিতল মাছে। ধনেপাতা কাঁচালঙ্কা বা সর্ষে দিয়ে ওইসব চিতলের পেটি রাঁধলে যা স্বাদ হবে না!

খাও? তোমরা?

সাধ্যি কী আমাদের। এ যে অভয়ারণ্য। এখানে মশা মারলেও চাকরি যাবে আমাদের। স্বপ্নে খাই।

মিহিমুখ বিলের পাশ দিয়ে তো এলাম। অন্য কোনও বিল নেই এর মধ্যে?

ভটকাই বলল।

নেই? মিহিমুখ তো ছোট্ট বিল। বড় বিলের মধ্যে আছে ভইষামারি, ঘাসিয়ামারি।

আর গাছ?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল পাইপটাতে নতুন করে টোব্যাকো ভরে।

নানারকম গাছ আছে স্যার। ঘাসবন হইলে কী হয়। তবে এইসব গাছের চেহারা-ছবি পাহাড়ের বা ডাঙা জমির বনের গাছেদের থেকে একেবারেই আলাদা। এতটাই আলাদা যে চিনতে পর্যন্ত ভুল হয়ে যায়।

তা তো হবেই।

ভটকাই বলল। বাংলার টোপর-পরা গিলে করা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বর আর আফগানিস্তানের বা তানজানিয়ার বরের চেহারা কি একরকম হবে?

ঋজুদা হেসে বলল, একশোতে একশো।

ভটকাই একটু লজ্জা লজ্জা করল মুখটা।

ঋজুদা বলল, গাছের কথা বলো তাগা।

কই স্যার।

বলেই তাগা বলল, শিমুল, শিশু, হিজল, গামহার, সিধা। এসব গাছেদের বিহারি বা উত্তরপ্রদেশের ভায়েদের সঙ্গে চেহারার কিন্তু কোনওই মিল নাই। আমাদের ভাষাতে এইসব গাছরে কয় পোমা, নাহর, বনশুক, গামারি, সিধা, বরুণ, সাতিয়ানা, এজার, হুঁয়ালো, ভেঁলো। ভেঁলো হচ্ছে শিমুল বা সাতিয়ানার মতো।

সাতিয়ানাটা কী বুঝলি?

ঋজুদা বলল আমাকে।

ছাতিম। যে গাছের নীচে পালকি থামিয়ে বিশ্রাম নিয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিনিকেতনের ছাতিম। নামনি আসামে এবং উত্তরবঙ্গে বলে ছাতিয়ান।

তবে আমাদের ভেঁলো দিয়ে ভাল তক্তা হয়। এজারম বলে একরকমের গাছ আছে তাতে বৈশাখ মাসে সুন্দর গোলাপি ফুলও ফোটে। আর কিছুদিন পরেই দেখতে পাবেন। শিমুল গাছের বীজ ফেটে তুলোর আঁশ যখন দিকে দিকে উড়ে যায় তখন কাজকর্ম সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তাদের দিকে চেয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে এত সুন্দর দেখায়।

চৈত্রে এরা তখন ন্যাংটা, পাতা নেই একটাও। আকাশের দিকে হাত তুলে সারি সারি এরা পথের পাশে দাঁড়িয়ে কী যেন প্রার্থনা করে আল্লার কাছে দোয়া মাঙ্গার মতো।

তারপর বলল, তবে কাঠোনিতে বড় বড় শিমুলই বেশি।

দু'-চারটে বড় বড় বট-অশ্বত্থও আছে। ব্রহ্মপুত্রের বানের মধ্যে এদের বেঁচে থাকতে হয় তাই কাদা মাখা চেহারাগুলো অন্য সময়ে কেমন রুগ্ন-সুখু দেখায়। যেন ডাঙায় রোদ পোয়ানো কুমির।

তাগা মেচের বর্ণনা শুনে আমাদের সত্যিই অনেক কিছু শেখা হল।

তাগা বলল, বলতে ভুলে গেছিলাম, এখানে খুব বড় বড় মনিটর লিজার্ডও আছে।

তাই?

ঋজুদা বলল।

তারপর আমরা অনেকক্ষণ সকলেই চুপ করে থাকলাম। যে যার ভাবনা ভাবছিলাম। এত সাপখোপ মনিটর লিজার্ড—এর মধ্যে ঘাসবনে রাতের বেলা লেপার্ড-ক্রলিং করে যাওয়ার আগে নিজের নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করেই যেতে হবে। কিন্তু উপায় নেই। যেতে হবেই। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। ইজ্জত রাখতে প্রাণ তো দিতে হতেই পারে।

ঋজুদা বলল, কাল রাতে কারওরই তো ভাল ঘুম হয়নি। ভটকাইচন্দ্র দুপুরে কী খাওয়া-দাওয়া করা যায় ঠিক করে লেগে পড়। খেয়ে-দেয়ে ভাল করে ঘুমুতে হবে। তারপর বিকেলে এক কাপ করে চা খেয়ে সন্ধে নামতেই বেরিয়ে পড়তে হবে। ঘুমটা খুবই দরকার। আজ রাতে ঘুমের সম্ভাবনা নেইই বলতে গেলে।

তারপর বলল, আমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু গাছে উঠে যেখান থেকে গুলির শব্দ হয়েছিল সে জায়গাটা ভাল করে দেখে নিতে হবে। আমরা নিজের নিজের দায়িত্বে যাব—রাতভর তো বটেই—কাল সকাল এবং দুপুরও কাটিয়ে এখানে ফিরে আসতে হবে। ওই গাছটাকেও ভাল করে চিনে রাখতে হবে। পিঠের রাক-স্যাকে কটা বিস্কিট এবং যার যার জলের বোতল নিয়ে নিতে হবে। তাগা, তুমি আর ভটকাইবাবু একসঙ্গে থেকো।

ভটকাই আপত্তি করে বলল, বাঃ, তা কেন?

তোর ভালর জন্যেই বলছি। ঠিক এইরকম টোপোগ্রাফিতে তো তুই আগে...

তা রুদ্রই কি গেছে নাকি?

তুই সবসময় রুদ্রর সঙ্গে তুলনা করিস না তো। রুদ্র এসব ব্যাপারেই তোর চেয়ে অনেকই সিনিয়র। বয়স এক হলেই কি অভিজ্ঞতা এক হয়?

ভটকাই চুপ করে গেল।

তারপরে হঠাৎই বলল, আচ্ছা হাতি তো মারে চোরাশিকারিরা হাতির দাঁতের জন্যে, গণ্ডার কেন মারে?

ঋজুদা হেসে ফেলল। বলল, এতদিন পরে তোর মনে এই প্রশ্নটা জাগল। সত্যি!

তাগা বলল, গণ্ডারের খড়্গর গুঁড়োর পৃথিবীর পয়সাওয়ালাদের দেশে খুব চাহিদা। ওই গুঁড়ো খেলে নাকি মানুষে জোয়ান থাকে, বুড়ো হয় না কখনও। তাই বহুৎ দামে বিক্রি হয় গণ্ডারের খড়্গ।

তাই? হাড়ের গুঁড়ো?

গণ্ডারের খড়্গে কিন্তু হাড় একেবারেই নেই।

তবে? খড়্গের এক ঝটকাতে জিপ উলটে দেয়, বুরুন্টিকা হাতির পেট ফাঁসিয়ে দিতে পারে আর সেটা হাড়ের নয়?

না। গণ্ডারের খড়্গ লোমের।

লোমের?

সত্যই কইতাছি স্যার।

তাগা বলল।

ভটকাইয়ের যেন তাও বিশ্বাস হল না। ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করল, সত্যি ঋজুদা?

সত্যি বলেই তো জানি।

ফ্যান্টাসটিক ব্যাপার-স্যাপার।

বলল, ভটকাই।

ঋজুদা বলল, লাঞ্চের কী হবে?

চলো তাগাদাদা। চালে-ডালে খিচুড়ি বানিয়ে ফেলি। মধ্যে একটু আলু, কাঁচালঙ্কা ফেলে দিয়ে।

পেঁয়াজ দিবেন না?

তাও দেওয়া যায়।

তাহলে কাজে লেগে যা।

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, আমাকে একটা বাইনাকুলার দে তো রুদ্র। একবার উঠে ভাল করে দেখি।

ঋজুদা গল্‌ফ-শু পরেছিল। বলল, জুতোটা কি খুলব নাকি রে?

যদি না খুলে উঠতে পারো তো ওঠো।

দেখি চেষ্টা করে। উঠতে পারা তো উচিত।

বলে ঋজুদা আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেল। তাগা আর ভটকাই গ্যাস সিলিন্ডারটা বের করে কাজে লেগে গেল। বললে হবে না, ভটকাই খেতেও যেমন ভালবাসে, রান্না-বান্না করতেও পারে। ঋজুদাও পারে, তবে করে না। আমি শুধু খেতে পারি—অকর্মার ঢেঁকি।

তিন

বেলা দশটার মধ্যে ভটকাই আর তাগা মেচ খিচুড়ি রেঁধে ফেলল। তবে আলু ও পটল এবং শুকনো লঙ্কা ভাজাও করে ফেলল ওরা সেদ্ধ না দিয়ে। তাতে স্বাদ আরও ভাল হয়। এবং আমরা যখন আবিষ্কার করলাম যে আমাদের খাবার-দাবারের মধ্যে এক টিন পাচরঙ্গ আচারও রয়েছে তখন আর জানতে বাকি রইল না যে এই অপকর্ম ভটকাই ছাড়া আর কারও পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। এমন বিপজ্জনক mission-এ এসে, মরি কি বাঁচি তার ঠিক না থাকা সত্ত্বেও আচার খাবার মানসিকতা এই ভটকাই ছাড়া আর কারওরই থাকার কথা ছিল না। নওগাঁতে পৌঁছে টর্চের ব্যাটারি এবং টুকটাক কেনার জন্যে ঋজুদা যখন ভটকাইকে পাঠিয়েছিল তখনই ভটকাই এই অপকর্মটা করেছিল মনে হয়। কিন্তু যার অপকর্মই হোক কাজিরাঙার এক কাঠোনির মধ্যে বসে পাচরঙ্গ আচার দিয়ে খিচুড়ি খাওয়ার মতো বিলাসিতার কথা আমাদের পক্ষে স্বপ্নেরও অতীত ছিল। আমরা সকলেই কৃতজ্ঞতার চোখে ভটকাইয়ের দিকে তাকালাম। ভটকাই এমনই একটা ভাব করল চোখে-মুখে যেন বলতে চাইছে বিন্দাস।

ঋজুদা গাছে ওঠার পরে আমি আর ভটকাইও উঠেছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পরে ঋজুদা আমাদের জিজ্ঞেস করল, আমরা কী দেখলাম এবং কী মনে হল আমাদের। আমরা নিজের নিজের অবজার্ভেশনের কথা বললাম। আমাদের কথা শোনার পরে ঋজুদা বলল, আজ রাতে পায়ে হেঁটে ওইরকমভাবে আত্মহত্যা করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না কারণ আমার মনে হয় না যে মোটকা গোগোই অ্যান্ড কোম্পানিই হোক আর যেই হোক ওই গণ্ডার মেরেছে বলে।

তাগা মেচ অবাক হয়ে বলল, ক্যান এ কথা কইতেছেন স্যার?

ঋজুদা বলল, সকালে গেন্দা যদি ওরা মারতই তবে এতক্ষণে খড়্গটা কেটে নিয়ে গণ্ডারটাকে ফেলে রেখে চলে যেত। এবং গেলে এতক্ষণে শকুন পড়ত গেন্দার ওপরে।

ভটকাই বলল, শকুন কি গণ্ডারের ওই মোটা চামড়া ভেদ করতে পারবে?

সেটা একটা কথা বটে। তবে রাইফেলের গুলিতে যে ক্ষত হবে সেই ক্ষতর উৎস ধরে শকুন খেতে আরম্ভ করতে পারে এবং শকুনদের মিলিত চেষ্টায় গণ্ডারের চামড়াও হয়তো গণ্ডারের মাংসে পৌঁছোনোর বাধা হবে না।

তারপর তাগার দিকে ফিরে বলল, তোমার কী মনে হয়?

তাগা বলল ব্যাপারটা সম্বন্ধে ঠিক বলতে পারবে না সে কারণ তার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। তা ছাড়া কাজিরাঙাতে শকুন সে দেখেওনি।

ঋজুদা বলল, টাটকা মারা গণ্ডারের মাংসতে পৌঁছোনো হয়তো শকুনের পক্ষেও সম্ভব নয় তবে গণ্ডারের মৃত্যুর দু'-চারদিন পরে গণ্ডারের চামড়াও তো

গলতে শুরু করবে, তখন অবশ্যই শকুনের পক্ষে তাকে কবজা করা সম্ভব হবে। তবে এ ব্যাপারে আমি ঠিক জানি না, স্বীকার করতেই হবে। জানতে হবে ব্যাপারটা।

তা তোমার কী মনে হল?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার মনে হল পোচাররা সম্ভবত কোনও হগ-ডিয়ার বা শুয়োর-টুয়োর শিকার করেছে নিজেদের খাওয়ার জন্যে। গণ্ডার মারলে পাখ-পাখালির ওপরে তার অভিঘাত অন্যরকম হত।

অভিঘাত তো রাইফেলের আওয়াজের। সে অভিঘাত তো কী জানোয়ার মারা হল তার ওপর নির্ভর করবে না। আওয়াজ হলেই পাখিরা চিৎকার করে ওড়াউড়ি করবে।

সেটাও ঠিক।

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, তাগা, তোমার কী মনে হয়?

তাগা বলল, আমার স্থির কিছু মনে হয় নাই স্যার।

ঋজুদা বলল, তাগার মনে হওয়াটাও অস্থির হলে আমাদের একটু ধৈর্য ধরাই শ্রেয়। আত্মহত্যাই যদি করবি তোরা তবে তো তোর বড়মামার এগারোতলার ফ্ল্যাট থেকে লাফিয়ে পড়লেই হত। এত কাঠখড় পুড়িয়ে হিরো বনবার জন্যে কাজিরাঙাতে আসা কেন? তাই আজকে আমরা কোথাওই যাব না। এখানেই থাকব। তাঁবুটা বরং খাটিয়ে ফেল। রাতেও যখন ঘুমোব তখন ভাল করে আরামে ঘুমোনোই ভাল, জিপ নিয়ে আমি এই কাঠোনি ছেড়ে রাতে বা দিনে বাইরে যেতে চাই না। ওরা বাইনাকুলার দিয়ে দেখে ফেলবে আমাদের। যেতে যদি হয়ই তাহলে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। তবে সেটা এখুনি নয়। ওরা যে এ অঞ্চলে আছেই রাইফেলের গুলির শব্দই তো তার অকাট্য প্রমাণ। তাই হড়বড় করার দরকার নেই। মহম্মদ পর্বতের কাছে না গেলে পর্বতই না হয় যাবে মহম্মদের কাছে। ধৈর্য ধরে দেখাই যাক।

ভটকাই বলল, পার্কালাম!

ইয়েস। পার্কালাম।

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, তাগা তুমি আমাদের একেবারে ডিটেইলসে বলো তো ফরেস্ট গার্ড মতিরাম যেবারে মারা গেলেন সে রাতে ঠিক কী হয়েছিল। সেটা জানলে ওদের modus-operandi-টা বোঝা সুবিধে হবে।

কাজিরাঙার অভয়ারণ্য এলাকার মধ্যে মধ্যে ফরেস্ট গার্ডদের, চোরাশিকার বন্ধ করার জন্যে এবং জানোয়ারদের খোঁজখবর রাখার জন্যে ক্যাম্পে থাকতে হয় ভাগ ভাগ করে। সাধারণত এক-একটি ক্যাম্পে চারজন করে গার্ড থাকে। তাঁদের

চারজনের মধ্যে দু'জনের কাছে হয় থ্রি-ফিফটিন রাইফেল, নয় দু'নলা বা একনলা টুয়েলভ বোর শটগান থাকে।

মতিরামের বয়স হয়েছিল বছর চল্লিশেক। কাজিরাঙা থেকে বনবিভাগেরই বানানো একটি পথ দিয়ে গেলে মাইল দশেক পরে পেলিক্যান কাঠোনি। এক সময়ে ওই কাঠোনিতে পেলিক্যানরা বাসা বেঁধে ডিম পাড়ত। এখন তারা বনের আরও অনেক গভীরে চলে গেছে যদিও, কিন্তু পেলিক্যান কাঠোনির নাম পেলিক্যান কাঠোনিই রয়ে গেছে। পেলিক্যান কাঠোনিতে বড় গাছের মধ্যে ছিল কোরোই (আলবিনিয়া প্রোসেরা), জংলি আম, অটেঙ্গা (ডেলিয়ানা ইন্ডিকানা), দু'-একটি বড় অশ্বত্থ, শিমুল, সিধা ইত্যাদি।

ঘটনার দিন শ্রীগুণিন শইকিয়া, রেঞ্জার এবং শ্রীস্বপন শীলশর্মা (এখন অবশ্যই ডি. এফ. ও. হয়ে গেছেন) রেঞ্জ অফিসে বসে একজন চোরাশিকারিকে ভাল করে জেরা করছিলেন। অল্প ক'দিন আগেই একটি গণ্ডারকে গুলি করার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। জেরা যখন চলছে ঠিক সেই সময়েই মতিরামের দলের একজন ভগ্নদূতের মতো এসে খবর দিলেন যে, তাঁরা চোরাশিকারিদের গুলির শব্দ শুনছেন। যা জানা গেল তাঁদের কাছে তা হচ্ছে এই যে, গুলির শব্দ শুনেই মতিরাম আর অন্য তিনজন কোথা থেকে গুলিটা এল তার খোঁজ করতে করতে এগিয়েও ছিলেন।

গাছের মাথায় চড়ে ওঁরা দেখতে পেলেন যে, এক জায়গায় কতগুলো গো-বক উড়ছে। যেখানে পাখি উড়ছে, তার কাছাকাছিই গুলিটা হয়েছে এমন অনুমান করেই ওঁরা ওইদিকে এগিয়েও যান। চার কিমি মতো পথ হবে সে জায়গাটা ওঁদের ক্যাম্প থেকে। মতিরামের দলের চারজনের মধ্যে মতিরামের কাছে একটা একনলা সিঙ্গল ব্যারেল বারো-বোরের শটগান, অন্য একজনের হাতে একটি থ্রি-ফিফটিন রাইফেল। এই ফায়ারিং পাওয়ার নিয়ে জায়গাটার কাছাকাছি মতিরামেরা পৌঁছোতেই চোরাশিকারিরা দূর থেকেই দেখতে পেয়ে গুলি চালায় ওঁদের দিকে। যদিও সে গুলি ওঁদের কারও গায়েই লাগেনি তবু মতিরামেরা পালটা গুলি না-ছুড়ে উত্তেজিত হয়ে রেঞ্জ অফিসে এলেন রিপোর্ট করতে। গুণিন শইকিয়া আর স্বপন শীলশর্মা যখন সেই গেন্দা-গুলি-করা চোরাশিকারিকে জেরা করে তার কাছ থেকে খবর বার করার চেষ্টা করছিলেন, সেই সময়েই ভগ্নদূতের মতো এই খবর নিয়ে এসে হাজির হলেন মতিরামরা।

খবর শুনেই রেঞ্জ অফিসে হই-চই পড়ে গেল। তক্ষুনি আট-আটজনের দুটি দল তৈরি করে দু'দলকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এমনই স্থির হল জিপে করে। কিন্তু জিপ ছিল মাত্র একটাই।

দু'দলকে সবসুদ্ধ আটটি আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হল, চারটি চারটি করে। আটটির মধ্যে ছটি থ্রি-ফিফটিন রাইফেল এবং দুটি শটগান।

প্রথমে দলটিকে পাঠানো হল লাউডুবির দিকে, অন্যদের পেলিক্যান কাঠোনির

দিকে। দু'দলকেই ওয়াকিটকিও দিয়ে দেওয়া হল, যাতে রেঞ্জ অফিসের সঙ্গে প্রয়োজন হলেই তারা কথা বলতে পারে। কী হল বা না-হল, জানাতে পারে। জিপ রেঞ্জারসাহেবের একটাই ছিল। সেই জিপটাই দু'ট্রিপে ওই ষোলোজনকে ওই দু'জায়গায় পৌঁছে দিয়ে ওখানেই রয়ে গেল।

যে এলাকাতে গুলি হয়েছিল এবং গো-বকদের উড়তে দেখেছিল, পেলিক্যান কাঠোনির কাছের সেই পুরো ঘাসী এলাকাটাতেই আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকেই কিছুদিন আগে, যেমন প্রত্যেক বছরই গরমের শুরুতে দেওয়া হয়। বড় গাছেদের অবশ্য কোনও ক্ষতি হয় না তাতে, শুধু ঘাসই পুড়ে যায়।

ওই দুটি দল লাউডুবি আর পেলিক্যান কাঠোনির কাছে পৌঁছে আলাদা হয়ে গিয়ে ওই পোড়া ঘাসের বনের মধ্যে দিয়ে এক সাঁড়াশি-অভিযান শুরু করল পেলিক্যান কাঠোনির দিকে। ষোলোজন গার্ড এবং দশটি আগ্নেয়াস্ত্র, জিপ এবং ওয়াকিটকি, সেই তখনও অদৃশ্য এবং সম্ভবত একজনমাত্র চোরাশিকারির মোকাবিলার পক্ষে যথেষ্টই ছিল।

জিপের শেষ ট্রিপ চলে গেলে, রেঞ্জার শইকিয়াসাহেব একটি সিগারেট ধরিয়ে আবারও মোটকা গোগোইকে নিয়ে পড়লেন। যে চোরাশিকারি ক'দিন আগে একটি গেন্দাকে গুলি করেছিল, তার নামই মোটকা গোগোই। তবে লোকটি সত্যিই মোটকা ছিল কিনা আমার জানা নেই। অনেক শুঁটকো লোকের নামও মোটকা হয় দেখেছি।

জেরা যখন জোরকদমে এগোচ্ছে, ঠিক তখনই ওয়ারলেস সেটে কোড ওয়ার্ড ক্যাঁ-ক্যাঁ করে উঠল: 'রাইনো'! 'রাইনো'!

প্রথম দলটি, যাদের পেলিক্যান কাঠোনিতে পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন উত্তেজিত গলায় খবর দিল যে, ওরা চোরাশিকারিদের সঠিক অবস্থান জানতে পেরেছে। শিকারি একজন নয়, চারজন। ব্যাপার খুবই ডেঞ্জারাস। তবে জবর খবর হচ্ছে এই যে, চোরাশিকারিদের মধ্যে তিনজনকে ওরা মেরেও ফেলেছে। চতুর্থজন একটা বড় বটগাছে উঠে লুকিয়ে আছে পাতার আড়ালে। তাকেই এখন কবজা করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে, গুলি সব ফুরিয়ে গেছে ওদের। গুলির দরকার আরও। এক্ষুনি।

রেঞ্জার গুণিন শইকিয়া এই খবরে স্বভাবতই খুশি এবং উত্তেজিতও হলেন। কিন্তু নাম গুণিন হলেও হাত গুনতে তো আর জানেন না তিনি! অতগুলো গুলি দিয়ে ষোলোজন গার্ড কী যুদ্ধ করলেন, তা ওঁরাই জানেন। প্রত্যেককে পাঁচ রাউন্ড করে গুলি দেওয়া হয়।

তার মানে চল্লিশ রাউন্ড গুলি।

আমি বললাম, তা দিয়ে তো কারগিলে পাকিস্তানকেই ঠাণ্ডা করে দেওয়া যেত।

ঋজুদা বলল, তা যেত যদি গুলি লক্ষ্যস্থানে পৌঁছোত। সবাই যদি জেঠুমনির

বন্ধুদের মতো to aim at the genuine direction-এ aim করে তাহলে গুলির সঙ্গে টার্গেটের যোগাযোগ হওয়ার সম্ভাবনা তো না থাকারই কথা।

তারপর বলল, নার্ভাস হয়ে গেলে ওরকম হতেই পারে। জেঠুমনির বন্ধুরা কি হরিণ দেখেও নার্ভাস হয়েছিলেন নাকি?

না। নার্ভাস হননি কারণ হরিণের কাছ থেকে কোনও ভয় ছিল না কিন্তু উত্তেজিত তো হয়েছিলেন। যাঁরা শিকারি নন তাঁরা বক দেখেও উত্তেজিত হতে পারেন। আর ওভার একসাইটমেন্ট নার্ভাসনেসের চেয়েও খারাপ।

তারপর, সবই ফুরিয়ে ফেললেন গার্ডরা তিনজন ডাকাত মারতে? তা ছাড়া গুলি এখন পাঠাবেনই বা কী করে? একটিমাত্র জিপ, সেটি তো আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এও ঠিক যে, তক্ষুনিই কিছু করা দরকার।

তাগা বলল, তারপর শইকিয়াসাহেব তড়িঘড়ি পর্যটন বিভাগের একটি জিপ বন্দোবস্ত করে সঙ্গে যথেষ্ট গুলি এবং স্বপন শীলশর্মা সাহেবকে নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নিজেই অকুস্থলে গিয়ে পৌঁছোলেন খালি হাতেই। মানে শুধুই গুলি নিয়ে। আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না কোনওই। গুলি ফুটোবার আগ্নেয়াস্ত্র তো ছিল না সঙ্গে। গুলি দিয়ে ঢিল মারলে তো গুলি ফুটবে না।

ভাগ্যিস সেই রাস্তাটা সে বছরই বানানো হয়েছিল। নইলে অত কম সময়ে পৌঁছোনো যেত না আদৌ। তবে ঠিক পৌঁছোনওনি তখনও, তাঁরা যখন পেলিক্যান কাঠোনি থেকে তিনশো মিটার মতো দূরে আছেন, তখনই একজন গার্ড পড়ি-কি মরি করে দৌড়ে আসতে আসতে হাত তুলে চেঁচাচ্ছিলেন, 'পলাউক পলাউক!' মানে 'পালিয়ে যান। পালিয়ে যান।' সেই গার্ড নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই গুণিনসাহেবদের সৎ পরামর্শ দিতে দিতে দৌড়ে আসছিলেন। বটগাছের ঝুপড়ি ডালপালায় প্রায়ান্ধকার থেকে যে কোনও সময়ে গুলি এসে ধরাশায়ী করতে পারত তাকে। সাংঘাতিক সাহসের কাজই করেছিলেন, সন্দেহ নেই।

সেই 'পলাউক, পলাউক' চিৎকারে রেঞ্জারের দল দাঁড়িয়ে পড়েন। কাছে এসে সেই গার্ড যে সংবাদ দিলেন তা শুনে তো চোখ কপালে উঠল শইকিয়াসাহেবদের। জানলেন যে আসল ঘটনার সঙ্গে প্রথম ওয়ারলেস মেসেজের কিছুমাত্র মিলই ছিল না।

ভটকাই তাগাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তার মানে?

তাগা বলল, আসল ঘটনা যা ঘটেছিল তা হল একেবারেই অন্যরকম। মতিরাম এবং অন্য গার্ডরা জিপে করে রেঞ্জ অফিস থেকে ফিরে গিয়ে শিকারিদের খুঁজতে খুঁজতে বড় বটগাছটার ঠিক নীচে এসে পৌঁছোন। অনেকদূর হেঁটে আসায় ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে মতিরাম পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করেন। সিগারেটে দেশলাই জ্বেলে যখন আগুন ধরাতে যাবেন ঠিক তখনই চোখ ওপরের দিকে তুলতেই তিনি দেখতে পান, বটগাছের ওপরে একজন নাগা-শিকারি রাইফেল হাতে বসে আছে।

মতিরামের সঙ্গে শিকারির চোখাচোখি হওয়ামাত্রই মতিরাম চিৎকার করে উঠে সঙ্গীদের জানান। কিন্তু মতিরাম তাঁর বন্দুকে হাত ছোঁয়াবার আগেই সেই নাগা চোরাশিকারি মতিরামকে গুলি করে। গুলি করতেই উনি মাটিতে পড়ে যান। সঙ্গীরা তখন গাছটিকে লক্ষ করে এবং ওই শিকারিকে লক্ষ করেও গুলি ছুড়তে থাকে। গাছের একাধিক জায়গা থেকেও যখন গুলি আসতে থাকে তখন বোঝা যায় যে, চোরাশিকারি একজন নয়, একাধিক।

যা ছিল সব গুলিই চোরাশিকারিদের প্রতি নৈবেদ্য দেন ওঁরা এবং মতিরাম অ্যান্ড কোম্পানির গুলি খেয়ে গাছে লুকোনো দলের তিনজন শিকারিই গুলিবিদ্ধ হয়ে নীচে পড়ে যায়। মতিরামের দলের আটজনের মধ্যে চারজনই নিরস্ত্র ছিলেন। নিরস্ত্রদের একজনের হাতে ছিল ওয়াকিটকি। গুলির বহর দেখে ওই নিরস্ত্র চারজনই পিঠটান দেন। নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গিয়ে রেঞ্জ অফিসে খবর দেন যে, তিনজন শিকারি গাছ থেকে পাকা আমের মতো গুলিতে খসে নীচে পড়েছে। কিন্তু তাঁদের মতিরাম বড়ুয়াও যে গুলি খেয়ে সবচেয়ে আগেই পড়ে গেছেন তা উনি জানতেনও না পর্যন্ত। যা জানতেন সেইরকমই মেসেজ পাঠিয়েছিলেন রেঞ্জ অফিসে।

গুলিতে পেলিক্যান কাঠোনির চারপাশের অনেক গাছই চিরে গিয়েছিল। সশস্ত্র গার্ডদের হয়তো ব্যাপার বেগতিক দেখে সঠিক খবরটা যে কী জানার কোনও তাগিদ ছিল না।

পলাউক, পলাউক শুনে শইকিয়াসাহেবেরা শাসিয়েছিলেন কিনা জানা নেই, তবে শইকিয়াসাহেবের কাছে যতটুকু শোনা গেল, তাতে এই-ই জানা গেল যে, 'পলাউক' ওয়ার্নিং শুনেই দাঁড়িয়ে পড়ে ওঁরা ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেন। ব্যাপার বেগতিক দেখেই ওঁরা সঙ্গে সঙ্গে জোরে জিপ চালিয়ে ফিরে যান কাজিরাঙা পুলিশ স্টেশনে। সেখান থেকে এক ব্যাটেলিয়ন আর্মড পুলিশ এবং পুলিশের গাড়ি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবারও পেলিক্যান কাঠোনিতে ফিরে আসেন। সেখানে পৌঁছে বটগাছের এক ফার্লং দূর থেকেই তাঁরা হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকেন ওইদিকে। এবং পুলিশের ব্যাটেলিয়ন বটগাছটিকে ঘিরেও ফেলে। তবে মাত্র তিন দিক। অন্য দিকে এলিফ্যান্ট গ্রাস ছিল। সেদিকে ঘাস পোড়ানো হয়নি। তাই সেদিকটা অরক্ষিতই রয়ে গেছিল। শিকারিরা চাইলেই ওদিক দিয়ে পালাতে পারত।

বটগাছের নীচে পৌঁছেই দেখা গেল মতিরাম বড়ুয়া বুকে ও পায়ে গুলি লাগা অবস্থায় পড়ে আছেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত জায়গাটা। গাছের নীচে আরও অনেক জায়গাতেও রক্ত পাওয়া গেল। কিন্তু বেমালুম গুলি হজম করা সেই নাগা চোরাশিকারিদের কাউকেই দেখা গেল না। তারা আহত হয়ে গাছ থেকে পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও।

আচ্ছা গুলিখোর লোক তো সব!

ভটকাই স্বগতোক্তি করল।

শোন। ইন্টারাপট করিস না।

ঋজুদা বলল, মতিরামকে সঙ্গে সঙ্গেই জিপে করে হাসপাতালে পাঠানো হল। কিন্তু হাসপাতালের পথেই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে যায়। বেচারি! 'পানি, পানি! বাঁচাও, বাঁচাও' করে অনেক চেঁচিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পালিয়ে যাওয়া নিরস্ত্র সঙ্গীরা তাঁর আর্ত চিৎকারকেই আহত নাগা-শিকারিদের আর্ত চিৎকার বলে ভুল করেছিলেন। উত্তেজিত অবস্থাতে এরকম অনেক ভুলই হয়।

মতিরামকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েই রক্তের দাগ দেখে এগোলেন ওঁরা সকলে মিলে। রাইফেল, বন্দুক রেডি পজিশনে ধরে। কিছুদূর এগোতেই আহত জানোয়ারের রক্তের দাগ যেমন পাওয়া যায় ঘাসে, ঝোপঝাড়ে, তেমনই আলাদা আলাদা তিনটি ব্লাড ট্রেইল পাওয়া গেল। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও নাকি আহত শিকারিদের টিকিও মিলল না।

সত্যিই কি খোঁজাখুঁজি করা হয়েছিল না তোর বাহাদুর জামাইবাবুর গুলি করা শেপার্ড খোঁজার মতো এইসব হয়েছিল তা কে বলতে পারে।

ভটকাই বলল।

ঋজুদা রেগে বলল, তুই চুপ করবি ভটকাই।

তারপর এলিফ্যান্ট গ্রাসের বনের মধ্যে যেদিকটাতে ঘাস তখনও ছিল, সেদিকটাতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। ওই ঘাসবনে আগুন ধরে যেতেই একজন লুকিয়ে থাকা শিকারি আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে কোনওরকমে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে বেরিয়ে আসতেই পুলিশের হাতে পড়ল। তাকে জেরা করে জানা গেল যে, গুলি তিনজন চোরাশিকারির গায়েই লেগেছিল। এবং তারা তিনজনই আহত হয়েছে। তবে নেতা যে চতুর্থজন, তার কিছুই হয়নি এবং সে পালিয়েও গেছে। বিপদে, সঙ্গীদের ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজে প্রাণ নিয়ে পালাতে না জানলে নেতা হওয়া যায় না বোধহয় আজকাল। বিশেষ করে আমাদের দেশে।

তবুও অন্যদের ধরার জন্যে সূর্যাস্ত অবধি তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি করেও কাউকেই পাওয়া গেল না। পরদিন সকালে আবারও নতুন করে খোঁজ আরম্ভ হল। কিন্তু লাভ হল না কিছু। তখন স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হল যে, শিকারিদের আঘাত নিশ্চয়ই তেমন গুরুতর নয়। তাই তারা পালিয়েই গেছে।

দুর্ঘটনার চতুর্থ দিনে মিস্টার পি সি দাস, তখনকার চিফ কনজার্ভেটর, ওয়াইল্ড লাইফ (এখন তিনি আসামের চিফ কনজার্ভেটর জেনারেল) নিজেই এলেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্কের ডিরেক্টর মি. পরমা লাহোনও আসেন। মি. লাহোন কিন্তু ঘটনার দিনেই তাঁর নিজের ওয়ারলেস সেটে রেঞ্জ অফিস আর মতিরামের দলের মধ্যে ওয়াকিটকিতে যে কথা হয়, তা মনিটর করামাত্রই নিজের রাইফেল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একাই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন।

খুবই প্রশংসনীয় এবং দুঃসাহসী কাজ বলতে হবে।

ঋজুদা বলল।

দ্বিতীয় এবং চতুর্থ দিনে আটটি হাতি দিয়ে ঘাসবন আঁতিপাতি করে খোঁজা হয়। মি. দাস যেদিন ছিলেন, মানে চতুর্থ দিনে, ওই এলিফ্যান্ট গ্রাসের বনের মধ্যে থেকেই একটি পচা, ফোলা, গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ খুঁজে পান ওঁরা।

শিকারিদের চারজনের মধ্যে প্রথমজন গুলিতে আহত অবস্থায় ধরা পড়েছিল প্রথম দিনেই। দ্বিতীয়জনের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ, ফোলা, শক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল চতুর্থ দিনে। নেতা পালিয়ে গিয়েছিল অক্ষত অবস্থায়। এবং অন্যজনের যে কী হল সেটাই রহস্য। সেও কি পালিয়েই গিয়েছিল? তা ছাড়া এতভাবে খুঁজেও দ্বিতীয়জনের মৃতদেহটি প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনে পাওয়া গেল না কেন? যদি প্রথম দিনই ঘাসের মধ্যে তিনজন মানুষের ব্লাড ট্রেইল পাওয়া গিয়ে থাকে, তাহলে তো অনুমান করতে হয় যে, নেতা ছাড়া যে পালিয়ে গেল, সেও আহতই ছিল। আহত অবস্থায় সে পালাল কী করে? নদী দিয়ে পালাল? না অন্যভাবে?

মতিরাম বভুয়ার মৃত্যুকে ঘিরে এই চারজন নাগা শিকারির ব্যাপারটাতে একটু রহস্যের গন্ধ থেকেই যায়। অবশ্য দাসসাহেব এবং লাহোনসাহেব নিজেরা যখন এসেছিলেন এবং ব্যাপারটার তদারকি নিজেরাই করেছিলেন, তার ওপর পুলিশের এক ব্যাটেলিয়ন সশস্ত্র প্রহরীও যখন যুক্ত ছিল ওই খোঁজে, তখন রহস্য কোনও থাকার কথা নয়। তবু পুরো ঘটনাটাই গোয়েন্দা কাহিনীরই মতো মনে হয়। তাই রহস্যের গন্ধ নাকে লেগে থাকে।

মতিরামের পরিবারকে বনবিভাগ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হয়। তা ছাড়া প্রত্যেক গার্ডের, যাঁরা চোরাশিকারিদের মোকাবিলা করার দায়িত্ব নিয়ে নির্জনে ক্যাম্প করে থাকেন তাঁদের জন্য কুড়ি হাজার টাকার জীবনবিমার প্রিমিয়ামও নাকি বনবিভাগই দেয়। সেই কুড়ি হাজারও পেয়েছিলেন মতিরামের পরিবার।

কুড়ি হাজার!

ভটকাই বলল।

হ্যাঁ। তাগা বলল।

কুড়ি হাজার দিয়ে কী করবে? গোরু হবে কি একটা ভাল? এটা বাড়ানো উচিত।

ঋজুদা বলল, এটা আসাম সরকারের ব্যাপার। তুই কোন মাতব্বর এসেছিস? তা ছাড়া আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আদৌ এটুকুও করা হয়েছে কিনা তার খোঁজ নে না ফিরে গিয়ে।

আমার কথা কে শুনবে? তুমি বলো না!

দেখব।

ঋজুদা বলল।

এই ঘটনার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে আমার মনে হচ্ছে যে, ভারতের সমস্ত অভয়ারণ্যই, যেখানেই চোরাশিকারিদের পা পড়ে, সেখানকার ফরেস্ট গার্ডদের

রাইফেল চালনা এবং প্যারা মিলিটারি না হলেও অন্তত ফিল্ড ট্রেনিংয়ের একটি করে কোর্স বাধ্যতামূলকভাবেই করাবার ব্যবস্থা করা উচিত, তাঁদের চোরাশিকারিদের ধরতে পাঠানোর আগে। নইলে আরও অনেক মতিরাম মারা যাবেন। হাতে রাইফেল থাকলেই সকলেই যে অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষর মোকাবিলা করতে পারবেন এমন নয়। শটগানও তাঁদের একেবারেই দেওয়া উচিত নয়। শটগান দিয়ে আধুনিক চোরাশিকারিদের মোকাবিলা করাও যায় না। এই নাগা শিকারিরা থ্রি-ও-থ্রি প্রহিবিটেড বোরের রাইফেল, এমনকী সেলফ-লোডিং রাইফেলও (এস এল আর) যে ব্যবহার করেছিল, তারও প্রমাণ নাকি পাওয়া গিয়েছিল।

আজকাল তো এ কে ফর্টি-সেভেনও আকছার আসছে। চিন আর পাকিস্তান দু'জনেই তো আমাদের বন্ধু।

রাতে খাওয়ার স্পৃহা কারওরই ছিল না। যে কাজে আসা সেই কাজটাই যদি একটুও না এগোয় তো খিদে পাবেই বা কার। পাঁউরুটি ছিল, তাই মাখন লাগিয়ে চার পিস করে খেয়ে নিলাম আমরা রাত ন'টা নাগাদ। আলো জ্বালানো বা আগুন জ্বালানোও চলবে না রাতের বেলা। তবে আমরা কাঠোনির মধ্যে অন্ধকারে এবং জটাজুট সংবলিত এক প্রাগৈতিহাসিক অশ্বত্থ গাছের নীচে আছি বলেই এখানে ঝুপসি অন্ধকার আর বাইরে রূপসী জ্যোৎস্না কাজিরাঙার ভয়াবহ এবং রহস্যময় মঞ্চকে আলোকিত করে রেখেছে। বসন্তে যে ঝিঁঝি ডাকে এইরকম অঞ্চলে তারা সন্ধে থেকেই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো কোরাস শুরু করে দিয়েছে নিচু গ্রামে। নানা রাতপাখির মিশ্র স্বর ভেসে আসছে চাঁদভাসি ঘাসবন আর মাঝে মাঝের ঝুপড়ি অন্ধকার কাঠোনি থেকে। একজোড়া পেঁচা ছাড়া অন্যদের নাম আমি জানি না। প্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ করে মার্সিডিজ ট্রাকের হর্নের মতো হাতির ডাক ভেসে এল দক্ষিণ দিক থেকে। গণ্ডারের ডাক কেমন তা আমি জানি না। আফ্রিকাতেও কখনও শুনিনি নিজকানে। ঋজুদা হয়তো বলতে পারবে।

রুটি মাখন খাওয়া সেরে যখন একেকজনকে তিন ঘণ্টার জন্যে নাইট গার্ড রেখে আমরা চারজন তিন ঘণ্টা করে ঘুমিয়ে নেব ঠিক করে ভটকাইকে প্রথম গার্ড করে আমরা তিনজন শুতে যাব, ঠিক সেই সময়েই ভটকাই হঠাৎ খুবই বিরক্ত হয়ে দু'হাত ওপরে ছুড়ে দিয়ে ঋজুদার অথরিটিকে পুরোপুরি অমান্য করে টিপিকালি ভটকাইয়ের কায়দাতে বলল, দুসসস-স-স। কোনও মানে হয়! এমন করে চোরাশিকারিদের জন্যে অপেক্ষা করব? আমি চললাম একাই। তোমরা ঘুমোও।

জঙ্গলে বা পাহাড়ে বা সমুদ্রে বা ঘাসবনেও সে শিকারের জন্যেই যাওয়া হোক, কী অন্য যে কোনও কাজে, নেতা একজন অবশ্য থাকা দরকার। নেতা না থাকলে নানারকম বিপদ হতে পারে—যেমন বিপদ হতে পারে নেতা থাকলে, শহরে-বন্দরে। নেতাকে অমান্য করার শাস্তি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী বা বায়ুসেনা

বাহিনীতেও কোর্ট-মার্শাল। তার মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। ভটকাই যে এসব জানে না তাও নয়। সব জেনেশুনেও এমন বেয়াদবি অভাবনীয়।

ঋজুদা এক মুহূর্ত ভটকাইয়ের মুখে চেয়ে থাকল। কাঠোনির গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে বাইরের আলোর উদ্ভাস যেটুকু আসছিল ভিতরে, তাতে ভটকাই বা ঋজুদার মনের ভাব অবশ্য বোঝা গেল না। দীর্ঘ দু'-তিন মিনিট নিস্তব্ধ হয়ে গেল আবহ।

নীরবতা ভেঙে ঋজুদা বলল, ঠিকই বলেছে ভটকাই। এরকম অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষাতে না বসে থেকে আমাদেরই ইনিসিয়েটিভ নিয়ে কিছু করা দরকার। বিপদ যদি হয় তো হবে।

আমি বললাম, বিপদের ভয় করলে তো আমরা কেউই এখানে আসতাম না। কিন্তু সাহস আর হঠকারিতা তো এক কথা নয়।

ঋজুদা, ইংরেজিতে যাকে বলে, to put one's foot down তাই করল। বলল, না, আমি veto দিলাম। ভটকাই যা বলছে তাই আমরা করব। যেদিকে গুলির শব্দ হয়েছিল শুধু সেদিকেই নয়, অন্য দিকেও আমরা বেরিয়ে পড়ব। গুলি করার পরে কেউ তো আর তাদের অ্যারালডাইট দিয়ে সেঁটে রাখেনি সেখানে। তারা কোন দিকে চলে গেছে তা ঈশ্বরই জানেন।

তারপর বলল, সবচেয়ে আগে আমি যাচ্ছি। আমার কুড়ি মিনিট পরে যাবে রুদ্র, উলটো দিকে।

কোন্ দিকের উলটো দিকে?

তা তো দেখতেই পাবে। আমি তো আর কর্পূরের মতো উবে যাব না।

ফেরার কোনও আউটার বাউন্ডস?

আমি জিজ্ঞেস করলাম ঋজুদাকে।

যখন খুশি ফিরতে পারো, তবে নিদেনপক্ষে এক-একজন করে চোরাশিকারি এক-একজনকে ধরে আনতে হবে—তাতে কাল ফেরো পরশু ফেরো আমার কোনও আপত্তি নেই।

বললাম, উইশফুল থিঙ্কিংয়ের ব্যাপার হয়ে গেল না ঋজুদা?

হল হয়তো, কিন্তু উইশ ছাড়া তো বাঁচাও যায় না কিনা।

ঋজুদা গলা থেকে বাইনাকুলারটা খুলে আমাকে দিয়ে দিল। অন্যটা তো তাগার কাছেই ছিল। বলল, চললাম।

বেরোবার আগে ওয়াকিটকিটা অন করে একবার চেক করে নিল ঋজুদা। আমাদেরও বলল চেক করে নিতে। ওগুলো বনবিভাগ থেকেই আমাদের দেওয়া হয়েছিল। নওগাঁ থেকে আসার পর থেকে জিপে ওয়ারলেস থেকেই কাজিরাঙার কন্ট্রোলের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর। এই কন্ট্রোল কাজিরাঙা পার্কের কন্ট্রোল নয়। পোচারদের ধরার অপারেশনের জন্যে অন্য একটা ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া হয়েছে আমাদের। কাজিরাঙা অভয়ারণ্যের গার্ডদের

কোড ওয়ার্ড হচ্ছে 'রাইনো'। কিন্তু আমাদের কোড ওয়ার্ড হচ্ছে, 'মোটকা'। তবে আমরা নিজেদের মধ্যেও কথা বলতে পারব। buzzer বেজে উঠলেই সুইচ টিপে কথা বলতে পারব। অন্যদের ডাকলেও তাদের buzzer বাজবে। বেরোবার আগে ঋজুদা 'মোটকা' কোডে ওঁদের জানিয়ে দিল যে জিপের ওয়ারলেস সেট অ্যাটেন্ড করার মতো কেউ থাকবে না, তাই উত্তর না পেলে চিন্তা না করতে। তবে কোনও মেসেজ দেওয়ার থাকলে আমাদের ওয়াকিটকিতে ডাইরেক্ট দিতে পারেন। তবে যত কম কথা বলেন আমাদের সঙ্গে ততই মঙ্গল, কারণ চোরাশিকারিদের কাছেও যে ওয়াকিটকি নেই তা কে বলতে পারে। আজকাল ইলেকট্রনিক ইন্ডাস্ট্রির দৌলতে যাদের পকেটে পয়সা পৃথিবী তো তাদেরই পকেটে।

ঋজুদা এগিয়ে গেল।

ভটকাই বলল, গুড লাক।

আমি বললাম, গুড হান্টিং।

তাগা মেচ বলল, সাবধানে যাইয়েন স্যার।

ঋজুদা সোজা যেদিক থেকে সকালে গুলির আওয়াজটা এসেছিল সেদিকে আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম যে ঋজুদা টুপিটা রেখে গেল। কেন যে, তা বুঝলাম না। তবে কারণ নিশ্চয়ই আছে।

ঠিক পনেরো মিনিট পরে আমিও বেরোলাম। আমার বেরোনোর পনেরো মিনিট পরে ভটকাই আর তাগা মেচ। আমিও টুপিটা জিপের মধ্যে রেখে গেলাম।

এতক্ষণ কাঠোনির গভীর জঙ্গলের ঘেরাটোপের মধ্যে ছিলাম, কাজিরাঙার এই ব্যাপ্তি ও আদিমতা সেখান থেকে ঠিক বোধগম্য হয়নি। বাইরে বেরোতেই হঠাৎ আমার মনে হল যে এ পর্যন্ত অনেক মানুষখেকো বাঘ, গুণ্ডা হাতি ইত্যাদির মোকাবিলা করেছি। চোরাশিকারিদেরও করেছি, কিন্তু এতখানি একলা কখনও মনে হয়নি নিজেকে। আরও একটা কথা মনে হল, তা হল এই যে, মানুষের মতো সাংঘাতিক জানোয়ার আর দুটি নেই। যখন সে জানোয়ার হবে বলে মনস্থ করে। আমি বাইরে বেরিয়ে ডানদিকে যেতে লাগলাম। ঋজুদা তো সোজা গেছে। প্রতিটি পা ফেলছি আর দাঁড়াচ্ছি। তীক্ষ্ণ চোখে সামনে ও দু'পাশে, এবং মাঝে মাঝে পেছনেও তাকিয়ে দেখছি অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে কিনা। গন্তব্যও কিছু নেই, বিশেষ দ্রষ্টব্যও কিছু নেই অথচ সব জায়গাতেই গন্তব্য, সব কিছুই দ্রষ্টব্য। আমার হাতঘড়িতে এখন আটটা বেজেছে রাত। এখানে সূর্য খুব তাড়াতাড়ি ওঠে। কলকাতার থেকে অনেকই পুবে তো। তাই আলো ফোটার আগে আমার হাতে ঘণ্টা আট-সাড়ে আট সময় আছে। রাত থাকতে তত চিন্তা নেই, কিন্তু সকাল হয়ে গেলেই বিপদ বাড়বে। পাওয়ারফুল বাইনাকুলার দিয়ে ওই আড়ালহীন তৃণভূমিতে বহু দূর থেকে নজর চলবে।

আধঘণ্টাটাক চলার পরে সামনে হঠাৎই একটি মস্ত জলাভূমি চোখে পড়ল। জলের আলাদা গন্ধ থাকে, বাদারও। শিশুকাল থেকে বনেবাদাড়ে ঘোরাঘুরি করে

নাকটা কুকুরের নাক হয়ে গেছে। চৈত্ররাতের মিশ্রগন্ধবাহী হাওয়া যেদিকে বইছিল আমি সম্ভবত সেইদিক দিয়েই এগোচ্ছি। তাই জলের গন্ধ পাইনি। হঠাৎই গতিপথ পরিবর্তিত হতেই নাকে বাদা-বিলের গন্ধ এল এবং চোখে পড়ল এক বিস্তীর্ণ জলজ উদ্ভাস। তার সঙ্গে কানও বঞ্চিত রইল না। জলের মধ্যে একদল জানোয়ারের লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়ার আওয়াজও কানে এল। হগ-ডিয়ারের দল এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় বাঘের চাপা বিরক্তি প্রকাশের আওয়াজ। সম্ভবত বড় বাঘটি অনেকক্ষণ পরিশ্রমের পরে হরিণের দলটাও কাছে চলে এসেছিল তাদের stalk করে। ইতিমধ্যে নিঃশব্দ পায়ে আমি হঠাৎ অকুস্থলে হাজির হওয়াতে হরিণরা আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল। মধ্যে দিয়ে বাঘ বেচারি পড়ল ফাঁকিতে। বাঘকে যখন হরিণেরা দেখেইনি তখন বাঘ নিজের অবস্থান আওয়াজ করে জানাল কেন সেইটাই রহস্য। সচরাচর ক্লাস ওয়ান গ্রেড ওয়ান শিকারি বলেই বাঘ নিজের অবস্থান জানান তো দেয়ই না, কোনওরকমের আওয়াজও করে না। এমন স্বল্পবাক সে যে মানুষদের মৌনী ঋষির সঙ্গে তুলনীয়।

ব্যাপারটা কী হল বোঝার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে দেখি সেই জলার মধ্যে দাঁড়িয়ে এক বুরুন্টিকা। আমার চেহারা হয়তো তার পছন্দ হয়নি। আমারও তার চেহারা পছন্দ হয়নি। হঠাৎ সামনে মাটি ফুঁড়ে পাহাড়ের মতো একদাঁতি গণেশ যদি আবির্ভূত হয় তবে পিলে তো চমকাবারই কথা। সবচেয়ে বিপদের কথা এই যে, কোনও কিছুকেই গুলি করার উপায় নেই আমাদের। সে বাঘে টুঁটি কামড়েই ধরুক আর গণেশ আমাকে নিয়ে ফুটবলই খেলুক। গণেশ তার বিরক্তি প্রকাশ করতেই প্যাঁ-অ্যা-অ্যা করে এমন চিৎকার করল যে আমার বুঝতে বাকি রইল না যে সেই ডাক শুনে তাগা মেচের বর্ণনা দেওয়া হুলালপথ নদীর মধ্যে পেল্লাই চিতলগুলোও ভয় পেয়ে জলে পেল্লাই পেল্লাই ঘাই মারল, ওলটাল-পালটাল।

আমি যে কত বড় পেটুক তা সেইক্ষণে বুঝলাম। বাঘেই খায় না হাতিতেই লাথি মারে সেই দুশ্চিন্তা ভুলে চিতল মাছের কথা নইলে মনে আসে কী করে। একটু কায়দা করে সরে গিয়ে আরও ডাইনে যেতেই এক অভাবনীয় দৃশ্য চোখে পড়ল। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সে জায়গাটা একটু উঁচু এবং শুকনো, জোয়ার-ভাটা খেলা স্যাংগ্রোভ ফরেস্টস, সুন্দরবনের মাঝে মাঝে যেমন থাকে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শিকারি ও জেলে মৌলেরা যাকে বলে 'ট্যাঁক', সেইরকম আর কী! সেই 'ট্যাঁকে' দাঁড়িয়ে ডানদিকে চাইতেই চোখে পড়ল দিগন্তবিস্তৃত ব্রহ্মপুত্র নদ চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় ভাসছে। শুধু ভাসছেই নয়, ভাসাচ্ছেও কত কিছু নিশ্চয়ই। নদীর পাড়, আমি যেখানে ছিলাম, এখান থেকে প্রায় আধ মাইল হবে। ট্যাঁক থেকে ভাল করে দেখে নিয়ে আমি নদীর দিকে এগোলাম। মনে হল, আমার আর নদীর, থুড়ি, নদের মধ্যে আরেকটা ট্যাঁক আছে যেটা নদের বেশ কাছে। ভাবলাম, সেখানে পৌঁছোতে পারলে, জায়গাটা উঁচু বলেই সেখান থেকে চারধার আরও ভাল করে দেখা যাবে।

শিকারিরা যেমন সাবধানী নিঃশব্দ পায়ে বনে চলাফেরা করে, চোরাশিকারিদের খোঁজে এসে আমিও তেমন করেই এগোতে লাগলাম। সারা শরীরের কোনও অংশই যেন ত্রস্ত বা চকিত কোনও ভঙ্গি না করে, শরীরের ওপরে মাথাটা এদিক থেকে ওদিক ঘোরাতেও অনন্তকাল সময় নিয়ে ঘোরাতে হয়, সেই সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করেই আমি এগোচ্ছিলাম। ঋজুদা আসবার সময়ে প্লেনে বলেছিল এবং আমারও সে কথা খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল যে, সম্ভবত গণ্ডার-শিকারিরা কাজিরাঙাতে পৌঁছোয় নৌকো করে। ডাঙা দিয়ে এলে বনবিভাগ তো বটেই, পুলিশ এবং সাধারণ মানুষেরও চোখে পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। নদ ধরে এলে জায়গা বুঝে নৌকো লাগিয়ে নৌকো থেকে অপারেট করাটাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। তাদের কোনও কাঠোনির মধ্যে বড় গাছের ওপরে মাচা বেঁধে থাকাটা যেমন খুবই সম্ভব, নৌকোতে থাকাটাও আরও বেশি সম্ভব। বেগতিক দেখলেই তারা নৌকো খুলে সমুদ্রের মতো নদীতে ভেসে পড়তে পারে।

আরও বেশ কয়েক পা যেতেই সামনের সেই কাঠোনিতে পৌঁছোবার আগেই ঘাসবনের মধ্যে সাদা একটা ঢিপি মতো দেখতে পেলাম চাঁদের আলোতে। আর একটু এগোতেই বুঝলাম যে সেটা ঢিপি নয়, একটা মস্ত গণ্ডার। এক পাশে কাত হয়ে শুয়ে আছে। আরও কাছে যেতেই দেখতে পেলাম যে তার খড়্গটা কাটা। চাঁদের আলোতে যতখানি ভাল করে নজর করা যায় তা করতে গিয়েই নাকে একটা পচা গন্ধ এল। শরীরের কোথায় গুলি করে মেরেছে গণ্ডারটা তা বোঝা গেল না, তবে তাকে মারা হয়েছে কম করে তিন-চারদিন আগে। তা যখন বোঝা গেল তখন এও প্রাঞ্জল হল যে সকালে আমরা যে গুলির আওয়াজ শুনেছিলাম তার সঙ্গে ওই গণ্ডারের মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক নেই।

সাদা গণ্ডারের পটভূমিতে চাঁদের আলোতে আমাকে সহজেই দেখা যাবে তা মনে হতেই আমি গণ্ডারটার পাশে বসে পড়লাম। বসে পড়তেই মানুষের গলার স্বর কানে এল। তবে বেশ দূর থেকে। কারা যেন নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। তারা কি সামনের কাঠোনির মধ্যে আছে নাকি নদীর দিকে আছে তা বোঝা গেল না। আমি স্থাণুর মতো বসে রইলাম, তবে তার আগে কাঁধে ঝোলানো রাইফেলটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিয়ে সেফটি ক্যাচ এবং ট্রিগার গার্ডে আঙুল ছুঁইয়ে স্মল অফ দ্য বাট ডান হাতের মুঠোতে শক্ত করে ধরে বসলাম যাতে মুহূর্তের মধ্যে গুলি করতে পারি। পিস্তলটা কোমরের হোলস্টারে ছিল। বেল্টের সঙ্গে বাঁধা। হোলস্টারের বোতামটা খুলে রাখলাম।

লোকগুলো ক'জন তা বোঝা যাচ্ছিল না তবে কমপক্ষে তিনজন হবেই। যে ভাষায় ওরা কথা বলছিল তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। তবে মাঝে মাঝে 'লাহে লাহে' শব্দ দুটি শুনতে পাচ্ছিলাম। অহমিয়াতে লাহে মানে যে আস্তে এটুকু জানতাম কারণ বাবার এক অহমিয়া বন্ধুকে তেজপুরে তাঁর গাড়ির ড্রাইভারকে প্রায়ই 'লাহে লাহে' বলতে শুনতাম, একবার যখন দোলের সময়ে তেজপুরে

গেছিলাম আমরা। লোকগুলোর কথাবার্তাতে কোনও উদ্বেগ ছিল না। তারা বেশ খোশমেজাজে আছে বলেই মনে হচ্ছিল।

এখন আমার কী করণীয় তাই হচ্ছে কথা! ওদের কথা আমি যখন শুনতে পাচ্ছি, ওয়াকিটকিতে আমি ঋজুদা ও ভটকাইদের সঙ্গে কথা বললেও ওরা শুনতে পাবে। তবে নাও হয়তো শুনতে পারে। এখন নদীর দিক থেকে হাওয়া বইছে এবং আমি সেইজন্যেই লোকগুলোর কথা শুনতে পাচ্ছি। হাওয়া তাদের কথা উড়িয়ে নিয়ে আসছে। আমি যেহেতু হাওয়ার ভাটিতে আছি, তাই আমার কথা হাওয়া উজানে থাকা ওরা শুনতে নাও পারে। কিন্তু বললেও আমি কী বলব ঋজুদাদের? ওদের কাউকেই এখানে আসতে বলে লাভ নেই। ওরা বিভিন্ন দিকে গেছে এবং কাঠোনি থেকে বেরিয়ে ডানদিকে আসতেও আমার প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। ওদের আসতে আরও বেশি সময় লাগবে। অথচ এও ঠিক যে ওরা তিন-চারজন থাকলে ওদের ফায়ারিং পাওয়ার আমার চেয়ে অনেক বেশি থাকবে। তা ছাড়া ফরেস্ট গার্ড মতিরামকে যেমন করে মেরেছিল তাতে বোঝা যায় যে গেন্দা মারতেও তাদের হাত যেমন কাঁপে না মানুষ মারতেও কাঁপে না। তবে আমার হালকা থার্টি-ও-সিক্স রাইফেলটা নিয়ে আমি অত্যন্তই দ্রুত গুলি করতে পারব এবং নির্ভুল নিশানাতে। ম্যাগাজিনে পাঁচটি এবং চেম্বারে একটি গুলি আছে— সফ্‌ট নোজড বুলেট। ম্যাগাজিন খালি হবার আগে কম করে পাঁচজনকে পটকে দিতে পারব আমি একাই। তবে গুলি করার আগে টার্গেট ভাল করে দেখা চাই। মানুষ মারা মোটেই আনন্দের জিনিস নয়, তবে নিজের প্রাণ বাঁচাতে যদি মারতে হয় তাহলে না মেরেই বা উপায় কী?

একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে আমি গণ্ডারের আড়াল ছেড়ে লেপার্ড-ক্রলিং করে এগোতে শুরু করলাম। তবে কাঠোনির দিকে সোজা নয়। নদীর দিকে এগোতে লাগলাম, যাতে সুযোগ ও সুবিধামতো দিক পরিবর্তন করে কাঠোনির দিকে এগোতে পারি। এলিফ্যান্ট গ্রাসের আড়াল তো ছিলই, কিন্তু সাবধান হতে হচ্ছিল, আমার শরীরের ধাক্কাতে নলবনের মাথাগুলো আন্দোলিত না হয় এবং কোনও শব্দও না হয়। এগোতে তাই খুবই সময় লাগছিল। প্রায় আধঘণ্টাতে যতটা এগোলাম তাও ব্রহ্মপুত্র থেকে বেশ খানিকটা দূরেই রইলাম। কিন্তু তাতেই আবার ঘটনা নতুন মোড়ে পৌঁছোল। এবারে নদীর দিক থেকেও দু'জন মানুষের কথা শোনা গেল। এই দু'জন কি কাঠোনি থেকে এল? না, এরা আলাদা!

এবারে খুবই সাবধানে এগোতে লাগলাম এবং নলবন ক্রমশ পাতলা হয়ে আসতে লাগল। নলবনের বদলে ঘাসবন শুরু হয়েছে। সেই ঘাসবন গিয়ে নদীর পাড়ে মিশেছে। নদীর কাছাকাছি পৌঁছে সটান শুয়ে পড়লাম কান খাড়া করে। সব ইন্দ্রিয়র প্রতিভূ হল তখন শুধুমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ই। তখন শোনা ছাড়াও কান দিয়ে দেখা। নাকও অবশ্য সজাগ থাকে, বেশ বেশি সজাগ, যখন চোখ কাজ করে না। ঠিক সেই সময়ে নাকে খিচুড়ি রান্নার গন্ধ এল নদীর দিক থেকে হাওয়ায় ভেসে।

ভাজা মুগের ডালের খিচুড়ি, তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ঘি ঢালা হয়েছে। হয়তো ঘি দিয়েই রান্না হচ্ছে। খিচুড়িভক্ত আমি তখন গেন্দা-শিকারিদের সঙ্গে এনকাউন্টারের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে খিচুড়ির গন্ধে বুঁদ হয়ে গেলাম।

আরও একটু এগিয়ে গিয়ে একেবারে ফ্রিজ করে গেলাম। দেখি মস্ত বড় একটা গামারি গাছের নীচে বাঁধা একটি বড় নৌকো। ব্রহ্মপুত্রে ছোট নৌকোর পক্ষে সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া সময়টা শেষ চৈত্র। যখন-তখন হাওয়া উঠতে পারে এবং ওঠেও। সেই বড় নৌকোটার সঙ্গে একটা ছোট নৌকো বাঁধা, জলিবোট-এর মতো। তাতেই দেখি একটা জনতা স্টোভে খিচুড়ির হাঁড়ি আর অন্য একটা স্টোভে কী ভাজছে। নাক আবারও চেগে উঠল। এ তো চিতল মাছের গন্ধ। চিতল মাছের নদনদে তেলওয়ালা পেটি ভাজছে কেউ। চিতল মাছের পেটি সর্ষে দিয়ে, কাঁচালঙ্কা-ধনেপাতা দিয়ে, এমনকী দই দিয়েও খেয়েছি কিন্তু পেটি ভাজা কখনও খাইনি। এই বনবাসে এত তরিবৎ করে রান্না করার সময় ও সুবিধাও ছিল না রাঁধুনির। রাঁধুনির সঙ্গে একটা লোক পাড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। রাঁধুনি তাকে যা বলল তাতে মনে হল সে অন্যদের ডেকে আনতে বলছে গরম গরম খাবার পরিবেশন করবে বলে।

একেই বলে কপাল! খিচুড়ি আর চিতল মাছের পেটি ভাজা যখন খাবে তারা তখন হয়তো একজন পাহারাতে থাকবে। অন্যরা তো খেতেই মশগুল থাকবে। দেখা যাক, ঘটনা কী ঘটে।

লোকটি কাঠোনির দিকে চলে গেল এবং আধখানি পথ গিয়েই গলা তুলে ডাক দিল ওদের। তার ডাকের মধ্যে মোটকা নামটা উচ্চারিত হল একবার। চমকে উঠলাম আমি। তবে তো তাগা মেচ ঠিকই আন্দাজ করেছিল।

যেখানে পড়ে ছিলাম সেখানেই ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম। আমার ভাগ্যেই যে শিকে ছিঁড়ল এটা ভেবেই আনন্দিত হলাম। এখন শিকেই ছেঁড়ে না প্রাণটাই যায় সেটাই দেখবার। উত্তেজনাতে শরীরের সব স্নায়ু এবং মন টানটান হয়ে রইল। সেই লোকটা ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। অন্ধকার কাঠোনির দিক থেকে দু'জন লোক বাইরে বেরিয়ে এসে চাঁদের আলোর মধ্যে ঘাসবন পেরিয়ে এসে ওই লোকটার সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনজনই নৌকোর দিকে যেতে লাগল। আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম যে সেই দু'জনের মধ্যে একজনের হাতে একটা রাইফেল। কী রাইফেল তা বোঝা সম্ভব ছিল না, তবে মনে হল সিঙ্গল ব্যারেল রাইফেল। হাতি মারার জন্যে হেভি বোরের রাইফেল আর মানুষ মারার জন্যে লাইট বোরের রাইফেল এনেছে কিনা জানা সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক যে গণ্ডার মারা রাইফেলের মার খেলে যে কোনও মানুষ কিমা হয়ে যাবে, কারণ তা চারশো বোরের বা তার চেয়েও হেভি বোরের রাইফেলই হবে। আর লাইট বোরের রাইফেল দিয়ে মারলে মানুষ মরবে অবশ্যই তবে ছেদড়ে-ভেদড়ে যাবে না।

ওরা তিনজন কথা বলতে বলতে নৌকোর দিকে এগোতে লাগল। তাদের

দেখে মনে হচ্ছিল যে তারা খুব খুশি। কে জানে! হয়তো খিচুড়ি আর চিতল মাছের পেটি ভাজা খেয়ে ওরা আজ রাতেই নৌকো ভাসাবে। কোন দিকে যাবে কে জানে! উজানে না ভাটিতে। নাকি রাতে ভাল করে ঘুমিয়ে ভোররাতে অন্ধকার থাকতে থাকতে রওনা হবে। হয়তো তাও নয়, ওরা আরও কিছু দিন থাকবে হয়তো এখানেই। যে লোক তিনটে নৌকোর দিকে যাচ্ছিল তাদের দু'জনের পরনে লুঙ্গি আর আরেকজনের পরনে জিনসের প্যান্ট। সে বড় বড় টানে সিগারেট খাচ্ছিল। তার সিগারেটের আগুন মাঝে মাঝে টান দেওয়ার সময়ে জোর হচ্ছিল। এদের মধ্যেই একজন মোটকা গোগোই, কিন্তু তিনজনেই রোগা-সোগা। মোটা কেউই নয়। এ কী রসিকতা কে জানে।

ওরা ছোট নৌকোটার কাছে পৌঁছে নদীর জলে ভাল করে হাত ধুয়ে নিল। নদীর ওপর দিয়ে চৈতি হাওয়া বইছে জলের গন্ধ নিয়ে, তারপর হাওয়াটা ডাঙায় পৌঁছোতেই জলজ গন্ধের সঙ্গে বনজ গন্ধ মিশে যাচ্ছে। ওরা বড় নৌকোটার দিকে চেয়ে কী সব বলাবলি করছিল। বড় নৌকোর মধ্যে আরও কেউ নেই তো? কে জানে।

নাঃ। বড় নৌকো থেকে আর কেউ তো বাইরে বেরিয়ে এল না।

ওই তিনজন লোক ছোট নৌকোর পাটাতনে বসল। ওদের স্টেনলেস স্টিলের থালাগুলো চাঁদের আলোয় চকচক করছিল। যে রান্না করছিল সে বোধহয় খিদমদগার। কারণ, সে নিজে না খেয়ে ওদের খাবার পরিবেশন করছিল। সম্ভবত পরে খাবে সে। যে লোকটার হাতে রাইফেল ছিল সে রাইফেলটাকে ছোট নৌকোর গলুইয়ের ওপরে হেলান দিয়ে রেখেছিল।

আমি এবারে আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। ওরা, মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছিল। খাওয়া যখন হয়ে গেছে তখন আমি ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটু দম নিয়ে রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়ালাম। আর দাঁড়ানোমাত্র রাঁধুনি, যে আমার দিকেই মুখ করে বসেছিল, উত্তেজিত হয়ে কী একটা বলেই আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। আর দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই যে লোকটা রাইফেল নিয়ে এসেছিল সে খাওয়া ফেলে এঁটো হাতেই রাইফেলটার দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাত বাড়াল। আর দেরি করা যায় না। আমি সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলাম লোকটাকে।

রাতের বেলা এবং চাঁদনি রাতে তো অবশ্যই বন্দুক দিয়ে মারাটা একটুও অসুবিধের নয়। কিন্তু রাইফেলের ব্যারেলের ব্যাক সাইট এবং ফ্রন্ট সাইটে আলো না পেলে রাইফেল দিয়ে মারতে রাতে খুবই অসুবিধা হয়। গুলি হয়তো লাগে, কিন্তু জায়গামতো লাগে না।

গুলি করতেই লোকটা পড়ে গেল। তার রাইফেলটা নেওয়ার জন্য অন্য একজন দৌড়ে যেতেই আমি তাকেও গুলি করলাম। তার পা লক্ষ করে। প্রথমজনের কোথায় গুলিটা ঠিক লেগেছিল জানি না। আরেকজন লোক আমি গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া ফেলে এক ডিগবাজি দিয়ে ঝপাং করে নদীতে

ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে আর দেখা গেল না।

যে লোকটা পরিবেশন করছিল সে আমাকে উদ্দেশ করে যা বলল, তার মানে হল বড্ড খিদে লেগেছে। সে বলতে চাইছে যে খেয়েনি আগে, তারপরে মামলাটা কী হল বোঝা যাবে এখন।

আমি ততক্ষণে এগিয়ে যেতে যেতে ওদের বলেছি, হ্যান্ডস আপ। দু'জন গুলি খাওয়া লোকই দু'হাত ওপরে তুলল। বুঝলাম যে তাদের বুকে-পেটে লাগেনি সম্ভবত গুলি। কিন্তু যে খাবার খাচ্ছিল সে খেয়েই যেতে লাগল হাত না তুলে। আমি তার মাথার এক হাত ওপর দিয়ে একটা গুলি চালিয়ে দিতেই লোকটা আতঙ্কেই উলটে পড়ে গেল। তখন আমার দয়া হল। আফটার অল আমি এবং সে দু'জনেই খিচুড়ি আর চিতল মাছের ভক্ত—তা ছাড়া যে মানুষ মৃত্যুকে উপেক্ষা করেও খেতে পারে তার খিদেটা নিশ্চয়ই মারাত্মক বেশি। আমি বললাম, ঠিক আছে। তুমি খাইতে পারো। আর গুলি করুম না। তারপরে তুমি রাইফেলটারে ছুইড়্যা আমারে দ্যাও। সাবধানে। ট্রিগারে যদি হাত দিছ মুণ্ডুটারে কিমা বানাইয়া দিমু অনে।

লোকটা কী বুঝল জানি না, কিন্তু উঠে গিয়ে রাইফেলটার নল ধরে জোরে আমার দিকে ছুড়ে দিল। তার রাইফেল ধরার কায়দা দেখেই বুঝলাম যে জীবনে সে রাইফেলে হাত দেয়নি। রাইফেলটা আমার পায়ের কাছে পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে রেখে তাকে বললাম, খাও এখনে, খাইয়্যা লও পেট ভইর‍্যা। তারপর মনে পড়ে গেল, 'পালিয়ে যান' যদি অহমিয়াতে পলাউক হয় তবে 'খান' হতেও পারে খাউক। তাই আমি তাকে বললাম, খাউক। লোকটা হয়তো গুলি খেলেও অত অবাক হত না এমনভাবে আমার দিকে তাকাল। অন্য দু'জনকেও বললাম, তোমরাও খাইতে পারো। কিন্তু তারা খেল তো নাই, সেই রাঁধুনিকে যাতা গালাগালি করতে লাগল।

আমার রাইফেলের নলটা ওদের দিকে রেখে ডানহাতে রাইফেলটাকে হোল্ড করে পকেট থেকে ওয়াকিটকিটা বের করে সুইচ টিপে বললাম, মোটকা। মোটকা। হ্যালো মোটকা। তখুনি দেখি যে লোকটার হাতে রাইফেল ছিল সে নড়ে-চড়ে উঠল, প্রতিবাদ করার ভঙ্গিতে। বুঝলাম যে সে তাহলে মোটকা গোগোই নয়।

কন্ট্রোল থেকে সাড়া পেয়ে যা বলার বললাম। আমার হাতঘড়ির সঙ্গে যে কম্পাস ছিল তা থেকেও জায়গাটার বিবরণ ও কাজিরাঙার রেঞ্জ অফিস থেকে কোন দিকে হবে তা বলে দিলাম। পুলিশকে খবর দিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসতে বললাম। বললাম, ডাক্তারও যেন নিয়ে আসে ওষুধ, ইঞ্জেকশন ইত্যাদি সব সঙ্গে নিয়ে। তিনজন ইনজিওর্ড মানুষ এখানে। তারপর ঋজুদাকে ওয়াকিটকিতে বললাম যা বলার। ডিরেকশনও দিলাম।

ঋজুদা বলল, খুব সাবধান।

কেন?

যে লোকটা নদীতে ঝাঁপাল সে নিশ্চয় সাঁতরে ডাঙাতে উঠে যাবে। আমার মনে হচ্ছে ও-ই মোটকা গোগোই। নইলে অত হুঁশিয়ার হত না। মাত্র একটা রাইফেল যখন ওদের কাছে দেখেছিস অন্য অস্ত্র-শস্ত্র নিশ্চয়ই কাঠোনির মাচা-টাচাতে রাখা আছে। সেই অস্ত্র নিয়ে সে এসে তার সঙ্গীদের তো উদ্ধার করবেই, তোকেও অবশ্যই মারবে।

আমি ইংরেজিতে বললাম, তুমি ভেবো না। আমি কাঠোনির দিকে তাকিয়ে থাকছি।

ঋজুদা বলল, তুই একটা নম্বরী গাধা। ও যে ওই দিক দিয়েই আসবে তার কী মানে আছে! তোর ডানদিক-বাঁদিক দিয়েও আসতে পারে। রাইফেল উঁচু করে ধরে সাঁতরেও আসতে পারে তোর পেছন দিক দিয়ে।

বুঝেছি।

আমি বললাম।

তারপর ভটকাইকেও ধরলাম ওয়াকিটকির বোতাম টিপে।

ও বলল, কী রে খোকা, খবর কী?

ভারিক্কি গলায় বললাম, বাঁদরামো না করে ডিরেকশনটা ভাল করে বুঝে নে, তারপর তাড়াতাড়ি চলে আয়। তোর জন্যে ভাজা মুগডালের গাওয়া-ঘি জবজবে খিচুড়ি আর চিতল মাছের পেটি ভাজা অপেক্ষা করছে।

ভটকাই বলল, স্বপ্নেই যখন বিরিয়ানি রাঁধছিস তখন ঘি ঢালতে কঞ্জুষিই বা করবি কেন?

আমি বললাম, সত্যি বলছি। এসেই দ্যাখ।

কামিং। বলে ভটকাই ডিসকানেক্ট করে দিল ওয়াকিটকি।

আমি ওদের তিনজনকে নৌকো থেকে নেমে এসে ফাঁকা জায়গাতে আমার দিকে পিছন ফিরে ঘাসবনের দিকে মুখ করে হাত ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে বললাম। যার উরুতে গুলি লেগেছিল তার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। তাকে বসার অনুমতি দিলাম। আর আমি রাইফেলের নল ওদের দিকে করে নৌকোর গলুইয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘড়িতে দেখলাম রাত দশটা। প্রথম দিনই অপারেশন সাকসেসফুল হওয়াতে এবং আমিই হিরো বনে যাওয়াতে মনে মনে একটু খুশিই হলাম। এখন ঋজুদা, ফরেস্টের লোকেরা, পুলিশ সব কখন আসে সেই হচ্ছে কথা। যাদের ধন তাদের হাতে এদের সঁপে দিলেই আমাদের ছুটি। কাজিরাঙা লজে গিয়ে ঘুম লাগাব, একেবারে আগামীকাল দশটাতে উঠব সকালে।

রাঁধুনির কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাওয়া হয়নি। তার সঙ্গীরা তাকে এমনই গালাগাল করেছিল যে বেচারির পক্ষে খাওয়া আর সম্ভবই হয়নি। মানুষটা বড় গরিব। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। এরা সকলেই গরিব। গুলি খাবে, জেল খাটবে,

হাত-পা কাটা যাবে সার্জেনের ছুরিতে এদেরই, আর ওরা যাদের হয়ে এসব করছে দুটো পেটের ভাতের জন্যে, তাদের নাগাল পাবে না আইন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কমলাকান্তের দপ্তরে সেই লিখে গেছিলেন না যে 'আইন একটা তামাশামাত্র। বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে'— সেই কথা এতদিন পরেও সত্যি আমাদের দেশে। এ বড় দুঃখের কথা।

অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। ঘড়িও দেখিনি বহুক্ষণ। একটা জিপের আওয়াজ শোনা গেল যেন মনে হল। ঘড়িতে তখন বারোটা বেজে দশ। তার আগেই ঋজুদা যেন মাটি ফুঁড়ে বেরোল লোকগুলোর বিস্ফারিত চোখের সামনে। তারপর আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, কনগ্র্যাচুলেশনস রুদ্র। ফরেস্টের লোকজন এলেই খড়্গগুলো খুঁজে বের করবে। বামাল ধরতে না পারলে অসুবিধে হবে অনেক।

আমি বললাম, মরা গণ্ডারই তো যথেষ্ট প্রমাণ।

ঋজুদা ওই তিনজনকে পেরিয়ে যে নৌকোতে ভর দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম সেদিকে এগিয়ে এল এবং তারপরই কোথা থেকে কী হয়ে গেল এক ঝটকায় নিজের রাইফেলটা তুলে নিয়েই ঋজুদা আমাকে গুলি করল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার বাঁপাশে জলের ওপর থেকে একটা গুলির আওয়াজ। কী যেন একটা গরম ছ্যাঁকা দিল, কী যেন একটা বেঁধালো কে আমার বাঁ কাঁধে, ধাক্কা দিল জোর। আমি পড়ে গেলাম নৌকোর ওপরে। ঋজুদার গুলি আমার লাগেনি, জলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল এবং যেখানে পড়েছিল সেখান থেকে একজন লোক হ্যাঁচোর-প্যাঁচোর করতে করতে জল থেকে ডাঙায় উঠেই পড়ে গেল মাটিতে। তার মুখ দিয়ে ঝলক ঝলক রক্ত বেরোতে লাগল। একবার খুব জোরে নড়ে উঠেই লোকটা স্থির হয়ে গেল। ইতিমধ্যে সেই রাঁধুনি গোলমালে তালেগোলে দৌড় লাগাল কাঠোনির দিকে আর সঙ্গে সঙ্গে ঋজুদার রাইফেলের গুলি গিয়ে পড়ল তার পায়ের পেছনে, মাটিতে। ভয় পাওয়াবার জন্যেই গুলিটা করেছিল ঋজুদা। এবং ভয় সে অবশ্যই পেয়েছিল। ভয় পেয়ে এক লাফে অনেকটা ওপরে উঠেই সে আবার ফিরে এসে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়াল দু'হাত ওপরে তুলে লক্ষ্মী ছেলের মতো।

আমি বললাম, ভাগ্যিস তুমি দেখেছিলে ঋজুদা।

সবই ভাগ্যিস। জোর বেঁচে গেছিস এযাত্রা। আর দু'ইঞ্চির জন্য তোর হার্টটা বেঁচে গেছে। কী রাইফেল ছিল মোটার হাতে কে জানে। মনে হয় থ্রি ফিফটিন। হেভি রাইফেল হলে তুই এতক্ষণে শেষ হয়ে যেতিস।

তার রাইফেল তো এখন ব্রহ্মপুত্রের তলায়। কী রাইফেল ছিল তা এখন জানার উপায় নেই।

ঋজুদা নিজেই বলল। তারপর ওয়াকিটকিতে রেঞ্জ অফিসের সঙ্গে কথা বলল। বলল, এখুনি একটা হেলিকপ্টার দরকার। ইনজিওর্ডদের হাসপাতালে নেওয়া দরকার। আর্মির হেলিকপ্টার আছে গুয়াহাটি এবং ডিমাপুরেও। কনজার্ভেটর

জেনারেল এবং ফরেস্ট মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলতে বলল।

ঋজুদার কথা শেষ হতে না হতেই ভটকাইচন্দ্র এবং তাগা মেচ এসে পৌঁছল। নৌকোর পাটাতনে শুয়ে শুয়ে দেখলাম আমি। তাদের পেছন পেছন রেঞ্জ অফিসের জিপও এল।

ঋজুদা বলল, ভটকাই, তুই আর তাগা এখানে থাক। আমি এই জিপে গিয়ে আমাদের 'বোলেরো'টা নিয়ে আসি। এত লোকে নইলে যাওয়া হবে কী করে। তা ছাড়া ফার্স্ট-এইড বক্সটাও আছে সেখানে। এখুনি দরকার।

জিপের ড্রাইভার জিপটা ঘোরাতেই ঋজুদা তাতে উঠে পড়ল। ভটকাই বলল, তোমাকে কী বলেছিলাম?

ঋজুদা বিরক্ত হয়ে বলল, কী?

নিজে না মরতে রাজি থাকলে কাউকেই মারা যায় না।

ঋজুদা একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলল, ঠিক। গৌতম বুদ্ধের পরে তোর মতো জ্ঞানী আর কেউ হননি ভারতবর্ষে।

ঋজুদা চলে গেলে ভটকাই আমার কাছে এসে বলল, যা রক্ত বেরোচ্ছে তাতে তাড়াতাড়ি কিছু একটা করতে না পারলে...

বললাম, সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা করিস না। ঋজুদা লোকটাকে সময়মতো না মারলে গুলি আমার হার্টে লাগত। তোর সঙ্গে এ জন্মে আর কথা বলা যেত না। তখন যখন মরিনি, আর এ যাত্রায় মরছি না।

কী যে বলিস।

ভটকাই বলল।

ওর দু'চোখ জলে ভরে গেছিল আমার অবস্থা দেখে।

তাগা মেচ মৃত লোকটাকে দেখে বলল, আরে এই তো মোটকা গোগোই। কী মোটা দেখলেন স্যার।

তুমি চিনলে কী করে?

আমাগো অফিসে ফোটো আছে না। তাই দেখছি।

ভটকাই বলল, আশ্চর্য। এত মোটা মানুষ এত ফিট হয় কী করে।

আমার জ্ঞান আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিল। আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। মোটকা গোগোই আর তার দু'জন গুলি-খাওয়া সঙ্গীর জন্যেও খুবই কষ্ট হচ্ছিল। রাঁধুনির সম্ভবত হবে না কিছু। অল্প-স্বল্পেই ছাড়া পাবে। কিন্তু বাড়ি ফিরে তো আর জবজবে করে ঘি-ঢালা মুগের ডালের খিচুড়ি আর চিতলের পেটি ভাজা খেতে পারবে না। শুধু দু'মুঠো পেটের ভাতের জন্যে মানুষ কত এবং কতরকম কষ্টই না করে। নানারকম অন্যায়ও করে। শুধু তাই নয়, প্রাণও দিয়ে দেয়। বাজে। বাজে। বাজে।

এবারে আমি ঘুমোব। আমার মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়া ভটকাইয়ের উদ্বিগ্ন মুখটা ক্রমশ, ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল।

আমি...

অরাটাকিরির বাঘ

গ্রীষ্মের শেষ। গরমটা অসহ্য হয়েছে। কিন্তু না এসে পারা যায়নি বলেই আমাদের আসা। ঋজুদাকে আসতেই হত। আমরা তাকে একা ছাড়িনি।

যে কোনও সময়েই বৃষ্টি হতে পারে কিন্তু হচ্ছে না। অথচ বৃষ্টি না হলে আর প্রাণ বাঁচে না পশু পাখি তরুলতার। মানও বাঁচে না ঋজু বোস অ্যান্ড কোম্পানির। হাতে সময় আর মাত্র তিনদিন আছে। এর মধ্যে বোধ হয় লণ্ডভণ্ডকারী বাঘকে এ যাত্রা মারতে পারা গেল না। বাঘটার এলাকা অনেকখানি কিন্তু যেহেতু প্রথম মানুষ ধরে সে আড়াই বছর আগে অরাটাকিরি গ্রামে তাই তার নাম হয়ে গেছে অরাটাকিরির বাঘ।

ওড়িশার কালাহান্ডি জেলার এই দুর্গম এবং সাংঘাতিক বনের মানুষেরা অনেক আশা করে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দিনের পর দিন ধরনা দিয়ে বসে থেকে রায়গড়ার কাগজকল ষ্ট্র-প্রোডাক্টস-এর মালিকদের ধরে ঋজুদাকে এখানে আনিয়েছে অরাটাকিরির মানুষখেকো বাঘটাকে মারবার জন্য। এই পাথুরে জায়গাতে এই সবকিছু ঝাঁঝাঁপোড়া করা গরমে বাঘের থাবার দাগ খুঁজে পাওয়া মুশকিল অথচ বাঘ সমানে তার হরকৎ চালিয়ে যাচ্ছে। গত পরশুই অরাটাকিরি থেকে মাইল পনেরো দূরের একটি গ্রাম থেকে বছর দশেকের একটি ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পাহাড়তলির একটি শুকনো নালাতে বসে পুরোটাই খেয়ে গেছে। শুকনো নালার বালিতে পায়ের দাগ দেখার পরও তার চলে যাওয়ার পথ খোঁজবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছি আমরা। বৃষ্টি হলে মাটি নরম হবে। তখন থাবার দাগ দেখা যাবে অনেক সহজে। তবুও আমরা হাল ছাড়িনি।

ঋজুদার গতকাল থেকে একটু জ্বর মতো হয়েছে। হিট ফিভার। তাই আমাকে আর ভটকাইকেই পাঠিয়েছিল ঋজুদা জলের জায়গাতে, যদি বাঘের রাহান-সাহানের কোনও খোঁজ পাই তাই দেখতে। পঞ্চাশ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে মাত্র একটি জায়গাতেই জল আছে। জল তো নয়, কাদা-গোলা সেমি-লিকুইড-পাডল। তাতেই বাইসন বা আমাদের গাউর, বুনো মোষ, শম্বর, চিতল হরিণ, কোটরা শুয়োর, শজারু, নানা সাপ, পাখিরা মায় প্রজাপতি পর্যন্ত

জল খেতে আসে সকালে-বিকেলে। বিকেলেই বেশি। এই বাঘ এমন সাংঘাতিক ধূর্ত মানুষখেকো না হলে তৃণভোজী জানোয়ারদের ধরবার জন্যই সে এখানে আসত। জল খাওয়াও হত, তার খাবার সংগ্রহও হত এবং এইখানেই আমরা তাকে কবজা করতে পারতাম। কিন্তু এই অরাটাকিরির মানুষখেকো জংলি জানোয়ার খাওয়া ছেড়েই দিয়েছে। সে কেবল ক্রমাগত মানুষই খেয়ে যাচ্ছে গত আড়াই বছর হল। আর অবশ্য তাকে নিশ্চয়ই খেতে হচ্ছে। নইলে সে বেঁচে আছে কেমন করে! কিন্তু জল খেতে সে এই জলে আসছে না। পাহাড়ের ভিতরে কোথাও হয়তো কোনও ঝরনা আছে, হয়তো তার আস্তানা যে গুহাতে সেই গুহারই কাছে, সেখানেই তৃষ্ণা নিবারণ করছে সে।

দিন পাঁচেক আগে এই জলটির কাছেই একটি বাঁশঝাড়ের পাশে একটি বড় চিতল হরিণকে মারে কোনও জানোয়ার। চিতল হরিণটি মস্ত বড় ছিল। জানোয়ারটা তাকে খেয়েও ছিল পিছন দিক থেকে, বাঘেরা যেমন করে খায়। পায়ের চিহ্ন দেখে, ঘাতক যে বাঘই সে বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া গেলেও আমরা কোনও ঝুঁকি না নিয়ে বাঁশঝাড়ের কাছেই একটি মিটকুনিয়া গাছে মাচা করে বসেছিলাম পরদিন বিকেল বিকেলই এসে। আমরা মানে, আমি আর ঋজুদা। মাঝরাতে এসেছিল ঘাতক, তবে সে বাঘ নয় মস্ত এক চিতা। বেচারির অর্জিত এবং স্বাভাবিক খাদ্য থেকে বঞ্চিত কেন করব তাকে আমরা? তাই মাচা থেকে নেমে আমি আর ঋজুদা ফিরে এসেছিলাম কশিপুরে আমাদের বাংলোতে। আগেই বলেছি যে এই ঘটনা পাঁচদিন আগের। পরদিন সকালে সেই জায়গাতে ফিরে গিয়ে তদন্ত করার সময় দেখেছিলাম যে মানুষখেকো বাঘটি মাচা থেকে নামার পরে জিপে গিয়ে পৌঁছোনো অবধি আমাদের অনুসরণ করেছিল। অবশ্য তার থাবার দাগ বহু ব্যবহৃত জানোয়ারের পায়ে চলা পথের ধুলোর উপরে দেখতে পেয়েছিলাম বলেই অমন অনুমান আমরা করতে পেরেছিলাম।

সাতদিন হল আমরা এসে পৌঁছেছি কশিপুরে। ভাইজাগ স্টেশনে নেমেছিলাম মাদ্রাস মেলে এসে। তারপর ভাইজাগ সার্কিট হাউসে দুপুরের খাওয়া সেরে চমৎকার উঁচু-নিচু পাহাড় এবং গভীর জঙ্গলের মধ্যের আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে সন্ধেবেলা এসে পৌঁছেছিলাম রায়গড়াতে স্টে-প্রোডাক্টস-এর গেস্ট হাউসে। রায়গড়া আসার পথেই শ্রীকাকুলাম বলে একটি জায়গা পড়েছিল। যেখানে একসময়ে অন্ধ্রপ্রদেশের নকশাল আন্দোলনের ঘাঁটি ছিল। ভাইজাগ থেকে রায়গড়া গাড়ি বা বাসেরই মতো ট্রেনেও আসা যায়। আর সেই রেলপথের দু'ধারের দৃশ্যও গাড়ির পথের দৃশ্যরই মতো অপূর্ব সুন্দর।

রাতটা রায়গড়ের কাগজকলের দারুণ গেস্ট হাউসে কাটিয়ে সকালে ওদেরই দেওয়া একটি জিপে করে দুপুরের আগেই আমরা কশিপুর এসে পৌঁছেছিলাম। প্রকাণ্ড কয়েকটি প্রাচীন আমগাছ ছিল ছোট বাংলোটির হাতায়। সামনে চওড়া বারান্দা। মধ্যে খাবার ও বসার ঘর আর দু'পাশে দু'টো শোবার ঘর। ঋজুদা

বলছিল, এই বাংলোতেই এসে ছিল নাকি একবার ষাটের দশকে ঋজুদার বন্ধু কেন জনসন আর জিম ক্যালান-এর সঙ্গে। তখন জঙ্গল আরও গভীর ছিল এবং জনবসতিও কম ছিল অনেকই। উন্নতি বিশেষ কিছু হয়নি কিছুরই গত দু'-তিন দশকে, শুধু জনসংখ্যা আর দারিদ্র্যই বেড়েছে। তবে তখনও বাঘের অত্যাচার খুবই ছিল। এখনকার চেয়ে হয়তো আরও বেশি ছিল কারণ তখন বাঘের সংখ্যাও ছিল বেশি । সুন্দরবনের বাঘেদেরই মতো কালাহান্ডির এই অঞ্চলের বাঘেরাও কুখ্যাত নরখাদক হিসেবে পরিচিত ছিল। কীভাবে তাদের স্বাভাবিক খাদ্য এমনভাবে কমে গেল যে মানুষকেই খাদ্য করতে হল ওদের, এ নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ কথাও সত্যি যে কালাহান্ডি নরখাদক বাঘের জন্য সুন্দরবনেরই মতো পরিচিত বহুদিন থেকে। বিখ্যাত শিকারি এবং ব্যারিস্টার কুমুদ চৌধুরি মশায় কালাহান্ডিতে বাঘ শিকারে এসে বাঘেরই হাতে প্রাণ হারান। তবে সে বাঘ মানুষখেকো ছিল কিনা তা আমার জানা নেই। ঋজুদারও জানা নেই।

জিপ নিয়ে আমি আর ভটকাই বাংলো থেকে বেরিয়েছিলাম চারটে নাগাদ। পৌনে পাঁচটা থেকে সূর্যাস্ত অবধি জলের পাশে একটি মস্ত শিমুলগাছের গুঁড়ির আড়ালে বসে ছিলাম আমরা। অনেক জানোয়ারই জল খেয়ে গেল এসে—মাংসাশী এবং তৃণভোজী—কিন্তু বাঘ এল না। হায়না, শেয়াল, বনবিড়াল এবং একটি ছোট চিতাও সন্ধে লাগার সঙ্গে সঙ্গে এল। কিন্তু না পাওয়া গেল বাঘের দেখা, না গেল তাকে শোনা। বাঘ এলে তাকে চাক্ষুষ দেখা না গেলেও পুরো জঙ্গল জানিয়ে দেয় যে, সে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'এসেছিলে তবু আসো নাই, জানায়ে গেলে' গানটি বাঘের বেলাতেও প্রযোজ্য। কিন্তু না, আমি আর ভটকাই দু'জনেই নিশ্চিন্ত যে, বাঘ আসেনি।

॥ ২ ॥

কালাহান্ডির নামী স্থান যদিও কোরাপুট, জেপুর হল বাণিজ্যিক রাজধানী। কালাহান্ডি, দণ্ডকারণ্যেরই লাগোয়া। আমরা যে পথ দিয়ে এসেছি ভাইজাগ হয়ে। ভাইজাগ বা ওয়ালটেয়ার থেকে রেলপথে জেপুর হয়ে এলে, আসতাম—আর্কুভ্যালি হয়ে। আর্কু মানে লাল। ওখানের মাটি লাল তাই নাম আর্কু। ওয়ালটেয়ার-আর্কুর পথে পড়ে দশ লক্ষ বছরের পুরনো বোরাগুহালু গুহা। চুনাপাথরের উপরে জল গড়িয়ে গড়িয়ে আশ্চর্য সব স্থাপত্যের সৃষ্টি হয়েছে বোরাগুহালুতে। কিন্তু পড়ে অন্ধ্রপ্রদেশে। আর্কু ভ্যালিও।

ঋজুদা আগে এদিকে যখন এসেছিল তখন দেখে গেছে। এবারে আমাদের হাতে সময় বড় কম তাই হবে না। তা ছাড়া যে কাজে আসা সেই কাজটিও সম্পন্ন হবে বলে মনে হচ্ছে না।

অরাটাকিরির এই মারাত্মক বাঘ গত আড়াই বছর হল ওড়িশার কালাহান্ডির

এই অঞ্চলে যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে তারই সমাধানের জন্য ঋজুদার ডাক পড়েছে কলকাতা থেকে। এই অঞ্চলে নানা আদিবাসীর বাস। খরা আর দারিদ্র্যর জন্য কুখ্যাত এই কালাহান্ডি জেলা। মানুষখেকো বাঘের জন্যও।

সকালে উঠে কশিপুর বাংলোর বারান্দাতে বসে চা খাচ্ছিলাম। ঋজুদাও এসে বসল। শেষ রাতের দিকে খুব ঘাম দিয়ে জ্বরটা নাকি ছেড়েছে। দু' কাপ চা খেয়ে পাইপটাও ধরাল। আমি বুঝলাম যে ঋজুদা ভাল হয়ে গেছে।

ব্রেকফাস্টে কী খাবে?

ভটকাই ঋজুদার আরোগ্যতে উৎসাহিত হয়ে বলল। ঋজুদা অসুস্থ থাকাতে খাওদা-দাওয়া নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে এ দু'দিন ভটকাই-এর বিবেকে সম্ভবত একটু বাধো- বাধো ঠেকছিল। এখন সে বাধা সরে গেছে। এবারে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে আবার নির্লজ্জ হবে সে।

ঋজুদা জবাব দেওয়ার আগেই সে নিজেই জবাব দিল। গরম গরম ফুলকো লুচি করতে বলি? সঙ্গে আলুভাজা আর বেগুনভাজা কী বল? আর পোড় পিঠা তো আছেই। কালকের পায়েসও আছে। ফ্রিজ থাকলে ভাল হত একটা। ননা, মানে আমাদের পাচক ঠাকুরের রান্নার হাতটা দারুণ।

তারপর বলল, ব্রেকফাস্টের মেনু তো ঠিক হল। দুপুরে মিষ্টি পোলাও, ছোলার ডাল, বেগুনভাজা, আর কচি পাঁঠার ঝোল করতে বলছি, দই দিয়ে, আর আমের চাটনি। ঠিক আছে তো ঋজুদা?

ঋজুদা আর কী বলবে। ভটকাই একাই প্রশ্নকর্তা একাই উত্তরদাতা। সত্যি! দিনে দিনে ও মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এসেছে মানুষখেকো বাঘ মারতে কিন্তু মনে হচ্ছে জামাই এল বুঝি জামাইষষ্ঠীতে।

ঋজুদা ভটকাইকে দেখেশুনে যেন বাক্যহারা হয়ে গেছে। আজকাল কিছু বলাও ছেড়ে দিয়েছে যেন। তিতিরও আসেনি এবারে যে ওকে একটু শাসনে রাখবে। ইতিমধ্যে দেখা গেল একটা জিপ আসছে লাল ধুলো উড়িয়ে। তখনও ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। একটু পরই ইঞ্জিনের গুনগুনানি শোনা গেল। কাছে এলে, জিপটাকেও চেনা গেল। মাথার উপরে লাল আলো লাগানো। কালাহান্ডির ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বিয়ান্দকার সাহেবের জিপ। ভবানী-পাটনা অথবা জেপুর থেকে আসছেন। খুব ভোরে বেরিয়েছেন নিশ্চয়ই। নইলে এত সকালে এসে হাজির হবেন কী করে। কী ব্যাপার কে জানে!

বিয়ান্দকার সাহেব মারাঠি। আই এ এস অফিসাররা দেশের সব রাজ্য থেকেই আসেন। তবে উনি ওড়িশা ক্যাডার বেছে নিয়েছেন তাঁর পছন্দসই বলে। সেদিন উনি বলেছিলেন আমাদের যে ওঁর এক মামিমা ওড়িয়া। সেই মামিমার বাপের বাড়ি সম্বলপুরে ছেলেবেলাতে নাকি বেড়াতে আসতেন। মহানদীর পারের সেই সম্বলপুর শহর আর সমলেশ্বরীর মন্দিরের প্রেমে পড়ে গিয়েই এই ওড়িশা-প্রীতি তাঁর। মানুষটা চমৎকার। এখনও বিয়ে-থা করেননি। বয়সও খুবই কম।

ডি এম সাহেবের জিপ কশিপুর বাংলোর হাতায় ঢুকতে না ঢুকতেই উলটোদিক থেকে একটা সাইকেল তিরের মতো এসে ঢুকল টায়ারে কাঁকড়মাটির কিড়কিড়ানি আওয়াজ তুলে। পিছনের ক্যারিয়ারে একজন রোগা, বেঁটে কালো লোক বসেছিল। তার পরনে গামছা। খালি গা, মাথায় টাক, মুখে বসন্তের দাগ। যে সাইকেল চালাচ্ছিল তার পরনে সাজিমাটিতে কাচা গেরুয়া ধুতি আর একটা ওই রঙেরই ফতুয়া। ওই লোকটির স্বাস্থ্য বেশ ভাল। গায়ের রং ফরসা, মুখে পান, মাথায় বাবরি চুল। যাত্রা-টাত্রা করে বোধহয়।

বিয়ান্দকার সাহেব জিপ থেকে নামতেই আমি আর ভটকাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করলাম। সাইকেলের আরোহীরা লাল আলো জ্বালানো ডি এম-এর গাড়ি এবং কোমরে রিভলবার গোঁজা দু'জন উর্দিধারী বডিগার্ডকে দেখা সত্ত্বেও জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে একটুও পাত্তা না দিয়ে সাইকেলটাকে একটা আমগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়েই তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দাতে উঠে এসে ইজিচেয়ারে বসে থাকা ঋজুদার দু' পায়ে দু' হাত ঠেকিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে বলল, নমস্কার আইজ্ঞাঁ। আপনি চঞ্চল চালুন্ত বাবু।

কন, হেল্বা কন?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

বিয়ান্দকার সাহেব তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে, চেয়ারে বসতে বসতে।

লোকদু'টো যা বলল তার বাংলা করলে এই দাঁড়ায়: শেষ রাতে ওদের গ্রামের একটি মেয়ে দরজা খুলে উঠোনে বেরিয়েছিল। সেই সময়েই বাঘ তাকে তুলে নেয়। মেয়েটির পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে তার স্বামী ফিতে কমিয়ে রাখা লণ্ঠনটাকে হাতে ধরে ফিতে বাড়াতে বাড়াতে বাইরে আসে আর আসতেই দেখে বাঘ তার বউকে টুঁটি কামড়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে উঠোন পেরিয়ে পিছনদিকে। ওদের বাড়ির পিছনেই পাহাড় উঠে গেছে এবং সেই পাহাড়ে কুচিলা গাছের জঙ্গল আর পাথর বড় বড়। ভয়ে এবং আতঙ্কে মুখ দিয়ে আওয়াজ করতে পারেনি লোকটি। তার সম্বিৎ যখন ফিরেছে তখনই সে চিৎকার করে উঠেছিল। কিন্তু তাদের তিন বছরের শিশুকন্যা ছাড়া আর কেউই ছিল না বাড়িতে। ধারে কাছে অন্য ঘরবাড়িও ছিল না। চিৎকার করার পরেই সে নিজের বিপদের আশঙ্কাতে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা দিয়েছিল। যতক্ষণ অন্ধকার ছিল সে ভয়ে বাইরে বেরোয়নি। ফরসা হলে শিশুকন্যাকে কোলে করে সে সবচেয়ে কাছে যে গ্রাম, সেখানে দৌড়ে গিয়ে খবর দেয়।

ভটকাই বলল, ম্যান-ইটার বাঘ এত মানুষ ধরছে জেনেও বেরোতে গেল কেন রাতে?

আমি বললাম, কেন আবার! ছোট বাইরে করতে। ওদের কি অ্যাটাচড বাথরুম আছে?

ঋজুদা আমাদের থামিয়ে দিয়ে লোকটিকে বলল, তারপর বলো।

লোকটি গড়গড় করে আবার শুরু করল, তারপর আমরা প্রায় জনা-বারো লোক লাঠি বল্লম এবং একটা গাদা বন্দুক নিয়ে গেলাম সেখানে। তারপর মাটিতে মেয়েটিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ঘষটানো দাগ দেখে দেখে পাহাড়ের গায়ে কিছুটা চড়লাম। মেয়েটির শাড়িটার টুকরো-টাকরা নানা চার গাছে এবং কাঁটাতে আটকে ছিল। রক্তের ধারার দাগ তো ছিলই শুকনো বনের ঝোপে-ঝাড়ে এবং প্রখর গ্রীষ্মের পোড়া মাটিতে।

তারপর? বাঘের হাত থেকে মেয়েটিকে বা তার মৃতদেহকে কী উদ্ধার করতে পারলে তোমরা?

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল।

না বাবু। কিছুটা যখন উঠেছি পাহাড়ে তখনই বাঘ একবার হুঙ্কার দিল আর সেই হুঙ্কারে একটা বহু পুরনো জংলি কাঁঠালগাছের ডাল থেকে খসে পড়ল...।

আমি বললাম, কী পড়ল? কাঁঠাল?

না বাবু, কাঁঠাল নয়।

তবে কী?

বাঁদর। কাঁঠালগাছের ডালে বসে কাঁঠাল খাচ্ছিল কোয়া কোয়া আঠা-টাঠা সুদ্ধ, সে ওই হুঙ্কার শুনে, হাত ফসকে সটান নীচে।

তারপর?

ভটকাই বলল।

নীচে পড়েই ভয়ে তো একেবারে কাঠ। কিন্তু বাঘ তাকে কিচ্ছুই করল না বা বাঘ হয়তো জানলই না যে সে পড়েছে নীচে...।

ঋজুদা লোকটিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, বড় বেশি কথা বল হে তুমি। সংক্ষেপে বলো। মেয়েটিকে বা তার লাশকে তোমরা পেলে কিনা বলো?

লোকটা অপ্রতিভ হয়ে বলল, না বাবু। মেয়েটির কাছ অবধি পৌঁছোবার সাহস হয়নি আমাদের কারওরই। জগা যখন তার বন্দুকে বারুদ গেদে আকাশের দিকে নল করে ঘোড়া টেনে দিল তখন বাঘ আরেক হুঙ্কার দিয়ে পাহাড় থেকে নেমে তেড়ে এল আমাদের দিকে।

আকাশে গুলি করার জন্য তো বন্দুক নিয়ে যাওনি তোমরা।

কী করা যাবে বাবু। ওই বাঘ মারার চেয়ে আকাশ বাতাসকে মারা অনেক সহজ। সে বাঘের কী রূপ। তার বুক, মুখ, গোঁফ, সামনের দু' পায়ের উরুর সামনেটা রক্তে লাল। তার ওই চেহারা দেখে আর কি আমরা সেখানে থাকি। পড়ি কি মরি করে দৌড়ে আমরা সকলে পাহাড় থেকে নেমে এলাম।

সেই মেয়েটির স্বামীও?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হঃ। সে তো এল সকলের আগে। প্রাণের ভয় বলে কথা বাবু। আর তার বউ

বেঁচে যে নেই সে তো আমাদের মতো সেও বুঝতে পারছিল, তাই খামোখা আত্মহত্যা করতে যাবেই বা কেন। তিন বছরের মেয়েটাকে দেখবে কে?

ঋজুদা বলল, ওই পাহাড়ে জল আছে কি কোথাও?

জল বলতে গেলে যা বোঝায় তা নেই তবে বৃষ্টির জল জমে একটা গুহার নীচে সামান্য জল আছে। তা মানুষের খাওয়ার যোগ্য নয়। তার মধ্যে পচা পাতা পোকা-মাকড়...।

আমি মানুষের খাওয়ার জলের কথা বলছি না, বাঘের খাওয়ার জলের কথাই বলছি।

তা হয়তো হবে। বাঘের তৃষ্ণা হয়তো মিটবে কোনওমতে।

তোমাদের কী মনে হয়? বাঘ কি থাকবে তখনও মড়িতে?

তা কী করে বলব। তবে রাম-এর মতো রোগাপটকা নয় তার বউ। সে খুব তাগড়া মেয়ে ছিল। শরীরে অনেক মাংস।

রামটা কে?

সেই মেয়েটার স্বামী।

ওখানে আমাদের এখুনি যাওয়া দরকার একবার। জায়গাটা কতদূর?

তিন ক্রোশ হবে।

অন্যজন বলল, পাক্কা তিন ক্রোশ।

গ্রামের নাম কী?

ধলাহান্ডি।

আশ্চর্য নাম তো।

ভটকাই বলল।

কেন? আশ্চর্য কেন? কালাহান্ডি হতে পারে আর ধলাহান্ডি হতে পারে না। ওখানের পাহাড়ে সাদা পাথর আছে অনেক, মানে পাথরের চাঁই। পাহাড়ের নীচে একটা নুনী আছে, সেই নুনীটাও সাদা।

নুনী কী জিনিস?

এবারে বিয়ান্দকার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

ঋজুদা বলল, সল্ট-লিক। বনের মধ্যে নোনাপাথর থাকে। তৃণভোজী জন্তুরা এবং অনেক সময় মাংসাশী জন্তুরাও সেই নুন চাটতে আসে।

ভটকাই বলল, আমরা যেমন লেক-এর পাশে বিকেলের ফুচকা খেতে যাই। কী বল রুদ্র?

ঋজুদা বলল, তোর কোনওদিনও সেন্স হবে না ভটকাই। একটা মেয়েকে খাচ্ছে বাঘটা এখনও আর এসব শুনেও এতটুকু সিরিয়াস হলি না তুই। তোকে নিয়ে আসাই ভুল হয়েছে।

আমি মনে মনে বললাম, সে তো প্রতিবারেই বলো আবার আসার সময়ে ঠিক নিয়েও আসো। কী যে গুণ করেছে ভটকাই তোমাকে!

আমি বললাম, তুমি কিন্তু যাবে না ঋজুদা। তুমি এখনও খুবই দুর্বল আছ। রাতেও জ্বর ছিল।

দুর্বলতার জন্য নয়। আমার মনে হচ্ছে এখন আমার নিজের না গেলেও চলবে। তারপরে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, এতক্ষণে বাঘ মড়ি ছেড়ে চলে গেছে। জল খেয়ে কোনও গুহাতে বা যেখানে বড় গাছের ছায়া আছে সেখানে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তোদের এখুনি যেতে হবে। গিয়ে সব দেখেশুনে আয়। তারপর বেলা চারটে নাগাদ আমি যাব। মড়ির কাছে মাচা বাঁধার মতো কোনও গাছ থাকলে মাচা বাঁধবি।

সাইকেল আরোহী বলল, লাশটা পাওয়া না গেলে দাহ হবে কী করে? মেয়েটা তো নির্ঘাৎ বাঘডুম্বা হয়ে যাবে।

লাশের আর কতটুকুই বা বাকি আছে? তবে যতটুকু থাকবে কাল সকালে নিয়ে গিয়ে দাহ কোরো। আজকেই নিয়ে চলে গেলে বাঘ আর কীসের জন্য আসবে? কিছু বাকি থাকলে তাই না খেতে আসবে সে সন্ধেবেলা অথবা রাতে!

লোকটা বলল, হঃ। বুঝিলু।

তোরা এখুনি বেরিয়ে যা জিপ নিয়ে। রুদ্র তুই একটা রাইফেল নিয়ে যা। আমার ফোরফিফটি-ফোরহানড্রেডটা নিয়ে যা। মাটিতে দাঁড়িয়ে মানুষখেকো বাঘের মোকাবিলা করতে একটা হেভি রাইফেল সঙ্গে থাকা দরকার। আর ভটকাই একটা শটগান নিয়ে যা। দু'ব্যারেলেই এল জি রাখবি। স্বল্প দূরত্বে এল জি-র মারের মতো মার নেই। জব্বর থাপ্পড়ের মতো গিয়ে লাগে বড় বড় দানাগুলো। স্টপিং পাওয়ার, শর্ট ডিসট্যান্সে রাইফেলের চেয়ে অনেক বেশি। রাইফেলের গুলি লাগলে মরবেই হয়তো বাঘ কিন্তু মরতে যতটুকু সময় লাগবে তার আগে তোদের মেরে দিয়ে যাবে। বাঘ বলে কথা! নে, যা বেরিয়ে পড়। জলের বোতল আর টর্চও নিয়ে যা।

বিয়ান্দকার সাহেব বললেন, টর্চ কী হবে এই সকালবেলা?

ঋজুদা হেসে বলল, এখন সকাল। শিকারে গেলে, বিশেষ করে মানুষখেকো বাঘ শিকারে গেলে, সকাল রাত হতে সময় নেয় না।

তারপর আমাদের বলল, যা দেরি করিস না। বাঘ যদি 'কিল'-এর উপরে থাকে তা হলে সে যতই তড়পাক না কেন দু'জনে একসঙ্গে গুলি করে তার তড়পানি শেষ করে দিবি। যদি না থাকে তবে মাচা বাঁধার বন্দোবস্ত করবি। যদি মনে করিস যে বাঘ দিনমানেই ফিরে আসতে পারে তবে মাচা বাঁধতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে ঝিলের আশপাশে জায়গা বুঝে দু'জনে দু'টি গাছে উঠে বসবি। পাথরে বসবি না। বিশ্বল সাহেবের কী দশা হয়েছিল তা তো শুনলি সেদিন দণ্ডসেনার কাছ থেকে।

বলেই বলল, দণ্ডসেনাটা থাকলে এখন তোদের সঙ্গে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতাম। কবে ফিরবে সে ভবানী-পাটনা থেকে?

বিয়ান্দকার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

ঋজুদা বলল, আগামীকাল।

তারপর আমাদের বলল, রাজয়াডুকে বলে দিবি যে তোরা যদি বারোটার মধ্যে জিপে ফিরে না আসিস তাহলে ও জিপ নিয়ে বাংলোতে ফিরে আসবে আমাকে নিয়ে যেতে।

আমরা উঠতে উঠতে বললাম, ঠিক আছে।

ঋজুদা বলল, ননাকে বল, বিয়ান্দকার সাহেবের জন্য চা দেবে আর সাহেবের ড্রাইভার ও বডিগার্ডদেরও নিয়ে গিয়ে চা খাওয়াবে।

ঠিক আছে।

বলল ভটকাই।

আমরা বারান্দা ছেড়ে ঘরে যেতে যেতে শুনলাম ঋজুদা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করছে বিয়ান্দকার সাহেবকে, এখন আপনি কেন এই সাতসকালে উঠে এতদূর এলেন বলুন।

উনি বললেন, না এসে কী করি বলুন। স্বয়ং চিফ সেক্রেটারি নিজে ভুবনেশ্বর থেকে ফোন করে কাল রাতে আমাকে খুব গালাগালি করলেন। ব্যাপারটা বুঝুন মিস্টার বোস। হোম সেক্রেটারিও নন একেবারে চিফ সেক্রেটারি।

কীসের জন্য?

আবার কীসের জন্য? অরাটাকিরির বাঘকে মারা যাচ্ছে না কেন? গতকাল নাকি অ্যাসেমব্লিতে চিফ মিনিস্টারকে বিরোধীপক্ষরা একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছিলেন। আপনি তো আমাদের সি এম-কে জানেনই। রেগে গেলে থাপ্পড় কষিয়ে দেন। একেবারে অন্য ধাতের মানুষ। বিজু পট্টনায়েকের মতো জবরদস্ত পুরুষ দেশেই কম আছে। কোনও রীতিনীতি বাগ-বিতণ্ডার ধার ধারেন না তিনি। তবে তিনিই বা কী করবেন।

আমরা জামাকাপড় বদলাতে বদলাতে শুনলাম যে উনি বলছেন, কথায় বলে না, স্নেহ নিম্নগামী। স্নেহেরই মতো রাগও নিম্নগামী। সব চোট এসে পড়েছে আমার উপরে।

ঋজুদা বলল, বললেন না কেন চিফ সেক্রেটারিকে, মানুষখেকো বাঘ তো আর সেক্রেটারিয়েটের ফাইল নয় যে ইচ্ছে করলেই বগলদাবা করে এ ঘর থেকে ও ঘরে নিয়ে যাবে চাপরাশি। তা ছাড়া আমি তো এসেইছি মাত্র সাতদিন হল। খবরাখবর নেওয়া, প্ল্যান করা, বাঘের গতিবিধি, কোথায় কোথায় মানুষ মারছে, কীভাবে মারছে, রাতে মারছে না দিনে মারছে এ সব মনিটর করতেই লেগে যায় পনেরোদিন। তার উপরে স্থানীয় শিকারিকে যদি বা ডেপুট করলেন সেও তো শালার বিয়ে দিতে চলে গেল ভবানী-পাটনা।

দন্ডসেনা ভাল শিকারি নয়?

খুবই ভাল শিকারি। সে একাই বাঘকে মারতে পারত।

তাই তো শুনেছি। সে লেসলি জনসনের সময়ে দণ্ডাকারণ্যর অফিসিয়াল শিকারি ছিল।

তা হলে মারল না কেন এতদিন?

বিয়ান্দকার সাহেব বললেন।

মারবে কী করে। সে তো গরিব মানুষ। ইংরেজি জানে না।

বাঘও কি ইংরেজি জানে নাকি?

ঋজুদা হেসে বলল, তা নয়। আমি বলছি, সাধারণ গরিব মানুষকে প্রশাসন কখনওই পাত্তা দেয় না আমাদের দেশে। সব রাজ্যেই। দন্ডসেনার পিছনে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পুরো শক্তি যদি আপনারা নিয়োগ করতেন তবে কবেই ও মেরে দিত ওই বাঘকে। ওকে কি আপনারা একটা জিপ দিয়েছেন? ফরেস্ট বা পি-ডব্লু-ডি-র বাংলোতে থাকার ব্ল্যানকেট পারমিট দিয়েছেন? আমাকে যেমন দিয়েছেন। ওকে কি ভাল আর্মস এবং গুলি জোগাড় করে দিয়েছেন? আমি না হয় শৌখিন শিকারি—স্পোর্টসম্যান—তার তো টাকার দরকার—তাকে কি আপনারা মোটা টাকা অগ্রিম দিয়েছেন? যার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, যার অন্নচিন্তা চমৎকারা তার পক্ষে এমন জবরদস্ত মানুষখেকো মারা অত সোজা নয়। এইসব অঞ্চলের মানুষ আমাকে যেমন ভয়-ভক্তি করছে এই সাতদিনেই তেমন কি এরা দন্ডসেনাকে করবে সাতবছর এখানে থাকলেও। আসলে সাহেবরা দেশ ছেড়ে চলে গেলে কী হয় অর্ধশতাব্দী আগে, আমরা এখনও নানা হীনম্মন্যতাতে ভুগি। নইলে আমি আপনাকে বিয়ান্দকার সাহেব বা আপনি আমাকে বোস সাহেব বলেন কেন? ব্যাপারটার অনেক গভীরে গিয়ে আমাদের বুঝতে হবে। মানুষখেকো বাঘটা বা দন্ডসেনা কোনও আলাদা ব্যাপার নয়।

বিয়ান্দকার সাহেব চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ।

তারপর বললেন, সবই তো বুঝলাম কিন্তু আমার তো চাকরি থাকবে না।

ভারতবর্ষে আই এ এস-দের চাকরি খায় কে? গোরু গাধা হলেও কেউ চাকরি খেতে পারে না।

তা পারে না তবে বাজে জায়গায় বদলি করে দিতে পারে। রিটায়ারমেন্টের দিন অবধি কু-নজরে দেখতে পারে। যে অফিসার সৎভাবে ভাল কাজ করতে চায় তার পক্ষে এমন ঘটলে সেটাই কি যথেষ্ট শাস্তি নয়?

ঋজুদা উত্তর না দিয়ে বলল, চা খান। ব্রেকফাস্টও খেয়ে যান। অনেকক্ষণের ড্রাইভ তো এখান থেকে।

তা তো বটেই।

আমরা যখন রাইফেল বন্দুক টুপি টর্চ জলের বোতল সব নিয়ে বেরোচ্ছি, ড্রাইভার রাজয়াডু জিপটা নিয়ে এসেছে বাংলোর সামনে তখন ঋজুদা বলল, কী খাবেন ব্রেকফাস্টে? লুচি বেগুনভাজা ওমলেট খাবেন? পোড়-পিঠাও আছে।

তখন ভটকাই একবার করুণ চোখে তাকাল ঋজুদার দিকে।

ঋজুদা বলল, ইন আ ম্যানস লাইফ, ডিউটি কামস ফার্স্ট।

আমি বললাম, ম্যান বোলো না, বলো পার্সন। 'ম্যান' শব্দটাই আধুনিক পৃথিবীতে বাতিল হয়ে গেছে।

বিয়ান্দকার সাহেব বললেন, তাই তো হওয়া উচিত।

॥ ৩ ॥

ওড়িশার এই কালাহান্ডি জেলা এক আশ্চর্য জায়গা। কেন জানি না, আফ্রিকার সঙ্গে খুব মিল মনে হয় আমার। প্রকাণ্ড সব কালো ও বাদামি কাছিম-পেঠা পাহাড় মৌন সন্ন্যাসীদের মতো দাঁড়িয়ে। একসময়ে ওইসব পাহাড়ে গাছপালা হয়তো ছিল কিন্তু এখন ন্যাড়া। ইচ্ছে করে ওইসব পাহাড়ে নানা গাছ-গাছালির বীজ এনে তাদের কাছিমের মতো পিঠের ফাঁকফোঁকরে ফেলে দিই। ধীরে ধীরে প্রথমে বাদামি ঘাসে তারপর সবুজ গাছপালাতে ভরে উঠুক সব পাহাড়।

আমি ভূতত্ত্ববিদ নই কিন্তু এখানের এই ন্যাড়া পাহাড়গুলো দেখে কেন যেন মনে হয় যে এদের বুকে অনেক খনিজ পদার্থ আছে। কালাহান্ডি অপেক্ষাকৃত জনবিরল এবং যে সব মানুষ এখানে থাকে তারা বড়ই গরিব। প্রকৃতিও বড় কৃপণ এখানে। বৃষ্টি খুবই কম হয় আর তাই খরা আর দুর্ভিক্ষ নিত্যসঙ্গী এইসব মানুষদের। কাছেই আমাদের মিগফাইটার প্লেন-এর কারখানা—অত্যাধুনিক ব্যাপার-স্যাপার অথচ এখানেই মানুষ জলের কষ্ট পায়, না খেয়ে মরে। কালাহান্ডির এইসব পাহাড়ের জন্যই বায়ু-পথ এখানে দুর্গম, শত্রুর ফাইটার প্লেনের আক্রমণ এখানে কঠিন তাই অনেক বেছে-টেছে এখানেই ফাইটার প্লেন তৈরির কারখানার জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে কোরাপুটে।

কশিপুর ফেলে এসেছি পিছনে। এখন ছাড়া ছাড়া গ্রাম। অল্প কয়েকঘর মানুষের বাস প্রতিটি গ্রামেই। জঙ্গল এই দুর্বিসহ গরমে যেন পুড়ে গেছে। রোদ পোড়া ঘাস, রোদ পোড়া পত্রহীন গাছের বন আর আশ্চর্য এই পত্রহীন বনেই সকালের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে একরকমের বড় বড় ঝিঁঝি একটানা ঝিঁঝিডাকের খঞ্জনি বাজাচ্ছে। প্রকৃতির মধ্যে যে কত রহস্যই আছে! এইসব রহস্যের অনেকেই মানুষ সমাধান করেছে বটে তবে বাকিও আছে অনেক।

আমার নিজের মনে হয় প্রকৃতির মধ্যে রহস্য থাকলে সেইসব রহস্যর সমাধান না করাই ভাল। রহস্যময়তা একরকমের সৌন্দর্য দেয়, মানুষকে যেমন দেয়, প্রকৃতিকেও।

একটা নদী পড়ল পথে। জল নেই। শুধু প্রস্তরময় বালিরেখা। বর্ষা ভাল করে নামলে নিশ্চয়ই জলে ভরে যাবে। নদীর উপরে কংক্রিটের একটা কজওয়ে। বর্ষাকালে নদীতে বান এলে এই কজওয়ের উপর দিয়ে জল বয়ে যাবে। তখনকার

মতো রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। দু'-এক ঘণ্টার জন্য মাত্র। তারপর নদীর জল কমলে আবার মাথা তুলবে কজওয়ে। পাহাড়ি নদীমাত্রেরই স্বভাব এরকম।

জিপের সামনে বসেছি আমি, আর ভটকাই রাজয়াডুর পাশে বন্দুক রাইফেল হাতে ধরে। টর্চ আর জলের বোতল আগন্তুকদের কাছে দিয়েছি। তারা দু'জনেই সাইকেলসুদ্ধু সওয়ার হয়েছে হুড-খোলা জিপের পিছনে।

ভটকাই জিজ্ঞেস করল রাজয়াডুকে, এই নদীটার নাম কী? যেটা পেরিয়ে এলাম?

রাজয়াডু বলল, স্যার। আমি তো এসেছি রায়গড়া থেকে আপনাদের ডিউটি করতে। আমি এ অঞ্চলের বিশেষ কিছু জানি না।

পিছন থেকে যে মেয়েটিকে বাঘে নিয়েছে তার বর বলে উঠল, এরাডি।

তারপর বলল, এই নদীটা নেমেছে আমার বাড়ির পিছনের পাহাড় থেকে।

তাই? তোমার নাম কী দাদা?

আমার নাম রাম।

মৃত মেয়েটির স্বামী বলল।

ভারতবর্ষে যে কত কোটি রাম আছে, ভারতবর্ষের সব রাজ্যে, তার খোঁজ সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের আঁতেলরা রাখেন না। তাঁরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনও খবর রাখেন না বলেই বোধহয় বলেন রামের কোনও অস্তিত্বই নেই। ওইসব কূপমণ্ডূকদের কাছে পশ্চিমবঙ্গই ভারতবর্ষ।

ভটকাই বলল, আর তোমার নাম? দাদা?

আমার নাম শত্রুঘ্ন। হৃষ্টপুষ্ট ফরসা মানুষটি বলল।

আমি ভাবছিলাম, এই বিরাট গ্রামীণ ভারতবর্ষে রামায়ণ ও মহাভারতের শিক্ষাই এখনও প্রধান শিক্ষা। সেই শিক্ষাতেই শিক্ষিত সাধারণ, গরিব, কোটি কোটি মানুষ। এরা 'ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ হ্যাভ ইউ এনি উল? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। থ্রি ব্যাগস ফুল' শেখা দিয়ে শিক্ষারম্ভ করে না। যেহেতু এরা অন্যরকম সেই হেতুই আম বা বিয়ান্দকার সাহেবের মতো প্রশাসকেরা এদের বুঝি না, এদের দুঃখকষ্ট বুঝি না। এরা এরা, আমরা আমরা। যেদিন এদের আমরা আমাদেরই করে নিয়ে ভাবতে শিখব সেদিনই আমাদের হতভাগা দেশ সত্যিকারের উন্নতি করবে। এদের অন্ধকারে রেখে আমরা আলোর কেন্দ্রে বাস করলে দেশ কখনওই এগোবে না।

ভাবছিলাম, এতসব কথা তো আমি জানতাম না—ভটকাই বা তিতিরও জানত না। ঋজুদার সঙ্গে ভারতবর্ষ এবং বিদেশের নানা অংশে গিয়ে গিয়ে, ঋজুদার চোখ দিয়ে স্বদেশ-বিদেশকে দেখে দেখে, স্বদেশ-বিদেশের জঙ্গল-পাহাড়ের সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে জেনেই এইসব ভাবনা আমি ভাবতে শিখেছি। ঋজুদা বলে, চোখ থাকলেই দেখা যায় না। দেখতে পাওয়াটাও শিখতে হয়। সময় নিয়ে, ধৈর্য ধরে।

আমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে দিয়ে ভটকাই বলল, এতক্ষণে বিয়ান্দকার সাহেব

জম্পেশ করে আমারই অর্ডার দেওয়া ফুলকো লুচি আর বেগুনভাজা খাচ্ছেন, সঙ্গে ওমলেট আর পোড়-পিঠা। আর ঋজুদাও। সত্যি! এইজন্যই বলে, 'কপালে নেই ঘি, ঠকঠকালে হবে কী?'

আমি বললাম, বয়স তো কম হল না ভটকাই। এবারে একটু ম্যাচিওরড হ। কথাকটি ইংরেজিতে বললাম, যাতে সঙ্গীরা বুঝতে না পারে। সদ্য স্ত্রী-হারানো এবং এমন রক্তাক্তভাবে হারানো স্বামী এবং তার গ্রামের মানুষ সঙ্গে রয়েছে আমাদের। তাদের মনে কী চিন্তা আর আমরা তাদের ত্রাণকর্তা হয়ে যাচ্ছি যারা তাদের মনে কী চিন্তা। ছিঃ ছিঃ ওরা কী ভাববে তোকে আমাকে?

ভটকাই লজ্জা পেয়ে বলল, স্যরি।

আমাদের সঙ্গীরা বলল, সামনেই একটা বাঁক পড়বে পথে, সেই বাঁকে পৌঁছে একটা মস্ত শিমুলগাছের পাশ দিয়ে আমাদের ডাইনে মোড় নিতে হবে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে। তারপর জিপ যতদূর যাবে ততদূর নিয়ে গিয়ে জিপ ছেড়ে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, কতটা হবে পথ?

পথ তো নেই বাবু। পথ করে নিয়ে যেতে হবে আমাদের।

বেশিটাই চড়াইয়ে?

না। চড়াই বেশি নয়। বাঘ তো খুব বেশি উপরে ওঠেনি আমার বউকে নিয়ে।

আমি ভাবছিলাম, আর বউ! সে তো এখন একটা রক্তমাংসের পিণ্ড হয়ে গেছে। শরীরের কতটুকু বাকি আছে খেতে, কে জানে!

পথ ছেড়ে দিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে আমরা প্রায় সাতশো মিটার অবধি গিয়ে জিপ থেকে নামতে বাধ্য হলাম। আর জিপ যাবে না।

এখান থেকে কতটা?

এই শিমুলগাছ থেকে যতটা এলাম ততটা।

কোনও লোকজন দেখছি না তো।

না। কারওকে আসতে বারণ করেই তো আমরা গেলাম কশিপুরে আপনাদের খবর দিতে। লোকজন সকলে ধলাহান্ডি গ্রামে ফিরে গেছে। পাছে বাঘ গোলমাল দেখে সরে যায় তাই এমনই বলে এসেছিলাম আমি।

তা বেশ করেছ। বুদ্ধিমানের কাজই করেছ। কিন্তু নিরিবিলি পেয়ে বাঘ তার শিকারের, মানে মেয়েটির শরীরের পুরোটাই না খেয়ে যায়। তাই যদি যায় তবে তো তার সঙ্গে মোলাকাতই হবে না। তাই কিছু লোকজন বোধহয় এখানে থাকলে ভাল হত।

তাই তো। এটা তো আগে ভেবে দেখিনি।

শত্রুঘ্ন বলল।

জিপ থেকে নেমে যার যার জলের বোতল কাঁধে ঝুলিয়ে টর্চ দু'টিকে নিতে বলে আমরা শুধু শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়েই এগোলাম। মেয়েটির স্বামী রামের

চোখমুখ তখনও আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। মনে হচ্ছিল, তার উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। তাই তাকে থাকতে বললাম জিপেই। তারপর ভাবলাম, এই বাঘ তো দিনমানেও অনেক মানুষ ধরেছে। মানুষের ভয় তার একেবারেই লোপ পেয়ে গেছে। রাজয়াড়ু আর মেয়েটির স্বামীকে এই নির্জনে রেখে যাওয়া কী ঠিক কাজ হবে? একথা ভেবেই জিজ্ঞেস করলাম, ধলাহান্ডি গ্রামে জিপ যাবে?

হ্যাঁ।

কতদূর হবে এখান থেকে?

বেশি পথ নয় বাবু। ওই যে পাহাড়ের নীচে মস্ত কুসুমগাছটা দেখা যাচ্ছে ওই গাছটারই পিছনে ধলাহান্ডি।

তবে ঠিক আছে। রাজয়াড়ু তুমি জিপ নিয়ে রামদাদাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাও ধলাহান্ডি গ্রামেই। গ্রামেই থাকবে তুমি।

এখন ক-টা বাজে? রাজয়াড়ু জিজ্ঞেস করল।

ন-টা। ঘড়ি দেখে বললাম আমি।

তারপর বললাম, আমরা যদি বেলা একটার মধ্যে গ্রামে গিয়ে না পৌঁছোই তবে তুমি জিপ নিয়ে চলে যাবে কশিপুর। ঋজুবাবুকে নিয়ে গ্রামেই ফিরে আসবে। হয় আমরা সবাই গ্রামে নেমে আসব নয়তো আমাদের মধ্যে একজন অন্তত আসবে ঋজুবাবুকে নিয়ে যেতে।

তারপর বললাম, বুঝেছ তো ভাল করে?

রাজয়াড়ু মাথা নাড়িয়ে বোঝাল যে, বুঝেছি।

জিপটা ধলাহান্ডির দিকে চলে গেলে আমি আর ভটকাই শত্রুঘ্নের সঙ্গে কিছুটা সমতলের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম।

পাহাড়টাতে সত্যিই অনেক কুচিলাগাছ। যে গাছের ফল দিয়ে নাক্সভমিকা ওষুধ তৈরি হয়। এখন শীতকাল হলে এই কুচিলাগাছে বড় বড় ধনেশ পাখিরা বসে থাকত, যাদের বলে গ্রেট ইন্ডিয়ান হর্নবিলস। তারা হ্যাঁক-হ্যাঁক-হ্যাঁক আওয়াজ করে উঁচু উঁচু গাছের এ ডাল থেকে ও ডালে সরে সরে বসত কুচিলার ফল খেতে খেতে। ভারী আওয়াজ করে পাখিগুলো। কুচিলাগাছে ফল আসে শীতে। কুচিলা খায় বলে ওদের নামই কুচিলা-খাঁই। এই পাহাড়ে কুচিলা ছাড়াও আরও অনেক গাছ আছে। বহু প্রাচীন আম, জাম, মহানিম, তেঁতরা, মিটকুনিয়া, রশশি, সেগুন, শাল, সিধা, কুসুম, মহুয়া। এই প্রখর গ্রীষ্মে পর্ণমোচী গাছেদের মধ্যে অনেকেরই পাতা ঝরে গেছে, অনেকের আবার ঝরেওনি। অনেক পর্ণমোচী গাছ আছে যাদের পাতা গ্রীষ্মকালে ঝরে না শীতকালে ঝরে। যেমন আমলকী। সেই জন্যই আমাদের দেশের জঙ্গল বছরের কখনওই একেবারে পত্রশূন্য মনে হয় না।

একটু গিয়েই আমরা রামের বাড়িতে এসে পৌঁছোলাম। শত্রুঘ্ন দূর থেকেই আঙুল দিয়ে দেখাল, ওই যে রামের বাড়ি। নামেই বাড়ি। একটাই মাত্র ঘর। সামনে নিকোনো উঠোন, ভেরেণ্ডা গাছের বেড়া লাগানো। সাপ যাতে না আসে

তাই বেড়ার বাইরের দিকে রাঙচিতারও বেড়া ছিল। বাইরে থেকে উঠোনে ঢোকার একটা দরজা মতো আছে বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি। রাতে সেটা খোলা ছিল কিনা কে জানে। তবে বাঘ ওই উঠোন থেকে রামের বউকে ঘাড় কামড়ে ধরে এক ধাক্কায় সেই বাখারির বেড়াকে ভেঙে চলে গেছে। উঠোনের এক কোণে তুলসি মঞ্চ। আজ সন্ধেবেলা এবং এর পরেও বহুদিন কেউ এখানে আর প্রদীপ দেবে না। রাম হয়তো বিয়ে করবে আবার। নিছকই প্রয়োজনে। বাড়িতে তিন বছরের মেয়েকে কে দেখাশোনা করবে? রাঁধবে বাড়বে কে? কে ফুলের লতা তুলে দেবে বাড়ির বারান্দার খুঁটি থেকে? কে লাউ-কুমড়ো বা সিমের লতা লতাবে? পেটের খিদে মেটাতেই এদের জীবন শেষ হয়ে যায়। কখন যৌবন আসে, কখন প্রৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্য তা বুঝতেই ওরা পায় না। একদিন মৃত্যু এসে ওদের সব যন্ত্রণার আর দারিদ্র্যের দুঃখ মোচন করে দেয়। এমন জীবনযাপন করে বলেই আনন্দ বা শোকের অভিঘাত এদের উপর তেমন করে প্রভাব ফেলে না। আনন্দকেও যেমন এক নৈর্ব্যক্তিক চোখে দেখে এরা, দুঃখকেও তাই। নইলে আজ সকালে শত্রুঘ্নর সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে রাম কশিপুরে পৌঁছে অমন নির্বিকার থাকতে পারত না। নিজের স্ত্রীর অমন মর্মান্তিক পরিণতি তাকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিত। কিন্তু এরা যে জীবনের হাতে গুঁড়িয়েই আছে। ওরা নতুন করে গুঁড়ো হবে কী করে।

রামের বাড়ি দেখে, রামের সামনে আজ সকালে ভটকাই-এর লুচি বেগুনভাজা নিয়ে আদেখলেপনা করাটা যে কতখানি স্থূলরুচির ব্যাপার হয়েছে তা পরে ভটকাইকে বুঝিয়ে বলতে হবে। কোনও কোনও ব্যাপারে ওর মাথাটা মোটা আছে। অনেক ব্যাপারই সে মাথাতে ঢোকে না যদিও তবু ও নিজেকে খুব চালাক বলে মনে করে।

কিছুদূর উঠতেই আমরা মাটিতে রক্তের দাগ পেলাম, ঝোপে-ঝাড়েও রামের বউকে ঘাড় কামড়ে নিয়ে যাবার সময়ে দু' পাশের ঝোপে-ঝাড়ে রক্ত লেগেছে। আরেকটু গিয়েই তার নীলরঙা শাড়িটা পাওয়া গেল। ছিঁড়ে গেছে সেটা এবং রক্তে লাল হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। আর কিছু পাওয়া গেল না। ওরা এত গরিব যে শায়া সেমিজ বা ব্লাউজ-টুলাউজ পরে না বাড়িতে। যদি বা এক আধটা থাকে তো হাটের দিনেই পরে যায়, নইলে নয়!

আমরা খুব সাবধানে হাতিয়ার রেডি-পজিশনে ধরে এগোচ্ছি এবারে। এতক্ষণ শত্রুঘ্ন আমাদের পথ দেখাচ্ছিল, এবারে আমরা ওকে পিছনে দিয়েছি। ও নিরস্ত্র। ওর হাতে ধরা আমাদের দু'টি টর্চ আর গলাতে-ঝোলানো দু'টি জলের বোতল। বাঘের এলাকাতে এসে গেছি আমরা। বাঘ যদি এখানে থেকে থাকে, মানে কিল ছেড়ে চলে গিয়ে না থাকে তবে যে কোনও সময়ে সে দেখা দেবে। কোনওরকম জানান না দিয়ে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো নিঃশব্দে উড়ে এসে পড়বে আমাদের উপরে নয়তো দূর থেকে হুংকার দিয়ে ভয় দেখাবে, সাবধান করবে আর

না এগোতে। তবে এমন করে স্বাভাবিক বাঘ। মানুষখেকোর মতিগতি আগে থাকতে বোঝা যায় না। কোন সময়ে যে সে কেমন ব্যবহার করবে তা আগে থাকতে বোঝা ভারী শক্ত। অধিকাংশ সময়েই মানুষখেকো বাঘ নিজের অবস্থান জানতে দেয় না। চুপ করে থাকে। কখনও বা কিল ছেড়ে ঘুরে শিকারির পিছনে চলে গিয়ে সে কিছু বোঝার আগেই পিছন থেকে তাকে আক্রমণ করে। এই ধলাহান্ডির মানুষখেকো ঠিক কী করবে তা সে নিজেই শুধু জানে।

শত্রুঘ্ন এবারে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখে কথাবার্তা আমরা অনেকক্ষণ ধরেই বলছি না। সামনে একটা পুটকাসিয়া গাছ। যার ছাল দিয়ে ওড়িয়া কবিরাজেরা নানারকম জড়িবুটি বানান। সেই গাছের পিছনে কতগুলো ফিকে সাদাটে পাথরের জটলা। আফ্রিকার সেরেঙ্গেটির কোপি (kopje)-র মতো। আমার মনে পড়ে গেল যে কালো পাথর আর পাহাড়ের রাজত্বে এই অঞ্চলের সাদা পাথরগুলোর জন্যই নীচের গ্রামের নাম হয়েছে ধলাহান্ডি।

এবারে শত্রুঘ্ন আঙুল দিয়ে ওই পাথরগুলোর স্তূপকে আবারও দেখাল। সামনে একটা মস্ত কদমগাছ ছিল। কদমগাছের ডাল শিমুলগাছের ডালের মতো দু' দিকে সমান্তরাল হাতের মতো ছড়ানো থাকে। আমি শত্রুঘ্নকে চোখ দিয়ে ও হাত দিয়ে ইশারা করলাম ওই গাছে উঠে চারদিক দেখে আমাদের ইশারাতে জানাতে। এমনিতে কোনও আওয়াজই ছিল না। একটা ছোট্ট সবুজ পাখির একলা স্বর যেন সেই ভয়াবহ বনের ভয়কে, নৈঃশব্দ্যকে আরও বাড়িয়ে দিল। কোনওরকম আওয়াজ না শুনতে পেয়ে আমি আর ভটকাইও শিমুলগাছের ডালেদের মতো সমান্তরালে ছড়িয়ে গেলাম দু'দিকে। কদমগাছেরা চিরহরিৎ পশ্চিমের দেশের কনিফারাস বনেদের মতো। সবসময়েই পাতা থাকে, ছায়া থাকে বলেই হয়তো শ্রীকৃষ্ণ এত গাছ থাকতে কদমতলাতে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাতেন আর রাধার আসার অপেক্ষাতে থাকতেন।

শত্রুঘ্ন নিঃশব্দে হাত দশেক উঠে গেল। তার বাহাদুরি আছে বলতে হবে। জলের বোতলগুলো তামার। তার উপরে খাকি ফ্ল্যানেল জড়ানো। বেরোবার সময়ে ফ্ল্যানেল ভিজিয়ে নিয়ে আসতে হয়, তাতে জল অনেকক্ষণ ফ্রিজের জলের মতো ঠাণ্ডা থাকে। এ সব ঋজুদার জেঠুমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে অ্যামেরিকান আর্মি ডিসপোজালের সেল-এ কিনে রেখেছিলেন। ঋজুদার কাছে আরও যে কত কিছু আছে। তামার বলে বোতলের ওজন অত্যন্ত হালকা—জলেরই যা ওজন। তবু তামা তো ধাতুই। দু'-দুটো বন্ড-এর পাঁচ ব্যাটারির টর্চ এবং দু'টি তামার বোতল থাকা সত্ত্বেও একটুও ধাতব শব্দ না করে ফিট দশেক ওঠা সহজ কর্ম নয়।

সামনে পিছনে এবং দু' পাশে নজর রেখেই আমরা উপরে তাকাচ্ছি শত্রুঘ্নর দিকে সে ইশারাতে কিছু বলে কি না তা দেখার জন্য। শত্রুঘ্ন আরও কিছুটা উপরে উঠে গিয়ে ইশারায় আমাদের ওই পাথরগুলোর ওপাশে দেখাল আর হাত নেড়ে জানাল যে বাঘ নেই। তার হাতের ইশারা পড়তে আমাদের ভুলও হতে পারত।

শত্রুঘ্ন সম্ভবত বলল যে বাঘ নেই কিন্তু মড়ি আছে। তার মানে বাঘ এখন মড়িতে নেই। হয়তো জল খেতে গেছে বা কোথাও গিয়ে ঘুমোচ্ছে।

আমরা নিরস্ত্র শত্রুঘ্নকে গাছের উপরে থাকতে বলে দু'জনে দু' দিক দিয়ে ওই পাথরগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। পায়ে পায়ে এবং নিঃশব্দে। আমাদের দু'জনের পায়েই বাটা কোম্পানির জগিং-শু। শুকনো পাতা এড়িয়ে পা ফেলাতে নিঃশব্দেই এগোতে পারছিলাম আমরা। জঙ্গলে নিঃশব্দে চলাফেরা করাও শিখতে হয়। আমি তো ঋজুদার অনেকদিনের সঙ্গী। ভটকাই সেদিক দিয়ে বিচার করলে প্রায় রংরুট। তাও আমার আর তিতিরের কাছ থেকে ট্রেনিং পেয়ে ও শিখে নিয়েছে অনেক কিছু। এসব ব্যাপারে সে খুব ভাল ছাত্র। বলতেই হবে যে অত্যন্ত অল্পদিনেই সে খুব তাড়াতাড়ি শিখেছে অনেক কিছু।

আমি যখন পাথরগুলোর ওপাশে গিয়ে পৌঁছোলাম তখনই আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হল। পাথরগুলোর একেবারে গোড়াতে থাকাতে ওপাশ থেকে দেখতে পায়নি শত্রুঘ্ন যে বাঘ ওখানেই আছে এবং ঝুঁকে পড়া কদমের ডালের ছায়াতে লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে। আর তার থেকে একটু দূরে রামের বউ শুয়ে আছে চিত হয়ে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। তার বুক দু'টি এবং তলপেটের প্রায় সবটাই খেয়ে নিয়েছে বাঘ নরম মাংস পেয়ে। ডান পা-টাও খেয়েছে হাঁটু অবধি। মেরুদণ্ডটি অক্ষত আছে বলেই শরীর থেকে পা বিচ্ছিন্ন হয়নি। উপরের চন্দ্রাতপের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে রোদের সরু সরু ফালি এসে পড়েছে কিল-এর উপরে। মেয়েটির মুখটি কিন্তু অক্ষত আছে। এলোমেলো চুলের কিছুটা সামনে চলে এসে মুখটিকে অংশত আড়াল করে রেখেছে কিন্তু তারই মধ্যে দিয়ে দু'টি ভয়ার্ত বিস্ফারিত খোলা চোখ যেন কী এক আতঙ্কে চেয়ে আছে আকাশের দিকে।

ঘুমন্ত বাঘকে কোনও ভাল শিকারি মারে না। সে বাঘ মানুষখেকো হলেও কি মারে না? এ কথা ভাবতে ভাবতেই আমি রাইফেলটা আস্তে আস্তে তুলতে লাগলাম। কাঁধ আর বাহুর সংযোগস্থলে রাইফেলের রাবারের প্যাড লাগানো বাঁটটিকে লাগাতে যাব এমন সময়ে ভটকাই চেঁচিয়ে উঠল, সাবধান রুদ্র। বাঘ।

ভটকাইকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। সে কতদূরে ছিল তাও নয় কিন্তু বাঘ তার অস্তিত্ব অবশ্যই টের পেয়েছিল কিন্তু আমি যে তার পিছনদিকে আছি তা বাঘ জানতেও পায়নি। ভটকাই-এর গলার আওয়াজ পেয়েই বাঘ তাকে আক্রমণ করবে যে এটাই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু এই বাঘ অন্য কোনও বাঘের মতনই নয়। আমি রাইফেলের বাঁট আমার বাহু আর কাঁধের সংযোগস্থলে লাগাবার আগেই এক ঝটকায় বাঘ উঠে দাঁড়িয়েই একটি প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে সামনের একসার অর্জুনগাছের ঝোপ টপকে মস্ত বড় একটা কুচিলাগাছের আড়ালে চলে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভাগ্যিস ভটকাই গুলি চালায়নি। বাঘের সামনে থেকে এবং মাত্র দশ হাত দূর থেকে গুলি চালালে তার বিষম বিপদ হতে পারত। সে এখনও শিকারি হিসেবে

পাকা হয়নি। নিনিকুমারীর বাঘ মারতে গিয়ে সে যা কাণ্ড করেছিল তা বলার নয়। গুলি মিস করলে তো বটেই গুলি লাগলেও তার কপালে দুঃখ ছিল। কারণ, গুলি খেলে বাঘ সবসময়েই তার মুখ যেদিকে থাকে সেদিকে লাফ মারে, সেই লাফ সে মারবেই, যদি না তার হার্ট অথবা লাংস অথবা তার সামনের দু'টি পা অকেজো হয়ে যায়। আর তিন সেকেন্ড সময় পেলেই বাঘ তার ঘাড়ে ঋজুদার ফোরফিফটি-ফোরহানড্রেড রাইফেলের গুলি আমার হাত থেকে খেয়ে পঞ্চত্ব পেতে পারত কিন্তু ভবিতব্যং ভবেতব্য। আমাদের কপালে এখন দুঃখ আছে।

মানুষখেকো বাঘেরা কীভাবে শিকারি ও অ-শিকারির মধ্যে তফাত বোঝে তা ঈশ্বরই জানেন। তা না বুঝলে ভটকাইকে আক্রমণ না করে সে অন্যদিকে লাফ দিয়ে আড়ালে চলে যেত না।

ইশারাতে শত্রুঘ্নকে নেমে আসতে বলে সেখান থেকে একটু পিছিয়ে গিয়ে আমাদের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করলাম। ঋজুদার শরীর খুবই দুর্বল। তাকে এখানে আসতে দিলে সে কোনও কথাই শুনবে না। তাই আমিই স্বঘোষিত নেতা বনে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে ভটকাই আর শত্রুঘ্ন কথা বলতে বলতে এখান থেকে চলে যাবে ধলাহান্ডি গ্রামে। এখন সোয়া দশটা বেজেছে। গ্রামে তারা একটা অবধি আমার জন্য অপেক্ষা করবে। একটার মধ্যে আমি না ফিরলে ভটকাই রাজয়াডুকে নিয়ে কশিপুরে ফিরে গিয়ে সব ঘটনা ঋজুদাকে রিপোর্ট করবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে আবার ফিরে আসবে ধলাহান্ডি গ্রামে। আমার ধারণা বাঘ আবার আসবে। না এলে সে কিল-এর পাশেই ঘুমোত না। সম্ভবত এক কোর্স খানা খেয়ে সে জল খেয়ে আসতে গেছিল। জল খেয়ে ফিরে এসে এখানেই ছায়াতে ঘুমোচ্ছিল। উপরের কদমগাছের চন্দ্রাতপের জন্য আকাশ থেকে শকুনেরা মড়িটাকে দেখতে পাবে না তাই তার আর অন্য কোনও চিন্তা নেই। মড়িটার উপরে চন্দ্রাতপ থাকা সত্ত্বেও বাঘ যে নিশ্চিন্তমনে অন্যত্র যায়নি তার মানেই হচ্ছে বাঘের খিদে এখনও মেটেনি। গত তিনদিনে এ অঞ্চলে কোনও মানুষও মারেনি বাঘ। তার মানে তার খিদেও পেয়েছিল প্রচণ্ড।

ভটকাই বলল, তুই একা থাকবি কেন? আমিও থাকব। ঋজুদা আমাকে কী বলবে তোকে একা রেখে গেলে?

বললাম, বেশি পাকামি করিস না। 'দু দিনের বৈরাগী ভাতরে কয় অন্ন'। শিকারের তুই কী বুঝিস? ঋজুদার শরীর অসুস্থ বলে তাকে আটকাবার জন্যই তোকে পাঠাচ্ছি আমি।

বাঘ যদি সন্ধের আগেও না আসে?

ভটকাই বলল।

না এলে রাতেও থাকব আমি এখানে। কাল সকালে হয় আমার মৃতদেহ তোরা বয়ে নিয়ে যাবি নয়তো বাঘের লাশ। হয় ইসপার নয় উসপার। আমার মামাতো বোন কাবেরীদির বিয়ে আছে সামনের সপ্তাহে। আজই দিনে-রাতে একটা

হেস্তনেস্ত হয়ে গেলে কলকাতায় ফিরে বিয়েটা খেতে পারব। তা ছাড়া বিয়েতে কাজও করতে হবে অনেক। মামিমা বারবার করে বলে দিয়েছেন।

এত সব কথা আমরা ফিসফিস করেই বললাম। ভটকাই বলল, জলের বোতল আর টর্চটা নিয়ে নে। আমি কি ফিরে এসে তোর গুলির শব্দ শুনলে আসব শত্রুঘ্নদাদের নিয়ে? হ্যাজাক হারিকেন সব নিয়ে? বাঘকে নিয়ে যাবার জন্য দড়ি-টড়ি সমেত?

আমি বললাম, একটা এমনকী দুটো গুলির শব্দ শুনলেই আসিস না। একটু ব্যবধানে যদি তৃতীয় গুলির শব্দ শুনিস তবেই বুঝবি যে বাঘ মরেছে। আর তুই তোর বন্দুকটা আর এল. জি.-গুলো আমাকে দিয়ে যা। ঋজুদার এই রাইফেলটা নিয়ে যা। গুলি গুনে নে।

কেন রাইফেল দিচ্ছিস?

ওই শর্ট রেঞ্জে বন্দুকই ভাল। তা ছাড়া যদি অন্ধকার হয়ে যায় তাহলে বন্দুকে মারা অনেক সহজ হবে। আলো ধরার যে কেউই থাকবে না।

কেন? শত্রুঘ্নদাকে সঙ্গে রাখ তুই। আমি একাই ফিরে যাচ্ছি ধলাহান্ডিতে।

না। ও তো আর আমাদের সঙ্গে শিকারে গিয়ে অভ্যস্ত নয়। পারফেক্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছাড়া সঙ্গী না নেওয়াই ভাল। যাকগে। আজ তুই যে বেঁচে ফিরেছিস এ তোর অনেকই ভাগ্য।

ভটকাই বলল, রাখে কেষ্ট মারে কে?

ঋজুদার কাছে খুব বকা খাবি। যা না তুই।

যো হোগা সো হোগা। চললাম তাহলে আমি। গুড লাক। তবে মাটিতে বসিস না। মিস্টার বিশ্বলেরই মতো তোর মাথাটাও তাহলে বাঘে কইমাছের মাথা শিয়ালে যেমন করে চিবিয়ে দিয়ে ফেলে যায় তেমন করে চিবিয়ে দিয়ে যাবে। যে গাছে শত্রুঘ্নদাদা উঠেছিল সেই কদমগাছটাতেই উঠিস।

বললাম, না সে গাছ থেকে, বাঘ পাথরের এদিকে এসে গেলে আর দেখা যাবে না—যে কারণে শত্রুঘ্নদাদাও দেখতে পায়নি বাঘকে। ওদিকের কোনও গাছে বসব। তোরা কিন্তু জোরে জোরে কথা বলতে বলতে যাবি।

ঠিক আছে। বলে, ভটকাইও এগোল শত্রুঘ্নকে নিয়ে আর আমিও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে গিয়ে অন্য পাশে একটা ঝাঁকড়া পছন্দসই তেঁতুলগাছ পেয়ে গিয়ে তাতেই উঠব ঠিক করলাম। জুতো জোড়া খুলে দুটো পাটিরই ফিতেতে গিঁট দিয়ে গলাতে ঝুলিয়ে নিলাম। মাখন জিনস-এর উরুর কাছের প্রকাণ্ড পকেটে পাঁচ ব্যাটারির টর্চটিকে ঢুকিয়ে অন্য পকেটে গুলিগুলো পুরে বন্দুকটা হাতে নিয়ে, গলাতে জলের বোতলও ঝুলিয়ে তেঁতুলগাছে উঠতে লাগলাম। ওই সময় বাঘ আমাকে দেখতে পেলে নির্ঘাৎ কোনও 'টাগ' ভেবে এমনিতেই ভয়ে অক্কা পেয়ে যেত। গুলি আর তাকে করতে হত না। কোনও ফোটোগ্রাফারও একটি ফোটো তুলে রাখলে তা নিয়ে পরে অনেক অবকাশের

মুহূর্তে হাসতে হাসতে প্রাণ যেত। বারো ফিট মতো উঠে দু' ডালের একটা মনোমতো সংযোগস্থল পেয়ে গিয়ে আরামে বসলাম সেখানে। পিছনে হেলানও দেওয়া যাবে মোটা কাণ্ডতে। বসাটা ঠিকমতো হতে জলের বোতল থেকে যতখানি কম শব্দ করে একটু জল খেলাম। তারপর একটি ছোট ডালে জুতো ও জলের বোতলকে ঝুলিয়ে দিলাম। গাছের উপরে টর্চ রাখার কোনও জায়গা নেই তাই সেটা উরুর পকেটেই রইল। বাঁ উরুর পকেটে। বন্দুকের কুঁদোর সঙ্গে টর্চের ধাক্কা লেগে শব্দ হওয়ার কোনও আশঙ্কা যে নেই তা জেনে আশ্বস্ত হওয়া গেল। এখন বাঘ এসে আমাকে ধন্য করে কি করে না তাই দেখার।

গাছে ওঠার পরও ভটকাই আর শত্রুঘ্নর গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। মিনিট পাঁচেক পর একটা ময়ূর খুব জোরে ডেকে উঠল আমার ডানদিক থেকে আর একটা হুপি পাখি অতর্কিতে এবং প্রচণ্ড জোরে ডেকে উড়ে গেল পাহাড়তলির দিকে। তার দু' দিকের ডানা এত জোরে আন্দোলিত হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল একটি খয়েরি-সাদা গোলাকৃতি পাখাই বুঝি চলছে তার পিঠের উপর। এই পাখির ডাক শুনলে মাথার মধ্যে চক্কর দিতে থাকে। তারও পরে একটি ইয়ালো-ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ টিটিরটি টিটিরটি করে জঙ্গলের বাইরের ফাঁকা জায়গার উপরে উড়ে উড়ে ডাকতে লাগল। ওই ডাক শুনেই ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। বাঘ ভটকাইদের পিছনে যায়নি তো? এই বাঘকে কোনওই বিশ্বাস নেই। মেয়েটির মড়ি ফেলে রেখে সে নতুন শিকার করে, শত্রুঘ্ন অথবা ভটকাইকে দিয়ে রাতের ডিনার সারবার মতলব করেছে হয়তো। দেখতে পেলাম, ভটকাই চলেছে আগে আগে রাইফেল কাঁধে নিয়ে। তার মাথায় টুপি। ল্যাপউইঙ্গের ডাক ওরাও শুনেছে। শুনেই ওরা দু'জনে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছনদিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল। ভটকাই কাঁধ থেকে নামিয়ে রাইফেলটাকে রেডি-পজিশনে ধরল দেখলাম। ওরা যেহেতু পাহাড়তলিতে প্রায় পৌঁছে গেছিল এবং সেখানে একটা আবাদহীন চষা-খেত ছিল তাই ওদের পাহাড়ের জঙ্গলের ফাঁকফোঁকর দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। ওরা দু' তিন মিনিট ভাল করে ওদের পিছনে বাঘের কোনও চিহ্ন যে নেই তা দেখে নিয়ে আবার এগোল। এমনও হতে পারে যে পাখিটা ওদের দেখেই ডাকছিল। জঙ্গলে কোনও কিছুকে চলাফেরা করতে দেখলেই ডাকে ওরা।

ওরা দু'জনে ঝাঁটিজঙ্গল ভরা একটা এলাকা পেরিয়ে পত্রহীন শালবনের মধ্যে ঢুকে যেতেই জঙ্গল স্তব্ধ হয়ে গেল। আমার পিছনে একটি কালো পাথরের গুহা ছিল। সেখানে একজোড়া নীল রক-পিজিয়ন বকবকম করে ডাকছিল। শীতকালে গ্রিন পিজিয়নেরা, যাদের হিন্দিতে বলে হরিয়াল, বট-অশ্বত্থের ফল খেয়ে বেড়ায় রোদ ঝিলমিল পাতাদের মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে—কোনটা পাখি আর কোনটা পাতা তা বোঝাই যায় না তখন। আর এই নীলরঙা রক-পিজিয়নরাও শীতের দিনে পাহাড়ের উপরের পাথরে জায়গাতে রোদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে খাবার খুঁটে খায়।

পাথরে তো ওদের খাবার থাকার কথা নয়। হয়তো মুখে করে নিয়ে আসে কোনও গাছ-টাছ থেকে। গরমটা এদেরও অসহ্য হয়েছে বোধহয়।

এখন চারদিক স্তব্ধ। একটা হাওয়া বইছে রৌদ্রদগ্ধ বনের মধ্যে অস্পষ্ট ফিসফিসানি তুলে। এখন সকাল সাড়ে দশটা। নিজে চুপ করে গাছের উপরে বসে থাকায় সমস্ত জঙ্গল যেন বাস্তুয় হল। ছোট বড় পাখি ডাকতে লাগল। একটা দাঁড়াশ সাপ তার চিত্রবিচিত্র শরীর নিয়ে খুব ধীরে ধীরে শুকনো পাতার মধ্যে মধ্যে সরসর আওয়াজ করে ডানদিক থেকে বাঁদিকে যাচ্ছিল। তার সামনে সামনে জংলি ইঁদুরেরা এদিক ওদিক শুকনো পাতার মধ্যে ছিটকে উঠছিল। কোথা থেকে খবর পেয়ে একদল নীল মাছি, যারা জঙ্গলে মরা-জানোয়ারের মড়ির উপরে বসে রক্ত খায় তারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে মেয়েটির শরীরের উপর বসছিল আর উড়ছিল। এক ইঞ্জিন বন্যাঞ্জা বা টাইগার-মথ প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দের মতো সেই নীল মাছিদের সম্মিলিত ডানার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সেই শব্দ জঙ্গলের মধ্যের নানা শব্দর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো একটানা হয়েই যাচ্ছিল। মাছিরা শবদেহ ঢেকে দিল। ভালই হল। নইলে আমার ভারী সংকোচ হচ্ছিল সেই উলঙ্গ মেয়েটির দিকে তাকাতে। তার পা দু'টি ছিল আমারই দিকে। দু'টি নয় একটি পা বলাই ভাল। কারণ ডান পা-টি তো প্রায় খেয়ে শেষ করে দিয়েছে বাঘে। যেখানে বুক ছিল সেখানে দু'টি সমান ঘা-এর মতো দগদগে ক্ষত। রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে। মাছিরা তার নীল অঙ্গবস্ত্র হয়ে তাকে লজ্জা থেকে বাঁচাল যেন।

বন জানে না যে আমি আছি সেখানে, তাই না জেনে তার সব পশুপাখি সরীসৃপ পোকামাকড় নিয়ে সে জেগে উঠেছে। শব্দর অর্কেস্ট্রা বাজছে নিচু গ্রামে। তার সঙ্গে গন্ধ উড়ছে নানারকম। আমাদের দেশের বনে বনে দিনে-রাতে শব্দ-গন্ধ এবং দৃশ্যর কোনও বিরাম নেই। একঘেয়েমিও নেই কোনও। প্রত্যেক ঋতুতে এর প্রকৃতি আলাদা আলাদা। এখন জঙ্গলে বারুদের গন্ধ। রোদে ও বৃষ্টিহীনতায় বন বারুদের মতো হয়ে রয়েছে। কেউ দেশলাই কাঠি একটি জ্বেলে দিলেই হল। দাউ দাউ করে চিতার মতো জ্বলতে থাকবে বন।

॥ ৪ ॥

ভটকাই যখন রাজয়াড়ুকে নিয়ে কশিপুরে পৌঁছোল তখন রীতিমতো লু বইতে শুরু করেছে। চৌকিদার পবন বলল যে ঋজুদার জ্বর এসেছে আবার ভালমতো। ব্রেকফাস্টে যা খেয়েছিলেন, তারপর খাননি কিছুই।

ভটকাই ঘরে গিয়ে দেখল ঋজুদা পাশ ফিরে শুয়ে আছে। ভটকাই-এর ঢোকার শব্দ পেয়েই বলল, কীরে, বাঘ মেরে এলি?

ভটকাই সব বলল ঋজুদাকে।

ঋজুদা বলল, ভালই করেছিস। আমার যাওয়ার মতো অবস্থা নেই, এদিকে

তোকে বা রুদ্রকে বাঘে খেলে কলকাতাতে কী করে মুখ দেখাব। যাই হোক, তোরা বড় হয়েছিস, ধীরে ধীরে অনেক কিছু শিখেছিস, রুদ্র তো আমাকেও অনেক ব্যাপারে শেখাতে পারে তাই তোদের উপরে আমার পূর্ণ আস্থা আছে। এই বাঘ না মারা গেলে আমাদেরই যে বেইজ্জৎ তাই নয় বিয়ান্দকার সাহেব এবং তাঁর অনেক উপরওয়ালাও বিপদে পড়বেন। আজ এই ঝুঁকি তোদের না নিলেই নয়। তবে রুদ্র যেমন বলেছে ঠিক তেমনই করবি। শিকারে, সে বাঘ শিকারই হোক কি পাখি শিকার, যুদ্ধেরই মতো একজনকে নেতা মানতে হয়, নইলে অঘটন ঘটে। এখন খেয়ে-দেয়ে রুদ্রর জন্যও কিছু খাবার নিয়ে যা। তোর লুচি বেগুনভাজা আর পোড়-পিঠাই খেয়ে যা এবং তোর সঙ্গী ও রাজয়াডুকেও খাওয়া। তারপর রুদ্রর জন্য টিফিন ক্যারিয়ারে করে নিয়ে যা। জলও নিয়ে যা একটা জেরিক্যানে করে। ফার্স্ট-এইড বক্সটাও নিয়ে যা, জিপ যখন ফাঁকাই যাচ্ছে। এই রাইফেলটা রেখে বার্টি-ও-সিক্স ম্যানকিলার শুনারটা নিয়ে যা। দূরে মারতে হলে সুবিধে হবে। রাইফেলটাও ডেড-অ্যাকুরেট। তা ছাড়া এর ব্যারেলের উপরে একটা পেনসিল-টর্চ ফিট করা আছে। অন্ধকারেও মারা যায়। নে, এবারে খেয়ে-দেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়, দেরি করিস না, রুদ্রর কখন কী দরকার হয় তোকে।

॥ ৫ ॥

ঋজুদার কথামতো ভটকাই খেয়ে দেয়ে রাইফেল বদলে যখন কশিপুর থেকে বেরোল তখন দুপুর পৌনে তিনটে। এর চেয়ে তাড়াতাড়ি করতে পারল না ও। পায়েস দিয়ে লুচি ওর বড় প্রিয় জিনিস। একটু বেশি খাওয়া হয়ে যাওয়াতে রুদ্রর জন্য আবার লুচি ভাজতে হল। রাজয়াডু আর শত্রুঘ্ন কবজি ডুবিয়ে পাঁঠার মাংসর ঝোল আর ভাত খেল। পাঁঠার মাংস দিয়েও লুচি খেতে বড় ভালবাসে ভটকাই তাই আরও ক-খানা লুচি বেশি খাওয়া হয়ে গেল। রুদ্রর জন্যই দু'তিনপিস আলু আর একটু ঝোল সমেত মাংস নিয়ে নিল আর শত্রুঘ্নকে বলল, ঝোল যদি একটুও চলকে পড়ে তবে তোমার মাথা থেকে আমিও ঘিলু চলকে দেব। ধলাহান্ডির বাঘ দেখেছ তোমরা, ভটকাইচন্দ্রকে তো দেখোনি।

কন চন্দ্র হেলা সেটা বাবু? তাংকু নাম তো কেব্বে শুনি নাস্তি।

ভটকাই বলল, কেমিতি শুনিবু দাদা? সে চন্দ্র কি আউ রোজ রোজ দিশিবা? সে যেব্বে উঠিছি ধরণী কম্পমান হউচি।

তাংকু নামটা কন কহিলে বাবু? আউ গুট্টেবার কহন্তু আইজ্ঞা।

ভটকাইচন্দ্র।

ভটকাই বলল।

মাত্র ছ-মাইল পথ কিন্তু রোদের যা তেজ আর গরম লু-এর যা হলকা তাতে মনে হল চোখের মণি দু'টো গলে গিয়ে জিপের মধ্যেই পড়ে থাকবে। তবে ভাগ্য

ভাল যে সব পথই এক সময়ে শেষ হয়। সুখের পথ কি দুঃখের পথ।

ধলাহান্ডি গ্রামে যখন পৌঁছোল ওরা তখন জানল যে না, কোনও গুলির শব্দ হয়নি।

এই বিসংবাদ শুনে ভটকাইচন্দ্রর ব্লাডপ্রেশার ধীরে ধীরে চড়তে লাগল। এখন বাজে তিনটে। তার অসহায় প্রতীক্ষার এই শুরু।

॥ ৬ ॥

গরম হাওয়াটা এই পাহাড়ের আনাচ-কানাচকেও পাঁপড়ভাজার মতো সেঁকে দিয়ে যাচ্ছে। দুপুরে পাখিদেরও শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। মুখ হাঁ করে চোখের মণি ড্যাবা ড্যাবা করে তারা চাতক পাখির মতো বৃষ্টির কামনাতে ছিল। ধলাহান্ডি গ্রামে বিকেলে বোধহয় কোনও নাচগান হবে। মাঝে মাঝেই মাদলে বা ধামসাতে চাঁটি পড়ছিল। মনে হয় ওরা এই মানুষখেকো বাঘ তাড়াবার এবং বৃষ্টি আনবার জন্য নাচবে সন্ধে নামার আগে। সন্ধে নেমে গেলে তো এখানে অলিখিত কারফিউ। সকলেই যে যার ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বে। এই গরমে বন্ধ ঘরে প্রাণ যায় যাবে কিন্তু বাঘের দাঁতে নখে তা যাওয়ার চেয়ে সেই মৃত্যু অনেক ভাল। খরার সময়ে যে এইরকম নাচগান হয় দেখেছি আমি ওড়িশার অন্যত্র।

এতক্ষণ খিদেটা বোধ করিনি। এখন হঠাৎ সেটা চনমনিয়ে উঠল। খিদে তো ছিলই। সকালে সেই দু'টি ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কিট আর চা খেয়েছিলাম দু' কাপ তারপরে দু' বার চার ঢোক জল ছাড়া পেটে আর কিছু পড়েনি। আর আধঘণ্টাটাক পরেই হাওয়াতে এই জ্বালাটা আর থাকবে না তবে উষ্ণতা থাকবে রাত দেড়টা দু'টো অবধি। তারপর থেকে হাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা হবে।

ভাবলাম, বাঘ তো এতক্ষণেও এল না, যদি দিনমানেও না আসে তবে তো মুশকিল হবে। সারাদিন এই গরমের আর অপেক্ষার ক্লান্তিতে ক্লান্ত হয়ে রাতে যদি খিদে ও ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি! তাহলে আজ সকালে রাম আর শত্রুঘ্নর বর্ণনার সেই বাঁদরের মতো অবস্থা হবে না তো! গাছ থেকে নীচে পড়লেই চিত্তির। সে বাঁদর রক্ষা পেয়েছিল বলেই যে তার এই অধস্তন পুরুষ রক্ষা পাবে তার কী গ্যারান্টি আছে?

বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন আবার সরব হল। পাখিদের কলকাকলি, কোটরা হরিণের ব্বাক ব্বাক ডাক আর ময়ূরের কেঁয়া কেঁয়া রবে মধ্য দুপুরের থমথমে নিস্তব্ধতা কেটে গিয়ে বন আবার স্বাভাবিক হল। কোটরা হরিণের আর ময়ূরের এই ডাক ভীতির ডাক নয়। ভয় পেয়ে বা বাঘ দেখে যখন ডাকে তারা তখন তাদের গলার স্বরে এক বিপন্নতা ফুটে ওঠে। সেই ডাক শুনতে পেলে খুশি হতাম আমি।

দেখতে দেখতে দ্রুত আলো কমে আসতে লাগল। এত কমল কী করে কে জানে! আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে যে পড়েছিলাম তাতে কোনওই

সন্দেহ নেই, নইলে ঝপ করে সন্ধে হয়ে যেত না।

আমার মন খুঁতখুঁত করছিল। নানা কারণে। প্রথমত ঋজুদা সঙ্গে নেই। দ্বিতীয়ত সারারাত জেগে বসে থাকার মতো অবস্থা আমার নেই। আমি অতিমানব নই—ঋজুদা বা জিম করবেট নই। তৃতীয়ত সারাদিন অভুক্ত আছি। চতুর্থত এই বাঘ, যা শুনেছি, আজ অবধি মড়িতে দ্বিতীয়বার আসেনি। সকালের যে সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেছি আমরা তা হয়তো আর পাব না।

আমার মন বলছে আলো থাকতে থাকতে গাছ থেকে নেমে গ্রামে চলে যাই। তারপর কশিপুরে ফিরে ঠাণ্ডা জলে চান করে উঠে ভাল করে খেয়ে ঘুম লাগাই। আমার স্নায়ু ও শরীরের যা অবস্থা তাতে সারারাত এখানে একা থাকতে হলে বিপদ হয়ে যাবে আমার। ঋজুদা না থাকলেও রামচন্দ্র দণ্ডসেনা থাকলেও হত। অথচ আশ্চর্য। এর আগে তো আমি কম বনে মানুষখেকো বাঘের মোকাবিলা করিনি! আসল কথাটা হচ্ছে সঙ্গে অথবা হাতের কাছেই ঋজুদা ছিল। সেই ভরসাটা আজ নেই বলেই মন দুর্বল লাগছে। বুঝতে পাচ্ছি যে আমার ভয় ভয়ও করছে একটু।

ওরা বাঘডুম্বার কথা বলছিল। কালাহান্ডির জঙ্গলে যে সব মানুষ মানুষখেকো বাঘের হাতে মরে তারা মরার পরে এক রকমের ভূত হয়ে যায়। তাদের বলে বাঘডুম্বা। রাতে পাখির রূপ ধরে তারা রাতের বেলা গাছের মগডাল থেকে আচমকা ডেকে ওঠে কিরি-কিরি-কিরি-ধ্বুপ-ধ্বুপ-ধ্বুপ-ধ্বুপ। আর সেই ডাক শুনেই কত মানুষে নাকি অক্কা পায়! আসলে নির্জন বনে জঙ্গলে পাহাড়ে নদীতে সমুদ্রে কত কী ঘটে, কত কী সত্যি বলে মনে হয় যা শহরের আলো ঝলমল পরিবেশে বসে কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। ভূতে আমিও বিশ্বাস করি না কিন্তু এই রাজয়াডু, রাম, শত্রুঘ্ন, দণ্ডসেনা এরা করে। কী করব ঠিক করতে পারছিলাম না। এখনও আলো আছে। নির্মেঘ পশ্চিমাকাশে আলো এখনও থাকবে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট। এখনও মাচা থেকে নেমে ধলাহান্ডি গ্রামে চলে যাবার সময় আছে নিরাপদে। কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেলে কৃষ্ণপক্ষের রাতে একা এক হাতে টর্চ আর অন্য হাতে বন্দুক ধরে পাহাড় থেকে নেমে অতখানি পাথরে ভরা জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়তলি দিয়ে ধলাহান্ডিতে হেঁটে যাওয়া এই নৃশংস বাঘের জমিদারিতে আত্মহত্যার শামিল হবে।

কী করব তা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ দেখলাম অন্ধকার হয়ে গেছে। স্নিগ্ধ সবুজ সন্ধ্যাতারাটা উজ্জ্বল পশ্চিমাকাশে নিঃশব্দে ফুটে উঠেছে। তারা ঠিকই ফুটেছে কিন্তু আমারই নিভু নিভু অবস্থা। সেই বনাঞ্জা বা টাইগার-মথ মোনো-ইঞ্জিন প্লেনের ইঞ্জিনের মতো বুঁউউউ-বুঁইইই শব্দ করা নীল মাছিগুলো কখন যে অদৃশ্য হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি।

প্রকৃতির মধ্যে কত রহস্যই যে থাকে। কত ফুল ফোটে প্রচণ্ড খরার পরে, রাতভর বৃষ্টির পরে রাতারাতি শুকনো গাছে গাছে লক্ষ লক্ষ গুঁড়ি গুঁড়ি সবুজ

কিশলয় আসে! শীত পড়লে সাপ ব্যাং নানা পোকামাকড় কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় আবার বসন্ত শেষে সব ফিরে আসে একা একা। বর্ষাতে লক্ষ লক্ষ নীল জোনাকি জ্বলে আর নেভে, নেভে আর জ্বলে, দেওয়ালির সময়ে ছোট ছোট সবুজ শামাপোকা, তারপর সব মরে যায় পরের বছর তাদের পরের প্রজন্ম আবার ফিরে আসবে বলে।

ধ্রুবতারাটার দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই গানটার কথা মনে পড়ে গেল। ছোটমাসিমা গানটা বড় ভাল গাইতেন। তিনি এখন নিজেই ধ্রুবতারাদের দেশে চলে গেছেন। 'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা/মনরে মোর পাথারে হোসনে দিশাহারা ॥ বিষাদে হয়ে ম্রিয়মাণ বন্ধ না করিয়ো গান, সফল করি তোলো প্রাণ টুটিয়া মোহকারা ॥'

এখন 'ঘোরান্ধকার' যাকে বলে তাই। নিজের হাত নিজে দেখতে পাচ্ছি না। তেঁতুলগাছে বসে আরেক ভুল করেছি। ঝাঁকড়া গাছ বলে তার ছায়াও ঝাঁকড়া। তারাদের যে সামান্য আলো তার ছিটেফোঁটাও পৌঁছোচ্ছে না এখানে এসে। তবে সাদা পাথরগুলোই একমাত্র ভরসা। অন্ধকারে তাদের আভাস ফুটে আছে। মেয়েটি সেই পাথরগুলোর নীচে ঠিক কোথায় আছে তার একটা আন্দাজ করা আছে আমার। পাথরের চারদিকেই এত ঝরা পাতা এবং সমস্ত বনতল এমনই মুচমুচে হয়ে আছে যে বাঘের পক্ষে নিঃশব্দে আসা বড় সহজ হবে না যদিও বাঘ মাত্রই অসাধ্য সাধন করতে পারে।

গাছে ওঠার পর থেকেই শটগানের দু' ব্যারেলেই এল. জি. ভরে নিয়েছিলাম। বন্দুকটাকে ডান উরুর উপরে শুইয়ে রেখেছি প্রয়োজনে বাঁ হাতে ব্যারেলের নীচের লক ধরে ডানহাতে স্মল অফ দ্য বাট ধরে বন্দুক তুলে স্কিট-শুটিং-এর মতো বন্দুকের মাছি দেখে নিশানা না নিয়েও গুলি করতে কয়েকমুহূর্ত লাগবে মাত্র। টর্চও লাগবে না। তবে গুলি করার পরক্ষণেই টর্চ জ্বালাতে হবে গুলির ফলাফল কী হল তা দেখার জন্য।

অন্ধকার এখন গভীর। ভাল বাংলায় যাকে বলে ঘোরা রজনি তাই। এমনই অন্ধকার যে নিজের হাত পাও দেখা যাচ্ছে না। এই অন্ধকার বন পাহাড়ের কিন্তু দারুণ এক ব্যক্তিত্ব আছে। পুরুষের ব্যক্তিত্বের মতো। চাঁদনি রাত হচ্ছে নারী আর অন্ধকার রাত পুরুষ।

আমার পিছনে অনেক দূরে এবং পাহাড়ের বেশ উঁচুতে শম্বর ডাকল ঢাংক ঢাংক করে। বাঘ কি আসছে? কে জানে। আমার পিছনে ঘন জঙ্গল। সেখানে দেখার কিছু নেই। শুধুই শোনার। আমিও এখন পুরোপুরি আমার শ্রবণের উপরেই নির্ভর করে আছি।

ডান পাশ থেকে দুরগুম দুরগুম করে বুকের মধ্যে চমকে দিয়ে একটা কালো পেঁচা ডেকে উঠল। বনতলের পাতার উপরে সড়সড় শিরশির করে শব্দ হল। হয়তো কোনও সাপ দৌড়ে যাচ্ছে বা ইঁদুর অথবা একাধিক ইঁদুর। সাপ হয়তো

ইঁদুর ধরার চক্করে আছে আর প্যাঁচা খুঁজছে সাপ ধরার সুযোগ। প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যেক প্রাণীই হয় খাদ্য নয় খাদক।

আমার ঘড়িটাতে রেডিয়াম নেই। আগামী জন্মদিনে ঋজুদা আমাকে টাইটান-এর একটা ইন্ডিগ্লো ঘড়ি দেবে বলেছে। বোতাম টিপলেই ঘড়ির ডায়ালে হালকা আলো জ্বলে ওঠে। বনেজঙ্গলে অমন ঘড়ি খুব কাজে লাগে, শহরেও কাজে লাগে রাতের বেলা অথবা সন্ধের পরে কোনও হলে অনুষ্ঠান শুনতে গিয়ে।

কতক্ষণ কেটে গেছে বুঝতে পারছি না। এখন আর খিদের বোধটা একেবারেই নেই। পিত্তি পড়ে গেছে। এমন সময়ে হঠাৎ কোনও জানোয়ারের পাহাড় থেকে নেমে আসার আওয়াজ শুনলাম। বেশ শব্দ করেই আসছিল সে রাখ-ঢাক না করে। একটু পরেই শব্দটা এসে সেই সাদা পাথরটার সামনে থেমে গেল এবং থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোঁৎ-ঘোঁৎ একটা বিতিকিচ্ছিরি আওয়াজ করে এক লাফ মেরে জানোয়ারটা খুব ভয় পেয়ে জোরে দৌড়ে শুকনো মাটিতে খটাখট করে ক্ষুরের আওয়াজ তুলে নীচের দিকে চলে গেল। ধলাহান্ডি গ্রামের দিকে গেল কিনা কে জানে। একটা মস্ত শুয়োর। নিশ্চয়ই বড় ও বাঁকানো দাঁত আছে তার। মূল খুঁড়ে খাবে সে। গ্রামের দিকে কেন গেল কে জানে। এখন তো কোনও ফসল নেই কোথাওই!

শুয়োরটা চলে যাবার পরই পাহাড়তিলতে তীব্র এক আলোর ঝলক দেখলাম। আকাশে তো মেঘ নেই। বিদ্যুৎ চমকাবার কোনও ব্যাপারই নেই। আলোটা কীসের? বৈদ্যুতিক আলোরই মতো তীব্র। বাদাতে যেমন আলেয়ার আলো দেখা যায় বিশেষ করে বর্ষাকালে এ তেমন আলো নয়। তারপর ভটকাই-এর গলা শুনলাম। ও কারও সঙ্গে কথা বলতে বলতে পাহাড়ে উঠে আসছে। ওর সঙ্গী একজন নয়, তিন-চারজন। ভটকাই-এর গলা ছাড়াও আরেকটা চেনা গলা কানে এল। এ যেন দণ্ডসেনার গলা বলে মনে হচ্ছে। সে কি ফিরে এসেছে ভবানী-পাটনা থেকে? কখন এল? আরেকটি গলাও চেনা চেনা লাগল। তারপরে আরও একজনের গলা। সম্ভবত রাম ও শত্রুঘ্নর গলা। কী ব্যাপার কে জানে! এরা হঠাৎ শোভাযাত্রা করে আমার মানুষখেকো বাঘ মারার সব সম্ভাবনাকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র কেন করল ঈশ্বরই জানেন।

এমন সময়ে ভটকাই গলা তুলে বলল, যেখানে আছিস সেখানেই থাক রুদ্র। আমরা পৌঁছোলে তারপর।

এদের হই হট্টগোলেই তো বাঘ যদিবা তল্লাটে থেকেও থাকে তবে সে ভেগে পড়বে মনে হল। তারপরই মনে হল এই বাঘও তো সুন্দরবনের বাঘেদেরই মতো। মানুষের গলার স্বরে আকৃষ্ট হয়ে এরা এগিয়েই আসে, পালিয়ে যায় না।

ওরা যখন হল্লাগুল্লা করে পাহাড়ে উঠেই আসছে তখন আমার আর লুকিয়ে

থাকার মানে হয় না। আমি টর্চটা বের করে জ্বেলে আলোটা বৃত্তাকারে ঘোরালাম। কিন্তু সাবধানতার মার নেই ভেবে গাছ থেকে তখনও নামলাম না। আমার আলো ফেলাতে ওদের আমার দিকে আসতে সুবিধে হল। দেখতে দেখতে ওরা এসে পড়ল সাদা পাথরগুলোর ওপাশে এবং তারপরই এ পাশে এসে গেল। ভটকাই-এর টর্চের আলো পড়ল মেয়েটির গায়ে, মুখে। আমি পরিষ্কার দেখলাম মেয়েটির মুখের সেই আতঙ্কর ভাবটি নেই, সে যেন হাসছে। জানি না, আমার দেখার ভুলও হতে পারে। দন্ডসেনা ভটকাইকে বলল আলোটা ঘুরিয়ে চারদিকে ভাল করে দেখে নিতে। ভটকাই আলো ফেলতে ফেলতে আমি দন্ডসেনাকে বন্দুকটা ধরতে বলে, কিছুটা নেমে এসে বন্দুকটার কুঁদোটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। দন্ডসেনার নিজের বন্দুক ছিল ডানহাতে ধরা, সে বাঁ হাত দিয়ে আমার বন্দুকটা ধরল। আমি গাছ থেকে নেমে এলাম।

দন্ডসেনা বলল, আপনি মিছিমিছি কষ্ট করলেন। এই বাঘ এ পর্যন্ত কখনও দু' বার ফিরে আসেনি মড়িতে। সকালে আপনারা যে সুযোগ পেয়েছিলেন তা ছিল সুবর্ণ সুযোগ। তা হারাবার পর আবার কবে দ্বিতীয় সুযোগ পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই। এই বাঘকে মাচায় বসে মারা যাবে বলে মনে হয় না। চলুন কাল থেকে আমরা জিপ নিয়ে গ্রাম ও জঙ্গলের পথে পথে সারারাত ঘুরে বেড়াই। বাঘের সঙ্গে দেখা হলেও হয়ে যেতে পারে। সে দূরে থাকলেও, তার চোখ আগুনের ভাটার মতো লাল হয়ে জ্বলবে জিপের হেডলাইট বা স্পটলাইটে এবং যত দূরেই থাকুক আপনাদের কাছে রকমারি রাইফেল আছে তা দিয়ে দূর থেকেও তাকে ধরাশায়ী করতে অসুবিধে হবে না।

তুমি কখন এলে?

আমি বললাম।

এই তো। সন্ধের অনেক আগেই। বাসও তো চলে না আজকাল সন্ধের পরে। কশিপুরে নেমেই তো বাংলোতে গেলাম। গিয়ে সব শুনলাম।

ঋজুদা কেমন আছে?

তাঁর ভারী জ্বর। সে জন্যও আপনাদের তাঁর কাছে থাকা দরকার। চৌকিদার আর ননা কি সেবা করতে পারে? জ্বরে গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। তাই ঋজুবাবুকে বলে আমার বন্দুকটা কাঁধে ফেলে চৌকিদারের সাইকেলটা নিয়ে পাঁই পাঁই করে চালিয়ে ধলাহান্ডি গ্রামে চলে এলাম। বাঘ যে আসবে না সে সম্বন্ধে আমি একশোভাগ নিশ্চিত। তাই ভটকেবাবুকে আর এদেরও নিয়ে চলে এলাম। ভটকেবাবুর রাইফেল এবং আমার বন্দুক এবং এত ভাল পাঁচ ব্যাটারির টর্চ থাকতে আর চিন্তা কী ছিল!

একটু থেমে বলল, যারে রাম। লুগা তো আনিলু। দাহ করিবা পাঁই তম ওয়াইফের দেহটাক্ নেইকি আসস। যারে শত্রুঘ্ন, চঞ্চল করিবা হেব্ব।

দন্ডসেনা চৌকিদারের সাইকেল নিয়ে এসেছিল। কশিপুর থেকে ধলাহান্ডি।

সেই সাইকেলটাকে জিপের পিছনে তুলে নিয়ে আমি আর ভটকাই সামনে বসলাম রাজয়াড়ুর পাশে আর দন্ডসেনা স্পটলাইটটা বনেটে তুলে ব্যাটারির সঙ্গে ক্ল্যাম্প দিয়ে লাগিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে স্পটলাইটটা ফেলতে ফেলতে যাবে বলল। ভটকাইকে বললাম, আমিও পিছনে দাঁড়াই রড ধরে। সেই সকাল থেকে বসে বসে কোমরে ব্যথা হয়ে গেছে। তুই আরাম করে বোস সামনে।

ভটকাই বলল, তা তো হল। কিন্তু ঋজুদা জানলে খুব রাগ করবে। তুই তো আমার থেকেও ভাল জানিস। জিপ থেকে স্পটলাইট ফেলে শিকার-করা শিকারিরাই আজ সারা ভারতবর্ষের বন-পাহাড়কে বন্যপ্রাণীশূন্য করে দিয়েছে।

আমি বললাম, আমরা তো কখনওই এমন করে করিনি শিকার। দু'-তিনদিন অন্তর অন্তর মানুষ ধরছে, দেখলি না, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি—এই বাঘকে এমনভাবে মারাটা দোষের বলবে মনে হয় না ঋজুদা। তা ছাড়া আমাদের দিনও তো ফুরিয়ে এল। এরই মধ্যে আমাদের এই বাঘকে মারতে হবে, বাই হুক অর বাই ক্রুক। এখানে কোনও চয়েজের ব্যাপার নেই।

তা ঠিক। ভটকাই বলল, নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার।

খুবই আস্তে জিপ চালাচ্ছিল রাজয়াড়ু। যাতে দন্ডসেনার আলোতে দু' পথের দু' পাশ ভাল করে দেখা যায়। আলোটা একবার ডাইনে আরেকবার বাঁয়ে পড়ছে আর তারই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মুণ্ডুও ঘুরছে ডাইনে বাঁয়ে। ছ মাইল তো পথ। সেই পথ পেরোতেই আমাদের আধঘণ্টা লাগল। এক ঝাঁক চিতল হরিণ, একটা মস্ত ভাল্লুক, একটা শিয়াল এবং একটা ধাড়ি খরগোশ পড়ল পথে। খরগোশটাই প্রথমে পড়েছিল। রাজয়াড়ু বিড়বিড় করে বলেছিল—সে বাঘ আউ দিশিবি নাই রাম্ব ভাই, ঈ খরাটা ভেটিলু অগ্রেরে কন হেল্লা।

আমরা যখন কশিপুর বাংলোর কাছে চলে এসেছি, বাংলোটা দেখা যাচ্ছে তখন ভটকাইচন্দ্র বলল, ঈ রে। তোর জন্য খাবার নিয়ে এসেছিলাম যে। একেবারে ভুল হয়ে গেছে।

আমি বললাম, নতুন আর কী। নিজেরটা ছাড়া আর কিছুই তো বুঝলি না কোনওদিন। ভুলে গেছিস ভাল হয়েছে। বাংলোতে ফিরে ঋজুদাকে দেখে ভাল করে চান করে তারপরে খাওয়ার কথা ভাবা যাবে।

তারপর বললাম, তুমি খেয়েছ রামভাই?

দন্ডসেনার পুরো নাম রামচন্দ্র দন্ডসেনা।

দন্ডসেনা বলল, আমি জেপুরের হোটেলে ভাল করে খেয়ে নিয়েছি, বাস যখন দাঁড়িয়েছিল। ভবানী-পাটনা থেকে নাস্তা করেই বেরিয়েছিলাম। বিয়ে বাড়ি খাইবা-পীবাকি অভাব সেটি কন? রাত্রির খাইবি।

দন্ডসেনা আমাদের সঙ্গেই আছে। তাতে রাজয়াড়ু, ননা আর চৌকিদারের বুকে একটু বলও হয়েছে। যদিও বাঘ আজ অবধি কোনও বনবাংলো বা

পি-ডব্লু-ডি বাংলো থেকে কোনও মানুষ নেয়নি। ভয় নেই কিন্তু ভরসাই বা কোথায়। প্রচণ্ড গরমের জন্য আমরা রাতে অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে থাকি যখন বাঘের পিছনে না যাই কিন্তু সবসময়েই হাতের কাছে গুলিভরা বন্দুক এবং রাইফেল থাকে, থাকে টর্চও। তবে বাঘ বাংলোতে এসে আত্মহত্যা করে আমাদের হিরো বানাবে এমন ঘটবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, চিরদিনই এইসব জংলি জায়গার বনবাংলো এবং পি-ডব্লু-ডি-র বাংলোতে শিকারিরা থেকেছেন বলেই হয়তো বাঘেদের স্পেশাল ব্রাঞ্চ-এর রিপোর্টে এইসব বাংলো 'আউট অফ বাউন্ডস' বলে চিহ্নিত আছে।

ঋজুদার ঘরে ঢুকে দেখলাম ঋজুদা ঘুমোচ্ছে। জিপের আওয়াজে এবং আমাদের কথাবার্তাতেও ঘুম যখন ভাঙেনি তখন আমরা আর ঘুম ভাঙালাম না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি আর ভটকাই বলাবলি করছিলাম যে এ পর্যন্ত কখনওই এমন হয়নি যে বাইরে কোথাও এসে ঋজুদা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যদি বাড়াবাড়ি কিছু হয় এই মানুষখেকো বাঘের দেশে তো তাকে ফেলে রাখা যাবে না। জেপুর থেকে বা রায়গড়া থেকে কোনও ডাক্তারও হয়তো আসতে চাইবেন না। না হলে বন্দুক রাইফেল দেখিয়ে পাকড়াও করেই আনতে হবে অগত্যা।

দেখা যাক কী হয়!

॥ ৭ ॥

ঋজুদা রাতে কিছুই খেতে চাইল না। ননা রান্না ভাল করে কিন্তু সুপ-টুপ বানাতে জানে না। সুপের প্যাকেট আনলে হত কলকাতা থেকে কিন্তু কে জানত যে ঋজুদা এমন কেলো করবে। পেটের কোনও গণ্ডগোল নেই। তাই আমরা যুক্তি করে ঋজুদাকে মুসুরির ডালের পাতলা খিচুড়ি খাইয়ে ক্রোসিন খাইয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়তে বললাম। কলকাতাতে জ্বর হলেও ঋজুদাকে কখনও এমন কাহিল দেখিনি। আমাদের সঙ্গে জ্বরের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলেছে, রসিকতা করেছে কিন্তু এখানে জ্বরের অন্য রূপ।

আবার ঘুমোবার আগে ঋজুদা বলল, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড় তোরা, সারাদিন ধকল গেছে। ভাল করে খা।

ভটকাই বলল, ঠিক আছে। তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাও। আর সবই ঠিকই চলবে।

ঋজুদার ঘরের লণ্ঠনের ফিতেটা কমিয়ে দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। রাতে আমি শোব ঋজুদার সঙ্গে। আসার পরে আমি আর ভটকাই দু'জনেই ঋজুদার মাথা পা টিপে দিয়েছি। ঋজুদাও ঋজুদার জেঠুমনিরই মতো জ্বর হলেই ঘোরের মধ্যে বলে, সবচেয়ে আগে চরিত্র। তারপরে পড়াশুনো।

তারপর খেলাধুলো। এই 'চরিত্র' শব্দটার উপরে খুব জোর দেয়। চরিত্র বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি এ চরিত্র তা নয়। আরও অন্য অনেককিছু যেন এই চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। আজকাল ঋজুদা প্রায়ই মির সাহেবের একটি শায়েরি বলে নিজের মনেই: 'হিঁয়া সুরত এ আদম বহত হ্যায়, আদম নেহি হ্যায়'। মানে, এখানে মানুষের চেহারার জীব অনেক আছে মানুষই নেই। রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ণ মানুষের' কথাও প্রায়ই বলে। আমাদের 'জ্ঞান' দেবার জন্য কিন্তু বলে না, নিজের সঙ্গেই নিজে যেন কথা বলে। এই পূর্ণ মনুষ্যত্বর সঙ্গে 'আদম'-এর, মানুষের চরিত্রর কোথায় যেন একটা যোগাযোগ আছে, আবছা আবছা বুঝতে পাই কিন্তু পুরোটা বুঝি না। সবই যদি বুঝতাম তবে আর আমাদের সঙ্গে ঋজুদার তফাত কী থাকত!

ঋজুদার ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বারান্দার একটি থামের একপাশে একটি লণ্ঠন রেখে দিলাম। এমনভাবে, যাতে আলো আমাদের চোখে না লাগে, চোখে লাগলে চোখ ধেঁধে যাবে, বাইরে দেখতে পারব না, তাই। আর নিজের হাতিয়ার হাতের কাছে রেখে আমাদের ঘরের সামনের ইজিচেয়ারে বসে ছিলাম আমি আর ভটকাই। রান্নাঘর থেকে ননা, রাজয়াড়ু, দন্ডসেনা আর চৌকিদারের পুটুর পুটুর কথা শোনা যাচ্ছে। ওরা গল্প করছে খেতে খেতে। রান্নাঘরের দরজাটাও ওরা ভেজিয়ে রেখেছে। সন্ধের পরে কেউই আর দরজা খোলা রাখে না এই আগুনে এই অসহ্য গরমেও। বাইরেও শোওয়ার সাহস নেই কারওই।

কশিপুর জায়গাটা ছোট। কয়েকঘর মানুষের বাস ওই গ্রামে। জানি না, এখন হয়তো পপুলেশন এক্সপ্লোশনে সে জায়গাতেও বিরাট জনবসতি গড়ে উঠেছে। যখনকার কথা বলছি তখন তাই-ই ছিল।

ভটকাই বলল, বাঘটা মারতে পারলে কেমন হত বল তো?

মেরে তো দিতামই। তুই একটা রিয়্যাল উজবুক হচ্ছিস দিনকে দিন। বাঘ শিকারে গিয়ে, তাও আবার মানুষখেকো বাঘ শিকারে গিয়ে কেউ কথা বলে! তোর গলা না শুনলে বাঘকে দেখে আমরা যতখানি হতভম্ব হয়েছিলাম সেও আমাদের দেখে ঠিক ততখানি হতভম্ব হত আর সেই কয়েক সেকেন্ড সময় পেলেই তাকে ধড়কে দিতাম।

আমি বললাম।

বাজে কথা বলিস না। মাটিতে দাঁড়িয়ে সামনে অত কাছে বাঘ দেখলে আমার পেটের মধ্যে গুড়গুড় করে, মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে একটা ঠাণ্ডা সাপ নামতে থাকে। তার উপরে মানুষখেকো বাঘ।

ভটকাই বলল, অপরাধীর মতো।

তাহলে আর মানুষখেকো বাঘ মারতে আসা কেন?

আমি তাচ্ছিল্যর সঙ্গে বললাম, এমনইভাবে, যেন আমার ভয়-টয় করে না।

যাই বলিস, বাঘটা মারতে পারলে এতক্ষণে এই বাংলোর চেহারাটা কেমন হত বল তো। হ্যাজাকের আলোতে আলো হয়ে যেত পুরো চত্বর। দুর দুর গ্রাম থেকে মেয়ে পুরুষ শিশু দলবেঁধে আসত আমাদের দেখতে। জেপুর আর ভবানী-পাটনা থেকেও অনেকে আসতেন জিপে, ট্রাকে, বাসে, ট্রেকারে করে। সারারাত গান হত। পানমৌরি আর সলপ্ব-রস খেয়ে নাচত ওরা। এবং বহুদিন পরে নির্ভয়ে আজ রাতে দরজা খুলে, বাইরে চৌপাইতে, গাছতলাতে উঠোনে শুত গ্রামবাসীরা গরমের হাত থেকে বাঁচতে। ভাবতেই আমার কীরকম রোমাঞ্চ হচ্ছে।

বাইরেটা নিকষ-কালো অন্ধকার। থম মেরে আছে প্রকৃতি। ঝড়ের আগে যেমন হয়। আকাশে তারাগুলো ঝকঝক করছিল। এমন অন্ধকার রাতে আমরা বনবাংলোর বারান্দাতে বসে তারা চিনি, চেনাই একে অন্যকে। ঋজুদাই এই তারা চেনার খেলা খেলতে শিখিয়েছে আমাদের। কালপুরুষ, কোমরে তরোয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে। আরও কত তারামণ্ডল, ক্লাসটারস, আর কী সুন্দর সুন্দর নাম তারাদের। স্বাতী, শতভিষা, অঙ্গিরা, ক্রতু, পুলহ, আরও কত নাম।

তারাগুলো কোথায় গেল বল তো?

ভটকাইকে শুধোলাম আমি।

তাই তো ভাবছি। আকাশটা এতই অন্ধকার যে মেঘ করেছে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না।

মেঘই করেছে। নইলে তারাগুলো হারাবে কী করে।

ভটকাই দাঁড়িয়ে উঠে বারান্দার কোনাতে দাঁড়িয়ে উপরে তাকিয়ে ভাল করে আকাশে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করল। করে বলল, নাঃ, মেঘই করেছে। দারুণ মেঘ। আজ বৃষ্টি হবেই।

আমি বললাম, বাঁচা যাবে। কিন্তু মেঘ জমলটা কখন। বিকেল অবধি তো একটুও মেঘ ছিল না আকাশে।

না, তা ছিল না!

ভটকাই বলল। তারপর পাকা বুড়োর মতো বলল, সবই প্রকৃতির লীলাখেলা!

রান্নাঘর থেকে একটা ধাতব শব্দ হল। কোনও হাঁড়ি বা কড়াই জোরে সিমেন্টের বাঁধানো মেঝেতে রাখলে যেমন হয়। সেই শব্দটা মিলিয়ে যাবার আগেই বাংলোর সামনের কাঁচা পথে একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল। কে যেন গান গাইতে গাইতে আসছে।

আমি আর ভটকাই অবাক হয়ে সেদিকে উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে রইলাম। গা ছমছম করে উঠল আমার। যে অঞ্চলে সূর্য ডোবার পরে প্রচণ্ড সাহসী ও শক্তিশালী পুরুষ মায় বন্দুকধারীও দরজা খুলে ঘরের বাইরে আসতে ভয় পায় সেখানে কে এই একলা নারী ঘোরান্ধকার পথে গান গাইতে গাইতে আসছে!

গানটা পথের বাঁদিক থেকে আসছে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে আখরগুলো। মেয়েটি চিকন গলাতে সুন্দর সুরে গাইছে—

'মত্বে দয়া করো প্রভু, তমে, দয়া করো মত্বে
এ নরকেরে আউ রহি হেব্বনি।
আউ কিছি চাহিবুনি মু, তম্বে দয়া করো,
টানি নেই যাও মত্বে তম পাদে।'

গানটি ধীরে ধীরে জোর হতে লাগল। সেই জমাট বাঁধা অন্ধকারে, জমাট বাঁধা নৈঃশব্দ্যকে মথিত করে তার পায়ে পায়ে আমাদের এত মানুষের সব ভয়কে তাচ্ছিল্য করে মাড়িয়ে সে এগিয়ে আসছিল অন্ধকারের দেয়াল ফুঁড়ে কোনও প্রেতিনীর মতো। পরিষ্কার উচ্চারণে সমর্পণের গান গাইতে গাইতে। 'আমাকে দয়া করো প্রভু, তুমি আমাকে দয়া করো। এই নরকে আর থাকতে পারি না। আর কিছু চাইব না আমি শুধু দয়া করে তুমি আমাকে টেনে নাও তোমার পায়ে।'

রান্নাঘরের দরজা খুলে ওরা সকলে ততক্ষণে বাইরে এসেছে। ননার হাতে লণ্ঠন, দন্ডসেনার হাতে বন্দুক, লুঙ্গি-পরা রাজয়াডুর হাতে উনুন থেকে টেনে বের করা একটা জ্বলন্ত চেলা কাঠ। তা থেকে রংমশালের মতো নানারকম আগুনের ফুলকি বেরোচ্ছে। কিন্তু ওইসব আলো রাতকে আলোকিত না করে অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে তুলেছে।

ননা আতঙ্কিত গলায় বলল, বাঘডুম্বা কী? সেটা কন?

দন্ডসেনা তাকে গাল পেড়ে বলল, তু শুট্টে বেধুয়াটা। সে ঝিও বাইয়ানিটা। আসিলা এ রাত্তিরে মরিবাকু। রাত্তিরে এত্তে পথ চালিকি কেমিতি আসিলা সে ঝিও। বাপ্পালো বাপ্পা! বাঘটা খাইলানি তাংকু? ভয় ডর বলিকী কীছি নাহি কি? সে ঝিও নাই স্ব সে সাক্ষাৎ মা ভবানী।

মানে, তুই একটা যাচ্ছেতাই। এ সেই পাগলি মেয়েটা। মরবার জন্য এসেছে রে। এই রাতে এতখানি পথ এলই বা কী করে ওই মেয়ে। বাঘে তাকে খেল না? ভয়ডর বলে কি কিছু নেই? এ মেয়ে, মেয়ে নয়, এ সাক্ষাৎ মা ভবানী!

তার গান ক্রমশই জোর হচ্ছে। এসে পৌঁছেছে সে বাংলোর গেটের কাছে। গেটের দু'-দিকে দু'টি পিলারই আছে, গেট নেই। পাঁচিলও নেই, শুধু ছেঁড়াখোঁড়া কাঁটাতারের বেড়া তাতে শিয়ারি আর মুতুরি লতা লতিয়ে ছিল, এখন গ্রীষ্মের তীব্রতায় প্রায় শুকিয়ে গেছে।

মেয়েটির গান শুনে ঋজুদাও দেখি বিছানা ছেড়ে উঠে ভেজানো দরজাটা ঠেলে বারান্দাতে এসে ইজিচেয়ারে বসল।

কেমন লাগছে ঋজুদা?

ভাল ভাল। কিন্তু ব্যাপারটা কী? দন্ডসেনাকে ডাক তো।

দন্ডসেনাকে ডাকল ভটকাই।

দন্ডসেনা বারান্দাতে এসে বলল, এ একটা পাগলি। আঠারো উনিশ বছর বয়স হবে। এর মা-বাবা কেউ নেই। পথপাশের চায়ের দোকানে একে দেখেও থাকবেন আপনারা। চায়ের দোকানে চায়ের কাপ-ডিশ ধুয়ে দেয়, উনুন ধরিয়ে দেয়, খদ্দেরকে চা-বিস্কুট-বিড়ি-দেশলাই এগিয়ে দেয় আর তার বদলে বুড়ো দোকানি তাকে দু'-বেলা খেতে দেয়, সকাল বিকেলে চা-বিস্কুটও দেয়। হলে কী হয়। সবাই কি আর বুড়োর মতো দয়ালু বাবু! যৌবন যে ভিখারিকে ক্ষমা করে না। যৌবন পরম বিপদ হয়ে আসেই। এই জায়গা ছোট হলে কী হয় বড় জায়গারই মতো এখানেও খারাপ লোক তো আছেই। বুড়ো দোকান সামলাবে না ওকে সামলাবে। তার উপর পাগলি। কখন কোথায় কার সঙ্গে চলে যায়। দু'-তিনদিন পরে ফিরে আসে বিধ্বস্ত হয়ে। ওর বড় কষ্ট ঋজুবাবু। ওকে বাঘে খেলেই ও বেঁচে যেত অথচ দেখুন একা একা হেঁটে এল বাঘ তাকে ছুঁল না। এই বাইয়ানি যমেরও অরুচি।

বাইয়ানি কী ঋজুদা?

ভটকাই জিজ্ঞেস করল।

ঋজুদা বলল, পাগলিকে ওড়িয়াতে বাইয়ানি বলে।

ও। কিন্তু এখন কী হবে?

কী করা যাবে দন্ডসেনা?

—ঋজুদা ভটকাই-এর প্রশ্নটাকেই দন্ডসেনার দিকে গড়িয়ে দিল।

তাই তো ভাবছি।

রাতটা ওকে তোমাদের সঙ্গে রেখে দাও।

পাগল বাবু আপনি! চারজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটালে ওর আরও বদনাম হবে।

যার নামই নেই তার আবার বদনাম কী? তা ছাড়া, ওকে তো আর আমরা উপস্থিত থাকতে বাঘ দিয়ে খাওয়ানো যায় না। লোকে বলবে কী? তোমরা যদি ওকে না রাখতে চাও রাতের মতো তবে ও রুদ্রবাবুদের সঙ্গেই থাকবে।

আমি আর ভটকাই চমকে উঠলাম ঋজুদার কথা শুনে। ভাষা জানি না তার উপরে পাগলি, খুব নোংরাও নিশ্চয়ই। আমি দিদির সঙ্গেই এক ঘরে শুতে পারিনি কোনওদিন, এই অজানা অচেনা মেয়ের সঙ্গে শোওয়া অসম্ভব।

ভটকাই দেখলাম আমার চেয়েও নার্ভাস। সে তুতলে বলল, তার চেয়ে সে-ই ঘরে থাকুক, আমি আর রুদ্র বারান্দায় বসে গল্প করেই রাতটা কাটিয়ে দেব।

দন্ডসেনা বলল, আধ মাইল তো পথ। ও আসুক, ওকে কিছু খাইয়ে-দাইয়ে জিপে করে ওকে নিয়ে গিয়ে মেঘনাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসছি। জিপে করে গেলে এবং রুদ্রবাবুরা সঙ্গে থাকলে ও আপত্তি করবে না। আমাদের কথা শুনবে।

মেঘনাদটা কে?

মেঘনাদ ওর জ্যাঠা।

সে কী? ওর আপন জ্যাঠা?

আইজ্ঞাঁ।

আপন জ্যাঠা থাকতে মেয়েটার এই অবস্থা! সে কী মানুষ না জানোয়ার?

মানুষ-জানোয়ার বাবু। তারা মানুষখেকো বাঘের চেয়েও অনেক খারাপ।

তারপরে দন্ডসেনা বলল, আর আপনি যদি অনুমতি করেন তবে জিপে স্পটলাইট লাগিয়ে নিয়ে ঘণ্টা দু'য়েক ধলাহান্ডি আর কশিপুরের পথে আপ-ডাউন করি আমরা। যদি বাইচান্স বাঘের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, বাঘ যখন সকালেও এ তল্লাটেই ছিল। একটা বাঘের পক্ষে তো এক রাতে পনেরো কুড়ি মাইলের চক্কর মারাটা কিছুই নয় আর আমরা তো মাত্র ছ-সাত মাইলই যাওয়া-আসা করব।

ঋজুদা কী ভাবল একটুক্ষণ। তারপর বলল, ঠিক আছে। তবে রাত দু'টো অবধি ঘুরে ফিরে এসো।

আমি বললাম, তুমি একা থাকবে? জ্বর যদি আবার বাড়ে? তার চেয়ে রাজয়াডুকে রেখে যাই। ও স্মার্ট আছে। ও তোমার দেখাশোনা করবে। বন্দুকও চালাতে পারে। আমার বন্দুকটা ওকে দিয়ে যাব।

ঋজুদা কী ভেবে বলল, ঠিক আছে।

বাইয়ানির নাম নেই। হয়তো ছিল কখনও। সেই নামে ওকে আর কেউই ডাকে না। কী নিষ্ঠুর পৃথিবী।

ওই লোকটা, মেঘনাদ না কী নাম বললে, তার অবস্থা কেমন?

অবস্থা আর কেমন বাবু? এখানে কোটিপতি তো আর নেই কেউ। তবে দু' বেলার অন্ন জুটে যায়। একটা স্কুটারও কিনেছে। এখানের মাপে বড়লোকই বলা চলে। ধান চালের কারবারি।

ওকে ভয়ও দেখিয়ো। মানুষ যদি অমানুষ হয় তাহলে তাকে টিট করতে হয় কী করে, তা আমার জানা আছে। তুমি বলবে মেয়েটাকে সে যদি না দেখাশোনা করে, তার ভার না নেয় তবে ডি এম আর এস-পি-কে আমি বলে যাব।

ইঁ আইজ্ঞাঁ।

রামচন্দ্র দন্ডসেনা বলল।

যাকে নিয়ে এত আলোচনা সে ওই কটি পংক্তিই সুরেলা গলাতে গাইতে গাইতে সোজা পথ ধরে ধলাহান্ডির দিকে চলে যাচ্ছিল বাংলো অতিক্রম করে। দন্ডসেনা আর রাজয়াডু গিয়ে তার পথরোধ করে তাকে বাংলোর মধ্যে নিয়ে এল। ননা তাকে জিজ্ঞেস করল খাইবা-পিবা হেল্বা কি?

বাইয়ানি গান থামিয়ে হেসে বলল, হইখেলে। কালি রাত্তির।

দন্ডসেনা ননাকে বলল, খাবার তো বেঁচেছে ননা, ভাল করে খাওয়াও ওকে।

ইতিমধ্যে বাইয়ানি বারান্দায় বসে থাকা আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, নমস্কার আইজ্ঞাঁ।

ভটকাই তার হাতে-ধরা টর্চটার বোতাম টিপে বাইয়ানির মুখে ফেলতেই আমি চমকে উঠলাম। এ যে সেই বাঘে-খাওয়া রামের বউ-এর মুখ। হুবহু। মুখে ঠিক সেইরকম হাসি। গা ছমছম করে উঠল আমার।

সম্বিৎ ভাঙল ঋজুদার ধমকে। ঋজুদা ধমক দিল ভটকাইকে, কী অসভ্যতা করছিস। এ গরিব, অসহায়, পাগলি বলে কি যা নয় তাই করবি।

ঋজুদা জ্বরে তো কষ্ট পাচ্ছিলই। ভটকাই-এর অসভ্যতায় যেন আরও কষ্ট পেল।

এরকম হয় দেখেছি। ঋজুদার বুকে আমাদের দেশের সাধারণ গরিব অসহায় মানুষদের জন্য যে বোধ আছে, যার প্রমাণ আমি আর তিতির বহু বহুবার পেয়েছি, তা যদি আরও অনেকের বুকে থাকত তবে দেশের মানুষের অনেকেই উপকার হত।

বারান্দার সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়াল সে যখন তখন লণ্ঠনের আলোতে দেখলাম যে বাইয়ানির পরনে একটা রং চটে-যাওয়া লাল আর সবুজ হাতি ছাপের সম্বলপুরি সিল্কের শাড়ি। দু'-একটা জায়গাতে ছেঁড়াও। কারও ফেলে-দেওয়া শাড়ি হবে। তবে শুধুই শাড়ি। পরনে আর কিছুই নেই। মুখ চোখ কাটা কাটা। কোমর-ছাপানো চুল কিন্তু অযত্নে জট পড়ে গেছে। আর হাসিটা—কী আশ্চর্য! আমার তখনও গা ছমছম করছিল।

ওরা বাইয়ানিকে খাওয়াতে নিয়ে গেল রান্নাঘরে। বাইয়ানি আসাতে কিছুক্ষণের জন্য বাঘ আমাদের মাথা থেকে চলে গেল। ও খিলখিল করে হাসে। হাসতে হাসতে খাচ্ছিল ও আমরা খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম। একটু আগে কাঁদতে কাঁদতে গাইছিল। আশ্চর্য মেয়ে। কিন্তু মুখটা আর হাসিটা। এত মিল হয় কী করে কে জানে। এইসব জঙ্গল পাহাড়ে কত কী গোলমেলে ব্যাপারই না ঘটে। সেইসব জট খোলা হয়তো বাইয়ানির জট-পড়া চুল খোলার চেয়েও কঠিন।

আধঘণ্টাটাক পরে বেরোলাম আমরা। যেমন ঠিক হয়েছিল, রাজয়াডুকে ঋজুদার কাছে রেখেই গেলাম, আমার বন্দুকটা দিয়ে। আমি স্টিয়ারিং-এ বসলাম। আমার পাশে বাইয়ানি। ওর গায়ে কিন্তু কোনও দুর্গন্ধ ছিল না। আমার নাক কুকুরের নাক। আমার মা বলেন ঠাট্টা করে গন্ধ-গোকুল। আমার নাকও যখন পেল না তখন দুর্গন্ধ সত্যিই নেই অথচ ও কত অযত্নে অবহেলাতে থাকে।

পিছনে ভটকাই ঋজুদার ফোরফিফটি-ফোরহানড্রেড রাইফেল নিয়ে দাঁড়াল রড ধরে আর দন্ডসেনা তার বন্দুকটার কুঁদোটাকে দু'পায়ের পাতার উপরে রেখে নলটাকে দু' উরু দিয়ে চেপে রইল। জিপ তো পাঁচ মাইল স্পিডে চালাব। ওর বন্দুক স্থানচ্যুত হবার সম্ভাবনা নেই।

প্রথমে বাইয়ানিকে নামাতে যাব। তারপর ওকে ওর জ্যাঠামশায়ের বাড়ি নামিয়ে আমরা ধলাহান্ডির দিকে যাব এমনই ঠিক করলাম আমি আর দন্ডসেনা। বাঘের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই-ই বলতে গেলে। অত সহজে জিপ থেকে এই বাঘ মারা গেলে জল এতদূর গড়াবার আগে বাঘ একশোবার মরে যেত। তবে শিকারে কোনও কিছুরই স্থিরতা নেই। যেখানে প্রত্যাশা একেবারেই নেই সেখানেই সকলকে বোকা বানিয়ে বাঘ এসে উপস্থিত হয়েছে, এরকম বহুবারই হয়েছে। বাঘ যদি বেরোয় তবে ঋজুদা নয়, আমি নই, কালাহান্ডির অরাটাকিরির এই কুখ্যাত বাঘ মারা যাবে দ্য গ্রেট শিকারি মিস্টার ভটকাই-এর হাতে। সবই কপালের লিখন!

বাংলো থেকে বেরোতে না বেরোতে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। কোনও তর্জন-গর্জন নেই, বিদ্যুৎ-চমকানি নেই, বৃষ্টির আগে সচরাচর যে একটা হাওয়া বয় তাও নেই আকাশ যেন হঠাৎ বিনা নোটিশে উপুড় হল আমাদের মাথার উপরে। দু' মিনিটের মধ্যে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেলাম কিন্তু জিপ ঘুরিয়ে বাংলোতে ফিরলাম না। এই অলৌকিক বৃষ্টি হয়তো অলৌকিক কোনও ঘটনা ঘটাবে। পাঁচশো গজও যাইনি এমন সময়ে স্পটলাইটের তারটা ব্যাটারি থেকে খুলে গেল। ক্ল্যাম্পটা বোধহয় ঠিকমতো লাগানো হয়নি। হুডখোলা জিপটা ফুটো হওয়া নৌকো যেমন জলে ভরে যায় তেমনই ভরে উঠল জলে। এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছে যে উইন্ডস্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হেডলাইটের আলোটার সামনে রুপোর পাতের মতো বৃষ্টির আড়াল। আরও একশো গজ এগোতেই কশিপুর হাটে এসে পৌঁছলাম। আজ হাট ছিল। থাকলে কী হয়, বেলা তিনটের মধ্যে হাট উঠে গেছে বাঘের ভয়ে, নইলে হাট জমত দুপুর থেকে আর হাটুরেরা রাত ন-টা অবধি হেঁটে ফিরত যার যার গ্রামে। এখন সব নিয়ম-কানুনই পালটে গেছে। হাটের চালাঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে জিপ ঢুকিয়ে দিয়ে হাটের ঠিক মধ্যিখানে যে মস্ত অশ্বত্থগাছটা আছে তার তলাতে নিয়ে গেলাম জিপটাকে বৃষ্টির তোড় থেকে মাথা বাঁচাতে। স্পটলাইটের তারটাকেও লাগাতে হবে। আমাকেই নামতে হবে কারণ এক হাতে স্পটলাইট ধরে আর দু'-পায়ে কসরত করে বন্দুককে আটকে রাখা অবস্থাতে দন্ডসেনার পক্ষে নড়াচড়া করা অসুবিধের।

অশ্বত্থগাছের নীচে আসতে সত্যিই বৃষ্টির দাপট থেকে বাঁচা গেল। তবে একটু পরেই পুরো গাছ জলে ভিজে গেলে পাতা থেকে জল পড়বে টপটপিয়ে। বছরের প্রথম বৃষ্টিতে গরম মাটি থেকে বাষ্প উঠছে—গরম কড়াইয়ের উপরে জল পড়লে যেমন হয়, তেমন।

আঃ কী আরাম! এই বাক্যটি এখন কতশো বর্গমাইল এলাকার ঘরে ঘরে এই মুহূর্তে উচ্চারিত হচ্ছে তা কে জানে!

বাইয়ানি খুব মজা পেয়েছে। সে খিদে পেলেও হাসে, ভরপেট খেলেও

হাসে, এখন বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়েও হাসছে। আমার ভয় হচ্ছে সে জিপ থেকে নেমে দৌড় না লাগায়।

জিপের স্টার্ট বন্ধ করলাম না। তবে হেডলাইট নিভিয়ে সাইডলাইট জ্বালিয়ে রাখলাম শুধু। ভটকাইকে বললাম, ভটকাই একবার টর্চটা জ্বেলে চারদিকে ঘোরা। স্পটলাইটের তার লাগাতে হবে। নামব এবারে।

ভটকাই টর্চটা জ্বেলে চারধারে আলো ফেলল, তারপর বলল, নাম। অল ক্লিয়ার। তোর কোনও ভয় নেই। আমি তো আছিই তোর বডিগার্ড।

বললাম, ভয় যেমন নেই, ভরসাও নেই। আলো ছাড়া রাইফেল দিয়ে তুই কী করবি? আমাকে দে রাইফেলটা।

এমনিই বললাম কথাটা। ভটকাইও এমনিই তার হাতে-ধরা ঋজুদার ফোরফিফটি-ফোরহান্ড্রেড রাইফেলটা এগিয়ে দিল। আমি নেমে বনেটটা খুললাম। বনেটের নীচে একটা আলো ছিল রাতের বেলা ইঞ্জিন দেখার জন্য। সেই আলোর সুইচটা দিতেই দেখলাম যে স্পটলাইটের তারের ক্ল্যাম্পটা খুলে গেছে। ক্ল্যাম্পটা লাগাতে মাথা নিচু করেছি ঠিক সেই সময়ে বনেটের নীচের সেই আলোতে হঠাৎ চোখে পড়ল নিভন্ত লাল আগুনের মতো ভৌতিক দু'টো চোখ চালার মধ্যে। চালাটার তিনদিক ঘেরা একদিক খোলা এবং জিপটা যেখানে দাঁড় করিয়েছি সেইখানেই সেই চালার খোলা দিকটা। একটা নিচু বারান্দাও ছিল মাটির। ঘরটাও মাটির কিন্তু উপরে খড় আর তিনপাশে বাখারি।

আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। কোনও আওয়াজ করা সম্ভব ছিল না। তার প্রয়োজনও ছিল না। আমি যেন বাঘকে দেখতেই পাইনি এমনভাবে মাথা নিচু করা অবস্থাতেই বনেটের নীচের ফ্রেমে-রাখা রাইফেলটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে এক ঝটকাতে ঘুরেই ডানহাত দিয়ে রাইফেলের স্মল অফ দ্য বাট এবং ট্রিগার-গার্ডকে একইসঙ্গে ধরে ট্রিগার টানলাম চালার দিকে রাইফেলের নল ঘুরিয়ে। প্রথম গুলিটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এবার দু' হাতে রাইফেল হোল্ড করে দ্বিতীয় গুলিটিও যেখানে চোখ দেখেছিলাম সেইখানে করলাম। জিপের মধ্যে দাঁড়িয়ে-বসে-থাকা ওরা বোমা পড়ার মতো হেভি রাইফেলের জোড়া-গুলির শব্দে চমকে উঠে একই সঙ্গে বলল, কী হল? কী হল?

ওরা ভেবেছিল, লোডেড রাইফেলের গুলি আমারই গায়ে লেগেছে অসাবধানতায়। ওরা কী ভাবল তা তো আন্দাজ করতে পারলাম কিন্তু অরাটাকিরির বাঘ যে কী ভাবল বা কিছু ভাবার সময় আদৌ পেল কিনা, তা জানতে পেলাম না। পাঁচ হাত দূর থেকে মাথাতে এবং বুকে লাগা জেফরির ফোরফিফটি-ফোরহান্ড্রেড রাইফেলের সফট-নোজড গুলি বাঘকে জীবন ও মৃত্যুর তফাত পর্যন্ত বুঝতে দিল না। বেচারি। এতদিন জলের কষ্ট সকলেরই মতো তারও ছিল। তবে ক্যাট ফ্যামিলির কেউই উপর থেকে গায়ে জল পড়া পছন্দ করে না যদিও গরমের দুপুরে জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়

বাঘকে শরীরের জ্বালা জুড়োবার জন্য।

রাইফেলের অতর্কিত আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাইয়ানি ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। ভটকাই এবং দণ্ডসেনা বন্দুক বাগিয়ে জিপের পিছন দিয়ে হুড়দাড় করে লাফিয়ে নেমে আমার কাছে চলে এল। ওরা ভেবেছিল আমাকে রক্তাক্ত অবস্থাতে দেখবে। কোন অভিমানে আমি হঠাৎ আত্মহত্যা করলাম বা কোন অসতর্কতাতে এমন অ্যাকসিডেন্ট হল তা ওরা ভেবে পাচ্ছিল না।

আমি স্পটলাইটের ক্ল্যাম্পটা খুলে ফেলে দন্ডসেনাকে দিয়ে বললাম, এর আর দরকার নেই।

ভটকাই মুখ হাঁ করে বলল, ব্যা-ব্যা-ব্যা ব্যাপারটা কী?

আমি বললাম, টর্চটা কই?

এই তো।

দে আমাকে।

টর্চটা আমাকে দিতেই আমি টর্চটার সুইচ টিপে চালার ভিতরে আলো ফেললাম। বাঘটা সামনের দু' থাবার উপরে মাথা রেখে শুয়েছিল। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল চালাঘর।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে দণ্ডসেনা আর ভটকাই মহা চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

আমি বললাম, বাইয়ানির কপালগুণেই এই মানুষখেকোটা মারা গেল।

ভটকাই বলল, চিন্তা কর একবার। এই হাটের পাশ দিয়েই তো বাইয়ানি ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েক আগে একা একা গান গাইতে গাইতে হেঁটে গেছে।

বাঘ তখন এখানে হয়তো ছিল না, আবার থাকতেও পারে।

তারপর বললাম, বৎস, কী করিয়া বা কোন কারণে যে কী ঘটে তাহা কি পূর্বে জানা যায়?

তুই নিশ্চয়ই বাঘটাকে দেখেছিলি জিপ থেকে নামার আগে। পাছে আমি মেরে দিই তাই কিছু বলিসনি, না?

ভটকাই বলল, অভিমানভরে।

আমি বললাম, বিশ্বাস কর। আমি তো বনেটের আলোতেই দেখলাম। তাও একজোড়া লাল চোখের আভাস। রাইফেলটাকেও যে কেন চাইলাম তোর কাছে সেও এক রহস্য। আর বাঘও যে কেন এক লাফে বাইরে বেরিয়ে দৌড়ে চলে গেল না সেও আরেক রহস্য, আমাকে বা জিপের সামনে-বসা বাইয়ানিকেও সে দুই থাপ্পড়ে ফর্দাফাঁই করে মেরে দিল না কেন, তাও রহস্য।

দন্ডসেনা বলল, রুদ্রবাবু, চলুন বাংলোতে যাই আগে। ঋজুবাবু গুলির আওয়াজ নিশ্চয়ই শুনেছেন এবং শুনে চিন্তা করছেন।

বাঘ? এখানেই থাকবে?

নিশ্চয়ই। দশ গ্রামের লোক আসবে বাঘ দেখতে। তবে রাজয়াড়ুকে এখানে

পাঠাতে হবে জিপ নিয়ে, নইলে গাঁয়ের মানুষে বাঘের গোঁফগুলো সব হাতিয়ে নেবে। বলেই, তার বন্দুকটা শূন্যে তুলে দু'টি ব্যারেলই ফায়ার করে দিল। তারপর আরও দু'টি গুলি ভরে সে দু'টিও ফায়ার করল।

কেন করছ এরকম?

ভটকাই শুধোল।

কশিপুরের ঘরে ঘরে এই গুলির শব্দ অরাটাকিরির বাঘ যে মারা পড়েছে এই সুখবরই পৌঁছে দেবে। রাতারাতিই কত মানুষে এসে জমায়েত হবে এখানে দেখুন না। পানমৌরি আর হাঁড়িয়ার আর পানবিড়ির দোকান খুলে যাবে। নাচগান চলবে। গত আড়াইবছর হল এখানের এবং এই পুরো অঞ্চলের মানুষ বন্দি-জীবনযাপন করছে। মুক্তি পাবে ওরা। ডাবল আনন্দ হবে ওদের। একে বাঘ মারা পড়ল তায় বৃষ্টিও নামল।

আমি বললাম, বাইয়ানির কপালেই কিন্তু এটা ঘটল। বাইয়ানির একটা পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে যেতে বলতে হবে ঋজুদাকে। সেই মেঘনাদের বাড়ি যাবে না এখন? কি দন্ডসেনা?

না না, এখন রাবণ অথবা মেঘনাদ কারও কাছেই যাব না রুদ্রবাবু। এখন ঋজুবাবুর কাছে যাব। বাইয়ানিও আমাদের সঙ্গেই যাবে।

দন্ডসেনা বলল।